# সুশান্ত-সা

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ
মহালয়া ১৯৬০

প্রকাশক
বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য
পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর
যোগেশচন্দ্র সরখেল
ক্যালকাটা ওরিয়েণ্টাল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ
বিনয় সাহা



প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ক্যালপ্রিণ্টস
১০ রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

বাঁধাই
আলম এণ্ড কোং

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

পূজনীয় পিতৃদেব

স্বর্গীয় রায় কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত

বাহাদুরের শ্রীচরণে

## প্রথম পর্ব

এক
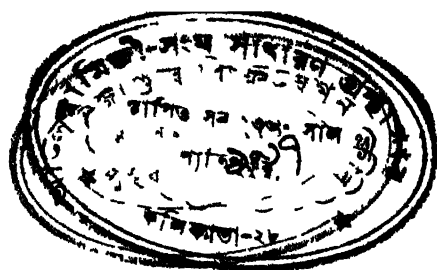
জীবনেব শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে, আমাব এই সৃষ্টিছাড়া হতভাগা জীবনের কাহিনী কেন যে লিখতে বসেছি আমি নিজেই জানি না। আমাব এই তুচ্ছ জীবনের ইতিহাস লিখি, বা নাই লিখি, এত বড জগৎটাব তাতে কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না, আমি তা বিলক্ষণ জানি। শুধু তাই নয়, এটাও আমি মর্মে মর্মে বুঝি যে, আমাব এই অভিশপ্ত জীবন যতশীঘ্র বিস্মৃতির অতল-তলে তলিয়ে যায়—ততই জগতেব কল্যাণ। এব স্মৃতি বাঁচিয়ে না বাখাই ভাল।

লিখতে বসেছি কেন? কোনও কৈফিয়ৎ নাই। লিখতে বসেছি, কেন-না আমাকে লিখ্‌তেই হবে। ভাবি, চিবন্তন সৃষ্টি-লীলাব আদি অনুপ্রেরণার ঢেউ কি শেষ পর্যন্ত আমাবও ভাঙ্গা বুকে এসে লাগল? মনে ত হয না। আজ যে আমাব প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গিযেছে। ঢেউ লাগবে কোথায়?

অথচ মনে পড়ে, একদিন ত সবই ছিল। জীবনের প্রথম প্রভাতে বড বড চোখ তুলে যখন পৃথিবীব দিকে চেযে দেখেছিলাম, ইচ্ছে হয়েছিল সমস্ত জগৎটাকে একদিন জয় ক'বে আমারই প্রাণেব মধ্যে বেঁধে ফেলব; আকাশ-বাতাস গাছ পালা নদী-মাঠ—সবই যেন সৃষ্টি হযেছে আমাবই জন্য। আমাব প্রাণেব আনন্দদানেব মধ্যেই যেন তাদেব সার্থকতা। জগৎটার উপব হেঁটে বেড়িয়েছি যেন আমারই লীলাভূমি।

বডলোকের ঘবে জন্মেছিলাম, দুঃখ কষ্ট—কৈ প্রথম জীবনে ত কিছুই পাইনি।

পিতা স্বর্গীয় রতনচন্দ্র সাহাচৌধুবী ছিলেন মাধবপুব গ্রামের স্বনামধন্য প্রতাপশালী জমিদার। বাংলাদেশের খুলনা জেলাব দক্ষিণ অঞ্চলে আজও তাঁর নাম লোকের মুখে-মুখে।

খুলনা সহব থেকে বরাবব দক্ষিণে জেলাবোর্ডের যে পাকা বাস্তা চলে

গ্রামের দক্ষিণেই ছোট নদীটি ব'য়ে গিয়েছে—নাম "বেগবতী"। রাস্তা নদীর ওপার দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে চলেছে, দূরে দূরে বিভিন্ন গ্রামে। মাধব গ্রামে রাস্তাটির শেষপ্রান্তে এপার-ওপার পার হওয়ার খেয়া।

এই "বেগবতী" নামটির একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। না আমারই আবিষ্কার। ছেলেবেলা থেকেই সকলের মুখে শুনেছি আমাদের গ্রামের নদীর নাম "শুক্‌না"। মনে পড়ে ছেলেবেলায় নামটি, আমাকে পীড়া দিত। মনে হ'ত অমন সুন্দর ছোট খরস্রোতা নদীটি, কত আম বাগান, বাঁশ বাগান, কত ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে কেমন এঁকে বেঁকে ব'য়ে গিয়েছে—তার কিনা অমন একটি কুৎসিত নাম "শুক্‌না"। ছেলেবেলায় বাংলাদেশের ভূগোল পড়তে পড়তে যখন সব নদীর নাম দেখতে পেয়েছি—পদ্মা, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মধুমতী, রূপনারায়ণ, ইছামতী ইত্যাদি—তখনই মনটা দুঃখে ভ'রে উঠ্‌ত—আমার গ্রামের নদীর নাম "শুক্‌না" হ'ল কেন? কেন রূপনারায়ণ না, কেন ইছামতী হ'ল না?

একদিন একটি ছোট গল্প মনে পড়ে। তখন আমি বোধহয় দশেকের বালক। স্কুলে আমাদের ক্লাসে মাধবপুর বাজারের দোকানদার জগবন্ধু ময়রার ছেলে ননী ময়রা পড়ত। বেশ গোলগাল চেহারা, গায়ের রং কালো, বড় বড় ভাসা-ভাসা চোখ, মাথার উপর সোজা চুল। মাধবপুরের বাজার ছিল ঠিক নদীর উপরেই এবং ননী ময়রার বাড়ী ও তাদের দোকানঘরের ঠিক পিছনে একেবারে নদীর গায়ে। বেচারী প্রায় ক্লাসে পণ্ডিতের কাছে মার খেত—কেননা কোনদিনই পড়া সে তৈরী ক'রে আসত না। একদিন পণ্ডিতমশাই তার কান দুটো মলে দিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলেছিলেন, "শুক্‌না নদীর জল খেয়ে আমাদের ননী ময়রার বুদ্ধি-সুদ্ধি সব শুকিয়ে গেছে।"

বেশ মনে আছে কথাটা আমার বুকে গিয়ে বাজল। ননী ময়রার দুর্দশার জন্য নয়, আমাদের গ্রামের নদীটিকে বিদ্রূপ করার জন্য। পণ্ডিতমশাই ছিলেন বিদেশী। মনে মনে শপথ করেছিলাম, আমি যখন বড় হ'য়ে গ্রামের জমিদার হব, সর্বাগ্রে এই পণ্ডিতমশাইটি বরখাস্ত করব। আমার বাবা ছিলেন স্কুলের সর্বময় কর্তা। রাত্রে বাবার কাছে নালিশও করেছিলাম পণ্ডিতমশাই নামে। বলেছিলাম, "রসিক পণ্ডিতমশাই কিছু পড়াতে পারেন না, উল্টে ছেলেদের ধরে ধরে মারেন।"

যাই হোক, সেই দিন থেকে উঠে পড়ে লাগলাম বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রমাণ করবার জন্য যে আমাদের নদীটির নাম শুক্না নয়। ওটা একটা ভুল চলতি নাম। আসলে আমাদের নদীটির নাম "চিত্রা"। ক্লাসের ছেলেদের কাছে জোর ক'রে বললাম যে, আমার এক মামা যিনি কলকাতায় কলেজে বি-এ পড়েন, তিনি বড় ইংরেজী ভূগোল প'ড়ে এ-কথা আমাকে ব'লে গেছেন, এবং একদিন রসিক পণ্ডিতমশাইএর কাছেও ক্লাসে একথা জোর ক'রে বলতে পিছপাও হইনি। কথাটার মধ্যে যে মোটেই সত্য ছিল না এমন নয়। আমার এক মামা কলকাতায় কলেজে বি-এ পড়তেন এটুকু সত্য। কিছুদিন পূর্বেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং শুনেছিলাম যশোর জেলায় "চিত্রা" নদী দিয়ে নৌকা ক'রে তাঁর শ্বশুরবাড়ী যেতে হয়।

যাই হোক, পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে একথা জোর ক'রে জাহির করলেও মনের মধ্যে জোর পেলাম কৈ? "শুক্না" নামটা মাঝে মাঝে মনটাকে পীড়া দিতে লাগলো, এবং "চিত্রা" নামটা এত চেষ্টা করেও কিছুতেই চালিয়ে দিতে পারিলাম না। এমন সময় হঠাৎ একদিন আমাদের গ্রামের নদীটির সত্য নামটি আমার কাছে ধরা পড়ল।

আমি তখন বোধ হয় তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। বাবা তখন সবেমাত্র জেলাবোর্ডের মেম্বর হয়েছেন। সদর থেকে ফিরে এলেন সঙ্গে খুলনা জেলার একটা মানচিত্র নিয়ে। খুলনা জেলার মানচিত্র পেয়েই আমি সোৎসাহে দেখতে লাগলাম আমাদের গ্রামটির নাম তাতে লেখা আছে কি না। খুঁজে খুঁজে গ্রামটির নাম বের করলাম তখন দেখলাম যে, আমাদের গ্রামের কাছে যে নদীটি বয়ে গিয়েছে, একটু পূবের দিকে গিয়ে তার নাম লেখা রয়েছে "বেগবতী।" "শুক্না" নাম কোথাও লেখা ছিল না।

উঃ, সে কী আনন্দ! কী তৃপ্তি! এখনও মনে পড়ে। আমার এতদিনের একটা বুকের কাঁটা আজ যেন খসে গেল। ভাবলাম আজই বিকেলে খেলার মাঠে এ কথা মিটিং ক'রে জাহির করতে হবে।

মাধবপুর গ্রামের নদীর পার দিয়ে পূব-পশ্চিমে যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে খুলনা জেলাবোর্ডের রাস্তাটি সোজা এসে সেই রাস্তায় মিশেছে ঠিক খেয়াঘাটের উপরে। এইখান থেকেই মাধবপুরের বাজার আরম্ভ—নদীর ধারে ধারে পূবের দিকে। এই বাজার ছাড়িয়ে আরও পূবে ঠিক নদীর উপরেই আমাদের স্কুল।

পশ্চিমের দিকে নদীর পার দিয়ে খানিকটা দূর বেশ ফাঁকা। গ্রাম্য রা

চলে গিয়েছে, একদিকে মাঠ ও নানান রকমের গাছ, ঝোপ ও ঝাড়, আর একদিকে বেগবতী নদী। আমাদের বাড়ী ছিল এই পথটির ধারেই গ্রামের একটু বাহিরে। নদীর ধারের এই থেকে একটি সরু পথ চলে গিয়েছে, সামান্য একটু উপরে শেষ হয়েছে আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণে। এটি আমাদেরই বাড়ীর পথ, লাল কাঁকর দিয়ে বাঁধান, দু'পাশে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী। এই পথটির পশ্চিমে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, তার পাড়েই বাঁধা ঘাট, এবং এই পুষ্করিণীর ঠিক উত্তরের দিকে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ী, ঠাকুর দালান, বাহির মহল, অন্দর মহল। পুষ্করিণীর দক্ষিণ এবং পশ্চিম পাড়ে আমাদেরই প্রশান্ত ফল-ফুল ও তরি-তরকারীর বাগিচা।

বাহির মহলে দোতালার উপর দক্ষিণ দিকের একটি ছোট ঘরে আমি পড়তাম। দুবেলা মাষ্টারমশাই এসে আমাকে পড়িয়ে যেতেন। এই ঘরটির দক্ষিণ দিকে দুটি জানালা ছিল, খুলে দিলে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় এবং ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখতাম, কেমন যেন একটা আনন্দ পেতাম, স্পষ্ট মনে আছে। আমাদের বাড়ীর পুকুরপাড়ের গাছগুলির মাথার উপর দিয়ে সারি সারি নারিকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেত দূরে বেগবতী নদী, তার দুই পার, ওপারে একটা নুয়ে-পড়া বাঁশঝাড়, তারপরে এক প্রকাণ্ড শিমুল গাছের মাথা ফুলে লাল হ'য়ে আছে এবং তার চারিপাশে এদিকে ওদিকে সেদিকে ছোট বড় নানান রকমের বৃক্ষরাজি এবং তারও ওধারে মনে হ'ত যেন কী একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা, মিশে গিয়েছে দিগন্তের সীমানায়, যেখানে নীল আকাশ নুয়ে পড়ে এসে ধরা দিয়েছে ধরণীর বুকে।

এই যে ছবি, আমার পড়বার ঘরের জানালা দিয়ে এই ছবি নিত্য আমার চোখে ধরা দিয়েছে সকালে, বিকালে, দুপুরে সন্ধ্যায় প্রকৃতির নানান ঋতুতে, নানান রূপে, নানান রঙে—এর এতখানি মহিমা, এ যে কেমন ক'রে ধীরে ধীরে—বালক আমি,—আমার সমস্ত প্রাণটা একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল —তখন ত কিছুই বুঝিনি। আজ ভাবি আর অবাক হই।

তবে একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার পড়বার ঘরের ঠিক গায়ে-লাগান পুবের বড় ঘরটায় ছিল বাবার বৈঠকখানা। দোতালায় দক্ষিণের দিকে পাশাপাশি এই দুটি ঘর। আর উত্তর দিকেও ঠিক ঐ রকম দুটি ঘর, সামনেরটিতে আমার দাদা পড়তেন। পিছনেরটিতে কতকগুলো অকেজো জিনিষ পড়ে থাকত, যথা—গোটা দুই ভাঙ্গা বাতির ঝাড়, পায়াভাঙ্গা একটা প্রকাণ্ড টেবিল, কতগুলো পুরোনো দেওয়ালগিরি, এবং কতকগুলো কাঁচ ভাঙ্গা,

ছিঁড়ে-যাওয়া ছবির ফ্রেম ও ছবি এবং এক পাশে ভাঁজ-করা গোটা তিন চার বড় বড় সতরঞ্চ। মাঝে একটা প্রকাণ্ড ঘর ছিল বিলাতি ধরণের গদী-আঁটা কৌচে সাজান, দেওয়ালে বড় বড় বিলাতি দৃশ্যের ছবি এবং মাঝখানে ঝুলতো একটা প্রকাণ্ড মোমবাতির ঝাড়। এইটিকে আমরা বলতাম "সাজান ঘর",—বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগতদের বসবার স্থান। বৈঠকখানা বাড়ীর একতলায় ছিল জমিদারীর সেরেস্তা। কর্মচারীরা কাজ করত।

হঠাৎ বাবা একদিন হুকুম দিলেন, আমার পড়বার ঘর সরিয়ে নিয়ে দাদার ঘরের পিছনদিকে সেই অকেজো ঘরটিতে বন্দোবস্ত ক'রে নিতে। কারণ শুনলাম, তাঁর ঠিক বৈঠকখানার পাশের ঘরেই দু'জন কর্মচারীর সেরেস্তা হওয়া দরকার।

শুনে প্রথমটা খুব আহ্লাদ হলো। বাবার বসবার ঘরের পাশেই পড়ার ঘর হওয়ার দারুণ আমাকে সব সময়ই একটু সন্ত্রস্ত ভাবে থাকতে হোত। আশা করেছিলাম পড়ার ঘর একটু দূরে হ'লে আমার স্বাধীনতা একটু বাড়বে বই কমবে না। হয়ত এটা একটা নূতনত্বের আনন্দ। মহা উৎসাহের সঙ্গে চাকর বাকরদের নিয়ে আমার পড়বার ঘর নূতন ক'রে সাজাতে সুরু করতাম। অকেজো জিনিষগুলো বেশীর ভাগই ছাদের উপর চালান হয়ে গেল, কেবল বড় টেবিলটা রাখা হোল কোণঠেসা ক'রে। আর ভাঁজ-করা সতরঞ্চগুলোর স্থান হোল এই টেবিলটার উপর! কিন্তু পড়তে বসে আমার যেন কেমন উৎসাহ চলে গেল। কেমন যেন ভাল লাগে না। পায়াভাঙ্গা ধূলোপড়া ঐ টেবিলটা এবং তার উপর ঐ ময়লা সতরঞ্চগুলো সর্বদাই চোখের সামনে রয়েছে—কেমন যেন ব্যথা দেয়। একটি মাত্র জানালা ঐ ঘরটির, তাকালে দেখা যায় আমাদের ঠাকুর-দালানের বড বড স্তম্ভ। বাহিরের দিকে তাকাই, আর মন যেন আমার বসে যায়।

অল্প কিছুদিন পরেই একদিন মাষ্টারমশায় পড়াশুনার অবহেলার জন্য যখন আমাকে তিরস্কার করলেন—আমার চোখে জল এল। বললাম, এ ঘরটাতে আমার মোটেই পড়তে ভাল লাগে না। মাষ্টারমশাই তিরস্কারের সুর আরও একটু তীক্ষ্ণ ক'রে বললেন "ছেলের কথা শোন! পড়বে ঘর, না পড়বে বই!" কথাটার যুক্তি অকাট্য। উত্তর দেওয়া চলে না।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। থেকে থেকে আমার যেন মনে হ'ত, কোথায় যেন আমার কি-একটা লোকসান হয়েছে; কি যেন আমার হারিয়ে গেছে

—এ রকমের একটাই মনোভাব। এর আবার আরও একটু কারণ ছিল। বাবার কড়া হুকুম ছিল, তাঁর অফিসে কিংবা সেরেস্তায় ছোট ছেলেরা কেউ কখনও যাবে না। এ রকম হুকুমের যে কি কারণ, ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে ভেবে দেখেছি কিছুই পাইনি—তবে এখন ভাবলে মনে হয়। বাবা ছিলেন অত্যন্ত সোজা, কড়া ধরণের মানুষ। চাকর-বাকর থেকে আরম্ভ ক'রে আমলা কর্মচারী, ছেলেমেয়েরা—এমন কি মা পর্যন্ত তাঁকে বিশেষ ভয় করে চলতেন। নিয়ম-কানুনের এতটুকু ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন তিনি সইতে পারতেন না, সেইজন্য সবাই ছিল সব সময় তটস্থ। তাঁর মতে এ সংসারে যে যে-অবস্থাতেই থাকুক না—সকলেরই জীবনের বিচরণ-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।—এই সীমা-রেখার বাইরে যাওয়ার কারুরই অধিকার নেই, এবং এ গণ্ডীর বাইরে গেলেই পরস্পরের বিরোধের সৃষ্টি হয়—সংসারে অঘটন ঘটে। তাই তাঁর মতে পরিবারের যিনি কর্তা তাঁর সর্বপ্রধান কর্তব্য সংসারে কি বড় কি ছোট সকলেরই জীবনের চারিদিকে সীমানা টেনে দেওয়া। তাই বোধহয় তাঁর মত ছিল, বড়দের অফিস সেরেস্তা ছোট ছেলেদের বিচরণ ক্ষেত্রের বাইরে। সেখানে গেলে ব্যাঘাতই ঘটবে, অনর্থই হবে, সুফল ফলবে না।

যাই হোক, ফলে হ'ল, সেই যে আমার পুরোনো পড়ার ঘর ছেড়ে দিয়ে এসেছি, তারপর থেকে বেশ কিছুদিন আর সে ঘরমুখো হইনি। আমার সেই দোতালার পড়বার ঘরের জানালা দিয়ে যে ছবিটা আমার চোখে ধরা দিয়েছিল, সে ছবিটি হারিয়েই গেল। সে লোকসান পূরণ হোল না।

আমার সেই ঘরটাতে যে দু'জন কর্মচারীর সেরেস্তা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনার কথা একটু বিশেষ ক'রে বলা দরকার। এই কর্মচারীটির নাম ছিল বাহার আলী নস্কর। আমরা সবাই তাঁকে আলীমিঞা ব'লে ডাকতাম। এই আলীমিঞার বাড়ী ছিল আমাদেরই গ্রামের উত্তরপূর্ব কোণে আর একটি ছোট গ্রামে, প্রায় মাইলখানেক দূরে—গ্রামটির নাম 'ভগতী'।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন আলীমিঞার বয়স ছিল বছর চব্বিশ-পঁচিশ, চেহারাখানা আজও চোখের সামনে ভাসছে। একহারা, গায়ের বর্ণ গৌর, ঘন কালো একরাশ চুল মাথায়, সব সময়ই যেন একটু উষ্ক-খুষ্ক, মুখে পাতলা পাতলা দাড়ী ও গোঁফ। কিন্তু বিশেষ ক'রে সে বয়সেই ভাল লাগত আমার আলীমিঞার চোখ দুটো। বড় কালো চোখে সব সময়েই যেন একটু বিষণ্ণতা মাখান, কেমন যেন একটু উদাস চাহনি। অত্যন্ত স্বল্পভাষী, উঁচু গলায় আলীমিঞাকে কখনও কথা কইতে শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না।

কিন্তু কথাটা আমার বুকের মধ্যে গিয়ে যেন তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধল। তারপর দু'দিন পর্যন্ত কথাটা উঠতে বসতে শুতে আমাকে ব্যথা দিয়েছে আজও মনে আছে! এই কথাটা পরে অনেক বার অনেকের মুখে শুনেছি, এবং যখনই শুনেছি, বেশ মনে পড়ে, প্রাণে একটা কষ্ট অনুভব করতাম।

একদিন শীতকালের সকালবেলা আমি আমাদের বৈঠকখানা দালানের সদর-বাড়ীর সামনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় দেখি আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টারমশাই আমাদেরই বাড়ীর দিকে আসছেন। সে দিনটা ছিল আমাদের স্কুলের বাৎসরিক প্রমোশনের দিন, তাই হেড মাষ্টারমশাইকে দেখেই আমার বুকটা কেমন দুর্ দুর্ ক'রে কেঁপে উঠল। তিনি আমাদের বাড়ীতে ঢুকেই আমাকে সামনে পেয়ে হেসে আদর ক'রে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন, "এবারও তুমি ফার্ষ্ট হয়েছ সুশান্ত! তোমার বাবাকে সেই খবরটা দিতে যাচ্ছি।" আনন্দ আমার বুকটা নেচে উঠ্‌ল। হঠাৎ দাদার কথা মনে পড়ল, জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা! দাদার কি হলো?" তিনি গম্ভীর হয়ে বল্লেন, "তোমার দাদার বোধ হয় এবারও হলো না। দেখি তোমার বাবা কি বলেন।" এই ব'লে তিনি বৈঠকখানা বাড়ীর ওপরে উঠে গেলেন।

শুনে বেশ মনে পড়ে, এক মুহূর্তে যেন আমার সমস্ত আনন্দ একেবারে নিভে গেল। গত বছরের কথা মনে পড়ল। দাদা থার্ডক্লাস থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে প্রমোশন না পেয়ে তিন দিন বিছানায় শুয়ে কেঁদেছিলেন। এবারও হলো না।

দাদার জন্য মনটা বড়ই অবসন্ন বোধ হ'তে লাগল। আমি আমাদের পুকুরের উত্তরের পাড়ের বাঁধা ঘাটের উপরে গিয়ে বসলাম—একটা পাতিলেবুর গাছের তলায়। এমন সময় চেয়ে দেখি—বাগানের ভিতর দাদা কোথায় ছিলেন জানি না—পুকুর পাড় দিয়ে হন্ হন্ ক'রে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। দাদার পায় এক জোড়া চটী এবং গায়ে একটা সবুজ রঙের আলোয়ান। চোখ দুটোর দিকে চেয়ে দেখি, একটা বিশেষ আকুল চাহনি। দাদার মুখের দিকে চেয়েই আমার মনটা কেমন হু-হু ক'রে উঠ্‌ল।

দাদার সেই বয়সের চেহারা আজ আমার মনে যেন আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, সব সময়ই জ্বলছে। একখানি সহজ-সরল মুখের উপর বড় বড় ভাসা ভাসা চোখে সব সময়ই একটা গভীর বিশ্বাসের ছায়া। চোখ তুলে যাই দেখতেন, তারই মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাসে আত্মনিবেদন করতেন—এইটেই ছিল যেন তাঁর প্রাণের সহজ ধর্ম, এবং তারই অভিব্যক্তি ছিল তাঁর সমস্ত অবয়বের মধ্যে,

সমস্ত ভঙ্গিমার মধ্যে। একটু হৃষ্ট-পুষ্ট গড়ন, শ্যামবর্ণ গায়ের রং এবং এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—এ সমস্তই ফুটিয়ে তুলত দাদার মুখখানার উপরে এমন একটা মমতা, যে তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা—সে যেন অসম্ভব! তাঁর মুখের দিকে চাইলে কেমন যেন মায়া হয়, তাঁকে ব্যথা দেওয়া যায় না।

দাদার মুখখানার গড়ন ছিল বড় সুন্দর। দাদার মুখের প্রশংসা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি এবং মুখের দিকে তাকিয়ে অতি সহজেই বিশ্বাস করেছিলাম, দ্বিধা করিনি। মুখের কোন একটী প্রত্যঙ্গের বিশেষ প্রশংসা না করা গেলেও সমস্ত মিলিয়ে এমন একটা পরিপূর্ণ সমাবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যে, দাদার মুখের সৌন্দর্যের প্রশংসা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত ছিল—এমন কথা বলা চলে না।

ছেলেবেলা থেকেই দাদা ছিলেন একটু বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চল্‌তি কথায় যাকে বলে 'বাবু'। আমার যতদূর মনে পড়ে ছেলেবেলা থেকে বরাবরই দেখেছি কোঁকড়া চুলের মাঝখানে সিঁথি কাটতেন—সব সময়ই সযত্ন-রক্ষিত। জামা-কাপড় সব সময়ই ছিল ফিট্‌ফাট এবং আমার মতন খালি পায়ে কখনও বেড়াতেন না।

ছেলেবেলা থেকে বড় শান্ত ছিল দাদার স্বভাব। ছেলেদের ছুটোছুটি হৈ-হৈ খেলা-ধূলোর মধ্যে দাদাকে খুব কমই দেখেছি, এবং খেলার মাঠে যদি বা কোনও দিন এলেন—চুপ ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতেন, যোগ দিতেন না। অতি স্বল্পভাষী, কথাবার্ত্তা খুব কমই বলতেন, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিপ হাতে করে পুকুরে বসে থাকতে কখনও ক্লান্তি দেখিনি।

দাদা এবারও ফেল করেছেন, কিন্তু পড়াশুনায় দাদার যে কিছু অবহেলা ছিল—তা নয়। দুবেলা মাষ্টারমশাইএর কাছে ত পড়তেনই এবং তা ছাড়া মাষ্টার চলে গেলেই আমার মতন বই খাতা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাতেন না। মাষ্টার চলে গেলেও দাদা অনেকক্ষণ ঝুঁকে পড়ে হয় পড়তেন, না-হয় লিখতেন, না-হয় অঙ্ক কষতেন। পরীক্ষার আগে ত দাদাকে দিনরাত পড়তে দেখতাম—পড়া ছাড়িয়ে আনতে মাকে অনেক বার বাইরে লোক পাঠাতে হ'ত। তবুও দাদা পরীক্ষায় যে কেন পাশ করতে পারতেন না, এটা ভেবে আমার সত্যই বড় আশ্চর্য বোধ হ'ত।

একটা কথা মাঝে মাঝে তখন প্রায়ই শুনতাম, "প্রশান্তর মোটে মাথা নাই, সুশান্তর খুব মাথা।" কথাটা প্রথম প্রথম ঠিক বুঝতে পারিনি। সময় সময়, ভেবেও দেখেছি মনে আছে এবং ভেবে সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে আমার মাথার

গড়নটা বোধ হয় দাদার চেয়ে বড়, তাই পড়া-শুনা আমার মাথায় ধরে বেশী। কিন্তু অত পড়াই বা তা হ'লে কেন—ধরবে কোথায় ?

তাই বোধহয় আমার একটু রাগ হ'ত যখন দেখতাম ছুটির দিন দুপুর বেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাদা চুপটী ক'রে মার কাছে বসে রামায়ণ কি মহাভারত শুনতেন। বেশ মনে পড়ে সে ছবি—ভিতরের বাড়ীর দোতলার পূবের বারান্দায় একটা মাদুর পেতে মা উপুড় হ'য়ে শুয়ে বুকের নীচে একটা বালিশ দিয়ে সুর ক'রে মহাভারত পড়তেন। আর দাদা পাশেই চুপ ক'রে বসে থাকতেন। আর কেউ বড় একটা থাকত না, কেবল মাঝে মাঝে ও-পাড়ার 'সাবির মা' শুনতে আসতেন। একদিন এইরকম সময় আমি হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার মত ছুটে উপরে গিয়েছি, বোধহয় কোন একটা খেলাধূলার জিনিষ আনতে। মা আমাকে দেখে পড়া বন্ধ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে ব'লে উঠলেন, "ছেলেটার মুখখানা দেখ না, রোদে একেবারে লাল হ'য়ে গিয়েছে। কোথায় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছিস্ এই দুপুর বেলা ?" সাবির মা বল্লেন, "আহা! সত্যিই ত চোখ দুটো পর্যন্ত লাল হ'য়ে উঠেছে।"

আমি এ-সব কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে আমার প্রয়োজনীয় জিনিষটী নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে গেলাম। যাবার সময় কানে গেল সাবির মা বলছেন "ছেলে তোমার এই বড়টি দিদি! আহা! যেন সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির। এমন ছেলে পাওয়া অনেক জন্মের পুণ্যের ফল।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবলাম, "মাথায় ত লেখাপড়াই ধরে না, তার উপর আবার এত মহাভারতের গল্প শোনা কেন ?"

মার কথার উত্তর দিলাম না, কেন না মাকে আমি মোটেই ভয় করতাম না। আমার মা ছিলেন অসাধারণ প্রকৃতির মানুষ। কখনও তাঁকে রাগতে দেখিনি। প্রাণখানা তাঁর সকলের জন্যই সব অবস্থায় দয়া ও দাক্ষিণ্যে ছিল ভরা। আহা! বেড়ালটাকে আজ বোধহয় তোরা কেউ খেতে দিস্নি, তাই বোধহয় অমন ক'রে ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে। আহা! মনুয়া চাকরটিকে তোরা কেউ ডাকিস্নি, আজ বেচারীর সকাল থেকে মাথা ধরেছে, বোধহয় জ্বর আসবে। আহা! অমন ক'রে মাগুর মাছটাকে আছড়ে আছড়ে মারিস্নি, শৈলি! তার চাইতে একেবারে কেটে ফ্যাল্—এই রকম ধরণের কথা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মার মুখে শুনতাম। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছি, মা আমার পাশে বসে হাতপাখায় হাওয়া করছেন, এমন সময় ঐরকম ধরণের কি একটা কথায় আমি মাকে বলেছিলাম, "আচ্ছা মা, গরু যখন বাগানের গাছ খাবে, তুমি গরুর জন্য আহা

করবে, না গাছের জন্য আহা করবে?" "ছেলের কথা শোন।" এই ব'লে মা একটু মৃদু হাসলেন।

আমার মার নামও ছিল দয়াবতী—সার্থক করেছিলেন তিনি নিজের নাম। আমার মা দেখতে ছিলেন কতকটা দাদার মত, কেবল দাদার চাইতে ছিলেন আরও একটু মোটা এবং গায়ের রং ছিল অনেক বেশী ফর্সা। ছেলেবেলা থেকে সকলের কাছেই শুনেছি যে, আমার মার মত সুন্দরী নাকি আমাদের সমাজে আর ছিল না। আমার ঠাকুরদাদা নাকি সাত গ্রাম খুঁজে বাবার জন্য ঐ মেয়ে পছন্দ করেছিলেন।

*   *   *   *

আমাকে ঘাটের পাড়ে দেখতে পেয়ে দাদা যখন আমার দিকে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে আসতে লাগলেন, দাদার চোখের দিখে চেয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। এখন দাদাকে কি বলি। ফেল হয়েছেন—একথা দাদার মুখের উপর বলবার নিষ্ঠুরতা আমার ছিল না। একবার ভাবলাম দাদা এখানে আমার কাছে এসে পৌঁছবার আগেই ছুটে পালাই। আবার ভাবলাম দাদা তা'হলে ভাববে কি!

দাদা আমার কাছে এসে ব্যাকুলকণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন "হ্যাঁরে সুশন্, হেড মাষ্টারমশাই এলেন না?—কেনরে?" বল্লাম, "কি জানি! বোধহয় বাবার সঙ্গে কি দরকার।" আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর সঙ্গে—কোন কথা হলো" এইবার কি বলি। মিথ্যাকথা ব'লে দাদাকে ঠকাতেও ভাল লাগছে না। আবার দাদার মুখের উত্তর অত বড় নিষ্ঠুর সত্যও বলতে বুকে লাগে। আস্তে আস্তে বল্লাম, "হ্যাঁ।" "কি বল্লেন?—প্রমোশনের কথা কিছু বল্লেন?"

বল্লাম "আমি এবার 6th. ক্লাসে উঠেছি।" ক্লাসে প্রথম হওয়ার কথাটা বলতে কি রকম বাধল।

ব্যাকুল ভাবে দাদা বল্লেন "আমার কথা? বলেছেন কি?" চট্ করে একটা বুদ্ধি মাথায় এসে গেল। বল্লাম "তোমার বিষয় বাবার কাছে বলবার জন্য উপরে উঠে গেলেন। তুমি এইখানে বসো, আমি শুনে আসছি।"

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ছুটে সেখান থেকে চলে গেলাম।

উপরের বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম দাদা চুপটি করে লেবুগাছ তলায় বসে আছেন—আমারই প্রতীক্ষায়। দাদার কাছে গিয়ে কি ভাবে সাজিয়ে কি

সব বলব—এই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আলীমিঞা এসে আমার হাত ধরলেন। আমি চম্‌কে উঠলাম।

"খোকাবাবু! দাদাবাবু—কোথায়?"

"কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"বাবু ডাকছেন।"

শুনে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। এত বড় নিষ্ঠুর খবর না জানি কি নিষ্ঠুর ভাবেই ওর কাছে প্রকাশ হবে। তারপর বাবার কাছে বেচারীর দুর্দশার সীমা থাকবে না। মনে পড়ল গত বছর বাবা শাসিয়েছিলেন "আসছে বছর যদি ক্লাসে উঠতে না পার—তোমায় বাড়ী থেকে দূর করে দেবো।" সবাই বলে বাবার যে কথা সেই কাজ। তাই ত কি হবে!

আলীমিঞাকে সত্যকথা বলতে পারলাম না; বললাম 'কি জানি'। আলী-মিঞা দাদাকে খুঁজতে চলে গেলেন।

এখন কি করি, একবার ভাবলাম ছুটে গিয়ে দাদাকে বলি 'পালাও'। কিন্তু কেমন যেন ভরসা হলো না। হঠাৎ মার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম যাই মাকে গিয়ে সব বলি যদি দাদাকে দুর্দশার হাত থেকে একটু বাঁচাতে পারেন। ছুটে বাড়ীর ভিতর চলে গেলাম।

মা তখন পূজো করছিলেন—পূজোর ঘরে। আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে ভয়ত্রস্ত সুরে মাকে সব বললাম। মা আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে বল্লেন "আচ্ছা, প্রশনকে এইখানে ডেকে নিয়ে আয়।" মার শান্ত সুরে কেমন যেন বুকে একটা ভরসা পেলাম।

ছুটলাম পুকুর-ঘাটের দিকে। গিয়ে দেখি দাদা নেই। চেয়ে দেখি খানিকটা দূরে দাদা আলীমিঞার সঙ্গে বৈঠকখানা বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন। এখনও স্পষ্ট মনে আছে—পিছন দিক থেকে দাদার চলে যাওয়ার ভঙ্গীটা যেন বড় করুণ, কেমন যেন আমার বুকের মধ্যে গিয়ে বাজলো। কেমন যেন দয়ায় সমস্ত প্রাণটা কেঁদে উঠল। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম দাদার সেই মমতা-মাখা মুখখানার সম্মুখে বাবার রুদ্রমূর্তি—দাদা চোরের মত দাঁড়িয়ে আছেন, চোখ ছল্ ছল্ করছে, বড় কাতর চাহনি। আমি সইতে পারলাম না। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো! ঘাটের পাড়ে সেই লেবুগাছ তলায় একদিক ওদিক চাই আর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছি—পাছে কেউ দেখে ফেলে!

যাই হোক, ফলে শেষ পর্যন্ত দাদাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হ'ল।

বিদেশ থেকে একজন বি-এ পাশ মাষ্টার এলো—আমাদের বাড়ীতেই থাকবেন ও দাদাকে তিন বেলা পড়াবেন।

## তিন

প্রায় বছর পাঁচেক কাটলো। আমি তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি; পড়াশুনায় ভাল ছেলে বলে, আমার একটা সুনাম তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বরাবর ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়ে উঠে এসেছি এবং গ্রামের সকলের কাছেই আদর-যত্ন খাতির—আমার যেন নিত্য পাওনা হয়ে উঠেছিল।

দাদার পড়াশুনা বাড়ীর মাষ্টারের কাছে বেশ ভালই হচ্ছিল—শুনতাম। ইংরেজী ভাষার উপর দাদার দখল কোনও কালেই হয়নি—হলোও না। কিন্তু বাংলা ভাষা, সংস্কৃত, অঙ্ক—ইত্যাদি বিষয়ে দাদা নাকি বেশ শিক্ষালাভ করেছেন।

শুধু তাই নয়, শুনে আশ্চর্য হয়েছিলাম, হিন্দু-শাস্ত্রের উপর দাদার নাকি এরই মধ্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে। দাদার বয়স তখন কুড়ি কি একুশ বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই দাদার স্বভাবের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। কথা এখন প্রায় বলেনই না, সমস্ত দিনে রাত্রে একটি-দুটি ছাড়া। দুবেলা ভাত খেতে বসে দাদা কারও সঙ্গে কথা বলতেন না এবং কি শীত, কি গ্রীষ্ম রোজই তিনবেলা পুকুরের ঘাটে অবগাহন স্নান করতেন এবং স্নান করে উঠেই ভিজে কাপড়ে মার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিতেন। রোজ দুবেলা মার পুজো করে গিয়ে কি সব জপ্ তপ্ করতেন এবং অমন যে চুলের বাহার ছিল, সেগুলোকে ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেলেছেন।

এ-সমস্ত শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণা দাদা যে কোথা থেকে পাচ্ছিলেন—সে খবরও আমার কানে এল। দাদার গ্রাজুয়েট মাষ্টারটীও ছিলেন ঐ দলেরই লোক। তাঁর নাকি কলকাতায় কে একজন সন্ন্যাসী গুরু আছেন, এবং সেই গুরুর শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি দাদাকে তৈরী করে তুলেছিলেন। মাংস বড় একটা বাড়ীতে রান্নাও হ'ত না এবং দাদা কোনকালেই খান না এবং বাবার ভয়ে স্পষ্ট "মাছ খাই না" একথা না বল্লেও আমি লক্ষ্য করতাম দাদার ঝোলের বাটীতে

প্রায়ই মাছ পড়ে থাকত—স্পর্শও করতেন না। দাদার মাষ্টারজীও অবশ্য যখন থেকে এলেন, তখন থেকেই শুনেছিলাম নিরামিষাশী।

যাই হোক, বাইরের এসব জিনিষের মূল্য কিছু থাক বা নাই থাক—ভিতরের দিক দিয়ে দাদার প্রাণের প্রসারতা যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল তারও স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। গ্রামের লোকের অসুখে-বিসুখে বিপদে-আপদে দাদা ছিলেন সর্বাগ্রণী। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর হাত থেকে রোগীকে বাঁচাবার জন্য দাদার অক্লান্ত সেবা একটা দেখবার জিনিষ ছিল—সে যেখানেই হোক না কেন। শুধু আমাদের গ্রামের নয়, আশে-পাশের গ্রামেরও কোন দুঃস্থ পরিবারের এই রকম কোনও বিপদের কথা শুনলে, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি রাত, কি দিন দাদা যেন অস্থির হয়ে উঠতেন, ছুটে যেতেন সেবা করবার জন্য।

একদিন একটা ব্যাপারে বিশেষ করে বুঝতে পেরেছিলাম দাদার প্রাণে প্রেমের গভীরতা কতখানি। তখন বর্ষাকাল! সকাল থেকে থেকে-থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। সমস্ত দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। এমন সময় আলীমিঞার গ্রাম থেকে একটি লোক ছুটে এল, মাথায় ছাতি, হাতে একটা লাঠি ও হ্যারিকেন। ছুটে এসে খবর দিলে আলীমিঞার বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতেই একটী ছেলেকে সাপে কামড়েছে। আলীমিঞা অবশ্য তৎক্ষণাৎ নিজের বাড়ী অভিমুখে রওনা হলেন এবং দাদারও বিশেষ ইচ্ছে হ'ল আলীমিঞার সঙ্গে যান। কিন্তু দাদার সকাল থেকে শরীরটা ভাল ছিল না, জ্বরভাব হয়েছিল—তাই আমি দাদাকে এই বাদলায় বেরুতে বারণ করলাম। বললাম "তুমি যখন সাপের ওঝা নও, তখন তুমি গিয়ে আর বেশী কি করবে।" আমার যুক্তিযুক্ত নিষেধ শুনেই হোক বা বাবা বাড়ীতে ছিলেন তাঁর ভয়েই হোক, দাদা চুপ করে গেলেন।

আমি আর দাদা এক ঘরে শুতাম। উপরে ভিতর মহলে পাশাপাশি চারখানা ঘর এবং সামনে পুবে বারান্দা। দক্ষিণের ঘরটাতে বাবা ও মা শুতেন, তার পাশের ঘরটাতে কেউ শুত না, তার পাশের ঘরটাতে শৈলি ঝি শুত এবং উত্তরের ঘরটাতে শুতাম আমি এবং দাদা। রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুয়েছি—বাইরে বনে-বনে, গাছে-গাছে, ঝুম্ ঝুম্ একটা বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার ঘরে চোখ বুজে সেই শব্দসমূহ প্রাণ-মন দিয়ে শুনতে শুনতে শরীর অলস হয়ে ঘুম এল। এমন সময় দাদা হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলেন। আমাকে ঠেলে বল্লেন, "দেখ্ সুশন, একটা বড় ভুল হয়ে গেছে।"

আমি বল্লাম "কি হলো আবার [illegible]

"আশীর্মিঞাকে বলে দেওয়া হয়নি, ছেলেটিকে যেন ঘুমুতে না দেওয়া হয় তাহলেই সর্বনাশ! ঘুমুলেই সাপের কামড়ে রক্ষে নেই।"

আমি বল্লাম "সে যা হওয়ার এতক্ষণে হয়ে গেছে। এখন আর ভেবে লাভ কি?"

দাদা বল্লেন, "তা বলা যায় না। দেখ্, আমি একবারটী যাই। যাব আর আসব। কেউ টের পাবে না।"

আমি বল্লাম, "তুমি কি পাগল হলে নাকি; তোমার জ্বর, বাইরে এই বৃষ্টি পড়ছে, আর তুমি এই রাত্রে জল-কাদায় অন্ধকারে ভগবতী যাবে?"

দাদা বল্লেন, "হয়ত আমি গিয়ে পড়লে ছেলেটা বেঁচে যেতে পারে।"

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গানর দরুণ আমার একটু রাগও হয়েছিল। একটু রুক্ষস্বরে বল্লাম 'সে হয় না দাদা। তুমি চলে গেলে আমি এ ঘরে একলা শুতে পারব না আর তোমারও অন্ধকারে দু'মাইল রাস্তা একলা যাওয়া হতে পারে না।"

বেশ মনে আছে, দাদা আর কিছু বল্লেন না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালবেলা শুনেছিলাম, ছেলেটী শেষরাত্রে মারা গিয়েছে। শুনলাম ছেলেটি বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মা শোকে প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠেছে। শুনে কেমন যেন একটা লজ্জা হ'ল আমার দাদার কাছে।

* * *

মুকুন্দ একদিন আমাকে বল্লে 'শুনেছ শান্তদা, বড়দার সঙ্গে যে মন্টির বিয়ে?' শুনে আমি অবাক হয়ে মুকুন্দর মুখের দিকে চাইলাম। কৈ এত বড় খবরটা কিছুই আমি শুনিনি।

মুকুন্দর একটু পরিচয় দি। মুকুন্দচরণ সাহা জ্ঞাতি-সম্পর্কে আমার ভাই হয়। বেশী দূরের সম্পর্ক নয়! শুনেছি নাকি মুকুন্দর বাড়ীতে কেউ মারা গেলে আমাদের এখনও একমাস অশৌচ প্রতিপালন করা বিধি।

মুকুন্দরাও জমিদার। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঠিক নদীর পাড়েই মুকুন্দদের বাড়ী। একতালা থেকে আমাদের পুকুর-পাড়ের বাগান আড়াল করে, কিন্তু আমাদের বাড়ীর দোতলা থেকে মুকুন্দদের বাড়ীর বারান্দায় মোটা মোটা থামগুলি দুটো বড় বড় কদম্ব গাছের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। মোটের উপর আমাদের বাড়ীর চেয়ে ছোট হলেও মুকুন্দদের বাড়ীটি দেখতে অনেক সুন্দর। বিশেষ করে সব চেয়ে আমাকে মুগ্ধ করত নদীর পাড় থেকে মুকুন্দদের বাড়ীর ছবিটি। বেগবতী নদীর পাড়ের রাস্তাটার

ধারে ধারে বড় বড় দেবদারু গাছের মধ্য দিয়ে দেখা যায় মুকুন্দদের বাড়ীর মোটা মোটা থামওয়ালা বারান্দা বাড়ীর তিনদিকে ঘুরে গিয়েছে।

বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় অনেক সময় নদীর কিনারা হতে মুকুন্দদের বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে আমি ভেবেছি মুকুন্দদের বাড়ীটা যদি আমাদের হত।

গ্রামের লোকেরা মুকুন্দদের বাড়ীকে 'ছোটবাড়ী' ও আমাদের বাড়ীকে "বড়বাড়ী' বলত। আমার বাবা ছিলেন গ্রামের 'বড়বাবু' এবং 'ছোট বাবু' ছিল মুকুন্দর বাবার পরিচয়। শুনেছিলাম জমিদারীর দশআনি অংশ আমাদের এবং ছ'আনি মুকুন্দদের।

ছেলেবেলা থেকেই মুকুন্দ আমার বড় অনুগত। আমার চাইতে দু'তিন বছরের ছোট সে—আমাদের গ্রামের স্কুলেই পড়ত। মুকুন্দ এখন চতুর্থ শ্রেণীতে (ফোর্থ ক্লাশে) পড়ে এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশীর ভাগই ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। আমার মত মুকুন্দের বাড়ীতে পড়াবার জন্য তার কোনও মাষ্টার ছিল না এবং সেইটে ছিল আমার সঙ্গ পাওয়ার তার সব চেয়ে বড় সুবিধা। 'শান্তদার কাছে পড়া বুঝে আসি'—এই কৈফিয়তের জোরে আমাদের বাড়ীতে যখন তখন তার গতিবিধিতে কোনও বাধা ছিল না, এবং লেখা-পড়ায় গ্রামে আমার অসামান্য সুযশের দরুণ আমার কাছে 'পড়া বোঝার' মূল্যটা পিতা কেশবচন্দ্র সাহা চৌধুরীকে বোঝাতে মুকুন্দর বিন্দুমাত্র ক্লেশ পেতে হয়নি।

মুকুন্দ ছেলেটাকে আমি বড় ভালবাসতাম। মিষ্টি মিষ্টি কথা, মেয়েলী ধরণের চেহারা এবং মিহি গলার সুর। মোটের উপর তাকে দেখলেই কেমন যেন ভাল লাগত আমার। রোগা ছোট হাল্কা ধরণের গড়ন, ফর্সা গায়ের রঙ, ছোট ছোট চোখ, লম্বা ধরণের মুখ, পাতলা পাতলা ঠোঁটে সব সময়ই একটা হাসি লেগে থাকত। এ ছাড়া তার গুণও ছিল অনেক, বড় মিষ্টি গান গাইত সে—অন্ততঃ সে বয়সে আমার বিশেষ ভাল লাগত। মনে পড়ে, নদীর ধারে কতদিন সন্ধ্যাবেলা স্কুলের খেলার মাঠ হতে বাড়ী ফিরবার পথে আমি ও মুকুন্দ নদীর কিনারায় জলের একেবারে ধারে গিয়ে খানিকক্ষণ বসতাম, মুকুন্দ গান গাইত আমি শুনতাম! উচ্চকণ্ঠে গলা কাঁপিয়ে মুকুন্দ গান গাইত—

"আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা"—

শুনতে শুনতে ওপারের ঐ দূর-দিগন্তের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কী যে আমার

মনে হ'ত, আমি যেন কেমন এক রকম হয়ে যেতাম, আজও মনে পড়ে। তারপর মনে পড়ে ধীরে ধীরে ওপারের ঐ নুয়ে-পড়া বাঁশঝাড়টা অন্ধকারে একটা সহস্র-হস্ত দৈত্যের মত দেখাত—যেন আমাদের ধরবার জন্য ঝুঁকে এগিয়ে আসছে। মুকুন্দ ভয় পেত, আমারও শরীর শিউরে উঠত। দু'জনে উঠে পড়তাম।

বেশ মনে আছে, দাদার সঙ্গে মন্টির বিয়ে—কথাটা শুনে আমি মোটেই খুশী হতে পারিনি।

মন্টি মেয়েটাকে আমি দু'-একবার দেখেছি। মন্টি মুকুন্দেরই মামাত বোন। মাঝে মাঝে মুকুন্দদের বাড়ীতে বেড়াতে আসত। আমাদের গ্রামের দশ-বারো ক্রোশ পশ্চিমে ত্রিচলা গ্রামে তাদের বাড়ী। বেগবতী নদী দিয়ে নৌকা করে তাদের বাড়ী যাওয়া যায়।

মন্টি মেয়েটাকে শেষ দেখেছিলাম, বছরখানেক আগে। বেশ ভাল করে যে লক্ষ্য করেছিলাম, এমন কথা বলতে পারি না, তবে তাকে দেখে আমার যা ধারণা হয়েছিল তাতে তাকে 'সুন্দরী' কোনও দিক দিয়েই বলা চলে না। গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না হলেও—কালো। একহারা লম্বা গোছের গড়ন, মুখের কোথাও কিছু বিশেষত্ব ছিল বলে মনে পড়ে না।

তাই বোধ হয়, মন্টির সঙ্গে দাদার বিয়ে, কথাটা আমার ভাল লাগেনি। আমার দাদা, মাধবপুরের সা চৌধুরীদের ঘরের ছেলে, রতন সা'র জ্যেষ্ঠ পুত্র, তার সঙ্গে কিনা একটা অতি সাধারণ কালো মেয়ের বিয়ে হবে। কথাটায় আমার মন মোটেই সায় দিল না।

শুধু তাই নয়, বছরখানেক বছর দেড়েক থেকে একটি রঙ্গিন সাড়ী পরা, মুখের উপর অর্দ্ধেক ঘোমটা টানা, টুকটুকে ফর্সা, পায় আলতা মাখান, একটি ছোটখাট বৌঠান আমাদের বাড়ীতে অন্দরে বিদ্যুতের মত ত্বরিতপদে এঘরে-ওঘরে বারান্দায় একটা রূপের লীলায়িত তরঙ্গে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে, তার চাপা হাসিতে চাপা কথায় সমস্ত অন্দরমহলটা একটা নতুন রসের শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠছে—এই রকম একটা কল্পনা আমার মনটাকে পেয়ে বসেছিল। যখন এই ছবি আমার মনে ভেসে উঠত, তখনই তাকে আমার প্রাণের রঙে রঙ্গিন করে তুলেছি—প্রাণভরা প্রীতির নব নব রসে।

কথাটা যেদিন প্রথম শুনেছিলাম, সেদিনের কথাও ভুলিনি। একদিন দুপুর বেলা, এই বেলা ১টা আন্দাজ, আমি আমাদের একতালার একটা ঘরে জানালার উপর উঠে বসে একটা গল্পের বই পড়ছিলাম। খানিকটা বই পড়তে পড়তে

কখন যে বই বন্ধ করে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে—ঝাঁ-ঝাঁ স্তব্ধ দুপুরের রোদ, আমাদের বাড়ীর পিছনে একটা খোলা প্রান্তরের উপর ছড়ান কতকগুলি বাবলা গাছ এবং আরও কিছুদূরে প্রকাণ্ড একটা তেঁতুল গাছের চারিধারে ছড়ান ছড়ান বাঁশঝাড়ের বন—এই সব দেখতে দেখতে একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গেছি, নিজেই জানি না ; এমন সময় হঠাৎ টের পেলাম ঘরের বারান্দায় বাবা ভাত খেতে বসেছেন, আর মা একখানা হাত-পাখা নিয়ে বাবাকে বাতাস করছেন। একটা কথা আমার কানে এল।

মা বাবাকে বল্লেন, "বড় ছেলেটার এই বেলা একটা বিয়ে দাও, নৈলে যে রকম ওর মতিগতি দেখছি, শেষ অবধি একেবারে বিবাগী না হয়ে যায়।"

কথাটা শুনে কেমন যে আশ্চর্য হয়ে গেলাম! বিয়ে, দাদার বিয়ে, আমার একটি বৌঠান! সেই থেকে সুরু হ'ল আমার কল্পনা! নানান রূপ নিয়েছে এই বছর দেড়েক ধরে।

তাই, মন্টি হবে আমার বৌঠান—কথাটা কেমন যেন অসম্ভব ঠেকল। মুকুন্দকে বল্লাম "দূর যত বাজে কথা।"—

মুকুন্দ বল্লে—"সত্যি বলছি শান্ত দা! আজ সকালেই রাঙা মামীর পত্র এসেছে মার কাছে।"

আমি চল্লাম, "চলত ভেতরে মাকে জিজ্ঞাসা করি।"

আমি আর মুকুন্দ ভেতরে গেলাম। মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি প্রাঙ্গণ থেকেই চেঁচিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"হাঁ মা, দাদার সঙ্গে নাকি মুকুন্দর বোন মন্টির বিয়ে?"

মা একটু হেসে বল্লেন—"হাঁ, সেই রকম ত কথা হচ্ছে।"

নেহাত মুকুন্দ সামনে ছিল। নৈলে আমি তখনই মার কাছে জোর করে বলে বসতাম—"তা কিছুতেই হতে পারে না।"

## চার

সেইদিন সকাল বেলায়ই মুকুন্দ চলে যাওয়ার পরে আমি মার কাছে গিয়ে কথাটা আবার তুললাম। বললাম "মা শেষ পর্যন্ত তোমরা এক কালো মেয়ের সঙ্গে দাদার বে দেবে?"

মা বললেন "ওঁর মেয়ে ভারি পছন্দ হয়েছে। বললেন বড় সুন্দর লক্ষ্মীশ্রী।"

বললাম "কিসে যে এত পছন্দ হ'ল তা ত জানি না মা! তুমি চেষ্টা করে বে-টা ভেঙ্গে দাও। আমার এ বে মোটেই ভাল লাগছে না। খুঁজলে এর চাইতে ঢের সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাবে দাদার জন্য।"

মা বললেন "সে আর হয় না সুশন! উনি কথা দিয়েছেন।"

বাবার কথা দেওয়ার মূল্য যে কতখানি, তা আমি ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি। তাই আর কোনও কথা বললাম না। মা আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন "কালো মেয়েতে তোর এত আপত্তি, তোর বেলায় যাতে খুব সুন্দরী মেয়ে ঘরে আসে সেই ব্যবস্থাই করব।"

কথাটা শুনে কেমন একটু লজ্জা হ'ল তাড়াতাড়ি বললাম "আহা। আমি সেই কথা বললাম বুঝি।"

দাদার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মন্টির বিয়ে মনটা সমস্ত দিনই কেমন যেন একটু ভারি হয়ে রইল। কিন্তু সেই দিনই বিকালবেলা এক ব্যাপার ঘটল এবং তাতে করে এ কথাটা আমার মনের মধ্যে একেবারে চাপা পড়ে গেল অন্ততঃ কিছু-দিনের জন্য।

আমাদের গ্রামের ফুটবল ক্লাবের আমি ছিলাম ক্যাপ্টেন। আমি নিজে যে খুব ভাল ফুটবল খেলতাম, তা নয়। কিন্তু কতকটা গ্রামের বড়বাবুর ছেলে হওয়ার দরুণ, এবং কতকটা আমার লেখাপড়ার খাতির জন্য খেলার মাঠের সব ছেলেরা মিলে আমাকেই ক্যাপ্টেন বানিয়েছিল।

কিছুদিন হ'ল গ্রীষ্মের ছুটির পরে স্কুল খুলেছিল, এবং স্কুল খোলার পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই আমাদের গ্রামের সঙ্গে 'বিলখালি' গ্রামের ম্যাচ হয়ে গেল, এবং তাতে বিলখালি আমাদের এক গোল দিলেও শেষ পর্যন্ত আমরাই এক গোলে জিতলাম। বিলখালি আবার আমাদের তাদের গ্রামে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়েছে। সেই বিষয় বিস্তারিত বিবেচনা করার জন্য আজ বিকেলে আমাদের স্কুলের খেলার মাঠে বড় বটগাছ তলায় ক্লাবের সভ্যদের এক মিটীং হবে। চারটে বাজতে না বাজতেই আমি ও মুকুন্দ খেলার মাঠ অভিমুখে রওয়ানা হলাম।

আমাদের খেলার দলে সবচেয়ে ভাল খেলত—হরিশ সেন বলে একটি ছেলে। কালো রং, ছিপ ছিপে রোগা লম্বা গোছের চেহারা এবং মুখের মধ্যে একটা বিরাট নাক ছাড়া তার যেন আর কিছুই ছিল না। সে স্কুলে আমার এক

ক্লাস উপরে পড়ত—এইবারই দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উঠেছে। লেখাপড়ায়ও ভাল ছেলে শুনেছি এবং স্কুলে তার বেশ একটা খাতির ছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই হরিশ সেন ছেলেটিকে আমি কোন কালেই পছন্দ করিনি। কি যে তার কারণ, এখন ভেবে দেখলে বিশেষ কিছু খুঁজে পাই না তবুও ছেলেটিকে দেখলেই আমার যেন কি রকম রাগ হ'ত। মনে হ'ত ও যেন সব সময়ই আমাকে অবহেলা করছে, তাচ্ছিল্য করছে।

এখন ভেবে বুঝতে পারি হরিশ সেন আমার প্রতি ব্যবহারে স্বেচ্ছাকৃত কোনও অভদ্রতার দোষে দোষী ছিল না। স্বভাবতঃই সে ছিল একটু আত্মাভিমানী এবং কারুরই মনস্তুষ্টির জন্য অযথা ব্যবহার বা বাক্যব্যয়—এসব ছিল একেবারেই তার স্বভাববিরুদ্ধ।

তাই যখন খেলার মাঠে ছেলেরা আমারই মনোরঞ্জনের জন্য আমারই উপাদেয় কথা বলতে এতটুকু দ্বিধা করত না, হরিশ সেন চুপ করে থাকত এবং প্রয়োজন হলে তীব্র প্রতিবাদ করতে তার এতটুকু ভয় ছিল না।

নিতান্ত গরীবের ছেলে ছিল সে। তার বাপ শ্রীযদুনাথ সেন বিদ্যানিধি ছিলেন আমাদেরই গ্রামে কবিরাজ। এই বছর দুই হ'ল আমাদের গ্রামে এসে ব্যবসা সুরু করেছেন। বাপ আর ছেলে মাধবপুর বাজারে রামচরণ ভুঁইয়ার প্রকাণ্ড চালের দোকানের পাশের ছোট ঘরটি ভাড়া নিয়ে কোনও রকমে নিজেদের একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। ঘরে একটি তক্তপোষ পাতা ছিল—বাপ আর ছেলে রাত্রে শুতেন। ঘরে গোটা দুই পুরোনো ময়লা কাঁচের আলমারি ছিল—বাপের ওষুধপত্র থাকত। এই ঘরের সঙ্গে রামচরণ ভুঁইয়ার পিছনের বারান্দার একটু কোণে বাপ ও ছেলে ভাগাভাগি করে নিজেরাই নিজেদের রান্না করে নিতেন।

যাই হোক, লেখাপড়ায় ভাল ছেলে, মাঠে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বিশেষ করে বিলখালির সঙ্গে ম্যাচে শেষ পনর মিনিটের মধ্যে ফুটবল খেলায় অদ্ভুত কৌশল দেখিয়ে পর পর দুটি গোল হওয়ার দরুণ গ্রামের ছেলেদের মধ্যে সে একটা "হিরো" হয়ে উঠেছিল এবং একটি দুটি করে ক্রমেই তার ভক্তের দল যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে—আমার অগোচর ছিল না।

পথে যেতে যেতে মুকুন্দকে বললাম "দেখ মুকুন্দ, হরিশ সেন যদি আজ আমার কথায় উপর কথা কয়, আমি তাহলে খেলার মাঠ ছেড়ে চলে আসব—এসব ব্যাপারের মধ্যে থাকব না।"

মুকুন্দ বল্লে "সে কি কথা শাস্তদা! তুমি ক্যাপ্টেন, তোমার কথা ত সকলকেই মেনে চলতে হবে!"

আমি বললাম "তা ত জানি, আর সবাই মানবেও। কিন্তু হরিশ সেন ছেলেটার বড্ড গুমোর। ভাল খেলে বলে ও যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে।"

মুকুন্দ বল্লে "তাই বলে ক্যাপ্টেনের কথা না শুনলে সবাই চাঁটি মেরে ওকে ঠিক করে দেব না।"

পথে একটা বিশেষ কিছু কথা হ'ল না। স্কুলের পাশের নদীর ধারের সেই সেই বটগাছ তলায় গিয়ে দেখি বেশীর ভাগ ছেলেরাই এসে হাজির হয়েছে। সেই বটগাছতলায় একটা বসবার জায়গা বড় সুন্দর ছিল, গাছের একটা বেশ মোটা রকমের শিকড় গাছের গুঁড়ি থেকে বেরিয়ে বেঁকে গিয়ে একটু দূরে মাটির সঙ্গে মিশেছে। এই শেকড়টার উপর বসে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিলে বেশ আরাম পাওয়া যায়, কতকটা ইজিচেয়ারে বসবার মত। যতীন বলে একটি ছেলে এই জায়গাটি দখল করে বসেছিল। আমাকে দেখেই যতীন উঠে বললে "বসো শাস্তদা! তুমি এইখানটায় বসো।"

আমি গিয়ে সেইখানটায় বসলাম। মুকুন্দ আমার পায়ের কাছটাতে বসল।

আমি একবার চারদিকে চেয়ে বললাম "কৈ, হরিশবাবুকে দেখতে পাচ্ছি না।"

ননী ময়রা বল্লে "হরিশবাবু এখুনিই আসবে। তার বাপ তাকে কোথায় একটা কি কাজে পাঠিয়েছে। আমাকে বলে দিয়েছে চট করে সে কাজটা সেরেই চলে আসবে।"

আমি ক্যাপ্টেনী সুরে বললাম "এ বড় অন্যায়। ঠিক চারটের সময় আমাদের মিটিং বসবার কথা ছিল। চারটে অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে।"

আমি আশা করেছিলাম দু'-চার জন আমার কথা সমর্থন করবে। কিন্তু কেউ কোনও কথা কইলে না। আমার একটু রাগ হ'ল।

এমন সময় আমরা সবাই দেখতে পেলাম দূরের মাঠের উপর দিয়ে হরিশ আসছে। খুব যেন হন হন ছুটে আসছিল তা নয়, বরং একটু মন্থর গতি।

মুকুন্দ আমাকে চুপি চুপি বল্লে "চাল দেখছ শাস্তদা!"

হরিশ এলো; এদিকে ওদিকে চেয়ে একটু দূর থেকে একটা ভাঙ্গা ইট নিয়ে এসে সেইটের উপর বসল। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে "কি ঠিক হ'ল—বিলখালিতে খেলতে যাওয়া হবে ত?"

মহিম বল্লে "শুধু ত আমাদের ইচ্ছায় হবে না, গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে খেলতে গেলে হেডমাষ্টার মশায়ের মত নেওয়া দরকার।"

আমি বল্লাম "তার জন্য আটকাবে না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে মাধবপুর যদি বিলখালির সঙ্গে খেলতে যায় তাহলে যেন একটা গোলও না খায়।"

হরিশ বল্লে "তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে।"

আমি বললাম 'সে ভরসা যদি না থাকে ত খেলতে না যাওয়াই ভাল। বিলখালি গিয়ে মান-সম্মান খোয়াতে আমি রাজী নই।"

হরিশ বলল "তা ভাবলে ত কোথাও খেলতে যাওয়া চলে না।"

বিপিন বল্লে তা ত বটেই। বিলখালি টিমও বেশ জোরের। জেতা যে খুব সহজ হবে বলে আমার মনে হয় না।"

আমি বললাম "তাহলে দরকার নেই গিয়ে।"

বিপিন বল্লে "কিন্তু শান্তবাবু। ওরা আমাদের ডাকছে—না গেলে বলবে ভয়ে পেছিয়ে গেল।"

মহিম বল্লে "তা ত বটেই। না যাওয়াটা ভীরুতা।"

আমি একটু জোরের সঙ্গে বললাম "ভয় আমার নেই। আমার ষোল আনা ভরসা আছে। যদি খেলতে যাই ত জিতবই।"

হরিশ শান্তদাকে ব'ল্লে "আমার অবশ্য অতখানি ভরসা নেই।"

কথাটা বিদ্রূপের মত শুনাল। হরিশ সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড। তার ওরকম ভরসা না হ'লে আমার পক্ষে ওরকম ভরসা হওয়া যে কতখানি বাতুলতা —এইটেই যেন সে সকলের কাছে প্রমাণ করতে চায়। আমাকে যেন অপমান করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। হরিশের কথাটাতে নিজেকে যেন বড় ছোট মনে হ'ল সকলের কাছে। রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল।

মুকুন্দ আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার মনের অবস্থাটা কতকটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল। সে কি যেন একটা জোরের সঙ্গে বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় যতীন বলে উঠল, "তা হরিশবাব যদি সে ভরসা না থাকে ত খেলতে না যাওয়াই ভাল।"

মহিম একটু উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল "এ তোমার অন্যায় কথা যতীন। হরিশবাবু একলাই ত সব খেলাটা খেলবেন না। এগার জন সবাই তাঁর মত হলে তিনিও ভরসা পেতেন।"

যতীন বল্লে "সে আর কোন টিমে কবে হ'য়ে থাকে।"

মহিম উত্তেজিত স্বরেই বল্লে "সেইজন্যই কোন টিমের কোনও খেলোয়াড়ের পক্ষে আমরা জিতবই একথা জোর করে বলা চলে না।"

মহিম যে প্রচণ্ড একজন হরিশ-ভক্ত, এবং আমার অবিদিত ছিল না, তাই মহিমের এই উত্তেজনার মূলে হরিশের অনুপ্রেরণায়, আমার রাগটা হরিশের উপরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

বিপিন বল্লে 'যাক, তর্কাতর্কি করে কি লাভ। এখন আসল কথাটা ঠিক করে ফেলা দরকার।" এই বলে আমার মুখের দিকে চাইলে।

মহিম বল্লে "বেশ, ভোট নেওয়া যাক আমরা বিলখালি খেলতে যাব কিনা।"

সহসা মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল "শান্তদা ক্যাপ্টেন, শান্তদা যা ঠিক করবেন তাই হবে। সবাই সেকথা শুনতে বাধ্য।"

হরিশ বল্লে "তার কোনও মানে নাই। এসব ব্যাপারে বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ের যা ইচ্ছা—সেই রকম কাজ হবে।"

কি স্পর্দ্ধা। একথা হরিশ ছাড়া ওখানে বোধ হয় কেউই বলতে সাহস করত না। বেশ একটু তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম "কার কার বিলখালিতে খেলতে যাওয়ার ইচ্ছে শুনি।"

হরিশ ও মহিম ছাড়া প্রথমটা কেউই হাত তোলেনি। তারপর হরিশের মুখের দিকে চোখাচোখি হওয়াতে ননী ময়রা অধোবদনে ধীরে ধীরে হাত তুলল। বিপিন, মহেশ পরস্পর চোখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। হরিশ বোধ হয় তখন রেগে গিয়েছিল। তার ছোট ছোট চোখ দুটো যেন কেমন একটু লাল হয়ে উঠল। কিন্তু অত্যন্ত শান্ত এবং গম্ভীর স্বরে বললে 'মোটে তিনজন। বেশ তাহ'লে বিলখালিতে খেলতে যাওয়া হবে না।" এই বলে সে উঠে দাঁড়াল।

আমি হঠাৎ চীৎকার করে বললাম "নিশ্চয়ই খেলতে যাবো।"

হরিশ বলল "তা ত হ'তে পারে না, মোটে তিনজন আমার দিকে ভোট দিয়েছে।"

আমি বললাম "ভোট কে চেয়েছিল। খেলতে যাব এইটেই আমি ঠিক করলাম।" এই বলে সকলের দিকে চাইলাম।

হরিশ বলল "আর সবাই যায় যাক, এর পরে আমি অন্ততঃ কিছুতেই খেলতে যাব না।"

আমি বললাম "ক্লাবের সভ্য হিসেবে আপনি যেতে বাধ্য।"

হরিশ একবার ঘৃণাভরে আমার দিকে চাইলে, তারপর একটু উত্তেজিত সুরে বললে, "না হয় ক্লাবের সভ্যগিরি আমি ইস্তফা দিচ্ছি।"

মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল "আপনি ক্যাপ্টেনকে অপমান করছেন হরিশবাবু!"

মহেশ বলে উঠল "এ আপনার অন্যায় হরিশবাবু"—সহসা মহিম মহেশকে এক ধমক দিলে "তুই চুপ কর!" মহেশ চুপ করে গেল।

আমি বললাম "হরিশবাবু! ইস্তফা দেব বল্লেই দেওয়া যায় না। ক্লাবের নিয়ম-কানুন আছে। খেলতে আপনি বাধ্য।"

হরিশ বলল "কেন? আপনি জমিদারের ছেলে ব'লে খেলার মাঠেও কি আপনার জোর চলবে?"

আমি রেগে চেঁচিয়ে উঠলাম "সাবধান হরিশবাবু! বাপ তুলে কথা কইবেন না বলে দিচ্ছি।"

হরিশ বলল "বাপ তুলে আমি কিছু বলিনি। আপনিও ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করবেন না।"

এই বলে হরিশ আর দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে আমাদের দিকে পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করল। আমার রাগ তখন সপ্তমে চড়েছে। এমন সময় মুকুন্দ এক কাণ্ড করে বসল। সে হঠাৎ সুর করে চেঁচিয়ে উঠল:

"যদু কবরেজের বড়ি
রোগীর গলায় দড়ি"

এই শ্লোকটির সৃষ্টিকর্তা কে জানিনে। কিন্তু স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এটা অনেকের মুখেই শুনেছি।

হরিশ আহত ব্যাঘ্রের মত হঠাৎ ফিরে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তার ছোট ছোট কোটরাগত চোখদুটো তখন জ্বলছে। চীৎকার করে উঠল "কে বললে—কে বললে একথা?"

মহিম যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে হরিশের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম "আমি বলেছি।"

হরিশ খানিকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে গুম্ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর তীক্ষ্নস্বরে বললে, "যার নিজের বাপ একটা খুনে, পরের বাপের বিষয়ে কথা কইতে তার লজ্জা করে না?"

রাগে আমি তখন চোখে অন্ধকার দেখছি। চীৎকার করে উঠলাম "মুখ সামলে কথা কও বলছি।"

হরিশও সমান চীৎকার করে বলল, "কার ভয়ে মুখ সামলে কথা কইব শুনি। সত্য কথা বলতে ভয় করি নাকি? তোমার বাপ যে সাতঘাটার ফকীর মণ্ডলকে নায়েব বাহার আলী মিঞাকে দিয়ে খুন করিয়েছিল কে না জানে। পয়সা আছে তাই বেঁচে গেছে, নৈলে যে এতদিন ফাঁসাকাঠে—

আমার চাইতেও বোধ হয় মুকুন্দর বেশী অসহ্য হয়েছিল। সে আমার পাশ কাটিয়ে, এক লাফে গিয়ে হরিশের টুঁটি চেপে ধরল। হরিশ হঠাৎ আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে নীচে পড়ে গেল। মুকুন্দ তার বুকের উপর বসে দু'হাত দিয়ে তার চুল টেনে ছিঁড়চে। সে ঘুসী চালাচ্ছে মুকুন্দর নাকে-মুখে-বুকে।

খানিকটা আমি কি রকম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম ছেলেদের মধ্যে সবাই কোথায় সরে পড়েছে, অন্ততঃ কাছাকাছি কেউ ছিল না। আমিও মারামারিতে মুকুন্দের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলাম—একটা কঞ্চি কুড়িয়ে নিলাম হাতে।

## পাঁচ

বাড়ী ফিরবার পথে মনটা ক্রমেই যেন অবসন্ন হয়ে আসছিল, একটা গ্লানিতে ভরা। অনুতাপ অবশ্য একটুও হয়নি কেন না এ বিশ্বাস আমার ছিল, হরিশের অপরাধের গুরুত্ব এত বেশী যে, তা ক্ষমা করা কোনও মতেই চলে না। তবুও ত ব্যাপারটা না ঘটলেই ছিল ভাল, কেন ঘটল।

ভয়ও যে প্রাণে এতটুকুও হয়নি, এমন নয়। কি জানি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। হয়ত বাবার কানে উঠবে। তিনি আমারই উপর রেগে না যান। স্কুলেই বা মাষ্টাররা বলবে কি, সবাই আমাকে এত ভালবাসেন। তারপর হরিশেরই বা মার খাওয়ার ফলে কি হয় কে জানে। মারটা একটু গুরুতর রকমেরই হয়েছিল। কেন না আমি গিয়ে মুকুন্দর সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর হরিশ আত্মরক্ষা করবার বিশেষ চেষ্টা করেনি। কেবল, বলেছিল "দুজনে মিলে একজনার সঙ্গে লড়তে এসেছ, লজ্জা করে না।"

বাড়ীর পথে ফিরতে ফিরতে অনেকক্ষণ আমার আর মুকুন্দের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। দুজনেই চুপচাপ করে চলেছি। হঠাৎ মুকুন্দ আমাকে প্রশ্ন করল "শান্ত-দা! বাড়ী গিয়ে কি বলা যাবে?"

মুকুন্দর দিকে চেয়ে দেখলাম, বেচারীর জামাটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে, মুখখানা যেন লাল হয়ে ফুলে উঠেছে! বললাম "বাড়ীতে গিয়ে এসব কথা কিছুই বলা চলবে না। দু'এক দিন চুপচাপ থাকা দরকার। দেখি না কতদূর গড়ায়।" মুকুন্দ বলল "তা ত বুঝলাম। কিন্তু আমার জামাটা যে একেবারে ছিঁড়ে গেছে?"

একটু ভেবে বললাম "এখনই বাড়ী ফিরব না। চল একটু নিরিবিলি কোথাও নদীর ধারে বসি। তারপর সন্ধ্যে ঘোর হলে তোর ঐ ছেঁড়া জামাটা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে খালি গায় টক করে অন্ধকারে বাড়ী ঢুকে পড়বি।"

*　　　*　　　*

ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু কোনই গোল হ'ল না, একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। আমাদের ভয় ছিল হরিশ কিংবা তার বাপ হয় আমার বাবার কাছে, না-হয় মুকুন্দের বাবার কাছে, না-হয় হেডমাষ্টার মশাইএর কাছে নালিশ রুজু করবেন এবং তাহ'লেই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। কিন্তু তারা কোনও নালিশ ত রুজু করেনই নাই বরং কোনদিন স্কুলে হরিশের মুখেও এ বিষয়ের কোন আলোচনা শুনিনি!

খেলার মাঠে হরিশ আর আসত না, কিন্তু স্কুলে হরিশের সঙ্গে আমার চোখোচোখি হলেই আমার কেমন যেন একটা লজ্জা হত এবং পাশ কাটিয়ে পালাবার পথ পেতাম না। সে-ই ত আমার বাপকে গালাগালি দিয়েছিল এবং তারই ফলে উচিত শিক্ষা পেয়েছে সে, তবুও তারই কাছে আমার যে কোন একটা লজ্জা হয়েছিল, এ কথা আজও ভেবে কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

কিছুদিন গেল। আমার প্রাণের মধ্যে ব্যাপারটার জন্য গ্লানি তখন আর নাই। হরিশের প্রতি মনোভাবে, তখন কোনও রকম বিরাগ ত ছিলই না বরং অনেক সময় মুকুন্দর সঙ্গে পরামর্শ করেছি যে, নিজেদের মান বাঁচিয়ে হরিশকে আবার কি করে ফুটবল খেলার দলে টানা যায়। কিন্তু তবুও কোথায় যেন প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ব্যথাটা সেই দিন বিকালবেলা থেকেই প্রাণের মধ্যে সুরু হয়েছিল, তবে প্রথম প্রথম সেই ঘটনাটি নিয়ে নানা বিভিন্নমুখী ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণের এই বেদনাটী কোথায় যেন

লুকিয়েছিল, সব সময় ধরা দিত না। কিন্তু ক্রমে মন যতই শান্ত হ'ল, প্রাণে কোনও আলোড়ন আর নেই, ততই আর ব্যাথাটী যেন স্পষ্ট হয়ে সজাগ হয়ে উঠল আমার সমস্ত অন্তরে।

বাপ আমার "খুনে"—এতবড় অপবাদ আমার বাবার সম্বন্ধে, আমি সইতে পারছিলাম না। এই কথাটা আমার প্রাণের মধ্যে যেন একটা কাঁটার মত ফুটে রইল—উঠতে বসতে শুতে লাগে। কে বলেছে, কেন বলেছে, কে শুনেছে, কে না শুনেছে—এ সব কথা আর আমার মনেই ছিল না। কেবল ঐ কথাটি যেন একটা বাস্তব রূপ নিয়ে জগতের মধ্যে সত্য হয়ে রইল আমার চোখের সামনে। হরিশকে শাসন করেছিলাম। আরও যদি কঠোর শাস্তি তার হ'ত, যদি হরিশ ও তার বাপকে মাধবপুর থেকে বিদেয়ও করে দিতাম, তবুও সে যে ঐ কথাটা বলেছে, মাধবপুরের আকাশে-বাতাসে ঐ কথাটী লেখা হয়ে গেল, তাত আর পুঁছে ফেলা যেত না। আমার বাপ রতন সা, যাঁর এতবড় নাম, এত খাতির, যাঁর গর্বে আমার বুকখানা সব সময়ই ছিল ভরা—তিনি—'খুনে'। এই কথা আমাকেই শুনতে হ'ল। আমার এত বড় গর্বে এমন করে ঘা লাগল—একি সওয়া যায়!

মনের যখন এই রকম অবস্থা, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ও মুকুন্দ বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে গিয়ে বসলাম। খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ্‌চাপ। হঠাৎ মুকুন্দ আমাকে প্রশ্ন করে বসল—

"হ্যাঁ, শান্তদা! কথাটা কি সত্যি?"

আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"কোন্ কথা?"

মুকুন্দ বল্‌ল,—"ঐ যে সেদিন হরিশ যে কথাটা বলেছিল?"

মুকুন্দও কি তা'হলে ঐ কথাটাই নীরবে ভাবছিল এতক্ষণ। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা! যারা যারা সেখানে ছিল সেদিন, সবাই বোধ হয় ঐ কথাটাই দিনরাত ভাবে কেউ ত ভোলেনি তাহ'লে। জিজ্ঞাসা করলাম—"কোন্ কথাটা রে?"

মুকুন্দ সঙ্গে সঙ্গে বলল—"ঐ যে জ্যাঠামশাইএর নামে—"

একটু বিরক্তির সুরে বললাম,—"যত বাজে কথা। এ কখনও হতে পারে।"

মুকুন্দ চুপ করে গেল।

বাজে কথা যে এ বিষয়ে আমার ত কোন সন্দেহ ছিল না। অবশ্য কথাটার সত্যাসত্যের দিক দিয়ে কখনও ভেবে দেখিনি! কিন্তু কথাটা যে সত্য হতে পারে এ ধারণাও যে অসম্ভব।

কিন্তু মুকুন্দ! মুকুন্দ কি তাহ'লে কথাটার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিহান! ছিঃ ছিঃ, এতবড় অপমান শেষকালে মুকুন্দ পর্যন্ত বাবাকে করলে। আবার আমাকেই প্রশ্ন। একবার দারুণ ঘৃণাভরে মুকুন্দের দিকে চাইলাম। ভাবলাম —মুকুন্দ ছেলেটা কি!

বললাম,—"তুই এতটা ভাবলি কি করে?"

মুকুন্দ অত্যন্ত অপরাধীর মত বলল,—"না শান্তদা! আমি ভাবিনি। আজ দুপুরবেলা ঘটকমশাই আর কেষ্টদা ঐ কথা বলছিল।"

ঘটকমশাই আর কেষ্টদা মুকুন্দদেরই গোমস্তা। একটু চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—

"কি? কি বলছিল তারা?"

মুকুন্দ কেমন যেন হয়ে গেল। চুপ করে রইল। একটু ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম,—"মুকুন্দ! সত্যি কথা বল্। কি বলছিল তারা?"

মুকুন্দ একটু ইতস্ততঃ করে বললে,—"না, ঐ ঘটকমশাই বললে—"সাতু ঘোষকে জ্যাঠামশাই হ'লে ফকীর মণ্ডলের দশা করত।"

উত্তেজিত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম,—"তার মানে কি?"

মুকুন্দ ঠিক তেমনি ইতস্ততঃ করেই বলল—"সাতু ঘোষ বড় পাজী। আমার বাবা ভালমানুষ কিনা, তাই কিছু বলেন না।"

তাই বুঝি ঘটকমশাই বললেন—"আমাদের প্রজা হ'লে বাবা তাকে খুন করতেন।"

মুকুন্দ চুপ করে রইল।

তাহ'লে গ্রামশুদ্ধ সবাই এই নিয়ে আলোচনা করে। কি অপমান! কি লজ্জা! বুকখানা যেন একখানা পাথর হয়ে উঠল।

কতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিলাম মনে নেই। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "মুকুন্দ! বাড়ী যাও—আমি চললাম।"

এই ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না করে হন হন করে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললাম। মুকুন্দ পেছন থেকে চীৎকার করে দু'বার ডাকল "শান্তদা, শান্তদা!" শেষবারের ডাকটা যেন একটা চাপা কান্নার মত শোনাল।

* * *

বাড়ীতে এসে কারও সঙ্গে কোনও কথা না ব'লে সটান শোবার ঘরে গিয়ে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে

পড়ল। কত কি যে ভেবেছিলাম, সে সব এখন এতদিন পরে বিস্তারিত লেখা কঠিন, ভেবেছিলাম যদি কাল সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে দেখি এ সবই একটা দুঃস্বপ্ন, বাবার এই অপবাদ এক রাত্রের স্বপ্নের মধ্যেই এর সৃষ্টি এবং স্বপ্নের মধ্যেই এর সমাপ্তি ; তা হ'লে— । ভেবেছিলাম, এর কোনও কি উপায় নেই এমন কোনও কি মন্ত্র নেই, যার ফলে সমস্ত গ্রামবাসীরা এক মুহূর্তে এ কথা একেবারে ভুলে যায়।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নাই। মা যখন খাবার জন্য ডাকতে এলেন, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে গেল। বেদনার তীব্রতাটা কমে গেছে—সমস্ত প্রাণে একটা আড়ষ্ট ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। আমার মা আমারই কাছে দাঁড়িয়ে আছেন,—নীচে বারান্দায় ভাতের থালায় সাদা সাদা ভাত, ডাল, বেগুন-ভাজা, মাছের ডিম-ভাজা ঝোল একবাটী দুধের ওপর সর ভাসছে এই সব কল্পনার মধ্যে একটা যেন জোর পেলাম প্রাণে। মার হাত ধরে নীচে খেতে গেলাম।

রাত্রে খেয়ে উঠে বিছানায় শুয়ে কেমন যেন একটা অবসন্নতায় প্রাণটা ভরে গেল। নানান রকম এলোমেলো ভাবছি, কোনও একটা চিন্তাকে আঁকড়ে ধরতে পারছিনে, এমন সময় কেন জানি না, এই প্রথম হঠাৎ মনে প্রশ্ন উঠল —কথাটা সত্যি নয় ত। আমাদের স্কুলে এসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার মশাই বড় ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি একটা কথা প্রায়ই বলতেন পাপ কখনও চাপা থাকে না, আগুন কি কাপড় দিয়ে চাপা যায় ? তবে ?

কথাটা ভাবা মাত্রই সমস্ত প্রাণটায় যেন হাজার বিছে একসঙ্গে কামড়ে দিলে। কেমন যেন শিউরে উঠল সমস্ত শরীর !

সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গেই হঠাৎ মনে হল, কি যেন একটা মস্ত কাজ আমার বাকী, আজই করতে হবে।

সেদিন উঠতে একটু বেলা হয়েছিল। পুকুর-পাড়ে গিয়ে দাঁতন দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে আমাদের পুকুর-পাড়ের বাগানের দিকে চেয়েছিলাম ! সূর্যদেব তখন পূর্বাকাশে অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েছেন। সকালবেলার তাজা সোনালী রংয়ের রোদটুকু ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের বাগানের গাছগুলির মাথায়-মাথায়, পুকুর-পাড়ের ঘন ঘাসের গায়ে-গায়ে। কালও ঠিক যেমন দেখে-ছিলাম, আজও জগৎটা ঠিক তেমনি আছে তবুও কেমনই যেন মনে হচ্ছিল জগৎটা যেন আজ নতুন রূপে ধরা দিল আমার চোখে। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মানন্দের

উপর দিয়ে এক রাত্রে কি যেন একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমার মধ্যে কালকের জগৎটা আজকে যেন আর নাই।

মুখ ধুয়ে চললাম বৈঠকখানা বাড়ীর উপরে আলী মিঞার সঙ্গে দেখা করতে তার সঙ্গে আমার একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া হওয়া দরকার। সেইটাই যেন সকাল বেলার প্রথম কাজ। তারপর অনেক কাজ, আমার যেন অনেক কাজ বাকি! তারপর সমস্ত পৃথিবীটার সঙ্গে যেন একটা নতুন করে হিসেব-নিকেশ করে নিতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলী মিঞার সঙ্গে সকালে কোনও কথাই হ'ল না। যতবার ওপরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি সমস্ত সকালটা আলী মিঞা বাবার ঘরে বাবারই সামনে বসে খাতা খুলে কি যেন কাজে মহাব্যস্ত। মাঝে মাঝে অধৈর্য হ'য়ে উঠেছিলাম। কিন্তু উপায় কি?

আলী মিঞা জিজ্ঞেস করলেন "আজ সন্ধ্যেবেলা মাষ্টার আসবেন না।"

বললাম "হ্যাঁ এখনও একটু দেরী আছে। তা আপনি এখানে বসে আছেন, বাড়ী গেলেন না?

আলী মিঞা বললেন "না। আজ যে কখন ছুটী পাব জানি না। সন্ধ্যের পরে বড়বাবুর সঙ্গে আবার খাতা-পত্র নিয়ে বসতে হবে। সাতঘাট মহল নিয়ে বড় গোলমাল চলছে কি না।"

হঠাৎ যেন একটু উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম "সাতঘাটা! সাতঘাটা, যেখানে ফকীর মণ্ডলের বাড়ী?"

আলী মিঞা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন "তা ফকীর মণ্ডলকে তুমি চিনলে কি করে খোকাবাবু?"

আমি বললাম "বলুন না সাতঘাটায় ফকীর মণ্ডলের বাড়ী কিনা?"

আলী মিঞা একটু যেন চুপ করে থেকে বেশ সহজ সুরেই বললেন "হ্যাঁ। তা ফকীর মণ্ডল ত এখন আর নেই খোকাবাবু। সে মারা গেছে।"

হঠাৎ আলী মিঞার উপর কেমন যেন রাগ হ'য়ে গেল। একটু তীক্ষ্ণসুরে জিজ্ঞাসা করলাম "তা আপনিই ত তাকে খুন করেছেন!"

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে, তাই আলী মিঞা আমার কথা শুনে চমকে উঠলেন কিনা ঠিক বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলেন।

বললাম "সত্য কথা বলুন না চুপ করে আছেন যে।"

গম্ভীর-কণ্ঠে আলী মিঞা জিজ্ঞেস করলেন, "তা এসব কথা তোমায় কে

বলেছে খোকাবাবু?" আমি উত্তেজিত স্বরে বললাম, "সবাই ত বলে, গ্রামশুদ্ধ লোকেই ত বলছে।"

আলী মিঞা আবার চুপ করে রইলেন। আমার রাগ যেন আলী মিঞার নীরবতাকে আশ্রয় করে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। বেশ একটু কটুস্বরে বললাম "কি? আমার কথার উত্তর দেবেন না ঠিক করেছেন?"

আলী মিঞা শান্ত অথচ বেশ একটু তীক্ষ্ণ সুরে বললেন "তুমি ছেলেমানুষ, এসব কথায় তোমার কি দরকার? বড় হও তখন প্রয়োজন হলে সব বুঝিয়ে দেব। এখন রাত হয়ে গেল, পড়তে যাও।"

আলী মিঞার মুখে এ রকম সুরে এ রকম ধরণের কথা কখনও ত শুনিনি। কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অন্য দিকে চেয়ে খানিকটা চুপ করে বসে রইলাম। আলী মিঞাও আর একটি কথাও কইলেন না।

একটু পরে ধীরে ধীরে ঘাট ছেড়ে চলে এলাম। আসার সময়ও আলী মিঞা আমার সঙ্গে কোনও কথা কননি। নিজের মনে অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবছেন।

বেশ মনে আছে সেই ভরা সন্ধ্যাবেলা বাগানের পথে ফিরতে ফিরতে আসল কথাটা প্রাণের মধ্যে কোথায় যেন তলিয়ে গেল। বড় করে প্রাণে বাজতে লাগল আলী মিঞার সেই রুক্ষ ব্যবহার। আজ পর্যন্ত আলী মিঞার কাছে সস্নেহ আদরই পেয়ে এসেছি, কখনও এতটুকু অবহেলা পাইনি। কিন্তু আজ একি হ'ল!

সন্ধ্যাবেলা মাষ্টার এলেন, পড়িয়ে গেলেন, কিন্তু আলী মিঞার এই ব্যবহার আমি যেন কিছুই ভুলতে পারছিলাম না। সমস্ত প্রাণখানা থেকে থেকে ব্যথায় টনটনিয়ে উঠতে লাগল।

একটা ভারী প্রাণ নিয়ে রাত্রে বিছানায় শুতে না শুতেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু খানিকটা পরেই কিসের যেন একটা শব্দে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। বুঝলাম বাবার শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে, হঠাৎ বুকের ভিতরটা কিসের যেন একটা ধাক্কা লেগে কেঁপে উঠল—আমার বাপ 'খুনে'! খুনীর রক্ত আমার শরীরে!

## ছয়

মাস চার-পাঁচ কেটে গেছে সত্তরই অগ্রহায়ণ দাদার সঙ্গে মন্টির বিয়ে। সেই সময় ক'টা দিন খুবই উত্তেজনায় কেটেছিল। আমার সমস্ত প্রাণে উৎসাহ যেন ধরে না। ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙ্গে যেত এবং মনে হ'ত সারা দিনটা আমার সামনে কেবল আনন্দ আর আনন্দ—দু'হাত দিয়ে কুড়িয়ে নিলেই হয়; বাড়ী ঘর-দোর আত্মীয়-স্বজনে ভরে গেছে, মফঃস্বল থেকে কত নূতন নূতন আমলা-কর্মচারী, পাইক-পিয়াদা এসেছে এবং বাসি-বিয়ে ও ফুলশয্যার দিন আমাদেরই বার-বাড়ীর প্রাঙ্গণে কলকাতার বিখ্যাত প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রা হবে —ভাবতেও আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতাম।

মন্টি আমার বৌঠান হবে—ভাবতে প্রাণে যে একটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা এখন প্রায় কেটেই গেছে। বৌঠান কে হচ্ছে না হচ্ছে সেটা তখন আর বিবেচনার বিষয়ই ছিল না। বৌঠান একজন হচ্ছে আর তাঁরই আগমনীর সুরে আমাদের বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠেছে—এইটেই হয়ে উঠেছিল আমার প্রাণের প্রধান উপভোগ। তবুও মাঝে মাঝে গভীরতম তলদেশ থেকে একটা ব্যথা কখনও যে উঁকি মারেনি এমন নয়। মুকুন্দর বোন মন্টি না হয়ে যদি আর কেউ আমার বৌঠান হ'ত, তবে যেন এই উৎসবে আমি আরও মসগুল হয়ে উঠতে পারতাম। মন্টিকে নিয়ে এত বড় উৎসবের আয়োজন ঠিক যেন শোভন হচ্ছিল না।

সে যাই হোক মন্টির সঙ্গে এই বিবাহ উপলক্ষে আমার যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল আমি কিন্তু বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবং বোধ হয় সেই দিনই আমার প্রাণের এই হতাশার দিকটা চিরকালের মত গেল কেটে—আমার আনন্দের ষোলকলা পূর্ণ হ'ল।

বিবাহের দিন সকাল বেলা। দিনটাও মনে আছে বুধবার। তার আগের দিন শুনেছিলাম, কনের নৌকা বুধবার ভোর হতে না হতেই মুকুন্দদের ঘাটে এসে লাগবে। মঙ্গলবার সমস্ত রাত একটা উত্তেজনায় আমি ভাল করে ঘুমুতেই পারিনি।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি আমাদের সা' চৌধুরী ঘরের ছেলেরা 'চলে' গিয়ে বিয়ে করে না, কনে

'তুলে' আনে। অর্থাৎ আমাদের বংশের ছেলেরা নাকি কারও বাড়ী গিয়ে বিয়ে করে না, কনেকেই নিয়ে আসা হয়, আমাদের বাড়ীতে এবং আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণেই বিবাহ হয়। আমাদের বংশের এই প্রথা তিন-পুরুষ ধরে চলে আসছে। এই প্রথার জন্য আমাদের বংশের ছেলেদের বিবাহ ব্যাপারটা অনেক সময়েই সহজ হয়নি। আমাদের ঘরের ছেলের জন্য অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে পাওয়া ত ছিল এক রকম অসম্ভব, এবং গরীব ঘরের মেয়েদের বাপেরাও অনেক সময় এ অপমান স্বীকার করতে নাকি রাজি হয়নি।

যাই হোক, তবুও এ প্রথা ভাঙবার নয়, অন্ততঃ রতন সা'র আমলে ত নয়ই। যেদিনের কথা বলছি সেদিন ভোর হতে না হতেই ছুটে আমাদের বাড়ীর পুকুরপাড়ে গিয়ে মুকুন্দদের বাড়ীর নদীর ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলাম। ভোরের আলোয় চারিদিক তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু আকাশে তখনও সূর্য-দেব দেখা দেননি। মুকুন্দদের বাড়ীর সামনের দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পেলাম, বাবার মফঃস্বলে যাওয়ার সবুজ রংয়ের বজরাখানা মুকুন্দদের বাড়ীর সোজা নদীর ঘাটে বাঁধা র'য়েছে। ঐ বজরাখানাই মন্টিকে আনতে ত্রিচলায় গিয়েছিল। ইচ্ছে হ'ল তখুনিই ছুটে গিয়ে মন্টিকে একবার দেখে আসি, কিন্তু প্রচলিত প্রথার দিক দিয়ে সেটা উচিত হবে কিনা বুঝতে না পেরে পেছিয়ে গেলাম।

খানিকটা পরেই মুকুন্দ আমাদের বাড়ীতে এল। বল্লে "শান্তদা! চল না বজরায় মন্টির সঙ্গে দেখা করে আসবে।"

সেই দিনটাই বিয়ের দিন। এই দিনটির জন্য অন্ততঃ দাদা—রাজা, আর মন্টি—রাণী। তাই মন্টি, মুকুন্দর মামাত বোন মন্টি কতবার তাকে ছেলেবেলায় মুকুন্দদের বাড়ীতে দেখেছি—আজ তার সঙ্গে দেখা করা—সেটা যেন একটা মস্ত বড় ঘটনা। অনেক নিয়ম-কানুন অনুমতি সাপেক্ষ। অতটুকু একটা মেয়ে, তার আজ এত বড় প্রভাব সারা মাধবপুর গ্রামটা তোলপাড় ক'রে তুলেছে। ভোর হ'তে না হ'তে আমাকে বিছানা থেকে তুলে এনেছে পুকুর-ঘাটে! আমা-দের সারা বাড়ীটায় ভরিয়ে দিয়েছে একটা অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য।

তারই আগমনী সামনে বাজছে ঐ আমাদের বাড়ীর সামনে নহবতে। এই হেমন্তকালের সরস সকালটা, সোনার রোদটুকু, ঐ গাঢ় নীল আকাশ সবই যেন রূপে-রসে-গন্ধে ভরিয়ে দিয়েছে সেই একফোঁটা মেয়ে মন্টি। হঠাৎ এই-সব ভেবে আমি যেন কেমন অবাক হয়ে গেলাম।

মুকুন্দ আবার বললে "চল না শান্তদা! যাবে?"

আমি বললাম "মাকে একবার জিজ্ঞেস কর।"

মুকুন্দ বলল "কেন? এর আবার জিজ্ঞেস করব কি?"

আমি বললাম "কি জানি, হয়ত এখন বজরায় দেখতে গেলে মা রাগ করবেন।"

"আচ্ছা চল, জ্যেঠাইমাকে জিজ্ঞেস করি।"

এই ব'লে মুকুন্দ আমার হাত ধরে বাড়ীর ভেতরের দিকে ছুটল।

মা শুনে তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন।

বললেন "বেশ ত, কিন্তু বেশীক্ষণ থেক না।"

বাড়ী থেকে বেরিয়ে মুকুন্দ বললে "চল শান্তদা, এক কাজ করা যাক। তোমার গামছাখানা নিয়ে চল, নদীতে একেবারে স্নান করে আসব।"

কথাটা মন্দ বলেনি। নদীতে স্নান করতে ছেলেবেলা থেকেই আমার অত্যন্ত ভাল লাগত। নদীর জলে নামলেই আমার সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠত, কেমন যেন একটা আনন্দ উপভোগ করতাম সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আজও মনে পড়ে। কিন্তু তবুও নদীতে রোজ স্নান সম্ভব হয় না, তার প্রথম এবং প্রধান কারণ, আমাদের বাড়ীর সোজা নদীর ঘাটটা বাঁধান ছিল না এবং মুকুন্দদের বাড়ীর সামনে বাঁধান ঘাটটাতে রোজই স্নান করতে যেতে কেমন যেন ভয় ভয় করত হয়ত বাবা রাগ করবেন। তাই মাঝে মাঝে মার অনুমতি নিয়ে যেদিনই যেতাম, স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে অঙ্গের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে একটা অপূর্ব পুলকের শিহরণ মাখিয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসতাম ভাবতে আজও শরীর শিউরে ওঠে। বললাম "তা মন্দ বলিসনি। তাই চল, মাথায় একটু তেল মেখেনি।"

আমি ও মুকুন্দ ছুটে বাড়ীর ভিতর গিয়ে, দু'জনেই মার ভাঁড়ার থেকে মাথায় খানিকটা সরিষার তেল বুলিয়ে নিয়ে গামছাটা কাঁদে কোসে ছুটলাম মুকুন্দদের বাড়ীর ঘাটের দিকে। অন্দরমহল থেকে বেরুবার সময় উঠান হইতেই মাকে চেঁচিয়ে বলে এলাম "মা! অমনি আমি নদীতে নেয়ে আসব।" উত্তরের অপেক্ষাও করিনি।

কথাটা মা শুনলেন কিনা জানি না, কেননা মা ঠিক চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন না। কিন্তু আজ যে আমার প্রাণ আনন্দ-উৎসাহে ভরা—ভয় ডরের কোন ঠাঁই ছিল না সেখানে।

দু'জন হন হন করে হেঁটে চলেছি, কিন্তু বজরার কাছাকাছি এসেই কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল। খালি গায়ে ছিলাম, কখন যে ধুতিটা ঘুরিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছি নিজেই টের পাইনি।

মুকুন্দকে বললাম "মুকুন্দ! মন্টি হয় ত বজরায় নেই, তোদের বাড়ীতে গেছে।"

মুকুন্দ বলল "না শান্তদা! মন্টি বজরাতেই আছে। রাঙামামা সকালে উঠেই বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আমি ত সেখানেই ছিলাম। মন্টি আজকের সমস্ত দিনটা নাকি বজরাতেই থাকবে। মা নেয়ে উঠে মন্টির কাছে যাবেন।"

ঘাটের কাছে গিয়ে দেখি বজরার সিঁড়ি পাড়ে ফেলা রয়েছে। মুকুন্দ হন হন করে উঠে গেল, আমি তার পেছন পেছন গিয়ে বজরায় উঠলাম। আমাদের একটা লম্বা-চওড়া হিন্দুস্থানী বুড়ো বরকন্দাজ—মাথায় তার সাদা রংএর মস্ত পাগড়ী, গায়ে একটা লম্বা গাঢ় নীল-রংয়ের কোট, তার কাঁধে ও হাতে রূপালী জরীর কাজকরা, হাতে একটা মস্ত লম্বা লাঠি নিয়ে বজরার সামনে দাঁড়িয়ে বোধ হয় বজরা পাহারা দিচ্ছিল। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠল "কি দাদাবাবু! বহু দেখতে এলেন।"

কথাটা শুনে বড় লজ্জা হ'ল। লোকটার উপরে রাগও হ'ল খুব। ভারী অসভ্য ত 'বহু, বহু' বলে চেঁচায় কেন। ও কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মুকুন্দর পিছু পিছু বজরার ভিতরে ঢুকলাম।

মুকুন্দ ঢুকেই বলে উঠল "কি গো! মন্টি বৌঠান! তোমার দেওর তোমায় দেখতে এসেছে।"

বজরায় দু'টি কামরা, একটি সামনে একটি পিছনে। সামনের কামরাটির দু'পাশে তিনটি তিনটি ছ'টি জানালা খোলা র'য়েছে এবং জানালাগুলির নীচেই দু'পাশে টানাটানি দু'টি বেঞ্চি।

মাঝখানে পাটাতনের উপর সতরঞ্চের ফরাস পাতা। পিছনের ঘরটি শোবার ঘর।

মন্টি বোধ হয় নীচেই সতরঞ্চের উপর শুয়ে ছিল। হঠাৎ আমাদের দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। একবার মুকুন্দর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র তড়িৎ চাহনিতে আমার দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। একটা দুষ্ট-হাসি যে এক নিমিষে তার চোখে-মুখে খেলে গেল সেটুকু কিন্তু আমার চোখ এড়ায়নি। —একটা বুড়ো ঝি, মন্টির বাপের বাড়ীর লোক,

বোধ হয় মন্টির পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, সেও আমাদের দেখে জড়সড় হয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল, চেয়ে রইল বাইরের দিকে।

মুকুন্দ গিয়ে বেঞ্চির উপর বসে মন্টিকে ডাকলে "আয়! বোস।" মন্টি ধীর পদক্ষেপে একটু এগিয়ে গিয়ে বেঞ্চির এক কোণে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফেরাল। মুকুন্দ আমাকে ডেকে বলল "বস শান্তদা!"

মুকুন্দর ভাব দেখে মনে হ'ল সেই যেন বজরায় সর্বময় বুড়ো কর্তা।

মন্টির দিকে দু-একবার চেয়ে দেখলাম। বেশ লাগল মন্টিকে আজ আমার চোখে। একখানা গাঢ় নীল-রংয়ের সিল্কের-সাড়ী তার পরিধানে, মাথা ভর্তি চুল, এখনও স্নান করেনি খোলা র'য়েছে, সামনে কপালের উপরে সীঁথির দু'পাশে একটু উস্কখুস্ক ভাবে ছড়ান। গায়ের রং যতটা কাল মনে মনে ভেবে-ছিলাম, ততটা ত নয়ই, বরং হঠাৎ যেন আমার ফর্সা বলেই মনে হ'ল। সুগোল বাহুযুগলের মধ্যেই শুধু নয়, সারা অঙ্গেই একটা পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের সুমধুর বিকাশ —প্রথম যৌবনের সদ্যপরশে লাবণ্যময়ী। চোখ দুটি বড় বড় না হলেও, চোখে-মুখে দেখেছিলাম একটা প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি একটা দুষ্ট চাপা-হাসির মধ্যে সমস্ত মুখখানা উজ্জল হ'য়ে উঠেছে। বিশেষ লক্ষ্য করে দেখলে কোন অঙ্গের মধ্যে প্রশংসা করবার বিশেষ কিছু না থাকলেও, মন্টিকে দেখতে ভালই লাগে, অবহেলা করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না।

আমি বোধ হয় এই ধরণেই কিছু একটা ভাবছিলাম, হঠাৎ মুকুন্দ বলল "বেশ ত শান্তদা! চুপ করে রইলে যে? আলাপ করতে এসেছ কথা কও।"

ভাবলাম মুকুন্দ ত ঠিকই ব'লেছে। কথা ত আমারই কওয়া উচিত। কথা কইচি না মন্টি ভাবছেই বা কি! হয় ত ভাবছে একটা আস্ত বোকা।

কিন্তু কি বলি তাও ত ভেবে পাচ্ছি না। অগত্যা চুপ করেই থাকতে হ'ল।

মুকুন্দ বলল "এইবার মন্টিকে তোমার প্রণাম করতে হবে শান্তদা! জান ত মন্টি আমার চাইতেও দু'মাসের ছোট।"

আমি বললাম "তা কি হ'য়েছে। সম্পর্কে ত বড়।"

মুকুন্দ বলল "সে ত আমারও। তাই ব'লে আমি ওকে প্রণাম করব নাকি —ইস।"

লক্ষ্য করেছিলাম মন্টির ঠোঁটে একটু ঈষৎ হাসি খেলে গেল।

হঠাৎ মুকুন্দ আবার জিজ্ঞেস করল "বল ত শান্তদা—মন্টির ভাল নাম কি? খবর্দার, বলিসনি মন্টি।"

বললাম "আহা! তা যেন আর জানি না। উমা—"

মুকুন্দ বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে "কি করে জানলে? ওর ভাল নাম ত ওর বাবা-মা আর আমি ছাড়া কেউই জানে না।"

এইবার মন্টির সামনে নিজের একটু বাহাদুরী দেখাবার সুযোগ হ'ল। বললাম "আমি যে গুণতে জানি। লোকের মুখ দেখে তাদের নাম বলে দিতে পারি - জানিস।"

মুকুন্দ একটু কি ভাবলে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে— "সবাই ত 'মণ্টী' বলেই জানে, 'উমা' নামটা ত কেউই জানে না। কে বলেছে বলনা শান্তদা।"

একটু হেসে বললাম "বলেছি ত গুণতে জানি।"

মুকুন্দ মন্টির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে "কে বলেছে বল ত? কেউ ত জানে না।"

মন্টির দিকে চেয়ে দেখি, মন্টি ওপরের ঠোঁট ও দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে বাইরের দিকে চেয়ে আছে, চোখ দুটি ভরিয়ে দিয়েছে একটা চাপা-হাসিতে।

মুকুন্দ নিজের মনেই বলতে লাগল "তা তুই কি করে জানবি! তোর সঙ্গে ত এই প্রথম দেখা। সকাল থেকে ত রাঙামামার সঙ্গেও দেখা হয়নি।"

বললাম "বিশ্বাস হচ্ছে না আমি গুণতে জানি! আমার যে কত বিদ্যে, বুঝতে তোর অনেক দেরী।"

মুকুন্দ বলল "যাও, যাও, চালাকী করো না। গুণতে জান না ছাই।"

বললাম "তবে বলনা কি করে জানলাম? বল দেখি? কেউ ত জানে না অথচ আমি জানি—দেখলি ত।"

মনে মনে ভাবছি আমার বাহাদুরী ষোল-আনা ছাড়িয়ে আঠারো আনা প্রমাণ হয়ে গেল। মুকুন্দ ত মুকুন্দ মন্টিও নিশ্চয় অবাক হয়ে গেছে আমার বুদ্ধির দৌড় দেখে। মুকুন্দর দিকে চেয়ে দেখি মুকুন্দ বোকার মত চেয়ে আছে আত্মপ্রসাদে আমার মনটা ভরে গেল। সগৌরবে পরাজিত মুকুন্দর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কেমন—বিশ্বাস হ'ল?"

মুকুন্দ বোধ হয় কাতরভাবে মন্টির দিকে চেয়ে ছিল। মুকুন্দর দুর্দশায় মন্টির বোধ হয় মুকুন্দর উপর দয়া হ'ল, আস্তে বললে "নেমন্তন্ন চিঠি।"

মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল। আমাকে কেউ বোধ হয় পাহাড়ের উপর থেকে নীচে সজোরে দিল ফেলে।

*　　　*　　　*

খানিকক্ষণ পরে আমি আর মুকুন্দ যখন স্নান করবার জন্য নদীর জলে নামলাম, চেয়ে দেখি মন্টি বজরার জানালা দিয়ে ঘাটের দিকেই চেয়ে আছে। হঠাৎ উৎসাহ যেন শতগুণ বেড়ে উঠল। চিৎ-সাঁতার, ডুব-সাঁতার—সাঁতারের নানান রকম বাহাদুরী, যত রকম আমার জানা ছিল, আজ যেন তার পরীক্ষা দিতে এসেছি। নদীটা সাঁতরে পারই হ'লাম পাঁচ-সাত বার। মুকুন্দকে টেনে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে হারিয়ে দিয়ে আড়চোখে দেখলাম বজরার জানালার দিকে।

*　　　*　　　*

সেদিন রাত্রে শুভ-লগ্নে মন্টির সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়ে গেল।

সাত

সাবিত্রী ওরফে সাবির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় হ'ল আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে।

*　　　*　　　*

দাদার বিয়ের পর কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিবাহ উপলক্ষে পড়াশুনার ক্ষতি কম হয়নি এবং বাৎসরিক পরীক্ষার পূর্বে আমার বেশ একটু ভয় হয়েছিল এবার পরীক্ষায় হয় ত প্রথম স্থান অধিকার করতে পারব না।

যাই হোক, দিন কয়েক খুব পড়াশুনার জন্য খেটেছিলাম, বেশ মনে আছে। চিরকালই আমার স্বভাব, সারা বছরটা ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার দু-এক মাস আগে থেকে দারুণ খেটে পড়াশুনা তৈরী করে ফেলতাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এ বছরেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এ বছর পরীক্ষার কিছুদিন

আগেই দাদার বিয়ের ধুম লেগে গেল। তাই বিয়ের হাঙ্গামা চুকে গেল, মনের মধ্যে আমার যখন ফিরে এল শান্ত-অবসর, মণ্টি বৌঠানও মাস দু-এর জন্য বাপের বাড়ী ত্রিচলায় গেল চলে, তখন হঠাৎ একদিন আমার খেয়াল হ'ল পরীক্ষার আর সামান্য ক'টা দিন বাকি মাত্র। কথাটা যেদিন প্রথম চমক ভাঙ্গিয়ে আমাকে ভাবিয়ে তুলল, সে দিনটা ছিল মঙ্গলবার। "বিদ্যারম্ভে গুরু-শ্রেষ্ঠ' এই শাস্ত্র-বচনের দোহাই দিয়ে ঠিক করে ফেললাম বৃহস্পতিবার থেকে রোজ আট-ঘণ্টা করে পড়াশুনা করব। একটা সাদা কাগজ নিয়ে রুল টেনে ঘর কেটে সমস্ত বইয়ের পাতা গুণে হিসেব করে, পরীক্ষার যে ক'টা দিন বাকি আছে, সেই ক'টা দিনের সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে মস্ত একটা রুটিন লিখে ফেললাম। এই কাজটিতেই মঙ্গল, বুধ দু'টো দিন গেল কেটে।

ঠিক বৃহস্পতিবারই পড়াশুনা আরম্ভ করে, রোজ রীতিমত আট-ঘণ্টা পরিশ্রম করেছিলাম কিনা, এখনও আমার ঠিক মনে নাই। তবে ঐ সময়টা ক'দিন খুব খেটেছিলাম এখনও মনে আছে, এবং পরীক্ষার ফলে, প্রথম স্থান অধিকার করে যে প্রথম শ্রেণীতে উঠেছিলাম--সেটা আজও ভুলিনি।

পরের বছরটার কথা বিশেষ কিছুই এখন মনে পড়ে না। কেবল এইটুকু মনে আছে পড়াশুনার একটা খুব চাপ পড়েছিল আমার উপরে। স্বয়ং এসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার নিযুক্ত হলেন, রোজ সন্ধ্যার পরে একঘণ্টা আমাকে ইংরেজী পড়িয়ে যাবেন। এ ছাড়া হেড্‌পণ্ডিত মশাই সংস্কৃত পড়াবার জন্য প্রত্যেক শনিবারে তিনটের সময় আসতেন। মোটের উপর বাবা যেন হঠাৎ একটু বেশী রকম সজাগ হ'য়ে উঠলেন আমার পড়াশুনার প্রতি।

তার বোধ হয় একটু বিশেষ কারণও ছিল, এখন ভেবে মনে হল। আমাদের সা'চৌধুরী বংশের তিনপুরুষের মধ্যে আমিই বোধ হয় এই প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চলেছি। তাই একদিকে যেমন আমার লেখাপড়ার প্রতি বাড়ীশুদ্ধ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ছিল বিশেষ সজাগ—কোনও দিকে যেন আমার কোনও অসুবিধা না হয়—অন্যদিকে আমারই বাড়ীতে আমার আদর-যত্ন গেল অন্ততঃ দশগুণ বেড়ে। লক্ষ্য করেছিলাম, দু'বেলায় আমার খাওয়া দুধের বরাদ্দ দ্বিগুণ না হলেও দেড়গুণ বেড়ে গেল এবং প্রায় প্রত্যহই মাছে একটা বড়-মুড়ো আমার পাতে দেওয়া হ'ত। মাকে যে এসব বুদ্ধি কে দিয়েছিল জানি না, তবে সেই বছরটা খাওয়া-দাওয়ায় আদর-যত্নে আমি এক এক সময় হাঁপিয়ে উঠতাম।

আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছি—এই গর্বটা বাবা-মার মনে সেইসময় নিশ্চয়ই খুব বড় হয়ে উঠেছিল. কিন্তু এই গর্বের প্রকাশ ছিল সব চেয়ে বেশী দাদার মুখে। কতবার যে কত লোকের কাছে দাদাকে বারে বারে বলতে শুনেছি, "সুশন এবার এণ্ট্রেন্স দেবে কিনা তাই—"। সেই বছরই আমাদের স্কুল থেকে প্রথম বৃত্তি পেল। শুনলাম হরিশ দশ টাকা জলপানি পেয়েছে। খবরটা গ্রামে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল আজও মনে আছে! এই খবরটা পাওয়ার পর দাদা আমলা কর্মচারী সকলের কাছেই বলেছিলেন "তা আমাদের সুশন ত হরিশের চাইতেও ভাল ছেলে। সব মাষ্টাররাই ত বলে আমি শুনেছি। আমাদের সুশন নিশ্চয়ই পনর টাকা জলপানি পাবে।"

একদিনের একটা ব্যাপার মনে পড়ে। তখন পরীক্ষার খুব বেশী দিন বাকি নেই। আমি রাত প্রায় বারটার সময় পড়া বন্ধ করে বাড়ীর ভিতরে গেছি, খেয়ে শুয়ে পড়ব। আমি আমার শোবার ঘরে ঘিয়ে ঢোকা মাত্র দাদার ঘরের দরজা খট্ করে খোলার শব্দ পেলাম। মণ্টি বেঠান বেরিয়ে এসে আমার ঘরে ঢুকলেন।

এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। এটা প্রায় দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে সকালবেলা খুব ভোরে কোনও কালেই আমি উঠতে পারি না। তাই . পরীক্ষার আগে চিরকালই আমি একটু বেশী রাত জেগে পড়াশুনা করতাম। বিশেষতঃ এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা সামনে।

রাত্রে খেয়ে উঠে পড়া, আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। ছেলেবেলা থেকে কোনও কালেই রাত্রে খেয়ে উঠে আমার দ্বারা কোনও কাজ হ'ত না।

তাই বরাবরই নিয়ম ছিল, যখন আমি বেশী রাত অবধি পড়তাম, আমার খাবার আমার ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকত। অন্য অন্য বছর রাত দশটা হলেই মা ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিতেন; কিন্তু এবছর প্রবেশিকা পরীক্ষা—আমাকে কেউ ডাকত না, সে যত রাতই হোক না কেন।

চিরকালই জানি রাত্রি দশটার পরে মার জেগে থাকা ছিল একরকম অসম্ভব।

ওদিকে মা ভোর পাঁচটা বাজতে না বাজতে উঠে পড়তেন; কিন্তু যেদিন আমি রাত দশটার পরেও পড়াশুনা করেছি, ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও যেদিন আসিনি, একটু বেশী রাত্রে পড়া শেষ করে নিজের ঘরে গিয়ে দেখতাম মা আমার ঘরে আমারই বিছানায় শুয়ে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। আমি

মধ্যে তার জীবনের বারোটি বৎসর কাটিয়ে দিয়েছে আমাদেরই গ্রামের মাঠে-মাঠে, বনে-বনে, আমাদেরই বেগবতী নদীর কূলে-কূলে, ঘাটে-ঘাটে।

আমাদের গ্রামের উত্তর পাড়ায় ছিল সাবিত্রীর বাড়ী। সাবিত্রীরা ছিল আমাদেরই স্বজাত। মুকুন্দের বাড়ীর পিছন দিয়ে, আমাদের বাড়ীর উত্তর দিয়ে একটি সরু গ্রাম্য পথ কখনও মাঠের উপর কখনও এর ওর বেড়া দেওয়া বাগানের পাশে পাশে এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে গ্রামের উত্তর পাড়ার দিকে। এই পথটির পাশেই, আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় এক পোয়া দূরে ছিল সাবিত্রীর বাড়ী। পথের ধারেই ছিল সাবিত্রীদের বাড়ীর ফটক—দু'পাশে বাঁশের খুঁটী পোঁতা এবং তাতেই দড়ি দিয়ে ঝোলান একখানি ছেঁচা বাঁশের ঝাঁপ। এই ঝাঁপ তুলে সাবিত্রীদের বাড়ীর অঙ্গনে দাঁড়ালে সামনেই দেখা যায়, একখানা জীর্ণ পুরাতন বাড়ী—বাইরে বেশীর ভাগই চূণ-বালির আস্তর বহুকাল খসে গিয়েছে, এমন কি বেরিয়ে-পড়া ইঁটগুলির ওপরেও স্থানে স্থানে শ্যাওলা ধরে কালো হয়ে গেছে। এই বাড়ীখানির চারিপাশে বহুকালের কতকগুলি আম, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছ, এলোমেলো দাঁড়িয়ে থেকে—বাড়ীখানির দৈন্য সমস্ত জগৎ থেকে যেন আড়াল করে লুকিয়ে রাখতে চায়। বাড়ীর উঠানে ডাঁটা গাছ এবং বড় বড় ঘাসের বন। কোনও রকমে কেন বাড়ীর ঠিক সামনের একটুখানি স্থান পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। বাড়ীখানি পশ্চিমমুখী—এবং বাড়িটীর পাশেই উত্তর-পূর্ব কোণে একটি ছোট পুষ্করিণী এবং তার চারি পাশেই কলাগাছের সারি।

ছেলেবেলা থেকেই সাবিত্রীকে দেখে এসেছি—কখনও লক্ষ্য করিনি। ছেলেবেলা থেকেই সাবিত্রী তার মার সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসা-যাওয়া করত —সাবিত্রীর মার সঙ্গে আমার মার ছিল বিশেষ বন্ধুত্ব! এবং বরাবরই সাবিত্রী আমার মাকে "সইমা" বলে ডেকে এসেছে তাও আমার অজানা ছিল না।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি সাবিত্রীদের অবস্থা ভাল নয়।—সাবিত্রীর যখন তিন বছর বয়স তখন তার বাপ মারা যান বিদেশে। বিদেশে তিনি নাকি কোন গ্রাম্য স্কুল হেডমাষ্টারী করতেন, হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সেই-খানেই তাঁর জীবন শেষ হয়। তারপর, সামান্য কিছু জমি-জমা ছিল, তারই ধান-চালের আয় থেকে এদিক ওদিক করে কোনও রকমে সাবিত্রী ও তার মার চলে যেত এবং এই জমি-জমা দেখা-শুনা করবার ভার বাবাই নিয়েছিলে।

এই সব নানান কারণে ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে কেমন একটা বিশ্বাস

হয়েছিল—সাবিত্রী ও তার মা আমাদেরই আশ্রিত, নিতান্ত আমাদেরই অনুগ্রহে তাদের দিন চলে। তাই বোধ হয় ছেলেবেলা থেকে কোনও দিন তাদের বিশেষ লক্ষ্য করে দেখা বা তাদের জীবনের প্রতি কোনও রকম শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি—তার যেন কোনও প্রয়োজনই ছিল না। তারা ছিল যেন আমাদেরই সংসারের আশ্রিত পাঁচজনার মধ্যে,—পরাশ্রিতের সুখ-দুঃখের ভার আর পাঁচজনার সঙ্গে সাধারণ নিয়মে তারা মাথায় বয়ে নিয়ে যাবে—এইটেই ছিল যেন স্বাভাবিক। এর মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবার আর বিশেষ কিই বা ছিল!

কিন্তু এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে, কিছুদিনের মধ্যেই, সমস্ত প্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম যে, এই সাবিত্রী মেয়েটিকে আর যেন অবহেলা করা চলে না। পাঁচজনার একজন বলে তাকে দূরে ঠেলে রাখা এখন যেন আর অসম্ভব। সমস্ত জগতের মধ্যে তারও যেন একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং তার আশে-পাশের সকলেই তার স্থানটুকু ছেড়ে দিতে বাধ্য—বার বছরের এই শান্ত-মৌন মেয়েটি সকলকেই যেন সেই কথাটি বুঝিয়ে দিলে তার রূপে, তার সমস্ত ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে।

সেই বয়সের সাবিত্রীকে আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আজ এই জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, সেই ছবি কৈ এতটুকুও ত মলিন হয়নি! আজ ভাবি আর মনে হয়, আমাদের মাধবপুর গ্রামখানি, তার মাঠ, বন, গাছ-পালা ঝোপ-ঝাড় আমাদের বেগবতী নদী, তার চঞ্চল জল-কল্লোল, তার এপার-ওপার এ সমস্তই হঠাৎ সজাগ হয়ে নূতন রূপে মূর্তিমতী হয়ে ফুটে উঠেছিল আমারই যৌবনের প্রথম উন্মেষে, আমারই চোখের সামনে, আমাদেরই গ্রামের সাবিত্রীর রূপে।

সাবিত্রীর দিকে চাইলেই সকলের আগে চোখে পড়ত তার নয়ন দুটো। বড় বড় দুটো কালো চোখ তার মধ্যে যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধরা দিয়েছে—অনাদি অনন্তকাল ধরে চ'লে হঠাৎ যেন আশ্রয় নিয়েছে সাবিত্রীর নয়ন দুটোর মধ্যে গভীর বিশ্রামে। এত বেশী মাধুর্য তার চোখ দুটোর মধ্যে যে, তার দিকে চাইলেই মনে হয়, চোখের লাবণ্য সব সময় ঢেউয়ে ঢেউয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার সারা মুখে, তার সারা অঙ্গে, সমস্ত ভঙ্গিমায়।

"সাবির মুখখানি বড় সুন্দর" এই কথাটি অনেকবার অনেকের মুখে শুনেছি, কিন্তু এইবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে এসে প্রথম মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম, কতখানি গভীর সত্য ঐ কথাটির মধ্যে এতদিন লুকিয়েছিল, আমার

কাছে ধরা দেয়নি। সাবিত্রীর মুখের প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটির বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা অসম্ভব, কেননা চোখ দুটি ছাড়া কোনটিরও নিজস্ব কোনও বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু নাক পাতলা, ঠোঁট, কপাল, ভুরু—যেটার দিকেই তাকান যায় সেইটাই মনে হয় সার্থক হয়েছে ঐ মুখখানির মধ্যে, তাকে ভাল করা গেলেও ভাল করা গেল না। সমস্ত মিলিয়ে মুখের নিটোল গড়নের মধ্যে এমন একটা মধুর সমাবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যে, তার কোনটিকে এতটুকু নড়ান অসম্ভব। এক চোখ ছাড়া মুখের কোনও একটি বিশিষ্ট অঙ্গের গড়ন বা রূপ হয়ত কারও কারও সাবিত্রীর চাইতেও ছিল ভাল, তবুও সাবিত্রীর মুখ সাবিত্রীর, সে যেন সকলের চেয়ে ভাল, সকলের চেয়ে বিভিন্ন, সে যেন আর কারও হওয়া অসম্ভব।

সাবিত্রীর গায়ের রং অবশ্য "গৌর" ছিল না। তবে সাধারণ চলতি কথায় বলে থাকে "ফর্সা" সাবিত্রী তাই। "কালো কেউ তাকে কখনও বলেনি, কেউ তাকে কখনও ভাবেনি। বাঙালীর গায়ের রং যদি চারিবর্ণে ভাগ করা যায়—গৌর, উজ্জ্বলশ্যাম, শ্যাম কালো তবে সাবিত্রীর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু এখানেও এমন একটা বিশেষত্ব ছিল তার রূপে যে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যেন সার্থক হয়েছিল সাবিত্রীর মধ্যে। গৌরবর্ণ যেন সাবিত্রীর রূপে শোভা পায়নি। তাই সাবিত্রী ছিল উজ্জ্বল শ্যামলা।

সাবিত্রী বয়সে তখন ছিল কিশোরী, কিন্তু এই বয়সেই যৌবনের মাধুর্য সাবিত্রীর সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিত্যই নব-নব রূপে নিজের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিল —লক্ষ্য করেছিলাম। লম্বা রোগাগোছের চেহারা সাবিত্রীর মোটেই ছিল না, বেশ সুগোল, নিটোল ছিল তার সারা অঙ্গের গড়নের ভঙ্গী—চারিদিকে একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। সমস্ত অঙ্গের মধ্যেই যৌবন ও স্বাস্থ্যের একটা মধুর সমাবেশ বিকশিত হয়ে উঠেছিল তনুতে তনুতে অপরূপ রূপ-লাবণ্য। যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে! অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছে "মেয়েটি সুন্দরী।" নিন্দাও যারা করেছে তারাও বলেছে "মেয়েটা বড় বাড়ন্ত এই বয়সেই এই—"এর বেশী নয়।

কিন্তু যে সময়ের কথা বলছিলাম, সে সময় সাবিত্রীর স্বভাব ছিল বড় শান্ত অন্ততঃ বাইরের অভিব্যক্তির দিক দিয়ে। চঞ্চল সে এতটুকুও ছিল না। ধীর-স্থির সমাহিত ছিল তার গতি, তার ভঙ্গিমা। সলজ্জ নম্র ছিল তার ধরণ-ধারণ কথাবার্তা। এবং যদিও মাঝে মাঝে একটি দুটি ছাড়া তার মুখের কথা খুব কমই শুনেছি, তবুও সাবিত্রী যেখানেই থাকত, সে অলস আনন্দেই হোক বা কর্ম-কঠিন কর্তব্যেই হোক, সাবিত্রীর উপস্থিতিতে সবই যেন কেমন সরস হয়ে

উঠত, তাকে ছাড়া যেত না। যেখানেই সে থাকত, সেখানেই বেশীর ভাগটা ভরিয়ে রাখত সে। চলে গেলে, সে ফাঁকা ভরিয়ে দেওয়ার শক্তি কৈ কারও মধ্যে ত দেখিনি।

বুদ্ধির দিক দিয়ে, আজ আমার মনে হয় সাবিত্রীর তুলনা মেলা ভার। সেই বয়সেই সাবিত্রী যেন জীবনটাকে ষোল আনা দেখেছিল, ষোল আনা বুঝেছিল। যেন সবই জেনে-শুনে বুঝে নিজের আসনখানি পেতেছিল জীবনের কেন্দ্রস্থলে যেখানে তার মত মেয়ের চরিত্র আশ্রয় পায়, নিজের ভারে নিজে অস্থির হয়ে না ওঠে। মন্টি বৌঠান বুদ্ধিমতী ছিলেন, এমন কি সময় সময় মনে হয় অসাধারণ বুদ্ধিমতী, তবুও তাঁর বুদ্ধির কিনারা পাওয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু সাবিত্রীর বুদ্ধির কূল-কিনারা পাওয়া ভার! মন্টি বৌঠানের বুদ্ধির ভিতরে যতখানি ছিল, বাইরে প্রকাশও ছিল ঠিক ততখানি। তাই মন্টি বৌঠানের চোখে-মুখে, কথাবার্তায় ভাব-ভঙ্গীতে একটা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সব সময়ই ঠিকরে বেরিয়ে আসত। উজ্জ্বল ছিল তার রূপ, প্রখর ছিল তার গতি। কিন্তু সাবিত্রীর বুদ্ধির জাতই ছিল স্বতন্ত্র। ভিতরে ছিল তার যতখানি, বাইরে প্রকাশ হ'ত তার সামান্য একটু ইঙ্গিত মাত্র; কিন্তু বুঝিয়ে দিত যার সামান্য ইঙ্গিতেরই এতখানি মূল্য, তার আসল রূপটির মূল্য যাচাই করবার বাজার মানুষের সমাজে মেলা ভার।

দুঃখে-কষ্টে, জীবনের কঠোর ঘাত-প্রতিঘাতে মন্টি বৌঠানের কাছে পাওয়া যেতসহানুভূতি, পাওয়া যেত সান্ত্বনা, কিন্তু সাবিত্রীর কাছে পাওয়া যেত বিশ্রাম। জীবনযুদ্ধে কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্যে মন্টি বৌঠান হয় ত পথ দেখিয়ে দিতেন, কিন্তু সাবিত্রী দিত শক্তি সাবিত্রী দিত প্রাণে উৎসাহ, উদ্যম।

চরিত্রের দিক দিয়ে সাবিত্রীকে বর্ণনা করা অসম্ভব, কেননা আজ পর্যন্ত ভেবে ভেবে সাবিত্রীর চরিত্রের কোনও দিকের কোনই কুল-কিনারা আমি এতটুকু পাইনি। জীবনে অনেক ব্যাপারে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বারে বারে সাবিত্রীর সঙ্গে আমার অনেক সংঘর্ষ হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই স্তম্ভিত হয়েছি—কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি!

তবুও মন্টি বৌঠানের সঙ্গে তুলনা করলে, সাবিত্রীর চরিত্রের একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র মন্টি বৌঠানের প্রাণে ছিল মমতা' সহানুভূতি, সেইটা সকলের জন্যই,—দরদ ছিল তার দুঃখে, সকলেরই ব্যথায়। ঘৃণা জিনিসটার বিশেষ কোনও স্থানই ছিল না মন্টি বৌঠানের প্রাণে।

কিন্তু সাবিত্রী! এদিক দিয়েও তার প্রাণের ধর্ম ছিল একেবারে বিভিন্ন। দয়া, মমতা, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণগুলির প্রাচুর্য ছিল তার প্রাণে—অনেক প্রমাণ পেয়েছি,—কিন্তু সবই ছিল তীক্ষ্ণ বিচারসাপেক্ষ; কিন্তু সে বিচারের কি যে নিয়ম-কানুন, আমি কোনও দিন বুঝিনি—আজও জানি না।

সাবিত্রীর বিচারে যে অপাত্র তার প্রতি দয়া সাবিত্রীর প্রাণে ছিল না, সেখানে ছিল তীব্র কঠোরতা। সময় সময় নিষ্ঠুরতায় সাবিত্রীর প্রাণ উষ্ণ পাষাণ হয়ে উঠত, হাজার চোখের জলেও তাকে এতটুকু শীতল করে কার সাধ্য! সাবিত্রী একবার ঘৃণার চোখ ফেরালে, সেদিকে আর জীবনে চাইত না,—মর্মে মর্মে এতখানি তীব্র ছিল তার অনুভূতি। একটা জিনিস চিরকালই লক্ষ্য করেছি, জীবনে দুর্বলতার প্রতি মন্টি বোঠানের ছিল করুণা, সাবিত্রীর ছিল ঘৃণা!

## আট

প্রথম যেদিন সাবিত্রীর দিকে প্রাণভরে চেয়ে দেখেছিলাম, সেদিন ছিল শুক্লা ত্রয়োদশী: শুধু তিথিটাই মনে আছে, তারিখও মনে নাই, বারও মনে নাই। শুক্লা ত্রয়োদশীতে সন্ধ্যার কিছু পরেই আমাদের বাড়ীর অন্দর মহলের ছাতের উপরে সাবিত্রী প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল, আমার জীবন-পথে—যেন অবরোধ করে দাঁড়াল আমার জীবনের সরল পথ, আমার জীবনের সহজ গতি।

পূর্ণ ষোলটা বৎসর জীবনের গতি আমার মোটের উপর সহজই ছিল। কেবল ষোল বৎসরের শেষের দিকে এবং সতর বৎসরের প্রারম্ভে জীবনের গতিতে একটা চাঞ্চল্য, একটা শিহরণ মাঝে মাঝে উপলব্ধি করতাম। একটা যেন অজানা রহস্যে ভরিয়ে দিত সমস্ত প্রাণখানা! "রমণী"—এই কথাটির মধ্যেই যেন ভেসে উঠত কি একটা অপূর্ব পুলক, একটা অপরিচিত মায়া—আমার সমস্ত প্রাণখানা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠত একটা সুমধুর আবেগে। রমণীর সংস্পর্শ এতদিন জীবনে পাইনি, চাইওনি! কিন্তু বেশ মনে আছে, যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার পড়ার মধ্যে আমার সমস্ত প্রাণ-মন একেবারে ভরপুর, সামনেই

প্রবেশিকা পরীক্ষার রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট রক্তশোষী দৈত্য, ছুটে চলেছি তারই পানে হয় তাকে সম্মুখ সময়ে পরাস্ত করতে হবে, নৈলে তারই হাতে মৃত্যু, তখনও সময় সময়, কিছুক্ষণের জন্য পড়াশুনার কঠোর কর্তব্য ও দুশ্চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে মন হঠাৎ কেমন যেন উদাসী হয়ে যেত, প্রাণভরা একটা আকাঙ্খার আকুল আবেগে।

রমণীর সহবাস, রমণীর সংস্পর্শ না জানি কি তার সুখ, কি তার পুলক। যুবতীর অঙ্গে-অঙ্গে যে গোপন রহস্য, যে লীলা, তার উন্মোচন, তার পরশ—উঃ শিউরে উঠতাম, পাগল হয়ে যেতাম কিছুক্ষণের জন্য।

একদিন সকালবেলা, প্রবেশিকা পরীক্ষার তখন বোধ হয় আর দিন দশ বারো বাকি, গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে পড়তে হঠাৎ একবার মুখ তুলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই চির-পুরাতন ছবিটি, সেই আমাদের বাগান, সেই বেগবতী নদীর ওপার, সেই দিগন্তের সীমানা সকালবেলার রৌদ্রে যেন ঝলমল্ করছে। এমন সময় হঠাৎ কেন মনে নাই, মনে পড়ল "বদসী যদি কিঞ্চিদপী দন্তরুচি কৌমুদী" জয়-দেবের এই শ্লোকটী কোথায় কবে কার কাছে শুনেছিলাম স্মরণ নাই! কিন্তু সেইদিন হঠাৎ এই শ্লোকটী মনে পড়াতে কেমন যেন একটা বেদনা অনুভব করেছিলাম প্রাণে। মনের মধ্যে ভেসে উঠল সুন্দরী শ্রীমতী রাধা, অভিমানিনী, —মান ক'রে নত মুখে বসে আছে কদম্বের মূলে,—আর তারই কোমল, শুভ্র, আলতা-পরা পা দু'খানি দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মুখের দিকে আকুলভাবে চেয়ে আছেন, কখন ঐ পাতলা ঠোঁট দু'খানিতে একটুখানি মৃদুহাসি ফুটে উঠবে।

আহা! কী মধুর মনে হয়েছিল, কী মধুর এই ছবিখানি। এই মিষ্টি অভিমানটুকু, এই শুভ্র-কোমল আলতা-পরা পা দু'খানি, তারই পরশের অপূর্ব পুলক ঐ মান ভাঙ্গান সরস কথাগুলি, একটুখানি পাতলা ঠোঁটের এতটুকু হাসি, তারই জন্য কাকুতি-মিনতি, সোহাগ-আদর, তুলনা নাই—এর মাধুর্য্যের তুলনা নাই।

এই সব ভাবতে ভাবতে খানিকক্ষণ বোধ হয় একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখি মুকুন্দ বই-খাতা বগলে নিয়ে, আমাদের পুকুরের পাড় দিয়ে স্কুলের দিকে চলেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বই, খাতা, স্কুল, সামনে দশ দিন পরেই প্রবেশিকা পরীক্ষা। মনকে চাবুক

মেরে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম, 'দন্তরুচী কৌমুদী' থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদীর মধ্যে—

অয়ম্, ইমৌ, ইমে
ইমম্, ইমৌ, ইমান।

প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেল। মনে এখন আমার প্রচুর অবসর। ধীরে ধীরে সেই মাদকতা, রমণীর সংস্পর্শের মোহ, কল্পনার মধ্যে আমার সমস্ত মন-প্রাণ যেন ছেয়ে গেল। বেশ মনে আছে, এক একদিন এক এক রূপ নিত আমার মনের এই প্রবৃত্তি—কল্পনার মধ্যে। কোনও দিন প্রাণের রঙে রঙিন করে ফুটিয়ে তুলতাম মনের মধ্যে আমার মানসী প্রিয়া—একদিন ধরা দেবে আমাদেরই বাড়ীর অঙ্গনে মন্টি বৌঠানের ছোট "জা"-এর রূপে। তাকে নিয়ে হয় ত সমস্ত দিনই মশগুল হয়ে থাকতাম, কত ছবি গড়তাম, ভাঙতাম আমার মানস-পটে। স্তব্ধ দুপুরে হয় ত সে নাইতে নেমেছে আমাদের পুকুরের ঘাটে, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ জনহীন, গৌর উজ্জ্বল তার অঙ্গশ্রী, আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়েছে পুকুরের জলে একটা অলস ভঙ্গিমায়; আর আমি আমাদের পুকুরের পশ্চিম পাড়ের তেঁতুল গাছটার উপরে চুপটি ক'রে লুকিয়ে বসে আছি, প্রাণভরে উপভোগ করছি ঐ ছবিখানি—সে জানেও না কিছু। হয় ত বা সন্ধ্যেবেলা, একখানি নীলাম্বরীসাড়ী তার পরিধানে, আমাদেরই অন্দর মহলের একতালার বারান্দায় আলোর সামনে ঝুঁকে পড়ে পান সাজছে সে, আলতা-পরা তার কোমল-শুভ্র পা দু'খানি, মধুর হাসিভরা তার আননখানি নীলাম্বরীর ফাঁকে ফাঁকে আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আমি আমাদের উঠানের এক কোণে, অন্ধকারের আড়ালে চুপটী করে দাঁড়িয়ে দেখছি সে জানেও না কিছু। তারপর চুপিচুপি পা টিপে টিপে এগিয়ে, গিয়ে, হঠাৎ একেবারে তার সম্মুখীন হয়ে "ছোট বউ দু'টো পান দাও না খাই" বলে তাকে একেবারে চমকে দিলাম। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালে সে, হঠাৎ মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে ত্বরিতপদে চলে গেল ঘরের ভিতরে। তারপর রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বিছানায় অভিমান ক'রে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল সে; অনেক সাধ্য-সাধনার পর কইলে কথা —"ছি, তুমি বড় দুষ্টু, অমন ক'রে আমায় লজ্জা দিলে কেন?" আমি হয় ত বললাম "তা ওখানে ত ছিলনা কেউ, লজ্জা কিসের?" হয় ত আবার তেমনি অভিমানের সুরে বললে "ছিল না বৈকি! পাশের ভাঁড়ার ঘরেই ত দিদি ছিলেন। ছিঃ কি ভাবলেন বল ত।" এই রকম সব কথায় কথায় নানান

রকম তুষ্টু আদর আব্দারের মধ্যে দিয়ে অভিমান হয় ত দিলাম ভাঙ্গিয়ে। তারপর এসে লুটিয়ে পড়ল সেই গৌর-সুন্দর তনুখানি আমারই বুকের মধ্যে, আমারই প্রাণের কিনারায়—।

এই রকম ভাবে নিত্য নিত্য নব নব রূপে আমার মন রমণীর সংস্পর্শের জন্য আকুল হয়ে কল্পনার রাজত্বে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু পাশেই সাবিত্রী তার দিকে একদিনও ফিরে চায়নি। তাই প্রথম যেদিন চাইলাম, সেদিন অবাক হয়ে ভেবেছিলাম আমার বদ্ধ প্রাণখানির একটি একটি ক'রে বাতায়নই এতদিন খুলেছি, দ্বার খুলিনি; তাই ত প্রাণের মধ্যে এতদিন সত্য হয়ে, সজীব হয়ে কেউই আসেনি, কেউই বাঁধেনি বাসা।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর, কিছুদিনের মধ্যেই, এক তাসের আড্ডা জমে উঠল আমাদের বাড়ীর অন্দরে। আড্ডাটী জমিয়ে তুললেন মন্টি বৌঠান। তাঁরি উদ্যোগে, দেখতে দেখতে আমিও তাসের নেশায় মজগুল হয়ে উঠলাম।

গেলোয়াড় ছিলাম আমরা চারজন। আমি মুকুন্দ, মন্টি বৌঠান ও সাবিত্রী। প্রথম প্রথম খেলাটা শনিবার, রবিবার তুপুরবেলায় বসত এবং তারপর মুকুন্দর স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটী হওয়ার পর রোজই তুপুরে আড্ডাটী বেশ পাকাপোক্ত হয়ে দাঁড়াল, একদিনও যেন বাদ দেওয়া চলে না। তুপুরের পর বিকেল হ'লে মা যখন ডাকাডাকি করতেন, তখন পরম মনঃকষ্টে আমরা তাসখেলা বন্ধ করতে বাধ্য হতাম এবং মন্টি বৌঠান সবাইকে হলপ করিয়ে নিতেন যে, কাল তুপুরে সবাই সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে তৈরী হয়ে নেবে।

যেদিনের কথা বলছিলাম, সেই শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে একটা প্রকাণ্ড সুযোগ হ'ল। সেদিন সকালবেলা বাবা জমিদারীর কি কাজে সহরে গিয়েছিলেন—তুই-এক দিন থাকবেন সেখানে। সঙ্গে গিয়েছিলেন দাদা। ইদানীং লক্ষ্য করেছিলাম, বাবা জমিদারীর কাজকর্মে দাদাকে প্রায়ই সঙ্গে নিচ্ছিলেন, বোধ হয় কাজকর্ম শেখাবার জন্য। রোজই সকালবেলা প্রায় তুঘণ্টা দাদা বাবার সঙ্গে বাবার ঘরে বসে জমিদারীর কাজকর্ম দেখতেন, এবং বাবা আজকাল জমিদারীর কাজে মফঃস্বল গেলেই দাদাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

সকালবেলায়ই মন্টি বৌঠান ঠিক করেছিলেন যে, আজ সন্ধ্যের পরেও একটা লম্বা তাসের আড্ডা বসাবেন। আমি আর মন্টি বৌঠান ত বাড়ীরই লোক। আমাকে দিয়ে মুকুন্দকে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করবেন এবং মাকে ব'লে বন্দোবস্ত করবেন, দাদা বাড়ী নেই, সাবিত্রী রাত্রে মন্টি বৌঠানের

কাছেই শোবে এবং শৈলা ঝি গিয়ে শোবে সাবিত্রীদের বাড়ীতে সাবিত্রীর মার কাছে।

মন্টি বৌঠান আমাদের বাড়ীতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই সাবিত্রী মন্টি বৌঠানের বিশেষ অনুগত হয়ে উঠল। দিনের বেলায় বেশীর ভাগ সময়টাই সাবিত্রী আমাদের বাড়ীতেই থাকত এবং ছায়ার মত নীরবে মন্টি বৌঠানের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত!

এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে এসে কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, সাবিত্রীর সঙ্গে মন্টি বৌঠানের ভাবটা যেন একটু বিশেষ রকম জমে উঠেছে।

যেদিনের কথা বলছি, দুপুর বেলায় সেদিন সে তাসের আড্ডা বসেনি, এমন নয়। বিকেল বেলা আড্ডা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঠিক করেছিলাম, সন্ধ্যের পরেই সবাই এসে আবার জড় হব এবং অনেক রাত পর্যন্ত তাস খেলা হবে।

সেদিন বিকেলটা আর বাড়ী থেকে বেরুলাম না। মুকুন্দ বাড়ী চলে গেল, সন্ধ্যের পরেই আবার ফিরে আসবে। আমি আমাদের পুকুরপাড়ের ঘাটের উপর খানিকটা বসে, ঘোর সন্ধ্যায় যখন আকাশ ছেয়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল, ধীরে ধীরে বাড়ীর ভেতরে গেলাম। দেখলাম মন্টি বৌঠান মার পুজোর ঘরে মাকে কি সব পূজোর যোগাড় ক'রে দিচ্ছেন। হঠাৎ বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। ভাবলাম আজ পূর্ণিমা নয় ত? তা'হলেই ত সব মাটি! আজ যদি সত্যনারায়ণের সিন্নি হয়, সন্ধ্যেটা ত পুজো করতে আর পুঁথি পড়তেই কেটে যাবে। তাহ'লে আর খেলা হবে কখন। মন্টি বৌঠানকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ কি সত্যনারায়ণ? বৌঠান বললেন "না আজ ত পূর্ণিমা নয়, আজ ত ত্রয়োদশী।" বললাম "তবে এত সব পুজোর আয়োজন?"

বল্লেন—"আজ মার একটা ব্রত ছিল কিনা।"

"ওঃ"—বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে উপরে গেলাম। যাওয়ার সময় মন্টি বৌঠান জিজ্ঞেস করলেন "বেড়াতে যাচ্ছেন ঠাকুরপো?"

বল্লাম—"না ছাদের উপর যাচ্ছি।"

ছাদের উপরে গিয়েই মনটা আমার হু হু ক'রে উঠল, কেমন যেন একটা উদাস-উদাস ভাব। প্রকাণ্ড ফাঁকা আমার চারিদিকে। মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশে ভেসে উঠেছে ত্রয়োদশীর চাঁদখানি, নিজের রূপে ছড়িয়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে আমার চারিদিকে, আমার সারা অঙ্গে, আমাদেরই ছাদের উপরে, আমাদেরই বাড়ীর আশে-পাশে গাছে-গাছে মাঠে-মাঠে দূরে বেগবতী নদীর

জলে, তার ওপারে আরও দূরে, আরও দূরে—একটা গভীর মায়ায় নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছে দূর-দিগন্তের রহস্যের গায়ে-গায়ে। হঠাৎ মনে পড়ল মুকুন্দর একটা গানের দু'চরণ—

"এমনও রজনী, এমনও জোছনা
নিরালা নদীর তীরে,
যদি আসে যদি বা এসে যদি চলে যায়
কোন্ প্রাণে যাব ঘরে ফিরে—"

কোথায়, কার কাছে মুকুন্দ এই গানখানি শিখেছিল জানি না! অনেকবার তার কাছ থেকে ঐ গানখানি শুনেছি; কিন্তু এখন যেন হঠাৎ আমার প্রাণের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে বাজতে লাগল ঐ সুর; ঐ চরণ দু'টি। মনে হচ্ছিল বৃথা, সবই বৃথা, সে যদি না আসে তবে "এমনও রজনী" "এমনও জোছনা" সবই যেন মিথ্যা হয়ে যাবে।

কল্পনাস্রোতে প্রাণখানি ভাসিয়ে দিয়ে একটা উদাসী মন নিয়ে চুপ ক'রে গিয়ে বসলাম ছাদের এক কোণে "আল্সের"উপরে। কতক্ষণ এইভাবে চুপ ক'রে বসেছিলাম মনে নাই, হঠাৎ দেখি সাবিত্রী উঠে এল আমাদের ছাদে একাকিনী। সাবিত্রীর পরিধানে ছিল একখানি নীলাম্বরী সাড়ী, উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম। একমাথা চুলে খোঁপা বাঁধা, তাতে জড়িয়েছে সাদা সাদা কি একটা ফুলের মালা। কপালে পরেছে একটি টিপ, কালো না লাল চাঁদের আলোয় ঠিক বুঝতে পারিনি।

সাবিত্রীকে ঠিক এইরকম পরিপাটি হয়ে সাজতে এর আগে খুব কমই দেখেছি—অন্ততঃ দেখেছি ব'লে ত আমার মনে হয় না। যদিও একথাও স্বীকার করতেই হবে সাবিত্রী তার সাজগোজে সব সময়ই ছিল বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বেশ ফিট্‌-ফাট। সাজের একটা এলোমেলো ধরণ সাবিত্রীর মধ্যে বোধহয় কখনই দেখিনি।

সাবিত্রী বোধ হয় আমাকে দেখতে পায়নি। সে ছাদে এসেই শান্ত ধীর পদক্ষেপে, আমি যেদিকটায় বসেছিলাম ঠিক তার উল্টো দিকে কিনারায় গিয়ে ছাদে রেলিংয়ের উপর ভর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আমিও কোন কথা কইলাম না। খানিকক্ষণ তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটা চেয়ে চেয়ে দেখলাম। সে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখখানি ঠিক দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটার মধ্যেই যেন সজাগ হয়ে উঠেছিল তার অসাধারণ অঙ্গশ্রী—সদ্য-বিকশিত যৌবনের লাবণ্যটুকু।

আমি চেয়ে চেয়ে হঠাৎ শিউরে উঠলাম। কেমন যেন একটা পুলক অনুভব করলাম সারা প্রাণে, সারা অঙ্গে-অঙ্গে। সাবিত্রী ঠিক সেই ভাবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে কি আকর্ষণে জানিনা চুপি চুপি পা টিপে টিপে সাবিত্রীর ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম—ধীরে হাত রাখলাম সাবিত্রীর কাঁধে।

ভেবেছিলাম সাবিত্রী হঠাৎ চমকে উঠবে। "বাপরে" ব'লে দুহাত লাফিয়ে সরে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য, সাবিত্রী কিছুই করলে না। ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। শুধু একটুখানি খিল খিল ক'রে হেসে বললে "আমি অনেকক্ষণ টের পেয়েছি।" আমি সাবিত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু কৈ হাতখানি ত সরিয়ে নিলাম না সাবিত্রীর কাঁধ থেকে।

বললাম "কি টের পেয়েছিলে ?"

সাবিত্রী বললে, "কেন—তুমি আমার ঠিক পেছনে এসে একটুখানি চুপ ক'রে দাঁড়ালে। তখনই বুঝেছিলাম, যে রকম পা টিপে টিপে এলে শান্তদা—হয় এইবার আমার চোখ টিপে ধরবে, না হয় আমাকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে চমকে দেবে।"

বললাম "তা কৈ তুমি ত কিছু বল্লে না আমাকে।"

সাবিত্রী বললে "ভাবলাম দেখি না তোমার দৌড়টা কতদূর।" জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি জানতে যে আমি ছাদের উপর আছি ?"

সাবিত্রী "হুঁ।"

জিজ্ঞেস করলাম "আমাকে দেখতে পেয়েছিলে ?"

সাবিত্রী "না, তবে আন্দাজ করেছিলাম তুমি কোন দিকটাতে আছ।"

জিজ্ঞেস করলাম "তবে সে দিকটায় গেলে না কেন ?"

সাবিত্রী চুপ করে রইল। উত্তর দিল না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম "তবে সে দিকটায় গেলে না কেন ?"

সাবিত্রী "খুসী।"

"ভারি দুষ্টু মেয়ে" এই বলে সাবিত্রীর কাঁধ একটু টিপে বোধ হয় একটু নিজের দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। সাবিত্রী একটুও নড়ল না। ফলে আমিই আরও একটু কাছে এগিয়ে গেলাম।

একটুক্ষণ দু'জনেই চুপ চাপ। বুকের গতি আমার তখন ঠিক সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। তাই বোধ হয় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ বললাম "তুমি আজ এত সেজেছ কেন সাবি ? কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।"

সাবিত্রী হঠাৎ যেন কেমন একটু চমকে উঠল। বড় বড় চোখ দুটো তুলে নিমেষের জন্য চাইল আমার দিকে আবার তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিলে। ক্ষণিকের সে চাহনিতে শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, সে চোখ দু'টির গভীর তলদেশে যাই থাক ওপরে ভেসে উঠেছিল শুধু একটুখানি সলজ্জ হাসি।

তাড়াতাড়ি বললে "ঐ বৌঠান কিছুতেই ছাড়লে না। এ সাড়ী ত আমার নয়, জোর ক'রে আমায় পরিয়ে দিয়েছে ?"

সাবিত্রীর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। ক্ষিপ্র হস্তে খোঁপা থেকে মালাটি খুলতে খুলতে বললে "ঐ বৌঠানই ত"।

আমি সাবিত্রীর হাত দু'খানি চেপে ধ'রে বললাম "থাক থাক, মালাটি থাক খোঁপায়।

সাবিত্রীর হাত দুখানি মাথায় খোঁপার উপরে রয়েছে—ধরা দিয়েছে আমার হাতের মধ্যে। ঘাড়টী বাঁকিয়ে, মুখখানি একটু উঁচু ক'রে তুলে, আমার মুখের দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে সহজ সুরে জিজ্ঞেস করলে "কেন ?"

বললাম "রইলই বা।"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে "নাই বা রইল।"

বললাম "মালাটী তোমার খোঁপায় চমৎকার মানিয়েছে সাবি—থাক না।"

সহজ সুরে বললে—"আচ্ছা থাক।"

এই ব'লে ধীরে হাত দুটি আমার হাতের মধ্য থেকে সরিয়ে নিলে—চেয়ে রইল বাইরের দিকে। আমার হাতখানি নেমে গিয়ে আবার ভর দিলে সাবিত্রীর কাঁধে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিন্তু এ আজ আমার কি হোল। সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায় যেন তড়িৎ খেলে যাচ্ছিল। একটু আদর মাখান সুরে বললাম "সাবি বড় লক্ষ্মী মেয়ে।"

মুখ না ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে "কেন ? সেজেছি ব'লে ?"

একটু অবাক হ'লাম। ভাবলাম বেশ কথা কইতে জানে ত সাবিত্রী। পাঁচ-জনার মধ্যে সাবিত্রীর মুখের কথা ত একরকম শোনাই যায় না! যা দু-একটা বলে, তাও অত্যন্ত আস্তে—নিতান্ত যেন পাশের লোকটীর জন্য।

বললাম "শুধু কি একটা, অনেক কারণে।"

জিজ্ঞেস করলে "কি কি, শুনি ?"

আমি বললাম "প্রথমতঃ, এমন চমৎকার সেজেছ।"

সঙ্গে সঙ্গে বললে "সে ত আমার ইচ্ছায় নয় বৌঠান জোর ক'রে পাঠিয়ে দিল।"

বললাম "দ্বিতীয়তঃ, আমি ছাদে একলাটী আছি জেনে আমার সঙ্গে গল্প করবার জন্য ছাদে উঠে এলে।"

বললে "উহুঁ—মোটেই নয়। সেও ঐ বৌঠান! জোর ক'রে আমায় ছাদে পাঠিয়ে দিলে।"

সত্যি অভিমান হয়েছিল কি না জানি না, একটু অভিমানের সুরে বললাম "ওঃ, জোর ক'রে ত, তোমার বুঝি আসার ইচ্ছে ছিল না ছাদে?"

একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে বললে "না।"

বললাম "কেন? আমি ছাদে ছিলাম ব'লে বুঝি?"

বললে "ভাবিনি সে কথা।"

বললাম "তবে ইচ্ছে ছিল না কেন?"

বললে "সইমা ত উপোস ক'রে আছেন, বৌঠান একলাটি সব কাজ করেছেন। ভেবেছিলাম বৌঠানের সঙ্গে সঙ্গে থাকব। যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।"

এ কথার জবাব নাই। চুপ ক'রে রইলাম। হঠাৎ সাবিত্রী জিজ্ঞেস করলে "এই দুটো কারণ ত?"

আমি বললাম "তারপর আমার কথা রাখলে, মালাটি নামালে না খোঁপা থেকে।"

বললে "কি করব। তোমার সঙ্গে কি আমি জোরে পারি শান্ত দা।"

বোধ হয় একটু অভিমানের সুরেই বললাম "বেশ। আমি আর জোর করব না, কথা দিচ্ছি নাও, নামিয়ে নাও মালাটি।"

সাবিত্রী যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি রইল। কিছুই করলে না।

বললাম "কৈ নিলে না মালাটি নামিয়ে?"

বললে "এখন আর ইচ্ছে করছে না।"

আবার আমায় চুপ করিয়ে দিলে। আমি বোধ হয় কেমন ক'রে কোনও একটা ফন্দীতে সাবিত্রীকে আরও কাছে টেনে নেওয়া যায় এই ভাবছিলাম এমন সময় সাবিত্রী বললে "দেখলে ত শান্ত দা! তুমি যে সব কারণ দেখালে তার একটাও সত্যি নয়।"

আমার হাতখানা তখন সাবিত্রীর কাঁধ থেকে ধীরে ধীরে গলার কাছে নেমেছে। তার একখানা হাত ঘুরিয়ে নিয়ে সেই হাতখানির সঙ্গে মিলিয়ে দিলাম। মুখ

একটু নীচু স্বরে বোধ হয় বেশ একটু আদরের সুরে বললাম "তা তুমি কি লক্ষ্মী নও সাবি ?" তৎক্ষণাৎ একটু নীচু হয়ে নিজের মাথাটা আমার বাহু দুখানির মধ্য দিয়ে গলিয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে চাইল আমার মুখের দিকে। মৃদু মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে বললে "উঁহু—হাড় দুষ্টু।"

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে ছুটে ছাদ থেকে নীচে নেমে গেল

## নয়

দু'খের বিষয় সেদিন রাত্রে খেলা হলো না। সারাদিন উপোস ক'রে সন্ধ্যার পর মার বড্ড মাথা ধরেছিল। কাজেই মন্টি বৌঠানের মার কাছেই থাকতে হলো—মার মাথা টিপে দিচ্ছিলেন। সাবিত্রীও সেইখানে ছিল। আমি আর মুকুন্দ ছাদে বসে বসে গল্প ক'রে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দিলাম।

রাত সাড়ে ন'টা আন্দাজ নীচে আমাদের খাওয়ার ডাক পড়ল। আমি আর মুকুন্দ নীচে খেতে নেমে এলাম। নীচের এক তালার বারান্দায় পাশাপাশি দুখানি আসন পাতা হয়েছে—আমার আর মুকুন্দর জন্য। আমরা দু'জনে খেতে বসলাম। রান্নার ঠাকুর দু'খানা থালায় আমাদের খাবার দিয়ে গেল! আমাদের খাবারের সামনে একটা জলচৌকির উপর একটা আলো বসান ছিল। মন্টি বৌঠান সেই আলোটির পাশে এসে মাটিতে বসলেন।

ইতিমধ্যে নীচে নামবার সময়ই আমার যেন কেমন একটু লজ্জা বোধ হচ্ছিল কেমন যেন একটু সঙ্কোচ ভাব। সাবিত্রী কি বুঝতে পেরেছিল আমার মনের ভাব? ছিঃ ছিঃ, কি ভাবলে সাবিত্রী। মনকে বোঝালাম—সাবিত্রী ছেলেমানুষ, কি আর বুঝবে। কিন্তু মন যেন কথায় সায় দিল না! যদি নাই কিছু বুঝে থাকতো হঠাৎ অমন ক'রে পালিয়ে গেল কেন? ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা!

খেতে বসতে বসতে মন্টি বৌঠানকে দেখে হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠল। হঠাৎ মনে হ'ল তাই ত সাবিত্রী মন্টি বৌঠানকে কিছু ব'লে দেয়নি ত? তাহ'লে—।

আমি কিছুক্ষণ কোনও কথা কইতে পারলাম না, মন্টি বৌঠানের মুখের দিকে চাইবার পর্যন্ত ভরসা ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্য, খেতে বসেই আমার চোখ একবার চারিদিকে ঘুরে এল—কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। বোধ হয় আশা করেছিলাম, মন্টি বৌঠানের পাশেই সাবিত্রীকে দেখতে পাব। কিন্তু সাবিত্রী মন্টি বৌঠানের পাশে ত ছিল না। ছেলেমানুষ, এত রাত হয়েছে, বোধ হয় ঘরের মধ্যে কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছে। এত যে লজ্জা অনুভব করছিলাম, তবুও সাবিত্রীকে না দেখে, কৈ, স্বস্তি ত হল না—একটা যেন হতাশার মতই বোধ হচ্ছিল প্রাণে।

একমার মন্টি বৌঠানকে জিজ্ঞেস করলে হ'ত "সাবি কোথায়।" কিন্তু আমার পক্ষে তখন সাবি এই নামটি মুখে আনাও যেন অসম্ভব। মুকুন্দটাও ত অনায়াসেই সুধাতে পারে? কিন্তু কবে কৈ?

মন্টি বৌঠানই প্রথম কথা কইলেন। বললে "সন্ধ্যেটা একেবারেই মাটি হ'ল।"

মুকুন্দ বললে, "তা জ্যেঠাইমা এখন ঘুমিয়েছেন বুঝি?"

বৌঠান বললেন, "হ্যাঁ—এই একটু আগে।"

মুকুন্দ বলল, "তা খেযে উঠে খানিকক্ষণ বসলে হয় না?"

বৌঠান বললেন, "সে বড্ড রাত হযে যাবে। তোমাদের খাওযা-দাওয়া হ'লে আমরা খাব—আজ আর হয না।"

মকুন্দ বলল, "তা ক'টা বেজেছে শান্তদা?"

আমি বললাম, "সাড়ে ন'টা! সিঁড়ি দিযে নামতে নামতে ঘড়িতে দেখলাম।"

মুকুন্দ বলল "তোমাদের খেতে আর কতক্ষণ লাগবে মন্টি? আমরা ত এখুনি খেয়ে উঠব। দশটার সময়ও যদি খেলতে বসা যায় ত অন্ততঃ এক ঘণ্টা খেলা যাবে।'

এ প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ মত ছিল। খেলা মানেই সাবিত্রী—সেইখানেই আমার আগ্রহ। খেলার নিজস্ব কোনও প্রলোভন তখন যেন আমার একেবারেই নাই।

বৌঠান বললেন "না। খেয়ে উঠে একটা কাজও আছে। আজ আর হয় না।"

ভাবলাম একবার বলি "সাবি ছেলেমানুষ হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।" কিন্তু বলা হ'ল না।

বললাম "বৌঠান! হাজার হ'লেও তুমি ছেলেমানুষ। অত রাত জাগা কি তোমার পক্ষে সম্ভব—কি বল?"

বৌঠান একটু হেসে বললেন "তা সত্যি কথা। রাত জাগতে আর পারি না। পারি খেলায় ত প্রায় রোজই হারিয়ে দিচ্ছেন। ছেলেমানুষ ব'লেই ত সম্ভব হচ্ছে।"

মুকুন্দ হি-হি ক'রে হেসে উঠল। বললে "তাহ'লে বুঝতে পাচ্ছিস্—বুদ্ধির জোরে আমরা জিতি। জুচ্চুরি-টুরী নয়।"

বৌঠান বললেন "খুব বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তোমরা দুজনেই খালি একসঙ্গে বসবে কেন? খেঁড়ী বদলাতেই বা তোমাদের এত আপত্তি কেন?

মুকুন্দ বললেন "সে আমরা যদি মেয়েমানুষের সঙ্গে না বসি।"

বৌঠান বললেন "মেয়েদের সঙ্গে খেলতে পাব আর মেয়েদের খেঁড়ী নিতেই যত আপত্তি?"

মুকুন্দ বললে "তা'হলে কি বলতে চাস্—আমরা জুচ্চুরী করে জিতি?"

বৌঠান বললেন 'দোহাই তোমার, আবার ঝগড়া সুরু করো না ছোড়দা। আমি কি কখনও বলেছি তোমরা জুচ্চুরী কর।"

মুকুন্দ বললে "না, ঐ সাবিটা খালি চেঁচায় কিনা। হেরে যাবে আর বলবে জুচ্চুরী করছে।"

বৌঠান বললেন "তুমি কাল সাবির সঙ্গে বোঝাপড়া কোরো। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে—আজ আর নয়।"

মুকুন্দ উত্তেজিত স্বরে বললে "বোঝাপড়া আবার কি? ফের যদি সাবি ওরকম বলে, আমি খেলব না সাবির সঙ্গে ব'লে দিচ্ছি! জুচ্চুরী করছে জুচ্চুরী করছে, মুখের কথা বললেই অমনি হ'ল।"

"বেশ! আমি কাল হাতে-হাতে ধরিয়া দেব।" হঠাৎ আমাদের দীর্ঘ বারান্দার এক কোণ থেকে সাবিত্রীর গলা পাওয়া গেল। আমরা তিনজনেই চমকে উঠলাম। তিনজনেই একসঙ্গে চেয়ে দেখি, বারান্দার এক পাশটিতে যেখানে কতকগুলি কাঠের বাক্স, কেরোসিনের টিন, কতকগুলি ধামা, কুলো এটা ওটা সেটা পাঁচরকম জড় করা আছে, সেইখানে একটি কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপর সাবিত্রী চুপ ক'রে বসে আছে। আমাদের খাওয়ার সামনের আলোটির রশ্মি ঠিক অত দূর পর্যন্ত গিয়ে উজ্জ্বলভাবে পৌঁছায়নি, তাই সেই কোণটা ছিল কতকটা অন্ধকার। আমার বুকের ভিতরটায় হঠাৎ কেমন যেন দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ হ'ল।

বৌঠান বললেন "আরে তুই কখন থেকে ওখানে চুপ ক'রে বসে আছিস সাবি ?"

সাবিত্রী বললে "গোড়া থেকে তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি বৌঠান।"

মুকুন্দ বললে "বেশ, দিও ধরিয়ে, কথা রইল।"

সাবিত্রী বললে "আমিও বলছি, শুধু একবার কেন, পর পর তিনবার ধরিয়ে দেব, তারপর আমিও আর জোচ্চরদের সঙ্গে খেলব না।"

সেদিন রাত্রে কেমন যেন ভাল ঘুম হ'ল না! রাতটাও ছিল ভীষণ গরম। একটুকুও হাওয়া ছিল না, কোথাও, গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। তার উপর আমার প্রাণে কিসের যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম—কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য সমস্ত প্রাণে-প্রাণে অঙ্গে-অঙ্গে! একটু-আধটু ঘুমিয়ে যদিও বা পড়ি, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়—এপাশ-ওপাশ ছটফট করি ঘুম আর আসে না!

কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে ভোর হতে না হতেই বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখি তখনও অন্ধকার রয়েছে, তবে ভোরের আলোর পূর্বাভাস অন্ধকারের মধ্য দিয়ে উঁকি মারছে—বেশ বোঝা যাচ্ছিল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। ক্রমেই আমার চোখের সামনে অন্ধকার পাতলা হয়ে এল। মাঠ, বন, গাছ-পালা আকাশ, সবই সদ্য জাগরণের তন্দ্রাচ্ছন্ন কুয়াসায়, একটা অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে ধীরে ধীরে ধরা দিল আমার নয়নে-নয়নে।

ছেলেবেলা থেকে এত ভোরে কখনও বোধহয় বিছানা ছেড়ে উঠিনি। প্রকৃতির এই রূপ, এর আগে কখনও দেখেছি ব'লে ত মনে হয় না। একটা অভূতপূর্ব আবেগে আমার প্রাণখানা কেঁপে উঠল। সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে জগতখানিকে আজ যেন এক নূতন রসে উপলব্ধি করলাম। এই নূতন রসের মধ্যে সরস মূর্তিমতী হয়ে, এই আদি উষার সদ্য জাগরণে ভেসে উঠল আমার সমস্ত প্রাণে—সাবিত্রী।

সাবিত্রী—এই সুন্দর পৃথিবীতেই সে আছে, বেঁচে আছে, আমারই পাশে-পাশে সে আছে, হাত বাড়ালেই তাকে স্পর্শ করা যায়। সে মিথ্যা নয়, মায়া নয়,—সত্য প্রত্যক্ষ সত্য,—আমারই পাশের ঘরের বিছানায় সে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। কেমন যেন একটা বিস্ময়ে ভরে গেল সমস্ত প্রাণ-মন। ঘরের দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভোরের একটা অস্পষ্ট অন্ধকারে এখনও চারিদিক ঢাকা। ভাবলাম, নীচে নেমে অঙ্গণ পেরিয়ে বাইরে পুকুরের ঘাটে গিয়ে একটু বসি।

নীচে নেমে, বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, কে যেন একজন বারান্দা দিয়ে প্রাঙ্গণে নামবার ধাপের উপরে চুপ ক'রে বসে আছে। আমার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। সাবিত্রী নয়? একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম সাবিত্রীই ত বটে।

বললাম "একি! তুমি এত ভোরে উঠে এসে বাইরে চুপ ক'রে বসে আছ সাবি?"

বললে "তুমিও যে এত ভোরে উঠেছ শান্তদা?"

বললাম "যে গরম, সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। তাই ভোর হ'তে না হ'তেই উঠে পড়েছি।"

বললে "আমারও তাই। সারারাত ঘুমুতে পারিনি।"

আমি গিয়ে সাবিত্রীর পাশে ধাপের উপর বসে পড়লাম। বললাম "বৌঠান এখনও ঘুমুচ্ছে বোধ হয়?"

সাবিত্রী বললে "মড়ার মতন।"

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে বসে রইলাম। কারও মুখে কোনও কথা নেই। হঠাৎ সাবিত্রী বললে "শান্তদা, চল না আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে।"

বললাম "তুমি এত ভোরেই যাবে সাবি?"

বললে "হ্যাঁ, মা কাল রাতে কিরকম ছিলেন কে জানে।"

বললাম "তোমার মা ত আজকাল ভালই আছেন। আজকাল ত আর জ্বর হয় না।"

সাবিত্রী বললে "হ্যাঁ,—কিন্তু কিছুই বিশ্বাস নেই। হঠাৎ জ্বর এসে যেতে পারে।"

এই ব'লে সাবিত্রী উঠে দাঁড়াল। আমিও আর কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়ালাম। এই ভোরে নির্জন গ্রামের পথে সাবিত্রী ও আমি দু'জনে বেড়াতে বেড়াতে যাব—ভাবতে প্রাণে একটা অপূর্ব পুলকের শিহরণ অনুভব করলাম। বললাম "চল।"

দু'জনে চললাম। পথে যেতে যেতে বিশেষ কিছুই হ'ল না। কেবল দু-একটা কথার মধ্যে ঠিক হ'ল, মা যদি ভাল থাকেন ত সকাল সকাল স্নান ক'রে খেয়েই সাবিত্রী চলে আসবে। আমরাও সকাল সকাল তৈরী হয়ে নেব!

নির্জন গ্রাম্যপথ। দু'জনে পাশাপাশি চলেছি। ভোরের অস্পষ্টতা তখন আর নাই, চারিদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। মাথার উপরে আকাশের দিকে

চেয়ে দেখেছিলাম, নীলাকাশের গায়ে গায়ে এখানে ওখানে পাতলা পাতলা সাদা সাদা মেঘ ভেসে র'য়েছে! সাবিত্রীর দিকে দু-একবার চেয়ে দেখেছিলাম মুখখানি একটা নিদ্রালস লাবণ্যের মাধুরীতে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। কপালের উপর উস্কখুস্ক রুক্ষ চুল, ইচ্ছে হচ্ছিল হাত দিয়ে একটু সরিয়ে দি—কিন্তু স্পর্শ করবার ভরসা হ'ল না।

চ'লেছি। চলতে চলতে এমন জায়গায় এলাম, যেখানে গ্রাম্যপথটী ভেঙ্গে গিয়েছে। পথের খানিকটা ধসে নেমে গিয়ে জল কাদায় এমন অবস্থা হয়েছে যে তার উপর দিয়ে সহজে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। তাই চলাচলের সুবিধার জন্য তিনখানা বাঁশ পাশাপাশি ফেলে দেওয়া আছে, ভাঙ্গা জায়গাটির এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত! আমি গিয়ে এগিয়ে সেই বাঁশের উপর উঠলাম, সাবিত্রীও আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল।

"হাত ধর না শান্তদা! না ধরলে কি পারি।" তাড়াতাড়ি সেই বাঁশের উপরে পিছন ফিরে আমি সাবিত্রীর হাত ধরলাম।

সাবিত্রী যে হাত না ধরলে পেরুতে পারে না—একথা আমার একবারও মনে হয়নি। দিনের মধ্যে পাঁচবার সে আমাদের বাড়ী যাতায়াত করে একা। তখন হাত ধরবার লোক কেউ সঙ্গে থাকে না! তা'হলে পার হয় কি করে?

যাই হোক, আমার ডান হাত দিয়ে সাবিত্রীর বাঁ হাতখানা ধরলাম। ধীরে সযত্নে তাকে নিয়ে এলাম, বাঁশের উত্তর দিয়ে রাস্তার এপারে।

এপারে এসে হাতখানি ছেড়ে দিতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। যে হাতখানি আমার হাতের মধ্যে ধরা দিয়েছে তাকে স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেব! কিন্তু বাঁশ ত পেরিয়ে এসেছি—আর প্রয়োজন নেই। বৃথাই বা ধরে রাখি কোন লজ্জায়!

সাবিত্রী কি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল? নিঃশব্দে কোন কথা না ব'লে নিজের হাতখানি সে আরও ভাল ক'রে রাখলে আমার হাতের মধ্যে সরিয়ে ত নিলে না? হাত ধরাধরি করে গেলাম বাকী পথটুকু।

উঃ সে কী পুলক! কী আনন্দ! এই ছোট হাতখানির মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছায় সাবিত্রী যেন তার প্রাণখানি ধরা দিয়েছিল আমার হাতের মধ্যে। ছড়িয়ে দিলে একটা অপূর্ব শিহরণ আমার সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

হাতখানি হাতে ধরা দেওয়ার পর থেকেই যেন হঠাৎ কথার বন্যা এল সাবিত্রীর মুখে। একথা, ওকথা, সেকথা, কত বাজে কথা যে অনর্গল বকে যেতে লাগল—কতক শুনেছিলাম কতক শুনিনি। হুঁ, হ্যাঁ, না—এইরকম জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম

এর বেশী কথা কইবার শক্তি আমার তখন লোপ পেয়েছিল। কেমন যেন একটা অভিভূতের মত চলতে লাগলাম সাবিত্রীর বাড়ীর অভিমুখে!

হঠাৎ হুঁস হল। সাবিত্রীর বাড়ীর কাছাকাছি এসে, হঠাৎ সাবিত্রী নিজের হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে, আমাকে ফেলে ছুটে চলে গেল বাড়ীর দিকে। আমি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কেমন যেন একটা প্রচণ্ড উৎসাহ এল প্রাণে। ইচ্ছে হচ্ছিল, বাড়ী ফিরবার পথে ছুটেই চলে যাই সারা পথটা। মনে হচ্ছিল আজ আমার গৌরব জগতের কারুর চেয়ে কম নয়। আমার প্রাণের আবেগে সাবিত্রী দিয়েছে সাড়া—আজ আমি জয়ী! ভাবলাম, আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম!—মনে পড়ল সাবিত্রী!

* * * *

সারা সকালটা কাটল একটা যেন স্বপ্নের মধ্যে। একটা নেশায় যেন মাতোয়ারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কোথাও একদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। থেকে থেকে অনবরত ঘড়ির দিকে দেখছিলাম—ক'টা বেজেছে।

মনে হচ্ছিল—একটা গোপন নিবিড় রহস্য আমার আর সাবিত্রীর মধ্যে। সে ত আর কেউ জানে না। সে যে একান্ত আমাদেরই দুজনার এবং তাই নিয়ে আমরা দুজনে এক—জগতের সকলের চেয়ে বিভিন্ন। মন্টি বৌঠানে মুখের দিকে চেয়ে যেন একটা করুণা হয়েছিল—নিতান্ত বাইরের প্রাণী সে, কতটুকুই বা জানে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা মন্টি বৌঠানের ঘরে তাসের আড্ডা বসল। বৌঠান প্রথমেই বলে বসলেন, "আজ খেঁড়ী বদলে বসতে হবে। আমি আর ছোড়দা, ঠাকুর-পো আর সাবি।"

কথাটা আমার ভালই লাগল। এইটেই যেন স্বাভাবিক, আজ[illegible] দিনের বিশেষ সুরটির সঙ্গে এইটেই খাপ খাবে।

মুকুন্দটা চেঁচিয়ে উঠল "কক্ষনো না।"

বৌঠান জিজ্ঞেস করলেন "আপত্তি কিসের ছোটদা—শুনি।"

মুকুন্দ বলল "তুমিইবা কেন খেঁড়ী বদলাতে চাইছ শুনি।"

বৌঠান বললেন "মাঝে মাঝে খেঁড়ী বদল বওয়া ত ভালই—আপত্তি কেন?"

মুকুন্দ বলল "আমাদের সন্দেহ ক'রে এইজন্য ত? তোমাদের অন্যায় সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতে পারি না।"

বৌঠানের বোধ হয় সেদিন একটু জিদ চেপেছিল। আমার দিকে চেয়ে বললেন "আপনি কি বলেন ঠাকুরপো?"

আমি একটা উদাসীনতার ভঙ্গীতে বললাম "আমার কিছুই যায় আসে না।"

মুকুন্দ বলল "না—খেঁড়ী বদলে আমি খেলব না।"

সাবিত্রী বললে "থাক্ থাক্ বৌঠান, দরকার নেই। তোমাতে আমাতেই বসব।"

বৌঠান আর কোনও কথা বললেন না। খেলা চলতে লাগল! খেলছিলাম আমরা টোয়েন্টি-নাইন। সেবার বৌঠান তাস দিলেন। বৌঠানের ডাইনে আমি। প্রথম ডাক আমার ডাকলাম "১৫"।

সাবি বললে "১৬"

"আছি"

"১৭"

"আছি"

"১৮"

"আছি"

"১৯"

"আছি"

"২০"

"আছি"

সাবিত্রী একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে পাস"।

এইবার মুকুন্দের ডাকের পালা। মুকুন্দ আমার দিকে একবার চাইলে। ইতস্ততঃ করতে লাগল আমার উপর ডাকবে কিনা।

হঠাৎ সাবিত্রী বললে "বৌঠান, ছোড়দা এবার 'পাস' দেবে।"

মুকুন্দ বলল "দেবই ত পাস'। খেঁড়ীর উপর—শুধু শুধু ডেকে নেব নাকি।"

সাবিত্রী কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সবাই বোধ হয় একটু একটু অবাক হ'লাম দেখে সাবিত্রী একটুকরো কাগজ ও পেন্সিল কোথা থেকে যেন হঠাৎ বার করলে এবং তাতে কি একটা লিখলে---কাউকে দেখালে না। চেপে রেখে দিল পায়ের নীচে।

সেবার বৌঠানও পাস দিলে, খেলা চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর একবার, ডাকাডাকি শেষ হয়ে গেছে। বৌঠান আর মুকুন্দতে জেদাজেদি ক'রে ডাক অনেকটা তুলে দিয়েছে ২৬ ডাকে মুকুন্দ ডেকে নিলে। ডেকে নিয়ে মুকুন্দ একবার এদিক ওদিক চেয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বৌঠান বল্লেন, "রং কর ছোড়দা।"

মুকুন্দ বললে "দাঁড়া ভেবে-চিন্তে, হিসেব ক'রে ত রং করব। অত তাড়াতাড়ি ক'রে কি রং করা যায়।"

আমি অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক চাইছিলাম। বিশেষ যেন খেলায় লক্ষ্যই নাই।

হঠাৎ সাবিত্রী বললে "রং হবে ইস্কাবন।"

মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল "ও নিশ্চয়ই আমার হাত দেখেছে।"

বৌঠানও তীব্র প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন—"সাবি অনেক দূরে বসে আছে, সাবির পক্ষে হাত দেখা অসম্ভব"—ইত্যাদি।

আমি শান্তস্বরে বললাম "থাক থাক, চেঁচামেচি করে কি হবে। রং করেই ফেল না বাপু।"

ইস্কাবনই রং হ'ল এবং খেলা চলতে লাগল।

এরই দু-চার বারের মধ্যে এক ব্যাপার ঘটল। সেবার আমিই ডেকে নিয়েছিলাম। বাজার থেকে রং কাবার ক'রে নিয়ে হাতে ফ্রী বিশেষ কিছু ছিল না! কি খেলব ভাবছি। এমন সময় সাবিত্রী চট ক'রে কাগজের এক টুকরো ছিঁড়ে তাতে কি একটা লিখে মন্টি বৌঠানের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

মন্টি চেঁচিয়ে উঠল।

সাবিত্রী বললে "বৌঠান! এখন দেখো না, শান্তদার খেলা হ'লে দেখো, এবং সবাইকে দেখিও।"

আমি হরতনের দশ খেললাম।

সাবিত্রী বললে "বৌঠান এবার কাগজ পড়।"

আমরা সবাই এমন কি মুকুন্দ পর্যন্ত একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। বৌঠান কাগজখানি নিয়ে পড়লেন "শান্তদা হরতনের দশ খেলবে।"

মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল "নিশ্চয়ই হাত দেখেছে।"

বৌঠান বললেন "বোকার মত চেঁচিও না ছোড়দা। হাতে ত আরও অনেক কাগজ আছে। হরতনের দশই খেলবে জানলে কি ক'রে।"

মুকুন্দ বোধ হয় অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল। বৌঠান সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি করে জানলি রে?"

বৌঠান সত্যসত্যই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তার চোখ দুটিতে বিস্ময়ের

চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। আমিও বোধ হয় বিস্মিত মুগ্ধ-দৃষ্টিতে সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

সাবিত্রীর মুখ তখন গম্ভীর। ধীরে ধীরে সে হাতের তাসগুলি ফেলে দিল। শান্তভাবে বৌঠানের দিকে চেয়ে বলতে লাগল "বৌঠান! এদের জোচ্চুরীর মধ্যে বেশ নিয়ম আছে। অনেকদিন লক্ষ্য ক'রে নিয়মগুলি আমি বুঝতে পেরেছি এবং আজ আমি সব নিয়ম কাগজে লিখে এনেছি।"

এই বলে সে একখানি কাগজের টুকরো পায়ের তলা থেকে বার ক'রে নিজের হাতে নিলে। তারপর ব'লে যেতে লাগল,—

"তাসের চারটে রংকে এরা মুখের চার জায়গায় রেখেছে। অর্থাৎ চোখে হরতন, নাকে রুহিতন, কানে ইস্কাবন এবং ঠোটে চিঁড়েতন। যখনই খেঁড়ীকে রংয়ের জোর বা স্ত্রী বোঝাতে হয়, তখুনই এদের চোখ, কান, নাক, কিম্বা ঠোট ভয়ানক চুলকাবার দরকার হয়। এ ছাড়া ছোট ছোট নিয়ম আরও আছে।"

এই ব'লে সাবিত্রী হাতের কাগজখানা সকলের মধ্যে ফেলে দিলে। তাতে অতি সংক্ষেপে লেখা ছিল—

চোখ—হরতন, কান—ইস্কাবন,

নাক—রুহিতন, ঠোট—চিড়েতন,

চুল—আর একটা কিছু বল।

পায়ের বুড়ো আঙ্গুল—ডেকো না।

হাঁটু—ডেকে নাও।

মন্টি বৌঠান কাগজখানি দু-একবার পড়ে সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা হরতনের দশ খেলবে বুঝলি কি করে?"

সাবিত্রী শান্তস্বরেই বলতে লাগল,

"সে ত অতি সোজা। হিসেবে হরতন বাজারে আর মাত্র তিনখানা আছে, গোলাম, দশ, আর বিবি। ছোড়দার হাতে গোলাম, ছোড়দার চোখ চুলকানো দেখেই বোঝা গেল। আমার হাতে বিবি। তোমার হাতে হরতন নেই, কেননা তুমি আগে হরতনের চোদ্দ পাসিয়েছ। দশ থাকলে তুমি ওদের পিঠে কখনই চোদ্দ পাসাতে না। শান্তদার হাতে যে একখানা হরতন আছে, এটা বুঝলাম শান্তদার চুলে হাত না দেওয়া দেখে। নইলে ছোড়দার চোখ চুলকানর পরে শান্তদা একবার চুলে হাত দিতেন। তাই হরতনের দশ ছাড়া আর কি খেলবেন।"

আমরা সকলেই চুপচাপ। মুকুন্দ গুম্ হয়ে বসে আছে। সাবিত্রী ধীরে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর ভাবে বললে—

"বৌঠান! আজ থেকে তাস খেলা ইতি। জোচ্চোরদের সঙ্গে আমি আর কখনই খেলব না।"

এই ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল!

দশ

সাবিত্রীর সঙ্গে সে সময় ক'টাদিন যে কি ভাবে কেটেছিল, ভাবলে আজ আমি অবাক হই—এত রসও একদিন ছিল আমার প্রাণে। কয়েকটা দিন, সেই সময় জীবনের কয়েকটা দিন মাত্র আমি যেন আর এ পৃথিবীর লোকই ছিলাম না। কল্পনালোকে একটা রসের সমুদ্রে দিন-রাত ভেসে বেড়াচ্ছি;—তরঙ্গের উত্থান-পতনে কখনও উঠেছি, কখনও নামছি। আর সেই উঠা-নামার অপূর্ব শিহরণে মুহূর্তে-মুহূর্তে নব-নব উপলব্ধির মধ্যে নিজেকে যেন আর সামলাতে পারছিলাম না।

সাবিত্রী মাঝে মাঝে বলত, "তোমাদের সঙ্গে আর পারি না শাস্তদা।" পারছিল না যে, তা আমি বিলক্ষণ জানতাম; কিন্তু পারাপারির মালিক আমিও ছিলাম না, সাবিত্রীও না। যে প্রবল বন্যা বয়ে গিয়েছিল আমাদের জীবনের উপর দিয়ে সেই সময়টাই তাতে ত দুজনেই নাকানি চোবানি খাচ্ছিলাম—কেই বা কাকে সামলায়। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—এইটেই স্বাভাবিক এবং সাধারণ জীবনের ধর্ম। কিন্তু সে সময়টা আমাদের দুজনার জীবনেই ধর্ম হয়ে উঠেছিল কর্মের ইচ্ছায় কর্তা।

প্রেম?—হ্যাঁ তা ছাড়া আর কিই বা বলা যায়।—বয়সে দুজনেই ছিলাম নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই জগতের প্রেমের হাটে, আমাদের সে বয়সের কাঁচা প্রেমটুকুর মূল্য হয় ত বিশেষ কিছুই দাঁড়ায় না, কিন্তু তবুও আমার আর সাবিত্রীর মধ্যে সে বয়সে যে লীলাটুকু ঘটেছিল তাকে অশ্রদ্ধা করা গেলেও

অস্বীকার করা চলে না। তার মধ্যে কোন ভেজাল ছিল না। তার জাত ও ধর্ম ছিল একেবারে খাঁটী। দেখতে দেখতে জিনিসটা গড়ে বেড়ে উঠল।

চোখে চোখে গড়ে উঠল একটা নতুন ভাষা, যা কেবল আমরা দু'জনেই বুঝতাম। দু'জনে কাছাকাছি থাকি বা দূরে দূরেই থাকি প্রাণে-প্রাণে গড়ে উঠল এমন একটা নির্ভরতা এমন একটা দাবী, যে তা উপেক্ষা করার শক্তি আমাদের দু'জনের কারুরই ছিল না।

মুখে মুখে যে প্রকাশ বিশেষ কিছু তা নয়, বরং বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও অন্তরের নীরব ভাষায় দু'জনে দু'জনকে বরণ ক'রে নিয়েছিলাম,—আনন্দে, প্রাণের চঞ্চল আবেগে—কেউই এতটুকু বাধা দেয়নি।

তাই সেদিন ভোরে সাবিত্রীর হাতখানি আমার হাতের মধ্যে ধরা দেওয়ার পর থেকেই, সকলের চোখের অন্তরালে যখনই আমরা দু'জনে একসঙ্গে হয়েছি সাবিত্রীর হাতখানি আমার হাতে ধরা দিয়েছে, বিনা দ্বিধায়—

মুখের কথার কোন প্রয়োজনই হয়নি। তাই, সাবিত্রী আর জোচ্চরদের সঙ্গে খেলবে না এই শপথ ক'রে উঠে যাওয়ার দু'দিন পরে মন্টি বৌঠান যখন দুঃখ করে আমাকে বল্লেন "সাবি যে কি রকম একগুঁয়ে মেয়ে জানেন না ঠাকুরপো, এত করে বলছি কিছুতেই খেলতে রাজি হচ্ছে না। তখন কেমন যেন একটা জোর, একটা প্রাণের দাবী, অনুভব ক'রছিলাম যে, আমি যদি সকলের আড়ালে সাবিত্রীর হাতখানি ধরে বলি "খেলবে না সাবি? রাখবে না আমার কথা?" সাবিত্রী অস্বীকার করতে পারবে না।

বৌঠানকে বললাম "আচ্ছা—সাবিকে আমি মত করিয়ে নেবো'খন।"

বৌঠান বললেন "দেখা যাক আপনি যদি পারেন। আমার দ্বারা ত হ'ল না। কিন্তু ছোড়দারই বা খবর কি? সেওত দু'দিন এ বাড়ী মুখো হচ্ছে না।"

আমি বললাম "তাকে ত টেনে আনলেই হয়।"

*　　*　　*

বৌঠানের সঙ্গে আমার এই কথাবার্তা হয়েছিল দুপুর বেলা খেতে বসে। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা একলা ঘাটে চুপ ক'রে বসেছিলাম। এক একবার ভাবছিলাম—যাই একবার বেড়াতে বেড়াতে মুকুন্দদের বাড়ী, কিন্তু কেমন যেন বাড়ী থেকে নড়তে ইচ্ছে করছিল না। সাবিত্রী তখনও আমাদের বাড়ীতেই ছিল—বাড়ী যায়নি।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিকে একটা ঘন কালো ছায়া ক্রমেই অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে আসছিল। আমি চুপ করে বসে বসে কি যে সব যা তা ভাবছিলাম, এখন সব ঠিক মনে নাই।

খানিকক্ষণ এই ভাবে কাটল—বাড়ীর ভিতরেও যাচ্ছি না, পুকুর ঘাট থেকে নড়চিও না কোথাও। বোধ হয় একটা আশা নিয়েই বসেছিলাম। সাবিত্রী ত বাড়ী যাবে এবং আমাদের অন্দর হ'তে বেরিয়ে ঘাটের পাশ দিয়েই সাবিত্রীকে যেতে হবে। তখন হয় ত একটুখানি দু'জনার দেখা হবে—নিরালা।

ক্রমে চাঁদ উঠল। আমি চুপ ক'রে বসে আছি এবং থেকে থেকে এক একবার চাইছি আমাদের অন্দরের দরজার দিকে।

এমন সময় হঠাৎ আমার পিছন দিকে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনতে পেলাম! চেয়ে দেখে কেমন যেন একটু চমকে উঠলাম। দেখলাম, আমাদের ঘাটের কাছেই পশ্চিম দিকের একটা পেয়ারা গাছের তলায় একটা নীচু ডাল ধরে সাবিত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। মুখে গায়ে লুটিয়ে পড়েছে চাঁদের আলোয় পেয়ারা গাছের ডাল-পালা পাতার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছায়া। পাতলা চাঁদের আলোয় চারিদিকের ছোট বড় গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে এক একটা দৈত্যের মত, এবং তারই একটি গাছের তলায় চুপ ক'রে দাড়িয়ে আছে সাবিত্রী—একটুও নড়ে না—দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটিও কেমন যেন অবাস্তব ব'লে মনে হচ্ছিল। সবই যেন একটা মায়া।

বললাম "বাবা! চমকে উঠেছি। অমন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

সাবিত্রী হাসতে হাসতে এগিয়ে এল।

বললে—"আমায় ডেকেছ শান্তদা?" কথার সুরের মধ্যে যেন একটু আদর মাখান ছিল।

বললাম "কে বললে?"

বললে "কেন বৌঠান। বললে—ঠাকুরপো তোকে ডেকেছে।"

বললাম "হ্যাঁ, কথা আছে। বস!"

বললে "না—আর বসব না—! রাত হয়ে গেছে; এখন বাড়ী যাই।"

বললাম "রাত হয়ে গেছে, এখন তুমি একলা বাড়ী যাবে কি করে?"

বললে, "একলা যাব না।"

বললাম, "তবে?"

বললে, "তুমি আমায় পৌঁছে দেবে যে।"

বললাম, "কে বল্লে?"

বললে, "আমি বলছি।"

কথাটা এত ভাল লাগলো যে, ঠিক উত্তর খুঁজে পেলাম না। একটু চুপ ক'রে আছি এমন সময় সাবি আবার বললে—"চল।"

বললাম, "বেশত!"—উঠে দাঁড়ালাম।

দু'জনে চলতে লাগলাম। আমাদের বাড়ীর সদর ছাড়িয়ে নিরিবিলি পথে দাঁড়াতেই সাবিত্রীর হাতখানি আমার হাতে দিল ধরা। হাত ধরাধরি ক'রে চলেছি দু'জনে নির্জন গ্রাম্যপথে।

অত্যন্ত কোমল স্বরে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করলে—"কেন ডাকছিলে শান্তদা?"

বললাম, "তুমি নাকি আর কখনও তাস খেলবে না সাবি?"

সাবিত্রী হঠাৎ যেন কেমন একটু গম্ভীর হ'য়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "খেলবে না সাবি?"

শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "না।"

জিজ্ঞাসা ক'রলাম, কেন?"

কোন উত্তর দিলে না। চুপ করে রইল।

বললাম, "আর যদি আমরা জোচ্চুরী না করি তবুও না?"

বললে, "ছোড়দার সঙ্গে আমি আর খেলব না।"

কথাটা শুনে খুসী হলাম। তাহলে রাগটা মুকুন্দর উপর। আমার উপর নয়।

বললাম, "তাহলে আমার উপর তুমি রাগ করনি সাবি? কেমন?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে,—

"ছোড়দা জোচ্চুরীও করবে আবার চোখও রাঙ্গাবে।"

বললাম "মুকুন্দর দোষে তুমি সবাইকে শাস্তি দেবে সাবি?"

বললে, "কেন।"

বললাম, "তাস খেলা ত বন্ধ হলো।"

বললে, "কেন? বড়দাকে ত বৌঠান রাজী করাবেন বলেছেন। বড়দাকে নিয়ে তোমরা খেলো।"

তখন চাঁদের আলো ছাড়িয়ে একটা ছায়াপথ দিয়ে আমরা চলেছি। দু'পাশে বড় বড় গাছ নুয়ে পড়ে পথটাকে খানিকটা অন্ধকার ক'রে দিয়েছে। আমি চট করে সাবিত্রীর হাত ছেড়ে দিয়ে হাতখানা রাখলাম তার পিঠের উপরে। একটু

কাছে টেনে নিয়ে বললাম না। তা হয় না। তুমি না খেললে আমিও খেলব না।"

"কেন ?" মুখ তুলে আমার মুখের দিকে চাইলে।

গলার সুর আবার কোমল হ'ল।

বললাম,"ভালই লাগে না খেলা, তুমি না খেললে।"

বলল "খেলতে খেলতেই ভাল লাগবে।"

বললাম "না।"

বোধ হয় আরও খুসী হ'ল। আরও যেন একটু কাছে এগিয়ে এল। দু'জনে চলেছি চুপ চাপ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। পথের একটা মোড় ফিরে প্রায় সাবিত্রীদের বাড়ীর কাছে এসে পড়লাম।

বাড়ীর ফটকের সামনে এসে দু'জনেই দাঁড়িয়ে গেলাম। সাবিত্রীর হাত আমার হাতের মধ্যে। সাবিত্রী আমার মুখের দিকে সোজা চেয়েছিল—মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে একটা মৃদু হাসিতে।

বললাম "তাহ'লে খেলবে না তুমি সাবি ?" ঠিক তেমনি ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঈষৎ মাথা দুলিয়ে বুঝিয়ে দিলে "না।" ঠোঁটে কিন্তু মৃদু হাসিটী লেগে আছে।

বিষণ্ণ স্বরে বললাম, "বেশ, রাখলে না আমার কথা।"

ঠিক তেমনি ভাবে খানিকটা চুপ করে চেয়ে রইল। কিছু বললে না।

হঠাৎ বললে, "তুমি যদি আমার খেড়ী হও তাহ'লে খেলব।"

এই ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না করে হাত ছাড়িয়ে ছুটে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

## এগারো

দিনকতক কাটল। রোজই সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হয় এবং রোজই আমাদের প্রাণের আদান-প্রদান চলে—বারো আনা নীরবে বাকী চার আনা ভাষায়। মাঝে মাঝে তাস খেলার বৈঠকও বসেছে, তবে সাবিত্রীর খেঁড়ী সব সময়ই ছিলাম

আমি। কিছুদিন পরে মুকুন্দদের বাড়ীতে এক যাত্রা-উৎসবের আয়োজন হ'ল। পর পর তিন ছেলের পরে মেয়ে হওয়াতে মুকুন্দর বাবা খুব ঘটা ক'রে অন্নপ্রাশন দিয়েছিলেন। সমস্ত গ্রাম খাওয়ান হয়েছিল এবং সেই উপলক্ষেই যাত্রা-গান।

যাত্রাগান আরম্ভ হওয়ার সময় ঠিক হয়েছিল বিকেল পাঁচটা। সখ হ'ল, সাবিত্রীকে পাশে নিয়ে বসে যাত্রা শুনব। সেই দিনই সকালে সাবিত্রীকে খানিকক্ষণ নিরিবিলি পেয়েছিলাম।

বললাম "সাবি! যাত্রা-গানের সময় তুমি আমার পাশে বসবে কিন্তু।"

সাবিত্রীর মুখখানা হঠাৎ কি রকম যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল! বললে "ওমা। সেকি কথা, আমি পুরুষদের মধ্যে বসব?"

একটু ভেবে বললাম "না। ছোট ছেলেমেয়েরা যেখানে বসবে তুমি সেই খানটায় থেকো আমি সেইখানেই একটা ব্যবস্থা ক'রে নেবোখন।"

মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে একটু মাথা দুলিয়ে সাবিত্রী বুঝিয়ে দিলে "না।"

একটু অভিমানের সুরে বললাম "বসবে না তাহ'লে তুমি আমার কাছে?"

সাবিত্রী বললে "বৌঠানের কাছে বসব।"

বললাম "বেশ, তাই বোস।"

এই বলে আর কোন কথার অপেক্ষা না রেখে খট খট ক'রে সেখান থেকে চলে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে আমি আমার শোবার ঘরে চুপ ক'রে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি একলা, এমন সময় আমার শোবার ঘরের দরজাটায় ঠক্ করে একটা শব্দ হল। চেয়ে দেখি সাবিত্রী দরজার কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে আমার দিকে। ঠোঁটে একটু মৃদু-হাসি তখনও মাখান আছে।

বললে "সকাল বেলায় অমন চুপ ক'রে শুয়ে আছ কেন শান্তদা?"

গম্ভীর সুরে বললাম "শুধু-শুধু।"

বললে "শুধু-শুধু বুঝি লোক অসময়ে চুপ করে শুয়ে থাকে?"

বললাম "হুঁঃ।"

বললে "ওঠ। সকাল সকাল চান করে খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও—নৈলে রাত জেগে যাত্রা দেখবে কেমন করে!"

বললাম "আমার জন্য আর অত মাথা ব্যথা কেন?"

সাবিত্রী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

বললে "তবে কার জন্য, বৌঠানের ?"

বললাম "সে তোমার খবর তুমি জান।"

সাবিত্রী ঘরে এল। বসলো আমার পাশে, আমার খাটের উপরে। হাতখানি এমন ভাবে আমার হাতের কাছে রাখলে আঙ্গুলগুলি বাড়িয়ে দিলেই ধরা যায়।

বললে "শোন শান্তদা। একটা মুস্কিল হয়েছে, বৌঠান ত চিকের মধ্যে বসবে। চিকের মধ্যে বড্ড গরম হবে, আমি বসতে পারব না।"

প্রাণখানা তখন আমার বুকের মধ্যে আনন্দে নৃত্য করতে সুরু করেছে।

মুখে বললাম "তবে কোথা বসবে তুমি ?"

বললে "তুমি একটা ব্যবস্থা করো।"

বললাম "কি ক'রে ব্যবস্থা করব। তুমি বৌঠানের পাশে বসবে, বৌঠান ত আর চিকের বাইরে বসতে পারে না।"

বললে "কি জানি কি করব, বাইরেই বা পুরুষদের মধ্যে বসি কি করে।"

তখন সাবিত্রীর হাতখানি আমার হাতের মধ্যে।

বললাম "আচ্ছা, আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করব এখন।"

বললে "করো শান্তদা ! লক্ষ্মীটি !"

সকাল সকাল নেয়ে-খেয়ে মুকুন্দদের বাড়ী গেলাম। দেখা যাক বসবার কি রকম ব্যবস্থা হচ্ছে। যেমন ক'রে হোক সাবিত্রী যাতে আমার পাশে বসে তার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। গিয়ে দেখলাম, আসর সাজান হচ্ছিল। আমি আর মুকুন্দ—মুকুন্দদের গোমস্তা ঘটক মশাইয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলাম ও আমাদের মতামত জানাচ্ছিলাম! মুকুন্দদের বাড়ীর সামনের রোয়াকটা চিক্ দিয়ে ঘেরা হচ্ছিল মেয়েদের বসবার জন্য। তারই পাশের পুবের দিকের খানিকটা রোয়াক চিক্ দিয়ে ঘেরা হ'ল না, খালি রাখা হ'ল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বসবার জন্য। বুঝলাম সাবিত্রী এবং তার মত অবিবাহিত মেয়েরা এইখানেই বসবে মেয়েদের কাছে অথচ চিকের বাইরে।

আমি ঘটক মশাইকে বললাম "ঘটক মশাই! এই খোলা রোয়াকটির পাশেই একখানা ছোট বেঞ্চি রেখে দেবেন, আমি আমি আর মুকুন্দ বসব। আমরা ভিড়ের মধ্যে আসরে গিয়ে বসতে পারব না।"

মুকুন্দ বললে "হ্যাঁ বেশ হবে—তাই করবেন ঘটক মশাই।"

ঘটক মশাই বললেন "বেশ ত। কিন্তু আগে থাকতে বেঞ্চি পেতে রাখলে

অন্য ছেলে-মেয়েরা এসে দখল করবে, কিম্বা হয় ত নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও পাতবে। তার চাইতে গান আরম্ভ হ'লে আমি নিয়ে এসে তোমাদের জন্য পেতে দেব।"

আমি বললাম "সেই বেশ হবে। এদিকটায় ভিড় হবে না এইখানটাই ভাল!"

*　　　*　　　*　　　*

সন্ধ্যার একটু আগে যাত্রা আরম্ভ হ'ল। আসর লোকে লোকারণ্য। আমাদের গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে ত এসেছেই, আশে-পাশের গ্রাম থেকেও অনেক লোক যাত্রা শুনতে এসেছে।

আমার মনের অবস্থা তখন যে ঠিক কি রকম হয়েছিল বোঝাতে পারব না। দাদার বিয়ের সময়ও যাত্রা শুনেছি, তখন ছিল মনখানা ষোল আনাই যাত্রার আনন্দে ভরা। আজ আমার মনের রসধারা বিভিন্নমুখী। একটা উৎসবের আনন্দে ত মজগুল হয়ে উঠেছিলামই, কিন্তু বড় ক'রে আমার প্রাণের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল যে আনন্দ তার যেন তুলনা নাই। এই উৎসবে, এই মানবের মহামেলায় সাবিত্রী আমার সঙ্গিনী, আমার পার্শ্ববর্তিনী,—আমার সমস্ত প্রাণের আনন্দ, রসের ধারা, তাকেই আশ্রয় ক'রে দুলে দুলে উঠেছিল। অন্যান্য ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাবিত্রী বসেছিল সেই রোয়াকটির ঠিক কিনারায়। পরিধানে ছিল তার একখানি গৈরিক-রংয়ের সিল্কের সাড়ী, পরিপাটী ক'রে চুল বাঁধা,—কপালে একটি খয়ের রংয়ের টিপ। একহাতে কয়েক গাছি চুড়ী এবং গলায় একছড়া বিছেহার বুকের উপর দুলছে। সাবিত্রীর দিকে চেয়েই, সাবিত্রীর সাজ দেখে বুঝেছিলাম, এর মধ্যে মন্টি বৌঠানের হাত আছে। সাড়ীখানি মন্টি বৌঠানের কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু ঐ হার ছাড়া যে মন্টি বৌঠানের, তা আমি আগেই জানতাম।

সেই রোয়াক ঘেঁসে একটি বেঞ্চি নিয়ে বসেছিলাম আমি ও মুকুন্দ। যাত্রা হচ্ছে, মাঝে মাঝে সাবিত্রী নিজের হাতখানি রোয়াকের কিনারা দিয়ে এলিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে লোকচক্ষের একটু আড়ালে, ধরা দিচ্ছে আমার হাতে, আবার তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নিচ্ছে। মনের তখন যা অবস্থা—সামনে যাত্রাগান হচ্ছে—কি যে হচ্ছে না হচ্ছে আমার যেন খেয়ালই ছিল না!

উঃ, কি পুলক! আনন্দের এতখানি আতিশয্য আমি যেন সইতে পারছিলাম না।

এমন সময় চেয়ে দেখলাম আসরের আর এক পাশে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে হরিশ দাঁড়িয়ে আছে। হরিশকে দেখেই তার সঙ্গে কয়েকটা কথা কইবার বিশেষ আগ্রহ হ'ল। সে ভাল ছেলে, কলেজে পড়ে, আমাদের পরীক্ষার খবর বেরুতে আর কত দেরী, সে কিছু শুনেছে কিনা, তা ছাড়া পাশ করলে, কলেজে পড়ার কি রকম কি করা যাবে, কোন কলেজ কি রকম এ বিষয়েও একটা আলোচনা করবার বিশেষ ইচ্ছে হ'ল। উঠে দাঁড়ালাম। সাবিত্রী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে "কোথায় যাচ্ছ শান্তদা ?"

বললাম যাই একটু ঘুরে আসি। ঐ হরিশ দাঁড়িয়ে আছে তার সঙ্গে একটা কথা কয়ে আসি।"

সাবিত্রী একটু যেন আদরের সুরে বললে "কেন ?"

বললাম "দেখি আমাদের পরীক্ষার খবরও কিছু শুনেছে কিনা।"

মুকুন্দ বলল "চল, আমিও যাব।"

আমি বললাম "তুই গেলে এ জায়গাটা অন্য কেউ নিয়ে নেয় যদি।"

মুকুন্দ বললে "বস। একটা দারোয়ানকে ডেকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে যাচ্ছি।"

মুকুন্দ একটা দারোয়ানকে ডাকলে, বললে "দেখিস। কেউ যেন এখানে না বসে।"

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করলে "কতক্ষণে আসবে ?"

বললাম "এই দশ-পনেরো মিনিট পরে।"

সাবিত্রী বললে "দেরী করো না কিন্তু।"

আমি আর মুকুন্দ, হরিশ যে দিকটায় দাঁড়িয়ে ছিল সেই দিকটায় গেলাম। আমরা যাওয়াতেই আসরের লোকেরা একটু সরে আমাদের বসবার জায়গা ক'রে দিলে। হরিশের দল বলের সঙ্গে আমরা সেইখানটায় বসে পড়লাম।

হরিশের দলে অপূর্ব ব'লে একটি ছেলে ছিল। সেও কলেজে পড়ে, হরিশের বিশেষ বন্ধু। তার সঙ্গে আমার আগে থেকেই অল্প আলাপ ছিল। ছেলেটি ভারী আমুদে—বেজায় হাসাতে পারে লোককে। ঐখানে বসে বসে যাত্রার অভিনেতাদের নকল ক'রে সে এমন মজা করছিল যে, আমরা সবাই হেসে গড়িয়ে যাচ্ছিলাম। দশ মিনিটের ছুটি নিয়ে এসেছিলাম আমি সাবিত্রীর কাছ থেকে, কিন্তু দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা কেটে গেল।

দু' একবার উঠব উঠব ভেবেছি, কিন্তু ওঠা হয়নি—তার অনেকগুলো কারণ

ছিল। প্রথমতঃ, ওদের দলের ঠাট্টা, তামাসা, ইয়ার্কিতে বেশ মজা পাচ্ছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, উঠে যেতে কেমন যেন একটা লজ্জা অনুভব করছিলাম। ওরা বিদেশী কলেজের ছেলে, আসরের পিছনে এক পাশটায় একটু যায়গা পেয়েছে আমরাও এসে বসেছি। এখন উঠে গিয়ে বড়লোকের ছেলে ব'লে বড় মানুষী দেখিয়ে স্বতন্ত্র বেঞ্চিতে বসাটাও একটা লজ্জার ব্যাপার এবং এঁদের ছেড়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে গিয়ে বসতেও কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। এই সব নানা কারণে ওঠা হ'ল না। সাবিত্রীর কথা অবশ্য আমি একেবারেই ভুলিনি। মনকে বোঝালাম "ভালই, ত সাবিত্রী একটু বুঝুক না, আমি অত সস্তা নই, চাইলেই সব সময় আমাকে পাওয়া যায় না, ইত্যাদি।"

হরিশের দল যখন উঠে গেল, তখন রাত দশটা বেজে গেছে। আমি আর মুকুন্দ হরিশের দলকে বিদেয় দিয়ে ফিরে এলাম আমাদের সেই বেঞ্চিটির কাছে দারোয়ান তখনও সেইখানেই আছে, বেঞ্চিটীতে কেউ বসেনি।

কিন্তু সাবিত্রী! ত নেই সেখানে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কতক কতক সেইখানেই পড়ে ঘুমুচ্ছে, বড়রা বসে আছে। কিন্তু সাবিত্রী কোথায়?

কোনও কথা খুঁজে পেলাম না। চুপ ক'রে কেমন বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। বৌঠান নিজের মনেই ব'লে যেতে লাগলেন—

"শরীর নিশ্চয়ই খুব বেশী খারাপ হয়েছে। নইলে একটু আধটু হ'লে শুয়ে থাকবার মেয়ে সাবি নয়। বিশেষতঃ, ওর যা সখ—আজ সাত দিন ধরে নেচে বেড়াচ্ছে—যাত্রা দেখবে।"

বুকের ভিতরটা কেমন হু-হু করে উঠল। বললাম "তা বন্ধ ঘরে শুয়ে থাকলে ত মাথা ছাড়বে না, তার চাইতে বাইরে রোয়াকের উপর এসে একটু শুয়ে থাকুক না! হয় ত মাথা ছেড়ে যাবে—যাত্রাও দেখতে পাবে!"

বৌঠান বললেন "এ কথা ত ভাল। কিন্তু আমি আর গিয়ে খোষামোদ করতে পারব না। যে একগুঁয়ে মেয়ে। তার চাইতে আপনি একবার যান না ভেতরে পিছনের দরজা দিয়ে। গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলুন। ঘরে আর কেউ নেই। শোনে যদি ত আপনার কথাই শুনবে।"

বললাম "আচ্ছা, তুমিও চল।"

বললেন "আমার বয়ে গেছে। যাত্রা এমন জমেছে, এ ফেলে আমি এখন ঐ নিয়ে হৈ হৈ করি।"

যদিও লজ্জা হচ্ছিল, তবুও কি রকম যেন একটা টানে বৌঠানের কথা

অস্বীকার করতে পারলাম না। ঘুরে পিছনের দরজা দিয়ে মুকুন্দের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে যে ঘরটায় সাবিত্রী শুয়েছিল সেই ঘরটায় গেলাম।

ঘরে কোনও আলো ছিলনা। ঘরের বাইরে দালানে একটি হ্যারিকেন কমান ছিল। ঘরে গিয়ে দেখলাম খাটের উপর সাবি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলাম "সাবি"? কোনও উত্তর নাই। আবার ডাকলাম "সাবি"? কোনও উত্তর নাই। পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে ডাকলাম "সাবি"? অঙ্গের কাপড়খানি টেনে-টুনে ঠিক ক'রে নিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে রইল। কোনও কথা কইলে না।

আগেই সন্দেহ হয়েছিল, এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—মাথা ধরা কিছু নয়, আসল রাগ-অভিমানটা আমার উপর। মনে পড়ল "বদসি যদি কিঞ্চিদপি"। সাবিত্রীর পায়ের কাছে বসে পড়লাম। বললাম "সাবি কইবে না কথা?"

হঠাৎ সাবি ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। ঘরের সামনেই রোয়াকে মেয়েরা ব'সে। সাবির কান্নার শব্দ শোনা তাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সাবি কি একেবারে পাগল হল!

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সাবি উঠে এসে বাইরে রোয়াকে বসল। আমি পিছনের দরজা দিয়ে ঘুরে রোয়াকের পাশে এসে দাঁড়ালাম।

বৌঠান চিক্ একটু ফাঁক ক'রে ঈষৎ অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "মাথা ছাড়ল সাবি?"

বৌঠানের দিকে চাইতে লজ্জা হচ্ছিল—কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি, বৌঠানের চোখে সেই হাসি ফুটে উঠেছিল—যেটা বৌঠানের নিজস্ব—সেই দুষ্ট-হাসি।

## বারো

যাত্রা হওয়ার চার-পাঁচ দিন পরেই আমার পরীক্ষার খবর পাওয়া গেল প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। কলকাতা থেকে দাদার সেই শিক্ষকটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন এবং দাদা সেই টেলিগ্রামখানা হাতে ক'রে সারা গ্রামটা ঘুরে এলেন।

প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। যেন জীবন-যুদ্ধে মস্ত বড় একটা সংগ্রাম জয় করলাম। যেখানে যাচ্ছি সেইখানেই একটা বিজয় বীরের গৌরবে সকলের দিকে চেয়ে দেখেছি—আমাকে দেখার মধ্যেই যেন আজ সকল চোখের সার্থকতা।

এইবার কোন কলেজে পড়ব, কলকাতায় কোথায় থাকব—এই হয়ে উঠল একটা মস্ত বড় আলোচনার বিষয়। আমাদের বাড়ীতে দিন-রাত কেবল ঐ আলোচনাই হচ্ছিল—দাদার মুখে ত ও ছাড়া কোন কথাই ছিল না। তা'ছাড়া যেখানেই যাচ্ছিলাম, সেইখানেই ঐ কথা। সকলকে ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকব, কলকাতার মেসের জীবনে একটা নতুন জীবন আরম্ভ হবে; কলেজে পড়া, মাষ্টাররা নয় প্রফেসাররা লেকচার দেবেন—এই সব নানান কারণে দু'চারদিন উত্তেজনা এত বেশী হয়েছিল যে সাবিত্রী পর্যন্ত যেন চাপা পড়ে গেল আমার প্রাণে!

দাদা সকলকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগলেন। আমলা কর্মচারী সকলের সঙ্গে ত আলোচনা হ'লই, এমন কি মাধবপুর বাজারের দোকানদাররাও বোধ হয় দাদার সঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনায় বাদ যায়নি। "তাইত সুশন কেমন ক'রে কলকাতায় গিয়ে একলা থাকবে? এত বয়স হ'ল মাকে ছেড়ে ত ও একদিনের তরেও দূরে থাকেনি, মা-ই বা ওকে ছেড়ে থাকবেন কি ক'রে? আমি বলি, কলকাতায় একটা বাড়ী ভাড়া করা হোক; সেখানে মা গিয়ে ওকে নিয়ে থাকুন, নইলে কলকাতার মেসে যা খাওয়া শুনেছি—ওর ত পেটই ভরবে না, ইত্যাদি";—এই রকম ধরণের কথা দাদার মুখে প্রায়ই শুনতে পেতাম, যখনই দাদার সঙ্গে কারুর সঙ্গে দেখা হ'ত। একদিন আলি মিঞাকে এই ধরণের কি বলাতে, আলি মিঞা বলছিলেন "তা'-কি হয়, দাদাবাবু? কলকাতা সহরে একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে রাখার খরচ কি কম—পোষাবে কি ক'রে?"

দাদা তার উত্তরে একটু উত্তেজিত হয়েই বলেছিলেন "না পোষায় না-হয় আমরা বাড়ীতে শাক ভাত খাব, তবুও বিদেশে সুশনকে কষ্ট দেওয়া চলবে না। সাধারণ পাশ ক'রে যাওয়া ছেলে হ'লেও বা একটা কথা ছিল; ও ত হরিশের চাইতেও ভাল ছেলে, এমন ছেলেকে কি কেউ অযত্ন করে!

বেশীর ভাগ দাদা ও বৌঠানের উদ্যোগেই গ্রামের লোকদের এক বিরাট নিমন্ত্রণ দেওয়া হ'ল আমাদের বাড়ীতে। সকলে এলেন, খেয়ে চলে গেলেন এবং সকলেরই মুখেই আমার প্রশংসা ধন্য ধন্য ক'রে উঠল। নিমন্ত্রণের দিন এত

উত্তেজনার মধ্যেও বৌঠানের সঙ্গে সাবিত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রম দেখে বিশেষ একটা তৃপ্তি পেয়েছিলাম, বেশ মনে আছে।

* * *

নতুন নতুন কল্পনার মধ্যে দিনকতক বেশ ভালই কাটল। ক্রমেই কলকাতা যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে—কলেজ খুলতে আর বোধ হয় তখন আট-দশ দিন বাকি। কলকাতায় হরিশ যে মেসে থেকে পড়াশুনা করে, সেই মেসেই আমার থাকবার বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছিল, এবং ভর্তিও হয়েছিলাম হরিশের কলেজে।

একদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি সমস্ত আকাশখানি মেঘে ঢাকা এবং বাইরে ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। আমার ঘরের জানালাটি খোলা ছিল এবং ঘুম ভাঙ্গার পর আমি বিছানা ছেড়ে না উঠে, বিছানায় চুপ ক'রে শুয়েই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। নানান রকম চিন্তার মধ্যে বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রাণটা কেমন যেন উদাস বোধ হতে লাগল। সমস্ত চিন্তা ছাপিয়ে প্রাণখানাকে পেয়ে বসল—সাবিত্রী।

কেমন যেন সমস্ত প্রাণ-মন, শরীর দিয়ে আজ এই বাদলার দিনে সকালবেলা সাবিত্রীকে কাছে পেতে ইচ্ছে করছিল—একান্ত আপনার ক'রে।

কলকাতায় যাব—সাবিত্রী ত আমার সঙ্গে যাবে না, কলকাতায় যাওয়ার অত উৎসাহ হঠাৎ যেন নিভে গেল। এখন যাব আর সেই পূজোর ছুটীতে আসব—সাবিত্রীকে ছেড়ে এতদিন থাকব কি ক'রে। সাবিত্রীকে কাছে না পেলে কলকাতায় থাকা যে আমার পক্ষে নির্বাসন। মনটা বড়ই খারাপ বোধ হতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিটা থামল—বোধ হয় খানিকক্ষণের জন্য। আকাশ-ছাওয়া মেঘ মাঝে মাঝে গুরু-গর্জন করছে। মনে হচ্ছে এখুনি যেন আবার আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামবে।

নীচে নেমে এলাম। পুকুরের ঘাটে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে বাড়ীর ভিতরের দিকে পিছল মাটীর উপর দিয়ে কোনও রকমে পা টিপে টিপে এগুচ্ছি, এমন সময় দেখি সাবিত্রী আসছে আমাদেরই বাড়ীর দিকে। সমস্ত মাথা-কাঁধ-গলা জড়িয়ে নিয়েছে একখানি ভিজে গামছায়, জল-কাদা, পিছল বাঁচিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম।

দূর থেকে ডাকল "শান্তদা! শান্তদা!

বললাম "তুমি এই জল-বৃষ্টিতে বেরিয়েছ সাবি ?"

বললে "কইমাছ ধরবে শান্তদা ?"

জিজ্ঞাসা করলাম "কি রকম ?"

সাবিত্রী বললে "আমাদের বাড়ীর উঠানের উপর দিয়ে কত যে কইমাছ যাচ্ছে, তুমি ধারণাও করতে পার না। চলনা আমাদের বাড়ী।"

কথাটা বুঝলাম। সাবিত্রীদের বাড়ীর উত্তরের দিকে একটা জলা জায়গা আছে, বর্ষাকালে প্রায় জলে ভরে যায় ; কতকটা বিলের মত। তাই বর্ষাকালে এক পশলা বড় বৃষ্টির পরে প্রায়ই কইমাছ সাবিত্রীদের বাড়ীর উঠানে ওঠে।

বললাম "হ্যাঁ ধরবো। চল। দাঁড়াও আমার গামছাখানা নিয়ে আসি।"

সাবিত্রী আর এগুলো না ; সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে একতলার বারান্দায় টাঙ্গানো একটা দড়ির উপর থেকে আমার গামছাখানা মাথার উপর ফেলে বেরিয়ে এলাম। চললাম সাবিত্রীর সঙ্গে তাদের বাড়ী।

সাবিত্রীর সঙ্গে পথে চলতে বিশেষ একটা আমোদ অনুভব করছিলাম। সারা পথটাই কাদা হ'য়েছে—মাঝে মাঝে পা পিছলে যাচ্ছে। দু'জনে দু'জনের হাত ধরে পড়তে পড়তে পরস্পরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কোনও রকমে এগুচ্ছি। মাঝে মাঝে পথে জল দাঁড়িয়েছে—ছপ ছপ করে দু'জনে চলেছি তার উপর দিয়ে। একটা কল-কল কল-কল শব্দ সারা পথটাই শুনতে শুনতে চলেছি—বর্ষার জল উঁচু জায়গা থেকে নীচু জায়গায় পড়ছে কখনও পুকুরে, কখনও ডোবায়, কখনও মাঠের উঁচু জায়গা ভেঙ্গে ধসে যাওয়া নীচু জায়গায়, কখনও পথটার দু'ধারের ড্রেনের ভিতরে !

সাবিত্রীদের বাড়ীতে গিয়ে পৌছতে না পৌছতেই মুষলধারে বৃষ্টি এল। দু'জনেই ছুটে কোনও রকমে সাবিত্রীদের বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে উঠলাম।

সাবিত্রীর মা বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে যাওয়ার দরজার চৌকাঠের কোণ ঠেসে একখানি কাঁথা গায়ে জড়িয়ে চুপ ক'রে বসে বোধ হয় জপ টপ কিছু করছিলেন। মুখ তাঁর শুকনো শুকনো—ছোট ক'রে ছাঁটা মাথার চুল, রুক্ষ। আমাদের দেখে বললেন, "মেয়েটার কাণ্ড দেখ। এই বৃষ্টিতে গিয়ে সুশনকে টেনে এনেছে।"

সাবিত্রী বললে "মা ! শান্তদা কইমাছ ধরবে বলে এসেছে।" এই ব'লে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। সাবিত্রীর মা আমার দিকে চেয়ে বললেন "হ্যাঁ বাবা

একটু বৃষ্টি হলেই কত যে কইমাছ আমাদের ঐ পুকুরের পাড়ের উঠানের উপর ওঠে—আমার ত লোকজন নেই, কেই বা ধরে।"

বললাম "দাঁড়াও সইমা! বৃষ্টিটা থামুক, কতকগুলো ধরচি আজ।"

সাবিত্রীর মা বললেন "সাবিত্রীটা কইমাছ খেতে এত ভালবাসে—কিন্তু ওরকম জ্যান্ত মাছ ধরতে ভয় পায়। আর আমার ত এই শরীর।"

বারান্দার একপাশে একটা খাট ছিল, আমি তার উপর গিয়ে বসলাম।

বললাম "তোমাকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে সইমা—আবার জ্বর হয়েছিল নাকি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সইমা বললেন "রোজই ত জ্বর হচ্ছে বাবা। দিন দিন শরীরটা যে কি রকম খারাপ হচ্ছে—সে কথা বলিই বা কাকে।"

বললাম "যদু কবরেজের ওষুধ খেয়ে জ্বর হওয়াটা বন্ধ হয়েছিল না।"

বললেন "দিনকয়েক মাঝে জ্বরটা বন্ধ হয়েছিল, সে ওষুধ খেয়ে কিনা জানিনা। কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হতে না হতেই আবার জ্বর সুরু হ'ল।"

জিজ্ঞাসা করলাম "ওষুধ এখন খাও ত?"

বললেন, "না। ওষুধ-টষুধ আর খাবনা ঠিক করেছি—ও কিছু হয় না।"

বললাম, "কিন্তু একটা চিকিৎসা করান ত দরকার—এ ভাবে অসুখ বাড়তে দিলে ত বেড়েই চলবে।"

সইমা বাইরের দিকে চেয়ে খানিকটা চুপ ক'রে বসে রইলেন! একটা হতাশামাখান করুণ উদাস-দৃষ্টি। দেখতে দেখতে চোখ দু'টি সজল হয়ে উঠল আঁচলের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে ভাঙ্গা গলায় বলতে লাগলেন "এ অসুখ আর আমার সারবে না বাবা। আমি জানি মিথ্যে আঁকু-পাঁকু ক'রে লাভ নেই। যে ক'দিন অদৃষ্টের ভোগ আছে বেঁচে থাকবই।"

খানিকটা চুপ করলেন। আঁচলে চোখ মুছে আবার বলতে লাগলেন, "শুধু সাবিটার জন্য ভাবি। আমি চলে গেলে ওর দশা কি হবে। ঐ ত পাগলি মেয়ে—কোন কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হয়নি।"

সইমার গলা একেবারে ভেঙ্গে গেল। আর কিছু বলতে পারলেন না। আঁচলের খুঁটে ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলেন। আমিও চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। বলবই বা কি? খানিকক্ষণ পরে সইমা কতকটা শান্ত হয়ে আবার বলতে লাগলেন, "কত যে-পাপ করেছে আর জন্মে তাই আমার ঘরে আমার পেটে এসে জন্মেছে। নইলে অমন মেয়ে বাবা—অমন রূপ, অমন

গুণ, কৈ আর ত একটাও দেখি না। অতটুকু মেয়ে নিজের হাতে সব করে, এই বয়সেই হাত পুড়িয়ে রাঁধে—আমার অসুখ ব'লে আমাকে উনুনের কাছে অবধি যেতে দেয় না।"

আবার চুপ করলেন। আমি চুপ ক'রেই বসে আছি। একটু পরে হঠাৎ আমাকে ডাকলেন, "বাবা সুশন।"

আমি চাইলাম সইমার মুখের দিকে।

বললেন, "এইখানে এস, আমার কাছে একটু বস বাবা। এই সাবি! কোথায় গেল মেয়েটা। একটা আসন যদি দিত।"

আমি উঠে গিয়ে সইমার কাছে চৌকাঠের উপর বসলাম; বললাম, "থাক, থাক, আসনের দরকার নেই।"

বললেন, "আমি একবার বসলে আর সহজে উঠতে পারি না সুশন। দিন দিন যেন আমার কোমরটা অবশ হয়ে আসছে।"

সইমা ধীরে ধীরে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন "বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘজীবি হও। বাপ-মার বুক জুড়ানো সন্তান তুমি। চারিদিকে সবাই তোমার সুখ্যাতি করে, শুনে, প্রাণে যে কি শান্তি পাই—ভগবানই জানেন।"

আবার একটু চুপ ক'রে রইলেন। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে ভাঙ্গা গলায় বললেন, "আমার আর বেশীদিন নেই বাবা! সাবিটা রইল। ওকে তুমিই আশ্রয় দাও। আমার এই অনুরোধটা রাখ। দেখছইত ওকে —রূপে গুণে তোমার অযোগ্য হবে না। চিরকাল তোমাকে পেটের ছেলে বই অন্য কিছু ভাবিনি। তুমি এখন যোগ্য হয়েছ; আমার এই কথাটি ফেল না বাবা। জীবন ভোর দুঃখই পেয়ে গেলাম—মরবার সময় আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দিও।"

এই ব'লে সইমা দু'হাত দিয়ে আমার হাত দু'খানি চেপে ধরে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললেন! আমি মাথা নীচু ক'রে বসে রইলাম। বাইরে ঝম ঝম শব্দে বৃষ্টি সমানে পড়ছে। খানিকক্ষণ কেঁদে চুপ করলেন। তারপর বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে রইলেন। পরে কতকটা শান্ত গলায় বলতে লাগলেন, "তোমার মাকে একথা আমি একদিন বলেছি। তাঁর খুব মত আছে। তোমার বাবাকে বলবেন বলেছেন। মন্টিরও খুব ইচ্ছে। বড় ভাল মেয়ে মন্টি, বড় ভাল মেয়ে।"

এই ব'লে আবার চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। আমি তখন আকাশ পাতাল ভাবছি। কতক্ষণ এইভাবে দু'জনে চুপচাপ বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ ঘরের ভিতর হ'তে চাপা গলায় সাবিত্রীর কথা শোনা গেল।

"মা!"

সইমা বললেন, "কি রে?"

ভিতর হ'তে সাবিত্রী চাপা গলায় বললে, "শোন না একবার ভেতরে।"

সইমা একটু হেসে হাতের কুনুয়ে ভর রেখে মুখটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, "জানিস্ ত আমি একবার বসলে সহজে উঠতে পারি না। কি বলছিস? তা বেশ ত তুইই নিয়ে আয় না।"

সাবিত্রী বোধ হয় ভেতর থেকে কিছু একটা ইসারা করলে।

সইমা বললেন, "আহা একটা পাগল। সুশনের সামনে খাবার নিয়ে আসতে মেয়ে হঠাৎ লজ্জায় মরে গেল!" সাবিত্রী আর দ্বিতীয় প্রতিবাদ না ক'রে মাথা নীচু ক'রে ত্বরিতপদে বাইরে এল। আমার সামনে একখানা পেতলের রেকাবীতে মুড়ী, বাতাসা ও নারকেলের সন্দেশ ও এক গেলাস জল রেখে দিয়ে ত্বরিতপদে ঘরের ভিতর চলে গেল।

একপ্রাণ চিন্তা নিয়ে যখন সাবিত্রীদের বাড়ী থেকে ফিরে এলাম, তখন বৃষ্টি সবেমাত্র একটু ধরেছে। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল তাই কইমাছ ধরা আর হ'ল না।

* * *

বাড়ী ফিরে এলাম, মধ্যে কেমন যেন একটা বোঝা নিয়ে। সাবিত্রীর মার কথার তাৎপর্য বুঝতে আমার একটুও দেরী হয়নি, কিন্তু এ কথাটা যতই ভাবতে লাগলাম, ততই যেন ভারী হয়ে উঠতে লাগল প্রাণটা বুকের মধ্যে।

বিয়ে? সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে? প্রথমটা কেমন যেন একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কই এ কথা ত এতদিন একবার মনে হয়নি। সাবিত্রীর সঙ্গে আমার এই যে প্রেমের লীলা সুরু হয়েছিল এর পরিণতি যে কি—কোনও দিনই ভেবে দেখিনি। একটা উত্তেজনা উন্মাদনার মধ্যে বর্তমান নিয়েই পাগল হয়ে উঠেছিলাম—ভবিষ্যতের দিকে কখনও তাকাইনি। কিন্তু আজ যখন সাবিত্রীর মা ভবিষ্যতের দিকে আঙুল দিয়ে ভবিষ্যৎটি দেখিয়ে দিলেন,

প্রথমটা যদিও বিশেষ আশ্চর্য হয়ে গেলাম কিন্তু ক্রমেই মনটা যেন সঙ্কুচিত হয়ে পেছিয়ে আসতে লাগল। সাবিত্রীর সঙ্গে পূর্ণ-মিলনের অপরিসীম আনন্দটুকু কল্পনা ক'রে পুলকে যে একবারও শিউরে উঠিনি এমন নয়, কিন্তু তবুও বিবাহ! সে যেন অনেক দূরের কথা; অনেক বড় কথা কেমন যেন অসম্ভব ঠেকল, যেন তা হবার নয়।

আজ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে জীবনের কাহিনী লিখতে বসে, সে সময়ের মনের অবস্থাটা অনেকবার ভেবে দেখেছি, কিন্তু সাবিত্রীর সঙ্গে বিবাহের নামে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে না উঠে কেন যে প্রাণটা ভারী হয়ে উঠেছিল—বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পাই না। সে বয়সে প্রেমের খেলাটুকু ষোল-আনা বুঝেছিলাম, কিন্তু বিবাহ জিনিষটার দায়িত্ব নেওয়ার শক্তি কি তখনও আমার হয়নি? কিম্বা ভাবতে আজও লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নুয়ে পড়ে—এমনই কি দম্ভ ছিল আমার প্রাণে, যে সাবিত্রীকে আমার সহধর্মিণীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না? আমি মাধবপুরের রতন-সার পুত্র, সাহাবংশের গৌরব, দেশের, দশের ষোল-আনা ভরসা আমারই উপরে, সুদর্শন বুদ্ধিমান—আমাব গলায় যে বরমাল্য দেবে সেই অসামান্য সুন্দরী যেন কোন সুদূর গুহায় বসে তপস্যা করছে, কঠোর তপস্যা, আমারই জন্য যুগ যুগ ধরে; সে কখনও ওপাড়ার "সাবি" নয়, হতে পারে না—এই রকম একটা নীচ আত্মম্ভরিতায় ভরা ছিল কি আমার প্রাণ? জানি না—আজ ভেবেও কোনই কূল-কিনারা পাই না।

বাড়ী ফিরে এসে সমস্ত দিন প্রাণখানা ভারী হয়ে রইল! সাবিত্রীর সঙ্গে প্রেমের লীলাটুকুর জন্য কোনও অনুশোচনা বা গ্লানি আমার মনে হয়নি। সাবিত্রীর মার কথার পরেও সাবিত্রী যেমন মধুর ছিল তেমনই রইল। তবুও সাবিত্রীর মার কথাটা যেন না শুনলেই ভাল হ'ত। সাবিত্রীকে নিয়ে মাধবপুরের আকাশের নীচে, ঘরে বাইরে, পথে ঘাটে, মাঠে যে আনন্দটুকু কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ যেন কেমন তাতে একটু বাধা পড়ল।

সেদিনটা সাবিত্রী আর আমাদের বাড়ীতে এল না। দুপুরের পরে বিকেলের দিকে বৃষ্টি আর ছিল না। সাবিত্রী আসবে—এ আশা যে করিনি, এমন নয়। বিকেল ফিরে সন্ধ্যে হয়ে গেল, কিন্তু সাবিত্রী এল না। তার পরের দিন সকাল-বেলা সাবিত্রী যখন আমাদের বাড়ীতে এল, তাকে দেখেই প্রাণটা হঠাৎ কেমন হাল্কা হয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কি যে তখন ভেবেছিলাম, কেন যে

মন সাবিত্রীকে দেখেই আমার মধুর সরস হয়ে উঠল—আমার আজ তা একেবারেই মনে নাই।

## তেরো

কলকাতায় যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এল—আর মাত্র একদিন বাকী। কাল বিকেলে গরুর গাড়ী ক'রে মাধবপুর থেকে খুলনা রওনা হতে হবে এবং রাত্রের ট্রেন ধরে পরশুদিন ভোরে কলকাতায় পৌঁছব। ঠিক হ'ল দাদা আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবেন এবং কয়েক দিন কলকাতায় থেকে আমাকে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে ফিরে আসবেন। বাবা প্রথমটা ঠিক করেছিলেন দাসমশাই ব'লে আমাদের একটি পুরানো কর্মচারীকে আমার সঙ্গে দিবেন ; কিন্তু দাদার বিশেষ ইচ্ছে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে যান এবং আমাকে দিয়ে বাবাকে বলালেনও সেকথা। তাই শেষ পর্যন্ত দাদাই আমার সঙ্গে যাবেন সাব্যস্ত হ'ল।

যাওয়ার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই মনটা খারাপ বোধ করতে লাগলাম। সাবিত্রী ত আছেই, তা'ছাড়া মা, মন্টি বৌঠান, সকলের জন্যই প্রাণটা হু-হু করতে লাগল যেন কতদিনের জন্য এদের ছেড়ে চলেছি, দূর—দূর বহুদূর—বিদেশে এক নতুন জীবনযাত্রার মধ্যে। অবশ্য সবচেয়ে বড় ক'রে ব্যথা পাচ্ছিলাম প্রাণে সাবিত্রীকে ছেড়ে যেতে হবে ব'লে। সাবিত্রীর কাছ থেকে এই মাধবপুরের জীবনের প্রতি মুহূর্তে যে আনন্দটুকু কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম, কলকাতায় গেলে ত আর পাব না। সাবিত্রীর অভাব ভরিয়ে দিয়ে প্রাণখানাকে সরস ক'রে রাখতে পারে এমন লোক কি কলকাতায় পাওয়া যাবে?—কখনও না।

যেদিন রওয়ানা হ'লাম, তার আগের দিন সকালবেলাটা সাবিত্রী অনেকক্ষণ আমাদের বাড়ীতে ছিল। কিন্তু নিরিবিলি একটুও তাকে পাওয়া গেল না। মা প্রায় সব সময়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, যেন ছাড়তেই চাইছেন না ; তা'ছাড়া দাদাও বেশীর ভাগটা বাড়ীর মধ্যেই কাটালেন—আমার পাশে পাশে ;

কলকাতায় আমার সঙ্গে কি কি দেওয়া হবে—না হবে এই বিষয় মার সঙ্গে, বৌঠানের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এক ফাঁকে শুধু সাবিত্রীকে ব'লে দিলাম, দুপুর বেলা খেয়ে-দেয়েই সে যেন একটু সকালে সকালে আসে। সাবিত্রী চাপা গলায় উত্তর দিয়েছিল "আচ্ছা"।

দুপুর ফিরে বিকেল হ'ল, সাবিত্রী কিন্তু এল না। সমস্ত বিকেলটা আমি ছট্‌ফট্‌ ক'রে কাটালাম, একবার ঘরে, একবার বাইরে—সাবিত্রী কিন্তু এল না। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল, সন্ধ্যার পরেই শুক্লপক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমী তিথির চাঁদ আকাশে ভেসে উঠল—তবুও সাবিত্রী এল না। বুঝলাম রাত হয়ে গেছে, সাবিত্রী আজ আর আসবে না।

মনটা বড়ই খারাপ বোধ করতে লাগলাম! ভাবলাম যাই, চাঁদের আলোয় শেষবারের মতন নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি। মুকুন্দর পড়াশুনার জন্য আজকাল বাড়ীতে একজন মাষ্টার রেখে দেওয়া হয়েছে, তাই সেও সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে বাড়ী চলে গিয়েছে।

একলা একলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নদীর ধারে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল জ্যোৎস্না আলোকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল জলের ছলাৎ ছলাৎ একটা শব্দ। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম, দেখতে পেলাম ওপারের সেই নুয়ে-পড়া বাঁশ ঝাড়টা। কাল এসব ছেড়ে চলে যাব।

বাড়ী থেকে বেরুবার সময় এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল—যাই সাবিত্রীদের বাড়ীর দিকে, দেখে আসি কেন সে এল না। কিন্তু কাল আমি চলে যাব, আর আজ তাকে অমন ক'রে বলে দিলাম একটু সকাল সকাল ক'রে আসতে—আর সে একবার এলই না। এমন কি তার বাধা হ'তে পারে যে একবার একটুখানির জন্যও সে ঘুরে যেতে পারেনি।

অভিমান হয়েছিল, দারুণ অভিমান হয়েছিল, তাই গেলামই না সাবিত্রীদের বাড়ীর দিকে। এলাম নদীর ধারে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, নদীর ধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ওপারের ঐ নুয়ে-পড়া বাঁশ ঝাড়টার দিকে চাইতে চাইতে প্রাণ কেমন যেন আপনা থেকে কোমল হয়ে গলে গেল। সাবিত্রীর উপর রাগ অভিমান কোথায় যেন গেল উড়ে। মনটা পাগল হয়ে উঠল সাবিত্রীর জন্য। চললাম ত্বরিতপদে সাবিত্রীর বাড়ীর দিকে।

ফিরে, আমাদের বাড়ীর উপর দিয়ে না গিয়ে সদর রাস্তা ধরে বাজারের মধ্য

দিয়ে ঘুরে গিয়ে পড়লাম জেলা-বোর্ডের পাকা রাস্তার উপরে। খানিকটা উত্তর মুখে গিয়ে একটা সরু গ্রাম্য রাস্তা ধরে ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালাম সাবিত্রীদের বাড়ীর সামনে পথের উপর।

তখন চারিদিক নিস্তব্ধ—গ্রাম্য পথ জনহীন। ফুট্‌ফুটে চাঁদের আলোর মায়ামন্ত্রে সমস্ত গ্রামখানি ঘুমিয়ে পড়েছে—একটা অলস মাধুরীর শান্ত ভঙ্গীমায়। দূরে, সাবিত্রীদের বাড়ীর উত্তরের সেই উন্মুক্ত জলাভূমির প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে আছে চারটি বড় বড় তালগাছ—জ্যোৎস্নালোকে নীরব, নিথর স্পন্দনহীন। আর সেই দিক দিয়ে আকাশে-বাতাসে ভেসে আস্‌ছে একটা পাখীর করুণ আবেদন, মর্মস্পর্শী বিলাপ—

"বৌ কথা কও," "বৌ কথা কও"
"বৌ কথা কও"

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দূরে তালগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে এই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নালোকে কেমন যেন আমার গা ছম্‌ ছম্‌ ক'রে উঠল—গ্রামছাড়া এত নিরিবিলি সেই দিকটা। একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে সাবিত্রীদের বাড়ীর ফটকের দিকে যেমন একলা এগিয়েছি, মিষ্টি গলায় কানে এল—"শান্তদা!"

চম্‌কে উঠলাম। চেয়ে দেখি ফটকের একটু উত্তরে বেড়ার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, পথের দিকে চেয়ে আছে সাবিত্রী। বেশী দূরে নয়, দু'পা এগুলেই তার কাছে যাওয়া যায়। আমি একটু এগিয়ে বেড়ার বাইরে পথের উপর দাঁড়ালাম। বললাম "তুমি এইখানে একলা দাঁড়িয়ে আছ সাবি? ভয় করে না?"

বললে "না। তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আসতে এত দেরী করলে কেন শান্তদা?"

বললাম "এই রাত্রিবেলা, একলা, এরকম নিরিবিলি পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার সাহস ত খুব!"

বললে "ও আমার অভ্যেস আছে। তুমি আসতে এত দেরী করলে কেন শান্তদা?"

বললাম "বাঃরে! আমার কি আসবার কথা ছিল?"

বললে "তা ত ছিল না। কিন্তু আমি গেলাম না দেখে ত তুমি একবার দেখতে আসবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি গেলে না কেন শুনি?"

বললে "কি করে যাই! মাকে নিয়ে সমস্তদিন যেভাবে কাটল। হঠাৎ আজ দুপুরবেলা জ্বর এল। এই ত সন্ধ্যাবেলায় একটু ঘুমিয়েছেন।

সাবিত্রীর দিকে একটু ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম। সাবিত্রী আজ সেজেছে। আজ তার বাড়ীতে তাকে সাজিয়ে দেওয়ার ত কেউ ছিল না—নিজেই সেজেছে। সুন্দর পরিপাটী ক'রে নিজেই চুল বেঁধেছে। খোঁপায় জড়িয়েছে একটী জবাফুলের মালা। ধবধবে সাদা চওড়া একখানি লাল পেড়ে সাড়ী পরেছে—বোধ হয় এইখানই ওর সব চেয়ে ভাল সাড়ী। আজ আর ধারকরা পোষাক নয়—এসবই ওর নিজের।

সাজের দিকে চেয়ে একটু অবাক হ'লাম। বাড়ীতে ত দ্বিতীয় প্রাণী নেই। মার ঐ রকম অসুখ, তাকে নিয়েই সমস্তদিন অস্থির হয়েছিল। কখন এমনি পরিপাটী ক'রে সাজাবার সময় পেল আজ?

সাবিত্রীর অবস্থাটা কল্পনা ক'রে মনটা কেমন যেন হু-হু ক'রে কেঁদে উঠল।—ঐ অতটকু মেয়ে এই নীরব নিস্তব্ধ একটী পোড়া বাড়ীতে একেবারে একলা জ্বরে বেঁহুস মাতাকে নিয়ে সমস্ত দিন কাটিয়েছে। নিশ্চয়ই ছটফট্ করেছে অন্ততঃ একবারটী আমাদের বাড়ী যাওয়ার জন্য—কিন্তু কোনও উপায় করতে পারেনি। তারপর সন্ধ্যাবেলা মা ঘুমিয়ে পড়লে এই নিস্তব্ধ অন্ধকার পুরীতে ছোট একটি তেলের প্রদীপের সামনে, একখানি ছোট ভাঙ্গা আরসী রেখে পরিপাটী ক'রে চুল বেঁধেছে। ভাঙ্গা একটি তোরঙ্গ খুলে সযত্নে রক্ষিত সবচেয়ে তার ভাল সাড়ীখানি বার ক'রে পরেছে। গাছ থেকে জবাফুল তোলা ছিল বোধ হয় তাই দিয়ে মালা তৈরী ক'রে জড়িয়েছে খোঁপায়। তারপর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে অঙ্গন পেরিয়ে চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে, এই নীরব নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না আলোকে। চেয়ে আছে পথের পানে একপ্রাণ আশা নিয়ে—আমি আসব।

বললাম "তাই ত! তা'হলে আজ তোমার বড় কষ্ট হয়েছে সাবি?"

সে কথার কোন উত্তর দিলে না।

জিজ্ঞাসা করলে "কালকেই তুমি চলে যাবে শান্তদা?"

বললাম "হ্যাঁ, সবই ত ঠিক, কাল বিকেলে যাব। তুমি কিন্তু তখন নিশ্চয়ই আসবে সাবি।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে "আবার কবে আসবে?"

ইতিমধ্যে বেড়ার একটা খুঁটীর উপর সাবিত্রীর হাত দু'খানিতে রেখেছিলাম আমার হাত দুটী। সাবিত্রী "আবার কবে আসবে" প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে

নিজের মাথাখানি কাত ক'রে বাঁ গালখানি রাখল আমারই হাতের উপরে, বেড়ার খুঁটীতে।

বললাম "পুজোর ছুটীর আগে যে আর আসা হয়ে উঠবে ব'লে ত মনে হয় না।"

সাবিত্রী আর কোনও কথা কইল না। সেই ভাবে মাথাটী এলিয়ে রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

সাবিত্রীর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটী দেখে করুণায় আমার বুকের মধ্যে দু'লে দু'লে উঠতে লাগল। ভাবলাম সাবিত্রীর মার কথাই ঠিক। এমন মেয়ে পাব কোথায়? সাবিত্রীকে বিয়ে করব।

সাবিত্রী তার মাথাটী কাত ক'রে রেখেছিল আমার হাতের উপরে—আকাশের দিকে তুলে দিয়েছিল তার ডান গালখানি। আমি ধীরে ধীরে নিজের গালখানি রাখলাম সাবিত্রীর গালের উপরে। আদর ক'রে ডাকলাম "সাবি!"

কোনও উত্তর নেই। ক্রমে টপ্ টপ্ ক'রে সাবিত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আমার হাতখানি ভিজে যেতে লাগল। আমিও চুপ ক'রে সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনও কথা কইনি।

আমাদের মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ—আমাদের চারিধারে পরিষ্কার চাঁদের আলো। বেড়ার ওপাশে সাবিত্রী, এপাশে আমি, সাবিত্রীর মুখের উপর—আমার মুখ। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ! কেবল দূর থেকে কাণে ভেসে আসছে—"বৌ কথা কও" বৌ কথা কও"

"বৌ কথা কও।"

আজ ভাবি, জীবনের সেই মুহূর্তে আমাদের জীবনের ভাগ্যবিধাতা কি প্রসন্নদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে দেখেননি—করেননি কি আশীর্বাদ?

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছিল মনে নাই। হঠাৎ সাবিত্রী মুখ তুললে। আঁচলের খুঁটে চোখ দুটি মুছে বললে,—

"মা এখন জ্বরে বেঁহুস। নইলে তোমাকে নিয়ে যেতাম বাড়ীর ভিতরে—মাকে প্রণাম ক'রে যেতে।"

হঠাৎ একটা কথা ভেবে চমকে উঠলাম। বললাম "সাবি! তুমি সমস্ত রাত বেঁহুস রোগী নিয়ে একেবারে একলা এ বাড়ীতে থাকবে?"

বললে "প্রায়ই ত থাকি!"

বললাম "সেকি! তুমি খবর দাও না কেন? তা হ'লে ত শৈলিঝি এসে তোমার কাছে থাকতে পারে। মন্টি বৌঠানকে বললেই ত ব্যবস্থা করেন।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সাবিত্রী একদৃষ্টে চেয়ে রইল দূরে—তালগাছগুলোর দিকে।

বললাম "আমি আজকে গিয়েই বৌঠানকে ব'লে শৈলিঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—এরকম একলা তোমার থাকা হ'তে পারে না।"

কিছু বললে না। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—চোখ দু'টী আবার সজল হয়ে উঠল। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

* * *

তার পরদিন সকাল বেলায় সাবিত্রী একটুখানির জন্য এসেছিল। বেশীক্ষণ থাকেনি। এক ফাঁকে ব'লে দিয়েছিলাম, খেয়ে উঠেই চলে আসে যেন, কেননা আমি বেলা তিনটার মধ্যেই রওনা হব। শুনলাম ওর মার জ্বর সকাল বেলা ছেড়ে গেছে- -তাই আসতে কোনই বাধা হবে না।

সে দিনটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন—কিন্তু বৃষ্টি ছিল না! দুপুরে খেয়ে ওঠার পর থেকেই খালি আকুল-নয়নে আমাদের অন্দরের উঠানের দরজার দিকে চাইছিলাম—এইবার সাবিত্রী আসবে। বেলা একটা বাজল, দু'টা বাজল, বাড়ীর মধ্যে যাত্রার বন্দোবস্ত হ'তে লাগল—কিন্তু সাবিত্রী এল না! বেলা যখন আড়াইটা, তখন মনের মধ্যে একটা ভীষণ অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম! সাবিত্রী ত এল না! ভাবলাম একটা খবর নিলে হ'ত, হয় ত আবার দুপুরে তার মার জ্বর এসেছে। কিন্তু সাবিত্রীর কথা কাউকে বলতেও কেমন যেন একটা লজ্জা বোধ হচ্ছিল।—মুকুন্দটাকে বললে হ'ত—একটা খবর নিয়ে আসে। কিন্তু কেমন যেন বলতে পারলাম না।

বেলা যখন পৌনে তিনটা—আর মিনিট পনের-কুড়ি পরেই আমাকে রওনা হতে হবে। মন্টি বৌঠানকে একটু নিরিবিলি পেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম—

"বৌঠান! সাবিত্রী এল না।"

বৌঠান বললেন "তাই ত,—এল নাইত দেখছি।"

বললাম "হয়ত ওর মার আবার জ্বর এসেছে।"

বৌঠান বললেন "না! একটু আগে লোক পাঠিয়েছিলাম। সাবির মা ভালই আছেন।"

বললাম "তবে?"

বৌঠান বললেন "কি জানি! মেয়ের ভাব বোঝাই ভার।" বৌঠানের মুখ গম্ভীর! রাগে, দুঃখে, অভিমানে আমার বুকের মধ্যটা তখন তোলপাড় করছিল। এল না, কালকে অত ক'রে আসতে বলেছি, আজ সকালেও ব'লে দিয়েছি, মাও ভাল আছে—তবুও একবারটী আমার যাওয়ার সময় এল না।

বাবা, মা, মন্টি বৌঠান সকলকে প্রণাম ক'রে গরুর গাড়ীতে রওনা হ'লাম। মা চোখের জল মুছতে মুছতে আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন! মন্টি বৌঠানও সঙ্গে সঙ্গে সদরে এসেছিলেন মুখের উপর একটু ঘোমটা টেনে—আর থেকে থেকে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছছিলেন।

গাড়ী চলতে লাগল। দাদা গাড়ীর সামনের দিকটাতে বসলেন। আমি, গাড়ীর ছৈয়ের মধ্যে গিয়ে পিছন দিক দিয়ে রইলাম। যতক্ষণ দেখা গেল চেয়ে দেখছিলাম, আমাদের সদরের একটা জামগাছ-তলায় দাঁড়িয়ে মা এক দৃষ্টে গাড়ীর দিকে চেয়ে আছেন; পাশে মন্টি বৌঠান চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, কপালের উপর একট ঘোম্‌টা টানা—মুখখানা বিষণ্ণ।

গাড়ী ঘুরে এসে নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। খানিকটা পূব মুখো গিয়েই জেলা-বোর্ডের পাকা রাস্তার উপর পড়ল। চলল সোজা উত্তর মুখে—সদরের দিকে।

আমি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। সেই চিরপুরাতন মাধবপুরের দৃশ্য আজ যেন নতুন করে চোখে ভাল লাগছে। এবং যে দিকটা মাধবপুরের আমি কোন কালেই দেখতে পারি না—অর্থাৎ মাধবপুরের বাজার, তাও যেন আজ চোখে মধুর লাগল।

পাকা রাস্তা ধরে চলেছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম, পাকা রাস্তা থেকে কিছু দূরে পশ্চিমে একটা বেতবনের ধারে, বেশ বড় বড় ঘন আগাছা জঙ্গলের মধ্যে কটা প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছের তলায় সাবিত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—চেয়ে আছে পাকা রাস্তার দিকে। শিউরে উঠলাম, মুখখানা বাড়িয়ে ভাল ক'রে চেয়ে রইলাম। ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক'রে গরুর গাড়ী চলতে লাগল—ধীরে ধীরে সাবিত্রীকে রেখে চলল চোখের আড়ালে।

সাবিত্রীর বাড়ীর পিছন দিকে, অর্থাৎ পূবের দিকে বেশ খানিকটা ঘন জঙ্গল। সেদিকটায় মানুষের চলাচল নেই বল্লেই হয়। ভেবে অবাক হলাম—সাবিত্রী সেই জঙ্গল ভেঙ্গে এই বর্ষাকালের দিনে রাস্তার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল—শুধু একবার আমাকে দেখবার জন্যে।

আসার সময় সাবিত্রীর সঙ্গে না দেখা হওয়ার দরুণ যে দুঃখ ও অভিমান হয়েছিল প্রাণে, জল হয়ে গেল সব। ভাবলাম অসাধারণ মেয়ে, সাবিত্রী অসাধারণ মেয়ে—ঐ জঙ্গল ভেঙ্গে এগিয়ে এসেছে প্রাণে কি ভয়ডর একেবারেই নেই? আবার ভাবলাম সাবিত্রাকেই বিয়ে করব,—এমন মেয়ে পাব কোথায়?

## চৌদ্দ

কলকাতা এলাম—ইট-কাঠ-ট্রাম, পাথরের কলকাতায়। শিবণারায়ণ দাস লেনের একখানি পুরাতন বাড়ীর দোতালার একটী ঘরে আমার থাকার বন্দোবস্ত হ'ল। দাদা দু'চারদিন কলকাতায় আমার সঙ্গে থেকে দেশে ফিরে গেলেন।

কলকাতায় এসে প্রথম সব সময়েই যেন কান্না পেত। সমস্ত কলকাতা সহরটা যেন আমার বুকের উপর চেপে ব'সেছে; থেকে থেকে যেন আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসত! মাটির সঙ্গে কোথাও এতটুকু যোগ হওয়ার উপায় নেই। একটা পুকুর, এমন কি একটা ডোবা পর্যন্ত, কোথাও দেখতে পাই না। দু'টো গাছ-পালা দেখতে গেলে আমার বাড়ী থেকে তিন-চার মাইল দূরে যেতে হয়। দু'টো ঘাস—মাঠের দু'টো সবুজ ঘাস—সেও এখানে অমূল্য সামগ্রী; চোখ চাইলেই দেখা যায় না, খুঁজে বেড়াতে হয়।

প্রথম প্রথম ভাবতাম. এখানে মানুষ বাস ক'রে কি ক'রে। একটা কোলাহল, দিনরাত একটা অবিশ্রান্ত কোলাহলের মধ্য দিয়ে জীবন এখানে চলেছে, এক মুহূর্তের জন্যও একটু নিস্তব্ধ হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়ায় না। সকাল বেলার ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেতাম বাড়ীর উঠানে কলের ছুপ্ ছুপ্ ছুপ্ ছুপ্ একটা জল পড়ার শব্দ, হয় চৌবাচ্ছা বোঝাই হচ্ছে, নয় কেউ হাত মুখ ধুচ্ছে। তারপর খালি কোলাহল, খালি কোলাহল, রাস্তায় একটার পর একটা ফেরীওয়ালার চীৎকার—হয় "চানাচুর ঘুগনী দানা" না হয় "বোম্বাই

আঁব," না হয় ঐ রকম আর একটা কিছু; থেকে থেকে ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ, পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে যেন শরীরের অস্থি-মজ্জা-প্রাণ গুঁড়িয়ে দিয়ে; খট্ খট্ শব্দ ক'রে বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে ঠিকা গাড়ীগুলো চলেছে, সকাল থেকে সমস্ত দিন সমস্ত রাত যেন এদের আর শেষ নেই, অন্ত নেই!

প্রথম-প্রথম দিন কতক বড়ই খারাপ লেগেছিল। বাড়ীর জন্য প্রায়ই প্রাণটা হু-হু করত, সেই মাধবপুর, সেই মা, সেই বৌঠান, আর সবচেয়ে বড় ক'রে সেই সাবিত্রী। কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে মন বাসা বাঁধল কলকাতার সহরে। বাহিরে শুষ্ক রুক্ষ খোলসের ভিতরে যে প্রচণ্ড প্রাণের লীলা দিন রাত তরঙ্গায়িত হচ্ছে কলকাতায়, তার একটা মাদকতা আছে। কোনও দিক দিয়ে তার সঙ্গে এতটুকু যোগ হলেই, অফুরন্ত রসের ধারায় প্রাণ ভেসে চলে একটা অনাবিল নেশার তরঙ্গে। যার যাই প্রাণের ধর্ম্ম হোক না কেন, সব প্রাণেরই লীলাভূমি কলকাতা সহরে আছে, খুঁজে নিতে পারলেই হয়।

কলকাতায় প্রথম আমার মনকে আকৃষ্ট করেছিল কলকাতার থিয়েটার। মনে আছে মেসের দুই একটি বন্ধুর সঙ্গে প্রথম যে দিন আমি কলকাতায় থিয়েটার দেখি সে যে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি পেয়ে ছিলাম, বোঝাতে পারব না। থিয়েটারে যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে জগৎটা আমার চোখে ভেসে উঠেছিল, সে যে কোনও দিন দিন মনুষ্য চক্ষে দেখা যায় এ আমার ধারণাই ছিল না।

দিন কয়েক, প্রায়ই মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখি এবং মেসের ছেলেদের সঙ্গে থিয়েটারের আলোচনা করি। কে সব চেয়ে ভাল গান গায়, কে সব চেয়ে বড় অভিনেতা—অমুক না অমুক—এই নিয়ে আলোচনা তর্ক মারামারিতে সময় কেটে যায়—বাড়ীর কথা ভেবে মন খারাপ হওয়ার ফুরসুৎই হয় না। দিন যায়। কলকাতার নেশা ক্রমেই যেন জমে উঠতে লাগল প্রাণে।

আর মেসের ছেলেদের সঙ্গে যখন বেশ ভাব জমে গেল, তখন দিন-রাত যে কোনদিক দিয়ে যেত টেরই পেতাম না। তাস খেলা, গল্প গুজব তর্কাতর্কি, এক সঙ্গে বিকেলে বেড়ান, মাঠে গিয়ে ম্যাচ দেখা, আমাদেরই মেসেব কাছাকাছি গিরিশের দোকানের চপ্ কাটলেট খাওয়া, ইত্যাদি নানান রকম ব্যাপারে দিন-গুলি বেশ আনন্দেই কাটছিল। কলেজে দু-তিন ঘণ্টা গিয়ে লেক্‌চার শুনে আসি, বাকী সমস্তদিনই ফুরসৎ। পরীক্ষার বৎসর নয়, তাই পড়াশুনার চাপও বিশেষ কিছু ছিল না।

কলকাতার কলেজে দিনকয়েক যাতায়াত করতে করতে একটি ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বিশেষ ভাবে জমে উঠল। ছেলেটির নাম 'ললিত'। সে আমাদেরই কলেজে আমাদেরই ক্লাসে পড়ত। থাকত আমাদেরই মেসের কাছাকাছি—সিমলা স্ট্রীটে। আমি ললিতদের বাড়ী প্রায়ই যেতাম এবং ক্রমে ললিতদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

ললিতদের বাড়ীতে সব চেয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছিল—ললিতের দিদি সুলোচনা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল—এলাহাবাদে ছিল তাঁর শ্বশুর-বাড়ী। সেইখানেই তাঁর স্বামী ডাক্তারী করতেন। সেই সময়টা তিনি মাসখানেকের জন্য কলকাতায় বাপের বাড়ীতে এসেছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে—যেদিন প্রথম তাঁকে দেখি, সেই দিনই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কলেজের ছুটীর পরে বেলা তিনটা আন্দাজ একদিন আমি ও ললিত ললিতদের বাড়ীতে তার বাইরের পড়বার ঘরে বসে গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ ললিতের দিদি সেই ঘরে ঢুকে, আমাকে সামনে দেখে একটু থমকে চুপ ক'রে দাঁড়ালেন। তারপর ললিতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "হ্যাঁরে ললিত! এ ছেলেটী কে? তোর বন্ধু বুঝি?"

ললিত বললে—"হ্যাঁ দিদি! ওর নাম সুশান্ত। আমার সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়ে।"

দেখেই আমার বড় ভাল লাগল। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। ধব্‌ধবে ফর্সা গায়ের বর্ণ। মোটাসোটা গড়নের উপর বেশ লম্বা চেহারা। মুখখানির মধ্যে, বিশেষ ক'রে চোখ দু'টির মধ্যে ছিল একটা অত্যন্ত সরল সহজ মমতা, যার দিকে চোখ তুলে চাইতেন তাকেই যেন আপনার ক'রে নিতেন, সেই চোখ দু'টির মমতাভরা চাহনিতে। পরিধানে ছিল তাঁর একখানি লালফুলের চওড়া পেড়ে ঢাকাই সাড়ী এবং গায়ে ছিল এক গা সোনার গহণা—গায়ের বর্ণের সঙ্গে সত্য সত্যই সুন্দর মানিয়েছিল।

তিনি এসে দাঁড়িয়ে, সহজ সুরে ললিতকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, চাইলেন সহজ মধুর দৃষ্টিতে আমার পানে, কোন জড়তা নাই সঙ্কোচ নাই। আমি ললিতের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু শুনেই তিনি বিনা দ্বিধায় বসলেন সেই ঘরে আর একখানি চেয়ারে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আমার বাড়ীর খবর।

বললেন "আচ্ছা, চিরকাল তুমি বাড়ীতে বাপ-মায়ের কাছে ছিলে, আর এখন মেসে তোমার একেবারে একলা থাকতে মন কেমন করে না?"

আমি একটু হেসে চুপ ক'রে রইলাম। কি আর বলব।

খানিকটা আবার একথা-ওকথার পর হঠাৎ বললেন, "দেখ সুশান্ত! তুমিও আমাকে দিদি বলে ডেকো। কেমন?"

আমি আস্তে বললাম, "আচ্ছা।"

তারপর থেকে যখনই ললিতদের বাড়ী যেতাম, সন্ধ্যাটা ললিত ও সুলোচনা—দিদির সঙ্গে নানান গল্পে বেশ আনন্দে কাটত্‌।

একদিন সুলোচনাদিদি কথায় কথায় আমায় বললেন, "সুশান্ত! এইবার তোমার বিয়ে হবে না? বড়লোকের ছেলে, একটা পাশ দিয়েছে। তোমাদের মধ্যে ত অল্প বয়সেই ছেলেদের বিয়ে হয়?"

বললাম, "কি জানি। বাবার যা মত তাই ত হবে।"

বললাম, "কিন্তু একটা যা-তা বিয়ে ক'রে ফেলনা যেন। খুব ফুট্‌ফুটে সুন্দরী মেয়ে হ'লে তবে বিয়ে কোর।"

আমি একটু হাসলাম। কি আর বলব। সুলোচনাদিদি আবার বললেন, "আর সুন্দরী মেয়ে তোমার জুটবে নাই বা কেন?—বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছ, অমন সুন্দর চেহারা—"

বললাম, "তা দিদি! আপনি দেখে-শুনে আমার জন্য মেয়ে পছন্দ করবেন—কেমন?"

সুলোচনাদিদি পরম উৎসাহভরে বললেন, "বেশ ত। সেই কথাই ভাল। তোমার বাবা-মা তোমার বিয়ের কথা বললে বলো—সুলোচনাদিদি যাকে পছন্দ করবেন আমি তাকেই বিয়ে করব!"

একটু হেসে বললাম, "আচ্ছা।"

বললেন, "মনে থাকবে ত সুশান্ত? একথা কিন্তু ঠিক রইল, আমাকে না দেখিয়ে বিয়ে করতে পারবে না—পরমাসুন্দরী মেয়ে না হ'লে আমি কিছুতেই তোমাকে বিয়ে করতে দেব না।"

মেসে ফিরে সেদিন রাত্রে সুলোচনাদিদির কথাগুলি বার বার মনে পড়তে লাগল। "পরমাসুন্দরী মেয়ে—" সাবিত্রী? সে কি পরমাসুন্দরী? আর একটি মেয়ের কথা মনে হ'ল, সেই বিষয়টা একটু বলি।

*      *      *      *

ইতিমধ্যে কলকাতা সহরে আর একটা ব্যাপারের সঙ্গে একটু জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমাদের মেসের তিন-চারটী ছেলে প্রত্যেক রবিবার বিকেল

বেলায় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সেজে-গুজে ব্রাহ্ম-সমাজে যেত। ব্রাহ্ম-সমাজে আমি কখনও যাইনি এবং আমার কেমন একটা বিশ্বাস ছিল—আমি হিন্দু. —ব্রাহ্ম-সমাজে যাওয়া আমার পক্ষে অন্যায়।

কিন্তু একদিন সকাল বেলা সেই তিন-চারটি ছেলের সঙ্গে আলোচনায় বুঝতে পারলাম যে, তারা ব্রাহ্ম-সমাজে যায়, তাদের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। তারা যায় মেয়েদের গান শুনতে, এবং ভাল ভাল লোকদের বক্তৃতা শুনতে। অনেক হিন্দু সেখানে যায় এবং ব্রাহ্ম-সমাজে গেলেই যে হিন্দুর কোন দোষ হয়, তার কোনও মানে নাই।

শুনে কেমন কৌতূহল হ'ল। ভাবলাম একদিন যাই না—দেখে আসি ব্যাপারটা কি। কিন্তু আমার মেসের ছেলেদের সঙ্গে যেতে কেমন ইচ্ছে হ'ল না! কেন না সেই তিন চারটি ছেলেকে আমার কোনও দিনই ভাল লাগেনি। কেমন যেন অতিরিক্ত ফাজিল।

পরের রবিবার দিন বিকেল বেলা আমি একলাই ব্রাহ্ম-সমাজে গেলাম। মেয়েদের গান হ'ল, উপাসনা হ'ল, বক্তৃতা হ'ল। মোটের উপর আমার ভালই লাগল। সবই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচির পরিচায়ক।

কিন্তু আমাকে বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট করেছিল—এতগুলি মেয়ের একত্র সমাবেশ। এর আগে এতগুলি বাঙালী মেয়েকে এক সঙ্গে এরকম স্বাধীন মুক্তভাবে কখনও দেখিনি, সকলেই কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত, কেমন মধুর তাদের ধরণ-ধারণ ভাব-ভঙ্গী, সকলেই যেন সুন্দরী!

সভা ভঙ্গ হ'লে আমি সমাজের বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে বোধ হয় মেয়েদের চলে যাওয়া লক্ষ্য করছিলাম। দলে দলে তারা গাড়ী ক'রে চ'লে যাচ্ছে—সকলকেই যেন ভাল লাগছে চোখে। এমন এমন সময় হঠাৎ একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়তেই আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম।

মেয়েটী সুন্দরী। যাকে বলে "পরমাসুন্দরী।" আমার মনে হ'ল, এত রূপ এর আগে আমি কখনও দেখিনি! মেয়েটির বয়স হবে পনেরো ষোল বৎসর। একখানি কচিকলাপাতা রংয়ের সিল্কের সাড়ী তার পরিধানে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রংয়ের সঙ্গে আশ্চর্য মানিয়েছিল। কালো চুলে বেণী-বাঁধা পিঠের উপর ঝুলছে। মুখখানি যেন বিধাতা নিজের হাতে সুনিপুণ ক'রে গড়ে তুলেছেন—তুলি দিয়ে এঁকেছেন দুটি ভুরু, কালো দুটি আঁখি-তারা। লীলায়িত

গড়নের ভঙ্গি একহারা। সুগোল বাহু যুগলের মধ্যে লাবণ্যের জোয়ার এসেছে —কানায় কানায় ভরে উঠেছে অপরূপ অঙ্গ-শ্রী।

মেয়েটী চলে গেল আমার চোখের সামনে দিয়ে।

তারই বয়সী আর একটি মেয়ে তার পাশে পাশে যাচ্ছিল তার গায়ে ঈষৎ একটু ধাক্কা দিয়ে কি যেন একটা বললে, শুনে একটা মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখখানা—আমার বুকের মধ্যে তড়িৎ খেলে গেল। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

বাড়ী ফিরে এসে উঠতে বসতে শুতে প্রাণের মধ্যে একটা কাঁটা ফুটতে লাগল—একটা হতাশার বেদনা। ঐ মেয়েটির সঙ্গে একটুখানির জন্য একদিন একটা কথা কইতে পারি, তাহ'লেই যেন জীবন সার্থক হয়, আর যেন কিছুরই প্রয়োজন নাই। জীবনের সেটুকু পাওয়াও যেন অসম্ভব বোধ হতে লাগল।

এক দিন গেল, দু'দিন গেল, তিন দিন গেল, কিন্তু কৈ সে মেয়েটির স্মৃতি ত একটুকুও মলিন হ'ল না প্রাণে। খালি ইচ্ছে করে সেই মেয়েটির কথা আলোচনা করি—কিন্তু বলিই বা কাকে। ললিতের সঙ্গে আলোচনা করা চলে না—মেয়েটির কথা বললেই সে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে, আমার মনের এত বড় কথাকে উপহাস ক'রে উড়িয়ে দেয়—আমলই দেয় না।

পরের রবিবার ঠিক সময়ে আবার গিয়ে সমাজে হাজির হ'লাম। খানিকক্ষণ আগে থাকতে গিয়েই বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম—মেয়েরা যখন আসবে লক্ষ্য করব। দলে দলে পুরুষরা এল, দলে দলে মেয়েরা এল—কিন্তু কৈ, সে মেয়েটি ত এল না। সভা আরম্ভ হ'ল। ঘরের মধ্যে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে চাইছি কিন্তু—সে মেয়েটিকে পেলাম না। গান হলো, উপাসনা হলো, সভা ভঙ্গ হলো, আবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। যাওয়ার সময় একটি একটি ক'রে সমস্ত মেয়েকে লক্ষ্য করলাম—সে মেয়েটি—আসেনি।

ধীরে ধীরে মেসের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম—একটা বিষণ্ণ-প্রাণ নিয়ে। সে যে কে, কি তার নাম, কোথায় তার বাড়ী, কে তার বাপ, কিছুই জানি না।

এত বড় বিরাট কলকাতা সহরে প্রাণখানা যেন দিশাহারা হয়ে উঠল—অকূল সমুদ্রে যেন আমার তরী ডুবে গিয়েছে, কোনও দিকে কূল-কিনারা নাই!

পরের রবিবার দিন বিকেল বেলা সুলোচনাদিদি ডেকে পাঠালেন। বেলা তিনটে আন্দাজ ললিত এসে আমার মেস থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। সুলোচনাদিদি ছাড়লেন না। সমাজে যাওয়া হলো না।

তার পরের রবিবার অবশ্য গিয়েছিলাম। কিন্তু সে মেয়েটিকে দেখতে পাইনি।—কিন্তু এবার যেন এর জন্য মন প্রস্তুতই ছিল।

বিশেষ কোনও ব্যথা ত বাজেনি প্রাণে। কখন যে মন ইতিমধ্যে নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নিয়েছিল—টের পাইনি।

*   *   *

যে রবিবার সুলোচনাদিদি ডেকে পাঠালেন, ব্রাহ্ম-সমাজে যাওয়া হ'ল না, সেইদিন বলেছিলেন, "সুশান্ত! আর ত পাঁচ-সাত দিন পরেই আমি চলে যাব। পূজোর ছুটীতে কোথায় যাবে?"

বললাম "কেন? বাড়ী।"

দিদি বললেন, বাড়ীতে ত কি পূজোয়ই থাক। এবার এসনা এলাহাবাদ—ললিতও যাবে।"

বললাম, "তা কি হয়—বাবা-মা যেতে দেবেন কেন? বাড়ীতে পূজো হয়!"

দিদি বললেন, "পূজোর ক'টা দিন না-হয় বাড়ীতে কাটিয়ে তারপর এস।"

ভাবলাম—এলাহাবাদ, নতুন দেশ, কলকাতা থেকে অনেক দূর। তা পূজোর পরে দিনকতক বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না।

## পনেরো

সুলোচনাদিদির সঙ্গে এলাহাবাদ যাওয়ার কথাবার্তা হওয়ায় সাত-আট দিন পরেই হঠাৎ বাড়ী থেকে মন্টি বৌঠানের এক চিঠি পেলাম।

মাধবপুর ছেড়ে কলকাতায় আসার পর মন্টি বৌঠানের চিঠি এই প্রথম। প্রায় দেড়মাস হতে চলল কলকাতায় এসেছি, এতদিন দেশ থেকে এক বাবাই আমার কাছে চিঠি-পত্র লিখতেন। মার চিঠি-পত্র লেখার অভ্যাস একেবারেই ছিল না এবং দাদা-বৌঠানও এতদিন আমার কাছে কোনও চিঠি-পত্র লেখেননি।

তাই বোধ হয় হঠাৎ মন্টি বৌঠানের কাছ থেকে খামে এক চিঠি পেয়ে একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম। বিশেষ আগ্রহভরে চিঠি খুলে পড়তে লাগলাম—

ভাই ঠাকুরপো !

আশা করি, এখনও আমাদের একেবারে ভুলে যাননি। প্রথমবার আপনার কলকাতা যাওয়ার পরে আশা করেছিলাম, দু'লাইন চিঠি নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে পাব ; কিন্তু দিনের পর দিন যখন কেটে যেতে লাগল, চিঠি যখন এলই না, তখন আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বাবার কাছে লেখা, চিঠিতেই আপনার খবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে বাধ্য হয়েছিলাম। তারপর মাঝে বিশেষ ইচ্ছে হয়েছিল, আপনাকে একখানা বড় চিঠি লিখি—এদিকের সব খবর দিয়ে।

লিখতে বসেও ছিলাম—এমন সময় হঠাৎ সাবিত্রী এসে হাজির্। সে এসে সব মাটী করে দিলে, কিছুতেই চিঠি লিখতে দিলে না। বললে "খবর না চাইলে আগে থাকতে গায়ে পড়ে কেন খবর দিতে যাবে বৌঠান? যা দু'চার লাইন লিখেছিলাম, আমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। ভেবে দেখলাম, সাবিত্রীর কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। খবর তাকে দেওয়া উচিত, যার খবর নেওয়ার আগ্রহ আছে। নইলে গায়ে পড়ে খবর দিতে যাওয়া—সাবিত্রী বললে "ছিঃ ছিঃ, কি ঘেন্না!" আমি বলি "তার প্রয়োজনই বা কি ?"

কিন্তু কিছুতেই যখন মনে পড়ল না, তখন বাধ্য হয়ে চিঠি লিখতে বসেছি জানেন ত ঠাকুরপো, সাবির মতন একগুয়েমী আমার নেই। সাবির স্বভাব—ভেঙ্গে যাবে, তবু মচকাবে না।

চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি, কেননা চিঠি না লিখে আর উপায় নেই। আপনার দাদার কড়া হুকুম হয়েছে "এখুনি সুশনকে চিঠি লেখ।" ব্যাপারটা একটু খুলে বলি।

সাবির মার দিন দিন যে রকম অবস্থা হচ্ছে, তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন ব'লে আমাদের একেবারেই ভরসা নেই। দিন দিন যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর এবং জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না। ওষুধ পত্র খেতে চান না, জোর ক'রে কবরেজী ওষুধ খাওয়ান হচ্ছে—কিন্তু ফল হচ্ছে না কিছুই।

তিনি মারা গেলে সাবিটার কি অবস্থা হবে এই ভেবে তিনি দিন-রাত কান্নাকাটি করছেন। বুঝতে ত পারেন ঠাকুরপো,—সত্যিই ত সাবির অবস্থা

ভাবলে আমাদেরই বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে, আর তাঁর ত মার প্রাণ! তিনি চলে গেলে সাবির কি হবে—এই ভাবনায় তিনি যেন আরও ভেঙ্গে যাচ্ছেন।

দিন-রাত কেবল কাঁদেন আর বলেন "তোমরা সাবিকে নাও আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরি!"

এখন মার, আপনার দাদার, এবং আমার একান্ত ইচ্ছে সাবিকে আমাদের ঘরে আনি। ছোট 'যা' করে সাবিকে আমাদের ঘরে আনতে পারলে আমি যে কি খুসী হব ঠাকুরপো, তা আর আপনাকে নতুন ক'রে বোঝাতে হবে আজ?

তাই আপনার দাদার পরামর্শে আমি আর মা একদিন বাবাকে জোর ক'রে ধরেছিলাম! কিন্তু তিনি উচ্চবাচ্য কিছুই করলেন না। চুপ ক'রে আমাদের কথা শুনে গেলেন। জানেন ত কি রকম গম্ভীর লোক। তারপর আবার কাল মা যখন সেই কথাটা তুলে বিশেষ ক'রে চেপে ধরলেন, তখন খালি বললেন "দেখা যাক কি হয়।"

এখন আপনার দাদা বলেন "বাবা কিছু বলছেন না, কারণ সুশানের এ বিষয় মত আছে কিনা আগে বোঝা দরকার। হাজার হোক পাশ করা ছেলে তার মতের বিরুদ্ধে বাবা কিছু ঠিক করতে পারেন না।" হয় ত আপনার দাদার কথাই ঠিক। তাই কাল রাত্রে আপনার দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আজ আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি।

পাশ করা ছেলের যে কি মত, তা আর কেউ না জানলেও আমি ত জানি, কি বললে ঠাকুরপো? কিন্তু যাই হোক আপনার হাতের একখানা চিঠি দরকার। সেই চিঠি পেলে আবার বাবার কাছে কথাটা পাড়বো।

খুব শীগ্‌গীর চিঠির উত্তর দেবেন। বুঝতেই ত পারছেন সব অবস্থা। সাবিত্রীর মার যে রকম শরীর তাতে ক'রে আমাদের সকলেরই ইচ্ছে—যদি ঠিক হয়, আজ ত শ্রাবণ মাসের ১৮ই, এই শ্রাবণ মাসের ২৯শে বেশ ভাল দিন আছে, সেইদিনই শুভকার্য সম্পন্ন হয়। নইলে সামনে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক এই তিন মাস কাজ হ'তে পারে না। তারপরে সেই অগ্রহায়ণ মাস, ততদিন সাবিত্রীর মা যে বাঁচবেন—এ ভরসা নেই! আর ভগবান না করুন, তিনি যদি এই কাজের আগে মারা যান, তাহ'লে আপশোষের আর সীমা থাকবে না। আর সাবিটার দশাই বা হবে কি?

আপনাকে বেশী লেখা বাহুল্য। সব বুঝতে পারছেন!

এদিককার আর সব খবর ভালই। ছোড়দার পড়াশুনার উপর পিসেমশাই বোধ হয় একটু বেশী নজর দিচ্ছেন আজকাল, তাই সে বড় একটা আর এ বাড়ীতে আসে না। তার সাবিত্রীর খবর? অনেক আছে। কিন্তু পত্রপাঠ চিঠির উত্তর না পেলে কিছুই দেব না।

চিঠির আশায় পথ চেয়ে রইলাম। ইতি

আশীর্বাদিকা—মণ্টি বৌঠান

চিঠিখানা পড়ে খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলাম। আজ শ্রাবণ মাসের ১৮ই আর এই ২৯শে তারিখ রাত্রেই সাবির সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে। আর মাত্র এগারো দিন বাকী। আর এগারো দিন পরেই একদিন শুভক্ষণে সাবি হবে 'আমার'—একান্ত আমারই আপনার, চিরজীবনের জন্য। ভাবতে প্রাণখানা আনন্দে খানিকক্ষণ শিউরে শিউরে উঠতে লাগল!

সাবিকে একান্ত আপনার ক'রে পেলে, জীবনটাকে প্রতি মুহূর্তে কী রকম ক'রে নানান রসের মধ্য দিয়ে উপভোগ করবো—এই কল্পনায় সমস্ত প্রাণ-মন ভাসিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ। কত ছবিই না গড়লাম প্রাণে-প্রাণে! সেই মাধবপুর গ্রাম, সেই আমাদের বাড়ী, সেই আমাদের পুকুরঘাট, সকলের মধ্যে সাবি, আমাদেরই ঘরের-বৌ, আমাদের বাড়ীর সকলের একান্ত আদরের জিনিষ এবং বিশেষ ক'রে আমারই সঙ্গিনী। এই সব নানান রকম কল্পনায় মজগুল হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

ভাবতে ভাবতে মন নানান চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে কোথা দিয়ে যে কোথায় এসে দাঁড়াল, এতদিন পরে ঠিক ধাপে ধাপে তাকে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে ব'লে যখন স্নান করবার জন্য নীচে কলতলায় নেমে এলাম, তখন মনের সেই কল্পনার পুলকে ভাঁটা পড়েছে; নানান বিবেচনা, নানান হিসেব নিকেশ চলছে আমার প্রাণে প্রাণে—সাবিত্রীকে নিয়ে। কলকাতার সহরে মেয়েদের বাজারে, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্ম সমাজের সেই অচেনা-সুন্দরীর পাশে ফেলে, সাবিত্রীকে যাচাই ক'রে দেখে নিলাম। সুলোচনাদিদির চোখের কষ্টিপাথরে সাবিত্রীর ঠিক মূল্য বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম এবং সেদিন রাত্রে আমাদের মেসের ছাদে, আমাদের মেসের একটী বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে বন্ধুর স্ত্রীর যে রূপ বর্ণনা করেছিল, সেই বর্ণনার মাপ-কাঠিতে

সাবিত্রীকে মেপে দেখে নিলাম; কিন্তু কোন দিক দিয়েই যেন কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে পারিনি।

বিশেষ অন্যমনস্ক ভাবে সমস্ত দিনটা কাটল। ক্লাশে গিয়েছিলাম, কিন্তু লেক্‌চার এক বর্ণও শুনিনি। ভাবলাম সুলোচনাদিদির সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে পারলে ভাল হ'ত।

বিকেল বেলা কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে কেমন বেরুতে ইচ্ছে করল না। ঘরে গিয়ে খাটের উপর চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম। সমস্ত দিনের নানান রকমের এলোমেলো চিন্তার ভারে মনটা তখন বেশ ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকে, সূর্যদেব যখন পশ্চিম গগনের প্রান্তভাগে একেবারে ঢলে পড়লেন তখন ধীরে ধীরে উঠে আমাদের মেসের ছাদের উপর গেলাম।

চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, আশে-পাশের নানান বাড়ীর ছাদে-ছাদে পুরুষ-মেয়েতে ভরে গিয়েছে! বিকেল বেলা কাপড় কেচে, খোঁপা বেঁধে, ফর্সা সাড়ী প'রে কত মেয়ে আমার চারিদিকে একটু দূরে দূরে ভিন্ন ভিন্ন ছাদে বেড়াচ্ছে—আজ আমি তাদের একটু বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখতে লাগলাম। একটুখানি লক্ষ্য করার পরেই খানিক দূরে একটা ছাদের উপরের একটি মেয়েকে যেন একটু বিশেষ রকম ভাল লাগল। দূরে থেকে তার মুখের প্রত্যেক অঙ্গটি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু অস্তরবির রক্ত-আভায় তার গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তার পরিধানে লালপেড়ে সাড়ীর সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গিয়ে একটি মধুর রূপলাবণ্যের সৃষ্টি করেছিল। মাথার তার ঘোম্‌টা ছিল না, এবং তার দীর্ঘ শরীরের গড়নের মধ্যে তার যৌবনের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য এতদূর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। মনে পড়ে গেল এক ইংরাজ কবির একটি কবিতার এক ছত্র—কালই কলেজে পড়েছি—

... Devinely tall and devinely fair"

সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল সাবিত্রীর কথা, আর মনে হ'ল এই ২৯শে সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে।

বিয়ে—একটা আজন্মের বন্ধন, এই অল্প বয়সেই আমার জীবনকে বেড়ী দেবে। তারপর ব্রাহ্ম-সমাজের সেই অচেনা-সুন্দরীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখাও হবে আমার পক্ষে মহাপাপ। প্রাণখানা সব দিক দিয়ে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে আসতে লাগল ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

এখন ভাবি সাবিত্রীর সঙ্গে আমি প্রেমের খেলা খেলে এসেছি, কিন্তু সাবিত্রীকে আসলে আমি কি এতটুকুও ভালবাসিনি? সবই কি ছিল একটা নেশার মোহ? একটা বুভুক্ষু প্রাণের ক্ষণিকের তৃপ্তি?

* * *

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বৌঠানের কাছে চিঠি লিখতে বসলাম। অনেকক্ষণ বসে নানান রকম ভেবে শেষ পর্যন্ত লিখলাম—

শ্রীচরণকমলেষু—

বৌঠান! এতদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে বিশেষ সুখী হয়েছি। কলকাতায় এসে আমি তোমাকে কোনও চিঠি লিখিনি, কেননা আমিও অপেক্ষা করছিলাম— দেখি, কতদিনে তোমার আমাকে মনে পড়ে। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত তোমার যে আমাকে মনে পড়ল, সেইটেই আমার সৌভাগ্য—যদিও জানি আমাকে তুমি মনে করতে বাধ্য হয়েছ—আমার জন্য নয়, আর একজনের জন্য।

সাবিত্রীর মার অবস্থার কথা শুনে বিশেষ দুঃখিত হ'লাম।

আমার মনে হয় অন্য জায়গা থেকে একজন ভাল ডাক্তার ডাকিয়ে তাঁর চিকিৎসা করান উচিত। যদু কবরেজের চিকিৎসায় বিশেষ কিছু হবে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না। এ বিষয় তুমি বাবাকে জোর ক'রে বোল—ব'লে একটা ব্যবস্থা করো। তুমি না করলে আর কেউ গা করবে না। তুমি এ বিষয় কি করলে না করলে পত্র পাঠ আমাকে জানিও! আমি বিশেষ ব্যস্ত রইলাম।

তারপর বিয়ের বিষয়। তুমি ওকথা আমাকে লিখেছ কেন বুঝতে পারলাম না। আমার মতে কি হবে? এ বিষয়ে বাবা বর্তমানে আমার কোনও মতামত দেওয়াই ধৃষ্টতা। তোমরা পাঁচজন মাথার উপর রয়েছ। এ বিষয় আমার চিন্তা করবারই বা দরকার কি!

তবে তোমাকে বলতে আমার কোনও বাধা নেই, এখুনিই বিয়ে ক'রে একটা বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে আমার বিশেষ ইচ্ছে নেই। লেখাপড়া শেষ ক'রে বিয়ে করব—এইটেই আমার চিরকালের ইচ্ছে।

তোমাদের বিস্তারিত খবর দিয়ে, সাবিত্রীর মার খবর জানিয়ে পত্রপাঠ উত্তর দিও কিন্তু। ইতি—

স্নেহের ঠাকুরপো—সুশান্ত সা

চিঠি শেষ ক'রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে কখন যে সমস্ত আকাশ ছেয়ে মেঘ করেছিল লক্ষ্য করিনি।

আলো নিভিয়ে খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে লক্ষ্য করলাম সমস্ত আকাশখানা কালো মেঘে থম্ থম্ করছে আর থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে।

বিছানায় শুয়ে আকাশের ঐ রকম অবস্থা দেখে মনটা যেন কেমন খারাপ হয়ে গেল—কেমন যেন একটা উদাস-উদাস ভাব। চুপ ক'রে শুয়ে আছি, ঘুম আসছে না,—কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল।

নিঝুম রাত্রি—চুপ ক'রে জানালা দিয়ে বাইরে বৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে ক্রমেই যেন প্রাণটা আকুল হয়ে উঠতে লাগল। নানান স্মৃতি—অতীতের স্মৃতি—প্রাণের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল। সেই আমার—মাধবপুর গ্রাম, সেই তার বর্ষার রাত্রি—কত দূরে! সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মধ্যে ভেসে উঠল সাবিত্রী! এই গভীর রাত্রির ঘন বর্ষায় সে কোথায়, কতদূরে! এক দূর নিভৃত পল্লীগ্রামে একখানি জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো বাড়ীতে রুগ্ন-মাতাকে পাশে নিয়ে নিতান্ত একাকিনী ঘুমিয়ে আছে সাবিত্রী—কেউ নেই, জগতে কেউ নেই তার! আকুল আগ্রহে সে জড়িয়ে ধরতে চায় আমাকেই আর আমি তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। নিষ্ঠুরের মত তীক্ষ্ণধার ছুরি পাঠাচ্ছি বৌঠানের চিঠির মধ্যে—তারই বুকে বসিয়ে দেবার জন্য!

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম। বাইরে অন্ধকারে আকাশ ভেঙ্গে সমানে বৃষ্টি পড়ছে আর আমার প্রাণ আকুলতায় ভরে উঠছে কানায় কানায় —সাবিত্রীর জন্য।

উঠলাম বিছানা ছেড়ে। আলো জ্বালালাম। যে চিঠিখানা লিখেছি, বার ক'রে আবার একবার পড়লাম।

"তবে তোমাকে বলতে আমার কোনও বাধা নেই"—ইত্যাদি নীচের দিকটা সবই দিলাম কেটে,—এমন ভাবে যে বৌঠান যেন পড়তে না পারেন। তার পরিবর্তে লিখলাম—

"তবে তোমার কাছে চুপি চুপি বলতে আমার কোনও বাধা নেই, সাবিত্রীর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয় ত আমি বিশেষ সুখী হব। সাবিত্রীকে তুমিও জান আমিও জানি—অমন মেয়ে পাব কোথায়? সত্যি কথা বলতে গেলে সে ত আমাদেরই বাড়ীর একজন। তাকে কি এখন আর পর করা যায়!"

* * *

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি মেঘ কেটে গেছে, রোদ উঠেছে আকাশ জুড়ে। কলেজে যাওয়ার সময়, কাল রাত্রে ঝোঁকের মাথায় আগের লেখা কেটে দিয়ে যা নতুন লিখেছিলাম, সবই আবার কেটে দিলাম। কেন ঠিক মনে নাই। উচ্ছ্বাসটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল, তাই লজ্জা হ'ল কি? জানি না। তার পরিবর্তে আবার লিখলাম—"তবে তোমরা পাঁচজনে যদি মত ক'রে সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, তাতে আর আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে!"

কলেজে যাওয়ার সময় চিঠি ডাকে দিয়ে গেলাম। চিঠি ডাকে দেওয়ার পর থেকে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্যে ভরে উঠল সারা প্রাণখানা। কলেজ থেকে ফিরে সমস্ত বিকেলটা কোথাও যেন একদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না। ললিতদের বাড়ী গেলাম, খবর নিলাম, সুলোচনাদিদি বাড়ীতে নাই! ললিত রাজী হ'ল না, তাই একলাই ট্রামে উঠে বেড়াতে চলে গেলাম—গড়ের মাঠে।

বিয়ে—সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে; শেষ পর্যন্ত তাই হ'ল। আমি যখন মত দিয়েছি এবং বৌঠান মা সকলেরই যখন একান্ত ইচ্ছা, তখন বাবা কোনও আপত্তি করবেন না—এ বিশ্বাস আমার ছিল। কাজেই আর দশ দিন পরেই সাবিত্রী হবে আমার—একান্ত নিজের।

ঠিক যখন হোলই, তখন সব হিসেব-নিকেশ ভুলে গিয়ে মন আবার রঙিন হয়ে উঠল! সাবিত্রীকে নিয়ে নানান পুলকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, —কল্পনা-রাজ্যে! বেড়িয়ে যখন রাত্রে মেসে ফিরে এলাম, তখন প্রাণ আমার সাবিত্রীকে নিয়ে ভরপুর।

পরের দিন কলেজে যাওয়ার সময় মেসের চাকরটাকে বিশেষ ক'রে ব'লে গেলাম, আমার নামে যদি কোনও টেলিগ্রাম আসে, তাহ'লে যেন সে রেখে দেয়। কেননা, মনে মনে হিসেব ক'রে দেখে নিয়েছিলাম, আমার চিঠি বেলা ১২টা কি ১টার সময় মন্টি বৌঠান পাবেন, এবং বেলা ১২টা কি ১টাতেই বাবা খেতে ভিতরে আসেন, নিশ্চয়ই কথাটা তখুনিই উঠবে; তখুনিই যদি ঠিক হয় এবং বিকেলে যদি বাবা আমাকে তার করতে লোক পাঠান,—তবে হয় ত আমি কলেজ থেকে ফিরে আসবার আগেই টেলিগ্রাম এসে যেতে পারে।

যাই হোক্, সে দিনটার বিষয় আমার একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু পরের দিন আমি প্রায় নিশ্চিতই ছিলাম যে, আজ টেলিগ্রাম আসবেই। তাই যখন পর

পর তিন-চার দিন কেটে গেল কোনও তার এলনা তখন আমি সত্য সত্যই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।

মন তখন আমার ষোল আনা আকুল হয়ে উঠছে সাবিত্রীকে জীবন-সঙ্গিনী করবার জন্য। বৌঠানকে চিঠি লেখার পর থেকে দিনরাত প্রায় সাবিত্রীর কথাই ভাবি এবং নিত্য রাত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গে এক একটা নতুন আশার পুলকে পাগল হয়ে উঠি।

যাই হোক্, ২৪শে, ২৫শে, ২৬শে, ২৭শে, কেটে গেল কোনও খবর এল না। ক্রমেই মন হতাশায় ভরে উঠছিল এবং ২৯শে সকালবেলা সত্য সত্যই প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম।

শ্রাবণ মাস কেটে গেল! ভাদ্র মাসেরও সাত-আট দিন হয়ে গেছে। মন্টি বৌঠানের চিঠির কোনই জবাব এল না। ইতিমধ্যে বাবার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, কিন্তু তাতে ওসব বিষয় কোন কিছুরই এতটুকু আভাষ ইঙ্গিত পর্যন্ত ছিল না।

কি হল? মনকে বোঝাই, হয়ত পূজোর সময় আমার বাড়ী যাওয়া পর্যন্ত বাবা অপেক্ষা করেছেন। পূজোর সময় যা-হয় একটা কিছু ঠিক হবে। কিন্তু মন কিছুতেই বোঝে না। মন্টি বৌঠান চিঠির জবাব দিলে না কেন? সাবিত্রীর মার যে রকম অসুখ তাতে এ বিবাহ পূজো পর্যন্ত রাখা ত মোটেই যুক্তির কাজ হচ্ছে না। বাবা কি সেটুকু বিবেচনা করেননি?

যাই হোক্, ১৩ই ভাদ্র মন্টি বৌঠানকে আর একখানি চিঠি লিখলাম। একটু অনুযোগ করেই লিখলাম চিঠির উত্তর না দেওয়ার জন্য এবং বারে বারে বিশেষ অনুরোধ ক'রে লিখলাম পত্রপাঠ চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য।

১৯শে ভাদ্র সকাল বেলা মন্টি বৌঠানের চিঠি পেলাম। তৎক্ষণাৎ আমার ঘরে গিয়ে জানালার কাছে খাটের উপর বসে চিঠিখানা পড়লাম। লেখা ছিল—

ভাই ঠাকুরপো!

চিঠি লিখিনি ব'লে রাগ করছেন। কি লিখব! লেখার কিছু ছিল না। তাই এতদিন কোনও চিঠি লিখিনি।

লেখার কিছুই ছিল না—একথা বললে অবশ্য ঠিক সত্য কথা বলা হবে না। লেখার ছিল অনেক। কিন্তু আপনাকে সে সব কথা লিখতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। তাই এতদিন চুপ ক'রে ছিলাম।

আপনার চিঠিখানা পড়ে বুঝতে পারলাম, কি রকম অস্থির ভাবে আপনি

দিন কাটাচ্ছেন, তাই ভেবে দেখলাম আপনার কাছে সমস্ত খুলে লেখাই ভাল আর আমি না লিখলে সব কথা খুলে আপনার কাছে লিখবেই বা কে?

আমার চিঠির উত্তরে আপনি যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, পেয়েই আমি মাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। মা চিঠিখানা পড়ে অত্যন্ত সুখী হলেন, এবং মা ও আমাতে পরামর্শ হ'ল আমরা দু'জনেই একসঙ্গে বাবাকে বিশেষ ক'রে ধরব যাতে শ্রাবণ মাসের ২৯শেই বিয়ে হয়।

সেই দিনই রাত্রে বাবা যখন খেতে এলেন আমি ও মা দু'জনেই বাবার সামনে কথাটা তুলে বাবাকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করলাম। বাবা সমস্ত শুনে, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "সাবিত্রী মেয়েটির সঙ্গে তুমি ত বেশ ভাল ক'রেই মিশে দেখেছ বৌমা! তোমার কি মনে হয় মেয়েটি সত্যই ভাল?"

উত্তরে আমি উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে সাবির প্রশংসা করতে লাগলাম বাবার কাছে। শুধু তাই নয়, বাবাকে ব'লেও দিলাম যে, সাবির সম্বন্ধে আপনিও খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

বাবা শেষ পর্যন্ত বললেন "তোমাদের সকলেরই যখন ইচ্ছে তখন আমার আর অমতের কি কারণ থাকতে পারে। মেয়েটি দেখতে ত বেশ।"

ঠাকুরপো! শুনে আহ্লাদে আমার প্রাণ নেচে উঠল। বাবা যখন একবার মত দিলেন, তখন যে সে মত আর সহজে ওল্টাবে না—বাবার বিষয় এ আর কে জানে?

সেদিন রাত্রে আর কোনও কথা হ'ল না। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি যখন বাইরে যাচ্ছিলেন হঠাৎ আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন "বৌমা! কাল রাত্রে সুশনের বিয়ের বিষয় যে সব কথাবার্তা হয়েছে, এ নিয়ে তোমরা আর কিছু উচ্চ বাচ্য বা আলোচনা করো না। আমি আর একটু বিবেচনা ক'রে দেখি, তারপর যখন সময় হবে, আমি সকলকে বলব।"

এই ব'লে বাইরে চলে গেলেন।

আমি আর কাকেই বা বলতাম। এক আপনার দাদা।—তা তিনি ত সব খবরই জানতেন। আর এক সাবি স্বয়ং। তাকে অবশ্য সুখবরটা দেওয়ার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করছিল। যাই হোক্, বাবা যখন বারণই করলেন—চেপে গেলাম, সাবিকেও কিছু বললাম না।

মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "মা! বাবা আবার কি বিবেচনা করছেন। কিছু গোলমাল আছে নাকি?

মা হেসে বললেন, "না রে না। ওঁর নিজেরও মনে মনে খুব ইচ্ছে। সাবিকে উনিও খুব পছন্দ করেন। তবে বিশেষ হিসেবী লোক, দুই-এক দিন বিবেচনা না ক'রে কোনও কথা দেবেন না।"

আমি বললাম "মা! ২৯শে ত কাজ হওয়া দরকার।"

মা বললেন "হ্যাঁ রে হ্যাঁ। যদি হয় ত ২৯শেই হবে।"

তারপরের দিন কাটল, কোনও কিছু কথা হলো না। সেইদিন রাত্রে আপনার দাদার কাছে শুনলাম যে, তারপরের দিন সদর থেকে সরকারী বড় ডাক্তার সাহেব আসছেন সাবির মাকে দেখবার জন্য। বাবা বিকেলেই লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন সদরে। শুনে যে কি রকম আনন্দ হ'ল প্রাণে; সহজেই বুঝতে পারেন। বাবা এর মধ্যেই মনে মনে ওদের আপনার ক'রে নিয়েছেন।

পরের দিন বেলা ১২টা ১২৷৷টা আন্দাজ ডাক্তার সাহেব এলেন। বাবা তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন সাবিত্রীদের বাড়ী। সাবির মা ত এখন একেবারে শয্যাশায়ী—উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই। সেখানে তিনি নাকি অনেকক্ষণ সাবির মাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন।

ঠাকুরপো! এই ডাক্তার আনাই হ'ল কাল। ডাক্তার ত দেখেশুনে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে বাবার কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে চলে গেলেন! কিন্তু তিনি যে একটা জীবনের সর্বনাশ ক'রে দিয়ে গেলেন, তা কি তিনি বুঝে ছিলেন!

সেইদিন রাত্রে খেতে বসে দেখলাম বাবার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। জানেন ত বাবার সেই রকম একটা গম্ভীর ধরণ,—যখন আমরা কেউই বাবার সঙ্গে কথা কইতে সাহস করি না।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে বাড়ী শুদ্ধ সবাই যখন শুয়ে পড়েছে, হঠাৎ শৈলিঝি এসে আমাদের শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলে। বললে "বৌমাকে বাবু ডাকছেন।"

তাড়াতাড়ি উঠে বাবার শোবার ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি বাবা চুপ ক'রে বিছানায় শুয়ে আছেন আর মা বিছানার একপাশে বসে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছছেন! বাবা আমাকে দেখে বললেন "বৌমা! এস বসো!"

আমি চুপ ক'রে গিয়ে বাবার পায়ের কাছে বসলাম।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বাবা বললেন "বৌমা! তোমাকে একটা কথা

বলি! একথা আমি এবং উনি,—এ ছাড়া আর কেউ জানে না এবং এখন তোমায় বলব। কিন্তু বিশেষ সাবধান, কেউ যেন টের না পায়।"

আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম। আমার বুকের মধ্যটা কি রকম কেঁপে উঠল।

বাবা একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলতে লাগলেন "আজ জেলার ডাক্তার সাহেব এসে সাবির মাকে দেখে গেলেন, জান বোধ হয়। তিনি আমাকে চুপি চুপি বলে গেলেন—সাবির মার যক্ষ্মা হয়েছে এবং অত্যন্ত খারাপ জাতীয় যক্ষ্মা। এ রোগে আর নিস্তার ত নেই-ই, বড় জোর আর মাসখানেক বাঁচবেন। শুধু তা-ই নয়, ডাক্তার সাহেব আরও বললেন এ জাতীয় যক্ষ্মা বংশ পরম্পরায় চলে।"

বাবা একটু চুপ ক'রে রইলেন। আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎটা যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুরতে লাগল!

একটু পরে বাবা আবার বললেন "কাজেই বুঝতে পারছ, সুশনের সঙ্গে সাবির বিয়ে দেওয়া অসম্ভব! শুধু তাই নয়, একথা যদি প্রকাশ হয় সাবির বিয়ে দেওয়াই সম্ভব হবে না। তাই আমি ঠিক করেছি আমি কাল থেকেই উঠে-পড়ে লাগব—সাবির মা বেঁচে থাকতে থাকতে মেয়েটার একটা বিয়ে দিয়ে ফেলতে পারি কিনা, এতে যদি আমার কিছু টাকা যায়, উপায় কি? মেয়েটার কথা ভাবলে সত্যিই বড় দুঃখ হয়!"

তিনি চুপ ক'রে গেলেন। আমি ত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে যখন আর বসে থাকা অসম্ভব হ'ল "আচ্ছা যাই" বলে কোনও রকমে নিজের ঘরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঠাকুরপো! সমস্ত রাত কি ভাবে কেটেছে—কি আর লিখব!

বেশী আর কি লিখব, আর বিস্তারিত লিখতেও ইচ্ছা করছে না। দু'একটা কথায় বাকী খবরগুলো বলে দি।

সাবির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে—একটি দ্বিতীয় পক্ষ বৃদ্ধের সঙ্গে। শুনলাম বয়স তার প্রায় পঞ্চাশ হবে। আগের পক্ষের ছেলে-মেয়ে আছে। কিছুদূরে "গাবহাটি" ব'লে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামে বাড়ী। অবস্থা নাকি ভাল, জমি-জমা আছে, তেজারতি কারবার আছে, আরও কি কি সব আছে। তবে নাকি ভয়ানক কৃপণ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—বাবার কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা হাতে নিয়ে তবে করবে। সাবিকে অবশ্য দেখতে আসেনি, বলেছে তার দরকার নেই। শুনেছে নাকি মেয়ে সুন্দরী। তাই নাকি বিশ্বাস করেছে।

সাবির বিয়ে—আমাদের সাবির বিয়ে—এই পরশু পরের দিন অর্থাৎ ১৭শে ভাদ্র। মার অসুস্থতার দরুন, অরক্ষণীয়া-কন্যা ব'লে ভাদ্র মাসে বিয়ে হ'তে পারে —বামুনরা নাকি বিধান দিয়েছেন। তবে বর, ভাদ্র মাসে বিয়েতে নাকি রাজী হচ্ছিলেন না এবং শেষ পর্যন্ত বাবাকে পণের টাকা বাড়াতে হ'ল—তাই রাজী হয়েছেন।

আর কি লিখব, সবই ত লিখলাম। এখন পরশুর পরের দিন দাঁড়িয়ে থেকে গোধূলী লগ্নে সাবির বিয়ে দেখব; সেই আনন্দে আছি ঠাকুরপো!

তবে হ্যাঁ—একটা কথা হয়নি। সেটা আপনাকে আমার খুলে বলা উচিত। সাবি অবশ্য জানে না তার মার অসুখের ঠিক খবরটি। তাকে সেকথা আমি কিছু বলিনি। বাবা যখন উঠে-পড়ে লেগে সম্বন্ধ ঠিক করলেন, তারপর থেকে সাবি বড় একটা আর আমাদের বাড়ী আসত না—মাকে নিয়েই থাকত দিন-রাত।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ঘোর সন্ধ্যেবেলা কাপড় কেচে ঠাকুরঘরে প্রদীপ জেলে প্রণাম ক'রে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, অন্ধকারে বারান্দায় খুঁটির পাশে কে যেন একজন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল বুঝতে পারলাম না। মনে হ'ল যেন একটি মেয়ে। সন্দেহ হ'ল—সাবি বোধ হয়। তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গেলাম।

সাবি ডাকলে "বৌঠান।"

আদর ক'রে কাছে টেনে নিলাম। ঠাকুরপো! ওকে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই হঠাৎ যেন আমার চোখ জলে ভরে এল! কোনও কথা কইতে পারলাম না।

শান্ত গলায় সাবি বলল—"বৌঠান! তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

তাকে ওপরে আমার শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম। আলো না জেলেই ওকে কাছে নিয়ে চুপ ক'রে খাটের উপর বসে রইলাম।

হঠাৎ সাবি জিজ্ঞাসা করলে "বৌঠান! শান্তদাকে চিঠি লিখেছ? জানেন তিনি সব?"

বললাম "না।"

বললে "লিখে দাও একখানা চিঠি কালই।"

ঠাকুরপো! এই সাবিই একদিন আমাকে সেধে আপনার কাছে চিঠি লিখতে বারণ করেছিল। আজ তার সে গৌরব, সে অভিমান গেল কোথায়?

চেষ্টা ক'রে একটু হেসে বললাম "তোর বিয়ের খবর। তা দেব এখন লিখে। বিয়েতে শান্তদা না এলে ভাল লাগবে না বুঝি ?"

একটু চুপ ক'রে রইল। পরে বললে "হ্যাঁ, আমার বিয়ের! লিখবে ত কালই ?"

আমি বললাম "আচ্ছা।" একটু পরেই চলে গেল।

এর পরে আর আসেনি। কাল বিকেল বেলা আমি গিয়েছিলাম সাবিদের বাড়ীতে। চিরকালই ত মুখ বোজা ভাব, এখন আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু কথাই কইলে না। যখন চলে আসছি, ওদের বাড়ীর ফটকের কাছে এসে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—

"শান্তদার কোনও চিঠি পেয়েছ ?" হঠাৎ কি বলব খুঁজে পেলাম না। আগে সে আমাকে চিঠি লিখতে বলেছিল মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি হেসে কথাটাকে চাপা দিলাম। বললাম "হ্যাঁ রে হ্যাঁ! খুব খুসী হয়েছেন তোর বিয়ের খবর শুনে। তোর বিয়েতে আসবার খুব চেষ্টা করবেন, লিখেছেন।"

বাড়ী চলে এলাম। পথে ভাবতে ভাবতে এসেছি ঠিক যে কথাটি বলা উচিত ছিল তাই কি বলেছি।—মিথ্যে কথা বলাটা কি ঠিক হয়েছে! জানি না ঠাকুরপো! আপনার বিষয় ও কথাটা ওরকম ক'রে ব'লে ভুল করেছি কিনা।

সবই ত লিখলাম। চিঠি পড়ে আপনি ব্যথা পাবেন জানি। ভেবে বড় কষ্ট হচ্ছে! কিন্তু কি করব। ভেবে দেখলাম সব কথা খুলে লেখাই ভাল।

মাঝে সাবির সঙ্গে খুব কমই দেখা হ'ত। সে এক রকম ছিল ভাল। পরশুর পরের দিন বিয়ে—রোজই আমাকে সাবিদের বাড়ী যেতে হচ্ছে। ঠাকুরপো? আমি ওর মুখখানার দিকে চাইতে পারিনা।

ইতি—মণি বৌঠান।

চিঠিখানা শেষ ক'রে খানিকক্ষণের জন্য কিরকম যেন বোধশক্তি লোপ পেয়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল ১৯শে ভাদ্র। আজই ত ১৯শে। আজই সাবিত্রী চলল বিদায় নিয়ে আমার জীবন থেকে চিরকালের জন্য, চিরদিনের জন্য! চলল পরের ঘরে—পিছন ফিরে কখনও চাইবে না।

আর সাবিত্রীকে হারাতে বসে বুঝতে পারলাম আমার জীবনে সাবিত্রীকে হারান একেবারেই চলে না।

ভাবি, কি অশুভক্ষণেই না এবার বাড়ী থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম।

বৌঠানের চিঠি পাওয়ার পর দু'একদিন প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠেছিলাম। নেহাত কলেজ যাই আর আসি এবং বাকী সময়টা বেশীর ভাগ চুপ ক'রে নিজের ঘরে শুয়ে থাকি। একথা সেকথায় সাবিত্রীর সঙ্গে আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি একটি একটি ক'রে প্রাণের মধ্যে আলোচনা ক'রে দেখি, আর বুকের মধ্যে অস্থিরতায় আকুল হয়ে উঠি। মন হয় ত বা একটু শান্তও হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় সাবিত্রী অপরের অঙ্কশায়িণী, অমনি বুকের মধ্যে যেন শতবৃশ্চিকের দংশন জ্বলে ওঠে। সেই মধুর ডাক—"শান্তদা"! আর কখনও তেমন ক'রে কি ডাকবে? ও ডাক হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য আমার জীবনে।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন গেল। মাঝে মাঝে ভাবি ললিতকে সব বলি। কারুকে সব খুলে বলতে পারলে যেন প্রাণে একটু শান্তি পেতাম। কিন্তু ললিতের কেমনই একটা ধরণ, এ সব কথা ব'লে তার কাছ থেকে কোনও সহানুভূতি পাওয়া ত দূরের কথা, প্রেমের কথায় সাড়া পর্যন্ত পাওয়া যায় না তার কাছ থেকে। মেয়েদের কথা প্রেমের কথা তার কাছে বললে সে কেমন যেন হাঃ হাঃ ক'রে একটা ফাঁকা হাসি হাসে—সবই কেমন যেন হালকা করে উড়িয়ে দেয়।

যাই হোক, সুখের বিষয় কি দুঃখের বিষয় জানি না মন্টি বৌঠানের চিঠি পাওয়ার পরে প্রথমটা যেমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তেমনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই মন আবার স্বাভাবিক হয়ে সবল হয়ে উঠল। বেশ মনে আছে, পাঁচ-সাত দিন পরেই কলকাতার দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে আনন্দ কুড়িয়ে নেওয়ার শক্তি প্রায় ষোল আনাই ফিরিয়ে পেলাম। সাবিত্রী সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মত প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে বিশেষ কিছুই কষ্ট করতে হ'ল না। মনে মনে ভেবেছিলাম এটা কলকাতার গুণ, দেশে থাকলে এ ধাক্কা সামলাতেই পারতাম না বোধহয়।

কলকাতার যে গুণ, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সাত-রংয়ের খেলা কলকাতার উপরে চোখ চাইলেই দেখা যায়। কখন যে চোখ কোন রংয়ে ধরা দেয়, সে ত মুহূর্ত আগেও বলা যায় না। মন কি কোথায় দাঁড়ায় স্থির হয়ে এক দণ্ডের তরে।

মন্টি বৌঠানের দ্বিতীয় চিঠি পাওয়ার চোদ্দ-পনের দিন পরেই সুলোচনাদিদি এলাহাবাদ রওনা হয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় আমাকে বিশেষ ক'রে ব'লে

গেলেন পূজোর ছুটিতে আমি যেন অবশ্য অবশ্য এলাহাবাদ একবার বেড়াতে যাই। কথা দিলাম "যাবো"। মনে মনে ঠিক করেছিলাম যাবো,—নিশ্চয়ই যাবো। যেমন ক'রে হোক বাবার মত করাতেই হবে। সমস্ত ছুটিটা গ্রামে আমি বসে থাকতে পারব না। সেই একঘেয়ে পুরোনো আর ভাল লাগে না ভাবতে। হাওড়া ষ্টেশন থেকে টিকিট করে। পাঁচশ' মাইল দূরে এলাহাবাদ! নতুন দেশ, নতুন আবহাওয়া। এ সুযোগ আমি কখনও ছাড়ব না। .

* * * *

প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে, পূজোর ছুটী হতে আর দশ-পনের দিন বাকী। তিন-চার দিন হ'ল বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন "গত পরশ্ব শেষরাত্রে শ্রীমতী সাবিত্রীর মাতা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। চিঠিখানা পেয়ে প্রাণের মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা টন্‌টনিয়ে উঠল এবং সমস্ত দিনটাই বিশেষ অবসন্ন কাতর হয়ে রইল প্রাণখানা—একটু নড়লে চড়লেই যেন ব্যথা পায়।

তিন-চার দিন কেটে গেল! বাবার চিঠিব উত্তর এখনও দেওয়া হয় নি। রোজই ভাবি লিখব—কিন্তু হয়ে উঠে না। এমন সময় একদিন কলেজ থেকে মেসে ফিরে একখানা টেলিগ্রাফ পেলাম। লিখেছেন "Come home immediately" অর্থাৎ এখুনি বাড়ী চলে এস। টেলিগ্রাফখানা পেয়ে বুকটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। হঠাৎ এরকম টেলিগ্রাফ এল কেন? বাড়ীতে কারো কি বিশেষ অসুখ বিসুখ করল? কিন্তু এই চার দিন আগেও ত বাবার চিঠি পেয়েছি। তিনি ত লিখেছেন—সকলে বেশ ভাল আছে! তবে!—কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। ছুটীর আর মাত্র আট-দশ দিন বাকী, তার পরেই ত বাড়ী রওনা হতাম। এক'দিন আগে আমাকে এরকম ভাবে হঠাৎ ডেকে পাঠানোর মানে কি! কি হতে পারে, নানান দিক দিয়ে আকাশপাতাল মনের মধ্যে আলোচনা করতে-করতে কেমন যেন মনে হ'ল, তবে কি সাবিত্রীর বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়নি। বিয়ে ঠিক হয়ে শেষে কি ভেঙ্গে গিয়েছিল। "বিয়ে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হল"—এ খবরটা ত বাবার চিঠিতে ঠিক পাইনি বোধ হয়। কিন্তু তা যদি হত, মন্টি বৌঠান কি সে খবরটা আমাকে দিতেন না। মন্টি বৌঠানের শেষ চিঠির উত্তর অবশ্য আমি দিই নাই। উত্তর দেওয়ার ছিলও না কিছু তবুও, সে রকম একটা কিছু হ'লে—বৌঠান নিশ্চয়ই জানাতেন। আর

যদি তা না হয়েও থাকে, তা হ'লেই বা বাবা আমাকে ডেকে পাঠাবেন কেন? বিশেষতঃ, ছুটীর আব যখন আট-দশ দিন মাত্র বাকী।

ভেবে কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে মনে কতকটা ঠিক করে নিলাম—বোধহয় মার কোন একটা ব্রত উপলক্ষ্যে একটা কিছু খাওয়ান দাওয়ানর শুভদিন হঠাৎ এসে গেছে; বাবা ত জানেন আমার ছুটির আর মাত্র আট-দশ দিন বাকী, তাই আমাকে কিছু আগে যেতেই তার করেছেন।

এইরকম একটা ঠিক ক'বে নেওয়াতে মনটা অনেকটা শান্ত হ'ল। সেই দিনই রাত্রে ট্রেনে রওনা হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম, এবং রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে যখন ট্রেনে উঠে বসলাম, তখন মনের উদ্বেগ ভাবটা অনেক কেটে গেছে। বেশ হাল্‌কা হয়ে উঠল প্রাণখানা।

গাড়ী ছাড়ল। মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হু-হু ক'রে ছুটে চলল আমার বাড়ীর দিকে।

ট্রেনে অত্যন্ত ভীড ছিল ঘুমবার জায়গা পেলাম না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। সাবিত্রী আব নাই বোধহয় গ্রামে, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না—এই কথাটাই বাইরের দিকে চেয়ে বড ক'রে প্রাণে বাজতে লাগল এবং একটা উদাস ভাবে প্রাণখানা ভ'রে গেল। তবুও বাড়া যাচ্ছি—সেই মাধবপুর, সেই আমাদেব বাড়ী, সেই মা, সেই মন্টি বৌঠান—প্রাণখানা যেন ট্রেনেব আগে ছুটে যেতে চায়,—এত তার আবেগ।

সত্যি ক'বে প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা পেলাম, যখন আমার গরুর গাডীখানা জেলা বোর্ডের রাস্তাব উপর দিয়ে শরৎকালের উজ্জল সকাল বেলায় মাধবপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকল, যখন দেখতে পেলাম সেই জঙ্গলের মধ্যে সেই কাঁটাল গাছের তলা, সেই বেতবন,—যেখানে সাবিত্রীকে শেষ দাঁডিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। সেই দিকে চেয়ে মনে হ'ল সেখানটার জঙ্গল যেন আরও বেশী হয়েছে—আজ সাবিত্রীকে দাঁডিয়ে থাকলেও যেন তাকে দেখা যেত না।

ক্রমে গাড়ী ঘুরে এসে নদীর পাড দিয়ে আমাদের বাড়ীর রাস্তায় মোড় নিল। সামনেই আমাদের বাড়ীর সদর দেখা যাচ্ছে—সেই জামগাছ তলা যেখানে মা, মন্টি বৌঠান দাঁড়িয়েছিলেন আমাব প্রথম যাত্রার দিন। আকুল আগ্রহে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখলাম—বাড়ীর বাইরে কোনও লোকজন দেখতে পেলাম না।

বাড়ীর পুকুরঘাটের পার দিয়ে গাড়ী যখন প্রায় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, দেখতে পেলাম আলী মিঞা বার বাড়ীর ভেতর থেকে বাইরের উঠানে এসে দাঁড়ালেন।

গাড়ী যখন একেবারে থেমে গেল আমি একলাফে গাড়ী থেকে নেমে আলী মিঞার কাছে এগিয়ে গেলাম।

বুকের মধ্যে তখন যেন আমার কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সবই কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'তে লাগল।—আমি এলাম, অনেক দূর থেকে বাড়ীর সবাই নিশ্চয়ই আমার গাড়ী দেখতে পেয়েছে কিন্তু একটা লোক কেউই এগিয়ে আসছে না বাইরের উঠানের দিকে। দাদারই বা হ'ল কি? তিনি ত সকলের আগে গিয়ে এগিয়ে নদীর ধারে দাঁড়াতেন। মেয়েরাও ত খিড়কী দিয়ে খানিক এগিয়ে আসতে পারত—পুকুর পাড়ের দিকে। আলী মিঞাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আলী মিঞা! বাড়ীর খবর ভাল ত? সবাই কোথায়?"

আলী মিঞা একটু চুপ ক'রে দাড়িয়ে রইলেন।

একটু উত্তেজিত স্বরেই বোধহয় জিজ্ঞাসা করলাম "চুপ ক'রে আছেন কেন? কি হয়েছে শীঘ্র বলুন। সবাই ভাল আছেন ত?"

আলী মিঞা কোন কথা না ব'লে আমার হাত ধ'রে নিয়ে বার-বাড়ীর বারান্দায় উঠলেন। একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন "বসুন দাদাবাবু!"

আমি বললাম "আমি বসব না। বাড়ীর ভেতর যাই। বলুন না সবাই ভাল আছেন ত?"

শান্তস্বরে আলী মিঞা বললেন "না"।

কিছু যে একটা নিদারুণ অশুভ ঘটেছে আমার বুঝতে বাকী ছিল না। চোখে অন্ধকার দেখলাম। চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হয়েছে বলুন, বলুন! বাবা কোথায়?" আলী মিঞা ঠিক সেই রকম শান্তস্বরেই বললেন "শ্মশানে। আমাকে বসিয়ে রেখে গেছেন, আপনি এলেই আপনাকে শ্মশানে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।"

শুধু একবার স্তম্ভিতের মত জিজ্ঞাসা করলাম "কে?—কে?—"

আলী মিঞা আস্তে বললেন, "বৌমা, আজ ভোরবেলায় মারা গেছেন।"

মণ্টি বৌঠান! আমার চোখের সামনে পৃথিবী ঘুরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে চিৎকার কান্না শোনা গেল।

*　　　*　　　*

আমাদের গ্রামের শ্মশানটি ছিল মুকুন্দদের বাড়ী ছাড়িয়ে নদীর ধার দিয়ে আরও খানিকটা পশ্চিমে। যখন শ্মশানে গিয়ে হাজির হ'লাম—চিতা সাজান হয়েছে। সমস্ত গা ঢেকে দিয়েছে কাঠে, কেবল মুখখানি দেখা যাচ্ছে। কপাল

ভরে মাখিয়ে দিয়েছে সিঁদুর, তার উপর শরৎকালের সকাল বেলার সোণার রোদটুকু এসে পড়েছে—চক্ চক্ করছে। অর্দ্ধনিমীলিত আঁখি, আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম,—মনে হ'ল যেন ঠোঁটে চাপা রয়েছে সেই দুষ্টু হাসি, যা মন্টি বৌঠানেরই নিজস্ব !

দাদা কিছুদূরে মাটিতে বসে আছেন হাঁটু ভেঙ্গে। হাঁটুর উপর হাত দু'টি রেখে তার উপর উপুড় হ'য়ে এলিয়ে দিয়েছেন মাথা।

আমায় দেখে আর কেউ কোনও কথা কইলেন না, কেবল মুকুন্দর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন "এই যে সুশান্ত ! নেবেই সোজা আসছ বুঝি ?"

কিছু জবাব দিয়েছিলাম কিনা মনে নাই, কিন্তু দাদার দিকে চেয়ে দেখলাম সেই অবস্থাতেই তাঁর পিঠটা হঠাৎ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল একটা চাপা কান্নায়—বোধ হয় আমার নাম শুনে।

মুকুন্দ উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। বললে "একটা দিন আগে যদি আসতে শান্তদা।"

কোনও রকমে ঢোঁক গিলে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হয়েছিল ?"

মুকুন্দ বললে "হঠাৎ। তিন দিনের জ্বরে মাথায় রক্ত উঠে গেল। কি নাকি ভয়ানক খারাপ জাতীয় ম্যালেরিয়া !"

চোখ ফিরিয়ে দূরের দিকে চাইলাম। চোখে পড়ল মুকুন্দদের বাড়ীর বাঁধাঘাট—যেখানে একদিন এমনি সকাল বেলায় বজরা বাঁধা ছিল।

* * * *

শ্মশান থেকে ফিরে আসতে আসতে প্রায় বেলা দু'টো বাজল। এসে বাড়ীর ভেতরে না গিয়ে বাইরের কর্ম্মচারীদের সেরেস্তার একপাশে শুয়ে পড়লাম, এবং শুতে শুতেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্যদেব প্রায় পশ্চিম গগনে অস্ত গিয়াছেন। অপরাহ্ণের একটা বিষাদমাখা ছাঁয়া আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গনে, পুকুরঘাটে, বাগানে, চারিদিকেই লুটিয়ে পড়েছে ! ঘুম ভাঙ্গার পর ঘরের বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম—বাইরের পানে, অপরাহ্ণের সেই ছায়াটার প্রতি। চারিদিক চুপচাপ নিস্তব্ধ। চেয়ে রইলাম—কিন্তু মন যেন তখনও ছিল ঘুমন্ত। যেন স্বপ্নেই অনুভব করলাম—সাবিত্রী এল, চলে গেল ! মন্টি বৌঠান এল, জন্মের মত ছেড়ে গেল। জীবন আবার নতুন ক'রে হবে সুরু—তাই এখন আমার চারিদিকে সবই চুপ-চাপ নিস্তব্ধ··· !

# দ্বিতীয় পর্ব

## এক

প্রায় বছর বারো পরে, একদিন শীতকালের মধ্যাহ্নে স্নান করবার জন্য আমাদের বাড়ীর পুকুরে পূবের পাড়ের বাঁধাঘাটের উপরের ধাপে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দেখতে পেলাম আমার দক্ষিণে, কিছুদূরে জলের কিনারায় একটা ঢোঁড়া সাপ একটা ব্যাঙ ধরেছে। ব্যাঙটা থেকে থেকে একটা চাপা আর্তনাদ করছে আর সাপটা ব্যাঙটাকে ধরে জলের কিনারায় ঘাসের উপর চুপ ক'রে শুয়ে, আস্তে আস্তে ল্যাজ নাড়াচ্ছে—যেন জীবনের পরিতৃপ্তির চরম বিকাশ, ব্যাঙটাকে ধরার মধ্যেই এই শীতের মধ্যাহ্নে রৌদ্রটুকুর নীচে পূর্ণতা লাভ করল আজ।

পৌষ মাস, দারুণ শীত। আমি ঘাটের একটা ধাপের উপর বসে পড়লাম। একটা চাকর আমার সর্বাঙ্গে তেল মালিস ক'রে দিতে লাগল, আর আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম সাপটার পানে। একবার ইচ্ছে হ'ল সাপটাকে মেরে ব্যাঙটাকে উদ্ধার করি। কিন্তু কেমন যেন ব্যাঙটার প্রতি করুণার চাইতেও সাপটির এই নিশ্চিন্ত উপভোগটুকুর মূল্যই বিশেষ ক'রে বড় হয়ে উঠল আমার প্রাণে।

তার বোধ হয় একটু কারণও ছিল। সেদিন আমার মনটা ছিল অশান্ত। দয়া-দাক্ষিণ্যের কোনও স্থানই ছিল না সেখানে। সাপটির দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল—জীবনটাকে ঠিক চেনা গেলনা ব'লেই অহিংসা হ'ল পরম ধর্ম। একটু চাইলেই দেখতে পাওয়া যায়, চারিদিকে পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই জীবনের গতি পূর্ণভাবে চলেছে। জয়-পরাজয়ই যেন জীবনের নিত্য ধর্ম। আদিকাল থেকে জয়ী বেঁচেছে, পরাজিত মরেছে। প্রাণের ধ্বংসের মধ্য দিয়েই প্রাণের পরিপুষ্টি বেড়ে চলে। রোগের বীজাণু ধ্বংস হলেই রোগী বাঁচে, আবার একটি প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আর একটিকে বলিতে দিতে হয় এবং সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ করা চলে না। এই যেন মহাসৃষ্টির চিরন্তন লীলা, আদিযুগ থেকে চলে এসেছে—চিরকালই চলবে।

তবে নিজের জীবনের দিকে চেয়ে মনে হ'ল জীবন-যুদ্ধে আমি যেন ক্রমেই পরাজিত হচ্ছি। জয়ের কোন লক্ষণই যেন কোন দিকে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছিল আমার জীবনের যবনিকা আমারই চোখের সামনে উঠে গেছে—শেষ পর্যন্ত দেখতেও পাচ্ছি। সোজা পথ, ডাইনে বাঁয়ে মোড় ফিরবার যেন কোন প্রয়োজনই নেই। সোজা পথে মাধবপুর শ্মশানেই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি। এখন কথা এই, সে পথটুকুও বা সরল হবে না কেন? কেনই বা পদে পদে পায় ফুটবে কাঁটা, আচ্ছন্ন ক'রে দেবে দেহ-মন? নিজের ঘরটিকে মনের মত ক'রে সাজিয়ে তোলবার শক্তিও যেন আমার নাই, অথচ সামান্ত পশু-পক্ষীর মধ্যেও সে শক্তির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। ঘরে সহধর্মিণী আছেন অথচ তাঁর সঙ্গে আমার জীবনের গতি আজ পর্যন্ত সহজস্থরে মিলিয়ে নিতে পারলাম না।

সহধর্মিণী। হ্যাঁ—আমার বিবাহ হয়েছে। প্রায় বছর সাত-আট হ'ল একদিন শুভলগ্নে তিনি এলেন আমার ঘরে। মনে পড়ে সেই দিন কত আকাঙ্ক্ষা কত অনিশ্চয়তার উত্তেজনায় দুরু দুরু ক'রে কেঁপে উঠেছিল হিয়া। কত রঙেই না রঙিন ক'রে তুলেছিলাম জীবনের ভবিষ্যৎ ছবি। কয়েকটা দিন চলেছিলাম যেন এক স্বপ্নালোকে—তার চারিদিকেই কেবল রূপ, রস, গন্ধ! কত কথাই না মনে পড়তে লাগল। বিবাহের পর প্রথম কয়েক মাস কেটে ছিলও বেশ। নিত্যই যেন নব নব রূপে জীবনটাকে সুন্দর ক'রে তোলবার অনুপ্রেরণা ও শক্তি আমার মধ্যে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছিল।

আমার স্ত্রীর নাম তুষারবালা, পরমাসুন্দরী সে। সুলোচনাদিদি বলেছিলেন, 'পরমাসুন্দরী'। সেই কথাটি আমারই বিবাহের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়েছিল আমার জীবনে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তনুখানি, একহারা দীর্ঘ লীলায়িত ভঙ্গীর মধ্যে চারিদিকে নিত্য-নতুন রূপের স্বষ্টি করে। সমুন্নত নাসিকা, একটু ছোট হ'লেও টানা-টানা দু'টি চোখে উজ্জ্বল দু'টি আঁখি-তারা, ছোট কপালটি, একপিঠ তরঙ্গায়িত কালো চুলে ঈষৎ স্বর্ণাভা—এই সমস্ত মিলিয়ে এমন একটা প্রখর জ্যোতির স্বষ্টি হ'ত চারি দিকে, যেন তার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। দূর থেকে চেয়ে চেয়ে চোখ ঝলসে যায়, অবাক ক'রে দেয় মন। মনে হয়, এত রূপও মানুষের সম্ভব!

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই বোঝা গেল যে, মনুষ্য-জীবনের শান্তি কেবল চোখের পরিতৃপ্তির মধ্যেই নয়। প্রাণ-মন যাতে বিশ্রাম পায় এমন একটি

আশ্রয়ের দরকার; কিন্তু কই তুষারবালার রূপে সে আশ্রয়ের ঠাঁই ছিল না! এ রূপ চোখে দেখতেই ভাল কিন্তু তার মধ্যে বিশ্রাম নাই! তার মধ্যে নিজের প্রাণের ঠাঁই খুঁজে নিতে গেলে যেন সমস্ত দেহ-মন জ্বলে ওঠে—এত প্রখর তার জ্যোতি। সাবিত্রীও ত সুন্দরী ছিল—, তার রূপে ছিল—শান্তি, আশ্রয়, বিশ্রাম। কিন্তু তুষারবালার রূপে যেন বিশ্রাম করা চলে না!

আমাদের গ্রামের বেগবতী নদীর ওপারের পথটি ধরে সোজা দক্ষিণ-পূর্ব মুখে পাঁচ-ছ' ক্রোশ গেলেই আর একটি নদীর তীরে একখানি গ্রাম,—নাম "পলতা"। এই গ্রামেরই মেয়ে তুষারবালা। তবে ঠিক গ্রাম্য মেয়ে নয়, বহুদূর পশ্চিমে অমৃতসর সহরে তার বাপের বড় ব্যবসা ছিল। আমার বিবাহের কিছুদিন পূর্বে তার বাবা দূর বিদেশেই হঠাৎ মারা যান। তখন তুষারবালার দুঃস্থা মাতা স্বামীর সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য—অমৃতসর সহরে যা-কিছু ছিল, সবই বিক্রয় ক'রে কিছু টাকাকড়ি হাতে নিয়ে তাঁর এই একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে ক'রে নিজে গ্রাম্য বাড়ীতে বসবাস করতে সুরু করেন। তুষারবালার বয়স তখন তেরো। এত বড় মেয়েকে গ্রাম্য নিয়ম অনুসারে ঘরে রাখা চলে না, তাই তিনি চারিদিকে লোকজন লাগিয়ে তুষারবালার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তুষারবালার রূপের খ্যাতি মাধবপুর গ্রামে আমাদের ঘরে এসে বাবার কানেও পৌঁছেছিল।

এমন সময় একদিন বজরা নৌকায় মফঃস্বলের মহল পর্যবেক্ষণ করবার জন্য পলতা গ্রামের পাশের নদী দিয়ে যেতে যেতে নদীর তীরে বাবা তুষারবালাকে দেখতে পান। তুষারবালাকে দেখেই বোধ হয় তার রূপের দরুণ তিনি পলতা গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিয়ে তার বিষয় সন্ধান করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। তিন-দিন পলতা গ্রামে থেকে তুষারবালার সমস্ত খবরাখবর নিয়ে সেইখানেই তার মাতাকে পাকা কথা দিয়ে আসেন। সেখান থেকে তিনি বাড়ী ফিরে এসে সকলকে এই বলেন। তারপর দু' তিন মাস পরে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলে, একদিন শুভলগ্নে তুষারবালার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়।

আগে আমি কিছুই জানতাম না তাই হঠাৎ বিবাহের সময় আমি যেন কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিলাম। বিবাহের পরে স্ত্রীর অসামান্য রূপের দিকে চেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলাম—আজও মনে পড়ে। বিবাহের পরে কয়েক মাস যে কেটেছিল স্বপ্নালোকে। জীবনের নতুন আনন্দের স্পর্শে আমি যেন রোজই নব নব পুলকে শিউরে উঠতাম। প্রত্যেক দিন দিনের বেলায় রাত্রের শয়নটি কেমন ক'রে নতুন রূপে সুন্দর ক'রে

তোলা যায় এই ছিল আমার একমাত্র সাধনা। নবে পড়ে কতদিন রাত্রে তুষার-বালার শুতে আসবার পূর্বে তার মিষ্টি অভিমানটুকু উপভোগ করবার জন্য কপট-নিদ্রায় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তাম। তারপর তার শয়নকক্ষে আসার মৃদু রিন্‌-ঝিন্ শব্দ-পুলকে সেই ঘুমের মধ্যেই শরীরে-মনে যে কি রকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ত—আমার কপট নিদ্রাকে সংযত রাখা কঠিন হয়ে উঠত। তারপর তুষারবালার বিছানায় নিঃশব্দে শয়ন এবং আমাকে কোনরূপ ডাকাডাকি বা ঠেলাঠেলি না করার দরুণ কতদিন প্রাণে যে বেদনা পেয়েছি—আজও স্পষ্ট মনে আছে।

যাই হোক, এতই অভিভূত ছিল আমার প্রাণ যে, বি-এ পাশ করবার পর বাবা যখন আমাকে আরও পড়াবেন কিনা এই নিয়ে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, তখন আমি কলকাতায় পড়তে গেলে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়—এই অজুহাতে বাড়ীতে বসেই পড়ে এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মাকে দিয়ে বাবাকে অনুরোধ করিয়েছিলাম।

হ্যাঁ—একটা কথা বলা হয়নি। বিবাহের দিন রাত্রে তুষারবালার ব্যবহারে আমি যেন একটু অবাক হয়েছিলাম। ঠিক সাধারণ চলতি গ্রাম্য জীবনের সদ্য বিবাহিত কন্যার ব্যবহারের সম্বন্ধে আমার যা ধারণা ছিল তুষারবালার ব্যবহারের সঙ্গে ঠিক যেন তার খাপ খায় না। তুষারবালার ব্যবহারে ছিল একটু যেন লজ্জাহীনতার পরিচয়, একটু যেন বেশী রকম অগ্রসর হয়ে যায় তার মন সাধারণের চেয়ে।

উদাহরণটা দি—

আমি ঠিক করেছিলাম বিবাহের বাসরেই স্বামী-স্ত্রীর নতুন পরিচয় সুরু করব না। তার দু'টি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, বাসরে নতুন পরিচয়ের চেয়ে ফুলশয্যায় নতুন পরিচয় হওয়াটাই সুন্দর—এই ছিল আমার ধারণা। দ্বিতীয়তঃ, ভেবেছিলাম নতুন পরিচয়ের নব আনন্দের প্রথম শিহরণ সংযমের মধ্য দিয়ে যতটা পেছিয়ে নেওয়া যায় ততই তার মাধুর্য আরও গভীর হয়ে মনকে অভিভূত করে। তারও একটু কারণ ছিল। ভেবেছিলাম, বিনা পরিচয়ে কেবলমাত্র সান্নিধ্যের আনন্দটুকুই যতক্ষণ উপভোগ করা যায় ততক্ষণই বা ছাড়ি কেন। জানা নাই, শোনা নাই অথচ একটি সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে সমস্ত জগৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক শয্যায় পাশাপাশি শয়ন ক'রে ছোট-ছোট হঠাৎ লাগা স্পর্শের শিহরণে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠার মূল্যটুকুই কি কম?

যাই হোক, সে উপভোগটুকু আমার হ'ল না। বাসরের উৎসব শেষ ক'রে

যখন আমাদের দু'জনকে নিয়ে সমস্ত পৃথিবী আড়াল হ'ল, তখন কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরই তুষারবালা যেন বড্ড বেশী আমার কাছে এগিয়ে এল। হঠাৎ ঘুমে এলিয়ে পড়ে এগিয়ে আসা নয়—বেশ সহজ সজাগ ভাবে স্পষ্ট এগিয়ে আসা। প্রথমটা আমার মনে হ'ল একটু সরে যাই। কিন্তু স্পর্শের পুলকে বোধ হয় এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত লোপ হ'ল। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ, পরে হঠাৎ তুষারবালাই প্রথম কথা কইলে। একটু মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করলে "তুমি কখনও অমৃতসরে গিয়েছিলে?" আমি বললাম "না"।

বললে "বেশ জায়গা। একবার আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে?"

আমি বললাম "হুঁ"।

আমার বাকশক্তি কি লোপ পেয়েছিল? তারপর দু'জনেই আবার চুপচাপ। ভাবলাম আমার একটা কথা বলা দরকার। অনেক ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম "মাধবপুর গ্রামে তুমি আগে কখনও এসেছ?" সে বললে "না। পলতাতেই মাত্র নৌকা ক'রে দু'তিনবার এসেছি জীবনে।"

খুলনা থেকে নদী দিয়ে পলতা গ্রামে বরাবর সোজা যাওয়া যায়। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর-আলিঙ্গনের নিবিড়-স্পর্শে দু'জনকে যেন হারিয়ে ফেললাম।

সেই ত প্রথম পরিচয়। তারপর মনের পরিচয় ক্রমে যতই নিবিড় হ'তে লাগল, ততই মাঝে মাঝে প্রাণে চমক ভাঙ্গান একটা ধাক্কা যে পাইনি এমন নয়, কিন্তু তবুও কয়েকমাস মোটের উপর উপভোগের আনন্দটুকুর মাত্রা এতই বেশী ছিল যে, তার মধ্যে একটু আধটু তিক্ততা যেন বুঝেও বুঝিনি। তুষারের সুন্দর তনুখানি নানান রূপে, নানান রঙে সাজাবার নেশা আমাকে যেন পেয়ে বসেছিল। ললিতকে কলকাতায় চিঠি লিখে মুখের ক্রীম, মাথার খোঁপার নানান রকম রঙিন জাল, পাউডার, এসেন্স ইত্যাদি কত জিনিষই যে মাঝে-মাঝে আনাতাম তার ইয়ত্তা নাই।

ক্রমে নেশা কাটল। বিশেষতঃ, একদিনের একটা ব্যবহারে বিশেষ ক'রে প্রাণে ব্যথা পেয়েছিলাম। কি একটা উপলক্ষে মনে তুষারবালার মাতা তাকে বাপের বাড়ী পাঠাবার জন্য আমাকে অনুরোধ ক'রে পত্র লেখেন। তুষারবালা অবশ্য ইতিমধ্যে মাসখানেক বাপের বাড়ী কাটিয়ে এসেছে। আমি পত্রখানি পাঠ ক'রে বাবাকে দেখাবার জন্য মার হাতে পত্রখানি দিলাম। মা বাবাকে পত্রখানি দিয়েছিলেন। বাবা অবশ্য চিঠি পড়ে, তাঁদের কাছে না দেখার দরুণই হোক বা

নিজের ব্যক্তিগত আপত্তির কারণেই হোক, উচ্চবাচ্য কিছুই করেন নি। ফলে বাপের বাড়ী যাওয়া হ'ল না। কিন্তু বাড়ীশুদ্ধ সবাই বোধ হয় স্তম্ভিত হয়েছিল, যখন তুষারবালা কারুকে কিছু না বলে সকালবেলা স্নান ক'রে এসেই নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। এমন কি বেলা তিনটার সময়ও অনেক রকম ধাক্কাধাক্কির ফলে বাবা নিজে এসে নাম ধরে বারে বারে ডাকা সত্ত্বেও কিছুতেই যখন দরজা খুলল না, তখন রাগে, দুঃখে, লজ্জায় আমার যেন মাটির মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছে হ'ল। মনে হ'ল আমার প্রচণ্ড গর্বে ভীষণ ঘা লাগল। আমার স্ত্রী—সে আমারই প্রাণের সচল গতির সঙ্গে প্রাণ-মন ভাসিয়ে দিয়ে আমারই অনুভূতিগুলি মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রে জীবনের পথে চলবে,—এই যেন দাম্পত্য জীবনের চরম সার্থকতা। জীবনভোর বাবাকে শুধু আমি ভয় করিনি, শ্রদ্ধাও করেছি। গভীর শ্রদ্ধায় বাবার চরণে আমার প্রাণ সব সময় নুয়ে থাকত এবং বাবার কোনও কথা বা আদেশ অবহেলা করার শক্তি যে কারো থাকতে পারে এমন ধারণাই আমার ছিল না, তাই বোধ হয় তুষারবালার বাবার প্রতি এই অবহেলায় প্রাণে একটা ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল সেদিন। তারপর রাত্রে শুতে গিয়ে, তুষারবালার কেমন যেন একটা উত্তেজিত কথাবার্তার মধ্যে আমাদের বাড়ীর প্রতি অসংযত অশ্রদ্ধায়, তার প্রতি ঘৃণায় ভরে গেল আমার প্রাণ। স্পষ্ট মনে আছে, সেই রাত্রে আমাদের পরস্পর সংঘাতের মধ্যে এমন একটা বিকারের সৃষ্টি হয়েছিল আমার প্রাণে, যে মনে হচ্ছিল জীবনে কোন দিনই প্রাণ ওরকম তিক্ত হয়ে ওঠেনি।

তারপর মাঝে মাঝে প্রায়ই এটা ওটা সেটা নিয়ে পরস্পরের কুৎসিত সংঘাতের মধ্যে আমার প্রাণ একটা বিকৃত অনুভূতিতে অস্থির হ'য়ে উঠত। বিবাহের ছয়-সাত বৎসর পরেও সেইদিন মধ্যাহ্নে এই রকমই একটা তিক্ত মন নিয়ে স্নানের ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই বলছিলাম দয়া-দাক্ষিণ্যের কোন স্থানই ছিল না সেদিন আমার প্রাণে।

কিন্তু মোটের উপর তখনও তুষারবালার প্রতি প্রাণের আনন্দটুকু একেবারে হারিয়ে ফেলিনি। এই সব কলহ-দ্বন্দ্বের মধ্যেও মাঝে-মাঝে বড়ই মধুর লাগত তাকে। সত্য কথা বলতে গেলে শান্তরূপে মাঝে মাঝে কমনীয়তার মাধুর্য চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার শক্তিও তুষারবালার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। মনে পড়ে জীবনে দু'-চার বার আমার অসুখের মধ্যে অক্লান্ত সেবায় আমার রুগ্নশয্যার চারিদিকে এমন একটা শান্ত আনন্দের সৃষ্টি করত সে, যে তখন আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে আমার সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠতাম। তুষারবালার মনের

উত্তেজিত রূপের অস্বাভাবিক বিকৃতি যেন নেহাত তুচ্ছ, কিছুই নয়,—এই রকম একটা ধারণায় গভীর শান্তি অনুভব করতাম প্রাণে-প্রাণে।

আজ জীবনের শেষ সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে ভাবি বিবাহের ছয়-সাত বৎসর পরে যদিও প্রাণ মাঝে মাঝে মর্মন্তুদ উত্তেজনায় অশান্ত হ'য়ে উঠত তবুও তার গতিতে ছন্দ তখনও হারাইনি। জীবনের সুর যদিও মাঝে-মাঝে প্রখর ঝঙ্কারে বিকৃত রসে-জলে উঠত, বেতালা ছিল না। তাই বোধ হয় সেদিন মধ্যাহ্নে স্নানের ঘাটে বসে বসে শীতের রৌদ্রটুকুর মধুর স্পর্শে অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবতে ভাবতে প্রাণ আবার শান্ত হ'ল। স্নান ক'রে ঘরে গেলাম, প্রাণ-খানা ভরিয়ে নিলাম একটা পরিপূর্ণ দাক্ষিণ্যে।

* * *

এই বছর বারোর মধ্যে আমাদের সংসারের উপর দিয়েও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মন্টি বৌঠানের মৃত্যুর পরে বছর খানেক যেতে না যেতে বাড়ীশুদ্ধ আমরা সবাই উঠে পড়ে লাগলাম দাদার আবার বিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু দাদা কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হলেন না। মা অনেক কান্নাকাটি করলেন—অনেক অনুরোধ উপরোধ—এতবড় সংসারের ভার তাঁর ভাঙ্গা স্বাস্থ্যে তাঁর পক্ষে একলা বওয়া যে কতখানি কষ্টকর, নানান কথায় নানান ভাবে দাদাকে অনেক ক'রে বোঝালেন, কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। দাদার ঐ এক কথা—যে চলে গেছে তার জায়গায় আমি আর একজনকে বসাতে পারব না; না—না, কখনই না। মার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের কথাও দাদাকে স্মরণ করিয়ে দিতে মা একেবারেই ভোলেননি। তার উত্তরে দাদা সহজসুরে বলতেন "বেশ ত সুশনের বিয়ে দাও না—তাহ'লেই ত আবার বৌ ঘরে আসবে, আমাকে আর জড়িও না।"

আমিও অনেকদিন দাদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলেছি কিন্তু কিছুই ফল হয় নি। অত ভাল মানুষ সহজ লোক দাদা, তবুও তাঁর মধ্যে কেমন একটা একগুঁয়েমী ছিল যে, একবার না বললে তাকে হ্যাঁ করান একরকম অসম্ভব। আমাকে বলতেন—

"দেখ্ সুশন তোর সেই মন্টি বৌঠানের জায়গায় আর একজনকে বৌঠান বানাতে তোর কষ্ট হয় না? আহা! কি ভালই না বাসত তোকে।"

এই ব'লে একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে যেতেন। আমিও চুপ ক'রে থাকতাম, দাদার ওরকম কথার উপর আর কোন কথা কইতে পারতাম

না। কেবল বাবাই বিবাহের বিষয় দাদাকে কোন দিন, কোন কথা বলেননি। আমি অনেকবার মাকে বলেছি বাবাকে দিয়ে বলাবার জন্য, কিন্তু মা বলতেন "সে উনি বলবেন না। আমি অনেকবার ব'লে দেখেছি। বল্লে আরও ফল খারাপ হয়! সেদিন খেতে বসেছিলেন, আমি কথাটা তুলেছিলাম, কিন্তু উনি কোনও কথাই কইলেন না, আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলাম ওঁর যেন ভাল ক'রে খাওয়াই হ'ল না।"

বোধ হয় বাবা মনে ভাবতেন পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার একবারই কর্তব্য, দ্বিতীয়বার বিবাহ করা না করা পুত্রের ইচ্ছা ; তাতে পিতার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিম্বা, তিনি মন্টি বৌঠানকে অত্যন্ত ভালবাসতেন—গভীর ছিল সে ভালবাসা এবং বোধ হয় অত্যন্ত নিবিড় ছিল তাঁর অনুভূতি ; দু' একবার জটিল জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারেও বাবার মত লোক মন্টি বৌঠানকে ডেকে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছেন, বাড়ীর আর কারোর সঙ্গে নয়। এতখানি আস্থা ছিল তাঁর সেই চোদ্দ-পনের বছরের মেয়েটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রতি। তাই বোধ হয় তিনি দাদার আবার একটা বিয়ের কথা ভাবতে নিজের প্রাণেই কষ্ট অনুভব করতেন। যাই হোক, তিনি দাদাকে কখনও কিছু বলেননি। বল্লে হয় ত দাদার পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই সহজ হ'ত না।

দাদা আর বিবাহ করলেন না ; এবং দাদার মধ্যে আবার এক পরিবর্তনের সুরু হ'ল। যদিও এখন মাছ খান তবুও মন্টি বৌঠানের মৃত্যুর ঠিক পর হতেই একেবারে নিরামিষাশী হয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, বছর দুই পর্যন্ত মাছমাংস একেবারেই স্পর্শ করেননি। বাহারী চুলগুলো আবার ছোট ছোট ক'রে ছেঁটে ফেললেন এবং মন্টি বৌঠানের একখানি বড় ফটোগ্রাফ নিজের শোবার ঘরে টাঙ্গিয়ে প্রত্যহ খানিকক্ষণ দরজা বন্ধ ক'রে কি যে করতেন তা তিনিই জানেন। পূজো আচ্ছার প্রতি ঝোঁক যা ছিল তার চাইতে শতগুণ গেল বেড়ে। সব চেয়ে যেটা বড় ক'রে সবার চোখে পড়ল, সেটা হচ্ছে—তিনি বাবার সঙ্গে জমিদারীর কাজকর্ম দেখা একেবারে ছেড়ে দিলেন। স্পষ্টই বোধ হয় বাবাকে বলেছিলেন—তার দ্বারা সম্ভব হবে না। তাই ছুটীতে যখনই বাড়ী আসতাম আমাকেই বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ জমিদারীর কাজকর্ম দেখতে হ'ত এবং তাই বোধ হয় আমার বি-এ পাশ করবার পরে বাবা এম-এ পড়বার জন্য আমাকে কলকাতায় পাঠাননি।

প্রায় বছর দশেক জমিদারীর কাজকর্ম শিখে আমি এখন জমিদারীর কাজে একরকম দক্ষতা লাভ করেছি। বাবার মত বিচক্ষণ দক্ষতা অবশ্য আমার হয়নি,

এবং কোন কালেই হবেনা। তবুও যেটুকু যা শিখেছি আলী মিঞাকে দক্ষিণ হস্ত ক'রেই আমিই এখন জমিদারীর কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছি।

কারণ, বাবা এখন ইহজগতে নাই। আমার বিবাহের বছর দু'য়ের মধ্যেই তিনি মারা যান হঠাৎ একদিন দুপুর বেলায় খেতে বসে। উঃ! সেদিনটা কি ভীষণ দিন ছিল আমাদের অদৃষ্টে! কোন অসুখ ছিল না, দিব্যি সুস্থ মানুষ স্নান ক'রে মধ্যাহ্নে ভিতরে এসে খেতে বসেছেন, এমন সময় হঠাৎ দু'এক গরোস মুখে দিতেই না দিতে কেমন যেন এলিয়ে ঢলে পড়লেন। কি হ'ল! কি হ'ল—ব'লে মা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। আমরা যে যেখানে ছিলাম সবাই ছুটে গেলাম. দেখতে কিন্তু জ্ঞান আর ফিরে এল না। আলী মিঞা সদরে ছুটলেন ডাক্তার আনতে। গ্রামের যে যেখানে ছিল ছুটে এল আমাদের বাড়ীতে। কত রকম টোটকা ঔষধ, এটা ওটা সেটা খাওয়াবার চেষ্টা করা গেল, কপালে কি একটা পাতার রস মাটির সঙ্গে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হ'ল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। সদর থেকে ডাক্তার সাহেব যখন এলেন, তখন প্রায় শেষ অবস্থা। রাত্রি ন'টার সময় আমার পিতা মাধবপুরের স্বনামধন্য 'রতন-সা' দেহত্যাগ করলেন। শেষ মুহূর্তে একটু জ্ঞান বোধ হয় ফিরে এসেছিল। বোঁ—বোঁ—বোঁ—এই রকম একটা শব্দ মুখ দিয়ে দু'চার বার বেরুল। মনে হ'ল যেন কিছু বলতে চান। মুখের কাছে কান নিয়ে কথাটা শোনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিছুই বোঝা গেল না।

শুনেছি মৃত আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুর সময় পাশে আসে, দেখা দেয়। আমার কেমন বিশ্বাস, মন্টি বৌঠান বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শেষ সময়। তাই বোধ হয় বাবা "বৌমা" ব'লে কিছু একটা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা কোন দিনই স্পষ্ট হ'ল না ইহজগতে।

মাধবপুরে একটা উল্কাপাত হ'ল। যেন প্রকাণ্ড একটা পাহাড়ের তলায় ছিল আমাদের মাধবপুর গ্রামখানি, এমন সময় হঠাৎ পাহাড়টা খসে ধসে ধসে পড়ে গেল—চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড ফাঁকা, হু-হু করছে—এই রকম একটা মনোভাবে বোধ হয় সমস্ত গ্রামখানা অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমাকে যে কিরকম ব্যথা দিয়েছিল তার তীব্রতা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। জীবনে এত বড় আঘাত কখনও পাইনি। মন্টি বৌঠানের মৃত্যুর পরে বুক ভেঙ্গে কান্না আসত, কিছুদিন মনটা হু-হু করত দিনরাত—এইমাত্র। এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু এবার যেন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, যেন সইতে পারব না, এ সওয়া যে অসম্ভব—

একটা দিশেহারা আকুল মনোভাব। কেবল মনে হ'ত কি করি!—এখন কি করি। জীবন-সমুদ্রে যেন অঘোরে তলিয়ে যাচ্ছি, কোনও উপায় নাই। চারিদিকে সবই যেন বিরাট ফাঁকা, এত ফাঁকা সওয়া যায় না, দম বন্ধ হয়ে আসে।

মা যে সেই শয্যা নিলেন বোধ হয় এক মাস বিছানা ছেড়ে উঠেন নি। যখন উঠলেন তখন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে আর চেনা যায় না। দাদার মুখের দিকে চাইলে মনে হ'ত তিনি কেমন যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেছেন; যেন অসম্ভব আজ সম্ভব হ'ল। এমন অবস্থায় যেন এ জগতে আর থাকাই চলে না।

লোকে কথায় বলে "সময়ে সবই সয়"। আমাদেরও সইল। দাদার সঙ্গে অনেক পরামর্শ ক'রে বাবার এমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করলাম যে, মাধবপুর অঞ্চলে কেউ কখন কোনও দিন শ্রাদ্ধে এত ঘটা দেখেনি। শ্রাদ্ধের দিনটা ব্রাহ্মণ ভোজন, দান, মন্ত্রপাঠ, কীর্তন ইত্যাদিতে যে কোন দিক দিয়ে কেটে গেল যেন টেরই পেলাম না। বাবার মাধবপুরের রতন-সার শ্রাদ্ধ ও অঞ্চলের লোক কেউ কখন ভোলেনি বোধ হয়; এবং আমার মনে চিরকাল সজাগ হ'য়ে ছিল, আজও আছে। তার আবার একটু বিশেষ কারণও ছিল। ঐ দিনটাকে নিয়ে আমার প্রাণের সশ্রদ্ধ অনুভূতির সঙ্গে একটা বেদনা জড়ান আছে। যেন বাবার কাছে চিরকালের মত আমিই অপরাধী হ'য়ে রইলাম।

ব্যাপারটা বলি। শ্রাদ্ধের আগের দিন সকাল বেলায় তুষারবালা আমাকে বল্লে, "বাড়ীতে সাবান ফুরিয়ে গেছে, আজকের মধ্যেই সাবান না আনিয়ে দিলে কালকে আমার স্নানই হবে না।"

কথাটা শুনে যুগপৎ স্তম্ভিত ও দুঃখিত হ'লাম।

বললাম, "তুমি এ সময় গায় সাবান মাখছ?"

বললে, "কেন? তাতে কি হয়েছে?"

বললাম, "মাখতে নেই এইটেই বিধি; এবং বাবার ব্যাপারে প্রত্যেক বিধিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানা হয়—এইটেই আমার ইচ্ছে।"

আমার কথার সুরে বোধ হয় একটু ঝাঁজ ছিল। তুষারবালাও একটু উত্তেজিত সুরে বললে,—"আমি ওসব মানি না—যত কুসংস্কার। বাইরে ঐ সব ভড়ং দেখালেই বুঝি যত শ্রদ্ধা দেখান হয়!! লোকের শ্রদ্ধা লোকের মনে, বাইরে নয়। আমার মনের খোঁজ তুমি কি রাখ?"

আমি একটু বিরক্তিপূর্ণ সুরে বললাম, "তোমার মনের খবরের আমার কোনও

দরকার নেই। কুসংস্কার কিনা বিচার করতেও তোমাকে কেউ বলেনি, আর সে বিচার করবার বিদ্যেও তোমার নেই।"

তুষারবালা বললে,—"বিদ্যে থাকুক বা না থাকুক, আমি মানব না—ব্যাস।"

আমি একটু জোরের সঙ্গে বললাম,—"তুমি আমার স্ত্রী—মানতেই হবে তোমাকে।"

তুষারবালার চোখ দু'টো জ্বলে উঠল, বললে,—"কেন? জোর নাকি? কিসের জোর এত শুনি—পুরুষ মানুষ বলে?"

আমি গম্ভীরভাবে শুধু বললাম, "হ্যাঁ"।

উত্তেজিত স্বরে বললে "জোরটা বুঝি পুরুষদেরই একচেটিয়া? যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘেন্না বোধ হচ্ছে।"

আমি বললাম,—"তোমার মত মেয়ের মুখ দেখতেও আমার ঘেন্না বোধ হয়।"

কোন কথা না ব'লে তুষারবালা হন্ হন্ ক'রে সেখান থেকে চলে গিয়ে সশব্দে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করলে। অন্য সময় হ'লে আমি হয় ত পিছন পিছন যেতাম, জোরে ধাক্কা দিতাম দরজা এবং কলহ যতই কুৎসিত হয়ে উঠুক না কেন, ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ক'রে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু সেই দিনকার আমার মনের অবস্থার দিক দিয়ে রাগটার চাইতেও গ্লানিটা হ'য়ে উঠল বড়। আমি কিছু না বলে সেখান থেকে চ'লে গেলাম। তুষারবালার আর কোন খবরই নিইনি সেইদিন। তাঁরই ঝি সরলা দু তিন বার দিনের মধ্যে আমার কাছে এসেছিল, যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বিরক্তিপূর্ণ চাহনির সম্মুখে কিছুতেই বলতে সাহস করেনি।

রাত্রে আমার মন অনেকটা শান্ত হয়েছে। একসঙ্গে শোবার বিধি নাই। তাই শুতে যাবার আগে ভাবলাম, তুষারের ঘরে গিয়ে অত্যন্ত কোমল ব্যবহারে তাকে গলিয়ে একটা মিটমাট করে নেব। রাত পোহালেই যে কালকে মহাদিন।

তুষারবালার ঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম ঘরের দরজা ভিতর হ'তে বন্ধ। আদর মাখান সুরে দু' একবার ডাকলাম কোন সাড়া এল না। তারপর ঈষৎ উত্তেজিত হ'য়ে দরজায় একটু জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম, ভিতর হতে উত্তেজিত কর্কশ কণ্ঠস্বর কানে এল—

"লজ্জা করে না? যার মুখ দেখতে ঘেন্না হয় তার কাছে আবার এগিয়ে এসেছ?"

শুনে শরীর-মন দুই এক সঙ্গে জ্বলে গেল। দ্বিতীয় কথা না ব'লে সেখান থেকে চলে গিয়ে বারান্দার একপাশে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসেনি। ক্রমে মন শান্ত হ'য়ে এল; হঠাৎ ভাবলাম, রাগের মাথায় রাত্রে কিছু ক'রে বসবে না ত? কালকের মহাদিন যে সামনে। কিন্তু উঠে গিয়ে আবার খোসামোদ করবার প্রবৃত্তিও হ'ল না।

পরের দিন শ্রাদ্ধের কাজকর্ম সুসম্পন্ন হ'ল। তুষারবালা কাজে যে যোগ দেয়নি এমন নয়, কিন্তু সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেই এমন একটা উদাসীন তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ হ'তে লাগল—বিশেষতঃ আমার সামনে, যে সকলের সম্মুখে লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে আসছিল। কেবল মনে মনে ভাবতে লাগলাম—বাবা ত বুদ্ধিমান ছিলেন, সবই দেখে গেছেন—তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবেন।

## দুই

ঘাটের পাড়ে বসে, তেল মাখতে মাখতে নানান রকমের চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রাণটা ক্রমেই শান্ত হ'য়ে এল সেদিন। তারপর স্নান সেরে যখন ঘরের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলাম মনটা তখন আমার মাধুর্যে ভরা। ইতিমধ্যে জলে নেমে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে তুষারবালার চরিত্রের কমনীয় দিকটা মনে মনে আলোচনা ক'রে নিয়েছিলাম। পথে যেতে যেতে ভাবলাম "দোষে গুণেই ত মানুষ হয়। তুষারের দোষের দিকটা যত বড়ই হোক না কেন, গুণের দিকটার মূল্যও ত কম নয়। অমন যার রূপ, তার চরিত্রের একটু ঝাঁজ থাকবেই ত—সেইটেই যেন স্বাভাবিক।" মনে মনে একটা গ্লানি অনুভব করতে লাগলাম, নিজের মনের অসংযত দুর্বলতার জন্য। ভাবলাম "আচ্ছা ও না হয় রেগে যায়, কিন্তু আমিই বা সঙ্গে সঙ্গে অত রাগ করি কেন? আমি যদি না রাগি তাহ'লেই ত কোন রকম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। ও যতই রাগে, ততই যদি প্রাণভরা আদর নিয়ে ভিজিয়ে ও প্রাণখানাকে ঠাণ্ডা ক'রে দি—তাহ'লেই ত আবার সব মধুর হ'য়ে ওঠে। না হয় ক্ষমাই ক'রে

নিলাম ওর সব অপরাধ, তাতে ত আমার দুর্বলতা নাই। জীবনে ওর ত আর কিছুই নেই—সমস্ত প্রাণমন দিয়ে যে নির্ভর করে, একান্ত.আমারই উপর! এই রকম সব ভাবতে ঠিক ক'রে নিলাম আর কখনও ওর উপর রাগ করব না, তা ও যতই অপরাধ করুক না কেন। জীবনে একটা মস্ত বড় সমস্যা যেন নিষ্পত্তি হ'য়ে গেল। আমাদের জীবনের বিরোধ যেন আজ থেকে শেষ হ'ল। সমস্ত দুপুরটা দু'জনার প্রাণে প্রীতির আদান প্রদানে কী রকম ক'রে মধুর ক'রে তুলব —এই কল্পনায় আত্মহারা হ'য়ে চললাম বাড়ীর ভিতরে।

দরজা দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকবার পথে তুষারবালার সঙ্গে দেখা হ'ল। তেল মেখে নাইতে চলেছে সে চুলগুলো টেনে কপালের উপর দিয়ে বাঁধা। বেশ পালিশ করে, তেল মাখা মুখে। মাথায় ঘোমটা। গায় একখানা সবুজ ডোরা কাটা গামছা জড়ান। কিছুই নয়, তবুও মোটের উপর সমস্ত মিলিয়ে বেশ যেন একটু পরিপাটি ধরণ।

এইটেই ছিল তার সাজ গোজের বিশেষত্ব। সাজ-গোজে যে ভাবেই থাকুক না কেন, সব সময়েই কেমন যেন একটু পরিপাটি ধরণ, সবই যেন বেশ ফিট্‌ফাট —সুরুচির পরিচায়ক! বেশীর ভাগ সময়েই সাজ-গোজের মধ্যে বেশ একটু বাহার ফুটিয়ে তুলতে সে যেন ছিল সিদ্ধহস্ত। সব সময়ই তার সাজ-গোজের ধরণ আমার চোখ দু'টোকে মুগ্ধ করত। কিন্তু তবুও সময় সময় সাজ-গোজের বাহার যে একটু অতিরিক্ত ব'লে আমার মনে হ'ত না এমন নয়।

তুষারবালা নাইতে চলেছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখী হওয়াতেই চোখ ফিরিয়ে নিলে। দেখলাম, চোখে ঘৃণা ও বিরক্তির সংমিশ্রণে একটা দারুণ রুক্ষভাব ফুটে উঠেছে। একটু পরিহাস ক'রে বললাম—

"আহা! রাই চলেছে সিনান তরে
পথেই বা না ঢলে পড়ে!"

কোনও কথা না ব'লে মৃদু-মন্থর গতিতে চলে গেল। একটু পিছে পিছে সরলা ঝি, একখানি গঙ্গা-যমুনা পাড় মিহি তাঁতের সাড়ী হাতে এবং সাবানের বাক্সে সাবান নিয়ে চলেছে। আমার পাশাপাশি হওয়াতেই জড়সড় হয়ে একটু ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল।

শোবার ঘরে গিয়ে আর্সীর সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি কিছুতেই যেন পছন্দই হচ্ছে না—এমন সময় হঠাৎ পুকুর পাড়ের দিক দিয়ে একটা চীৎকার শোনা গেল। আমি একটু চমকে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম,

আমাদের বাড়ীর চাকরগুলো বাড়ীর ভিতর থেকে পুকুর পাড়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে না পেরে, যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থাতেই পুকুরের দিকে ছুটলাম। আমাদের পুকুরের উত্তর পাড়ের ঘাটের উপর গিয়ে দেখি জলের কিনারায় তুষারবালা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, তার শরীরের নীচের দিকের বেশীর ভাগই জলের মধ্যে তলিয়ে গেছে, মাথাটা কাত হ'য়ে পড়ে আছে জলের কিনারায় ধাপের উপরে ; সরলা-ঝি প্রাণপণ শক্তিতে তাকে টেনে রেখেছে নইলে যেন সমস্ত শরীর এখুনি জলের ভিতর তলিয়ে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে নেমে গিয়ে তার দেহখানি আঁকড়ে ধরলাম, কোনরকমে তাকে টেনে তুলে শোয়ালাম ঘাটের নীচের ধাপে। অবিন্যস্ত বস্ত্র কতকটা সংযত ক'রে দিয়ে তার মাথার কাছে ধাপের উপর বসে, মুখখানি সযত্নে তুলে নিলাম আমার কোলের উপরে। তারপর হাতে ক'রে জল তুলে জোরে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম তার চোখে-মুখে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তুষারবালা চোখ মেলে চাইলে। একটা আকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। কাতরকণ্ঠে বললে "ওগো! আমি আর বাঁচব না—তুমি আমায় ঘরে নিয়ে চল।"

এই ব'লে দু'হাত দিয়ে আকুল ভাবে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে। ঘাটে অনেক লোক জড় হয়েছিল, এমন কি মা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘাটের নীচের ধাপে। আমার যেন একটু লজ্জা হ'ল। মনে হ'ল এখান থেকে তুষারবালাকে যত শীঘ্র ঘরের ভিতর নিয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল। আস্তে গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি এখন উঠতে পারবে ?"

বললে "না—না, আমি উঠতে পারব না। আমার বুকের মধ্যে এখনও কেমন করছে, বড্ড মাথা ঘুরছে। ওগো! আমার কি হবে ?"

এই বলে আকুল ভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বললাম "এ অবস্থায় তোমার ঠাণ্ডাও লাগছে—তাই ত কি করা যায়।"

সে বললে "সবাইকে এখান থেকে যেতে বল, তারপর তুমি আমাকে ধরে নিয়ে চল।"

আমি চাকরবাকরদের দিকে তাকিয়ে বললাম "তোমরা সব যাও এখান থেকে।"

মা বললেন "হ্যাঁ, সব চল এখান থেকে। সুশন! তুই ওকে একটু সুস্থ ক'রে বাড়ীর ভিতর নিয়ে আয়।"

এই ব'লে সকলের সঙ্গে মাও ঘাট ছেড়ে চলে গেলেন।

খানিক্ষণ তুষারবালা চোখ বুজে এলিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে রইল। একটি বাহু তুলে দিয়ে জড়িয়ে রইল আমার গলা। আমার মনের অবস্থা তখন যে ঠিক কি হয়েছিল এতদিন পরে ভেবে বলা কঠিন। স্নান ক'রে ফিরে আসতে আসতে যতই না কেন মনে মনে কল্পনা করেছিলাম, তুষারবালার সঙ্গে বিরোধ আমারই প্রাণের মাধুর্য ঢেলে মিটিয়ে ফেলব, তবুও মনের কোণে যে আমার ত্রাস একেবারেই ছিল না এমন নয়। তাই তুষারবালার এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের পরস্পরের মিলন বিনা বাধায় সহজ হ'য়ে উঠল দেখে মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। যদিও তার ব্যবহারে একটু অতিরিক্ত ঢলে পড়া ভাবে মন আমার ও অবস্থাতেও কেমন যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে আসছিল।

যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে ধীরে তুষারবালাকে তুলে বসালাম, কোন রকমে উঠে বসেই মাথাটি এলিয়ে রাখলে আমার বুকের উপরে। আমি একবার তাড়াতাড়ি ঘাটের চারিদিকে চেয়ে দেখলাম কেউ কোথাও আছে কিনা! তারপর সেই অবস্থাতেই দেহখানি জড়িয়ে ধরে সযত্নে দাঁড় করিয়ে ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে চললাম—বাঁধাঘাটের ধাপে ধাপে।

উপরের ধাপে এসেই "আমি আর পারছি না" ব'লে একেবারে যেন এলিয়ে পড়ল। তখন নিরুপায় দেখে আমি তুষারবালাকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, হাঁটুর নীচে একখানি হাত এবং গলার নীচে আর একখানি হাত দিয়ে। কিন্তু দেখলাম আমার শক্তিতে তা মোটেই সহজ সাধ্য নয়। সেও বোধ হয় তা বুঝলে; বললে, "থাক, থাক, চল কোনরকমে হেঁটেই যাচ্ছি" এই ব'লে আমার দেহের উপর তার সমস্ত দেহখানি এলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চলল বাড়ীর ভিতরে।

কোনরকমে শোবার ঘরে নিয়ে এসে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তারপর শৈলি-ঝিকে ডেকে বললাম "শীঘ্র একবাটি গরম দুধ নিয়ে এস।" তুষারবালা আস্তে আস্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি খেয়েছ?"

আমি বললাম "না। হবে এখন, তুমি ব্যস্ত হও না।" তুষারবালা আবার বললে "না—না, বড্ড বেলা হয়ে গেছে, তুমি খেয়ে নাও। এক কাজ কর, ঠাকুরকে বল এইখানে আমার সামনে তোমার খাবার দিয়ে যেতে।"

এই ক'টা কথা ব'লেই সে যেন কেমন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম,—"অত কথা বোলনা তুমি। আচ্ছা, আমি আমার খাবার ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছি। তুমি একটু স্থির হ'য়ে শোও।"

ক্ষীণ-কণ্ঠে বললে "তোমার খাওয়া না হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।"

"আচ্ছা ব্যবস্থা করছি" এই ব'লে আমি বারান্দায় বেরিয়ে এসে ঠাকুরকে আমার খাবার শোবার ঘরে নিয়ে আসতে বললাম।

এখন ভাবি, তুষারবালার সেই কাতর-করুণ ব্যবহারের মধ্যে ভিতরে সত্যি-কারের যতখানি ছিল, তার চাইতেও বাইরে প্রকাশ ছিল ঢের বেশী। তখনও যে তা আমি একেবারেই বুঝিনি এমন নয়। বুঝেছিলাম শরীরের দিক দিয়ে যতখানি সে এলিয়ে পড়েছিল, ততখানি এলিয়ে পড়ার মত তার কিছুই হয়নি। কিন্তু তবুও সমস্ত মিলিয়ে তার এই মিষ্টি-মধুর ব্যবহারটুকু আমি উপভোগই করেছিলাম। ভেবেছিলাম, বোধ হয় "স্বভাবে একটু বাড়াবাড়ি আছে, তা না হয় রইল কিন্তু আমাকে যে প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাসে, সে বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নেই। না হয় ওর মনস্তুষ্টির জন্য এই বাড়াবাড়ি ব্যবহারে তাল দিয়েই চললাম।"

ঘরের মধ্যেই আমি খেতে বসলাম। তুষারবালা শুয়ে শুয়ে আমার খাওয়া দেখতে লাগল। বললে "আহা! লাউয়ের ঘণ্টটার চেহারা দেখন। দেখলে আর খেতে ইচ্ছে করে না। কতদিন ঠাকুরকে দেখিয়েছি—মাছ দেওয়ার আগে লাউটাকে ভাল ক'রে গলিয়ে নিও, কিছুতেই কি কথা শোনে। ভারী একগুঁয়ে।"

কিছুক্ষণ পরে আবার বললে "ঝোল নয় ত যেন গঙ্গাজল। না, আজ তোমার খাওয়াই হ'ল না।" আমি বললাম "বেশ খাওয়া হয়েছে। তুমি অত কথা বলোনা, আবার শরীর খারাপ হবে।"

খেয়ে উঠে বাইরে আঁচিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দেখি তুষারবালা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাপড় ঠিক করছে। তাড়াতাড়ি বললাম "ওকি! তুমি উঠলে কেন? আবার এখুনি মাথা ঘুরবে।"

বলল "না, যাই তোমার জন্য দু'টো পান সেজে নিয়ে আসি।"

বললাম "তা সরলাকে বললেই ত হ'ত।"

তুষারবালা কোন কথা না ব'লে কোনো রকমে যেন এগুতে লাগলো। দরজার কাছটাতে গিয়ে মাথাটা একবার রাখলে দরজার উপরে। আমি বললাম "তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ।"

কোন কথা না ব'লে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই তুষারবালা হাতে গোটা চারেক পান ও বোঁটায় একটু চুণ নিয়ে ফিরে এল। আমার কাছে এসে আমাকে পানগুলো দিয়ে অতি চাপা রকমের

একটু কাতরোক্তি করতে করতে আমার খাবার থালার সামনে আসনের উপর গিয়ে বসে পড়ল।—আমি বললাম, "ওকি! তুমি ভাত খাবে নাকি?"

একটু ম্লান হাসি আমার দিকে তাকিয়ে বললে "হ্যাঁ, খাই দু'টি!"

আমি বললাম "এই ত কিছুদিন হ'ল তোমার জ্বর হয়ে গেছে। এই দুর্বল শরীরে ভাত খেয়ে আবার জ্বর আসে যদি।"

বললে "কিছুই হবে না।" এই ব'লে আমারই থালা পরিষ্কার ক'রে গুছিয়ে নিলে।

অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুর ভাত-তরকারী দিয়ে গেল এবং তুষারবালাও বেশ পরিপাটী ক'রে খেলে। খেয়ে উঠে আমাকে বললে, "সরলাকে ডাক না দু'টো পান দিয়ে যাক আমাকে।"

আমি সরলাকে ডেকে পান দিতে বললাম। তুষারবালা বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঝি এসে এঁটো তুলে নিয়ে গেলে, আমিও, দরজায় খিল দিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়লাম।

মা কিন্তু ইতিমধ্যে একবারও ঘরে আসেননি। একবারও খবর নেননি—বৌ কেমন আছে। সত্যি কথা বলতে গেলে মার এই অবহেলায়, তুষারবালার কাছে আমার একটু লজ্জা বোধ হচ্ছিল। অন্যদিন আমার খাবার সময়ে মা সামনে এসে বসেন, আজ তাও এলেন না।

তুষারের প্রতি মার ব্যবহার মোটেই ভাল ছিল না। বাড়াবাড়ি আদর-যত্ন মার স্বভাবে কোনদিনই ছিল না এবং তুষারবালার প্রতি কোনদিনই প্রকাশ পায়নি। তবুও বিবাহের পরে কিছুদিন তুষারের প্রতি মার ব্যবহারে একটা সস্নেহ প্রীতির ভাব বড় মধুর হ'য়ে ফুটে উঠত—আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে তাও গেল। অনেক বিচার করে দেখেছি, দোষটা মার উপর কিছুতেই চাপান যায় না। মার প্রতি তুষারবালার ব্যবহারে একটা সহজ সরল গতির বিশেষ অভাব ছিল। কখনও হয় ত অত্যধিক আদর-যত্নে মাকে একেবারে অস্থির ক'রে তুলত আবার কখনও হয় ত ব্যবহারে প্রকাশ পেত এমন ঘৃণা, অবহেলা যে, দেখলে আমারও শরীর জ্বলে উঠত। সময়ে সময়ে রেগে গেলে মাকে কটু অকথা-কুকথা শুনিয়ে দিতেও তুষার পিছপাও হ'ত না। মার স্বভাবে কলহ জিনিষটা একেবারেই সইত না এবং বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করেছিলাম, বাবার মৃত্যুর পরে মা যেন নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। অযথা কথা বা ব্যবহার মার আজকাল কারোই সঙ্গেই ছিল না, বিশেষতঃ তুষারবালার বেলায়

বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে তার সঙ্গে কোন কথাই কইতেন না। মার শরীর ভাল ছিল না। বহুদিন ধরে মার শরীরে নানান রকম ব্যাধি আশ্রয় নিয়েছিল। মনে পড়ে, মন্টি বৌঠানের আমলে মার অসুস্থতার বিষয় লোকের কাছে অগোচর থাকত না; কিন্তু আজকাল, ব্যাধিগুলি বেশীর ভাগ বাড়ীর সকলের অগোচরেই রইল।

কেবল দাদা এর মধ্যে দু'বার এসে খবর নিয়ে গেছেন। দরজার বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দু'বার জিজ্ঞেস করে গেছেন। "সুশন! বৌমা এখন ভাল আছে ত? যদু কবরেজকে একবার ডাকলে হ'ত না—কেন এমন হ'ল।"

আমি বলেছিলাম "না, তার দরকার নেই।"

বেশ বুঝতে পারতাম, সমস্ত বাড়ীর মধ্যে যদি কেউ তুষারকে আন্তরিক স্নেহ করতেন তবে সে দাদা। দাদার স্নেহের অভিব্যক্তির মধ্যে খুব যে বেশী বাড়াবাড়ি বা বাহুল্য ছিল তা নয়, কিন্তু যেটুকু ছিল সেটুকু যথার্থই খাঁটী। আমার বিবাহের পরে বার বার আমি তুষারকে বুঝিয়েছি—"আমার দাদা মানুষ নয়, দেবতা। মনুষ্য সমাজে হাজারে অমন একটা লোক বার করা যায় না।" কথায় কথায় দাদার প্রাণের প্রেমের গভীরতার কত যে উদাহরণ দিয়েছি তার ঠিক নাই এবং পদে পদে দাদার প্রত্যেক কর্মের মধ্যে, প্রত্যেক ব্যবহারের মধ্যে, কতখানি সরল, সহজ, সরল দাদার প্রাণখানা, এইটে বার বার তুষারকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। ফলে, তুষারের প্রাণে দাদার প্রতি কোনরূপ গভীর শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল কিনা জানি না; কিন্তু দাদার প্রতি ব্যবহারে তুষার কখনও কোন অমর্যাদা দেখায়নি। এবং উত্তেজিত তুষারবালার সম্মুখে সকলেই যখন অস্থির হ'য়ে উঠত, তখনও দাদার প্রতি ব্যবহারে তাহার স্বভাবে বিশেষ কোন অসংযমের পরিচয় ছিল না। যদিও সে রকম অবস্থায় দাদা সাধারণতঃ একটু পাশ কাটিয়ে চলতেন, তবুও এটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তুষারবালার প্রকৃতির বিপর্যয়ে যখন সকলেই তার প্রতি নিদারুণ বিমুখ হ'য়ে উঠত, দাদার কিন্তু তার প্রতি ব্যবহারে মোটের উপর একটা সহানুভূতি একটা সমবেদনাই প্রকাশ পেত —বিরক্তি নয়।

ফলে তুষারের প্রাণে ধীরে ধীরে দাদার প্রতি একটা নির্ভরতা গড়ে উঠল। অন্য সময় তার কোনও অভিব্যক্তি না থাকলেও প্রাণের আগুনে জ্বলে উঠে তুষার যখন প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠত, তখন দাদার আগমনে যেন একেবারে

গলে যেত—জগতের মধ্যে একজন যেন দরদ দিয়ে তার সমস্ত দুঃখ নিজের বুকে তুলে নিতে পারে।

স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় দাদার প্রতি তুষারবালার মনোভাবে যে কোন-রকম বিশেষত্ব ছিল—এমন নয়; বরং মনোভাবটা ছিল অত্যন্ত সাধারণ। দাদাকে যেন প্রাণের বিচারে বিবেচনা করারই প্রয়োজন নাই।

যাই হোক, নানান রকম মিষ্টি আদরের আদান-প্রদানে দুপুরটা ভালই কাটল। বড়ই সহজ ও সরল হয়ে উঠল তার ব্যবহার আমার প্রতি। এই রকম অবস্থায় তুষারবালার চোখ দুটির দিকে চেয়ে আমি অবাক হ'য়ে যেতাম—এত সহজ সরল তার অভিব্যক্তি। যেন জগতের কোন গোলমাল, কোন বিকৃতির মধ্যে তার প্রাণ কোনদিনই যায়নি,—জগতটার সঙ্গে তার পরিচয়ই হয়নি। এখনও এবয়সেও নিতান্ত ছেলেমানুষের মত অত্যন্ত সোজা তার মনখানা।

বিশ্বাস হয় না যে, কিছুক্ষণ আগে তার বুকের উপর দিয়ে অত বড় ঝড় ব'য়ে গেছে! এত কোমল, এত নরম হ'য়ে উঠত তার স্বভাব যে তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করান যেত। যেমন ক'রেই গড়ি—যেমন করেই ভাঙ্গি, কোন কিছুতেই কোন বাধা নাই। একটু আদরে যেন গলে যায়, একটু সহানুভূতিতে ভেঙ্গে পড়ে।

মাঝে মাঝে মনে হ'ত তুষারবালার প্রাণে এক সয়তান বাস করে। যখন সেই সয়তান ঘুমিয়ে থাকে তখন তুষার হ'য়ে উঠে অত্যন্ত মধুর, চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় প্রাণের কমনীয়তা। তখন যেন বুদ্ধিসুদ্ধিও তার কমে যায়—যেন কিছুই বোঝে না। কিন্তু সয়তান একবার জাগলে আর রক্ষা ছিল না। প্রাণের মধ্যে তার প্রচণ্ড লীলায় বুদ্ধিসুদ্ধিও তুষারবালার হ'য়ে উঠত—প্রবল প্রখর। একটা বিকৃত সৃষ্টিশক্তি আপনার কাজ সুরু ক'রে দিত তার প্রাণে। তখন, সে অবস্থায় তার অনর্গল কথার সম্মুখে স্তম্ভিত হ'য়ে নীরব হ'য়ে যেতে হ'ত, উত্তর পাওয়া যেত না। সত্য মিথ্যার অদ্ভুত সমন্বয়ে এমন সব কথা, এত তীব্র জোরের সঙ্গে বলবার শক্তি হ'য়ে উঠত তার, যে মনকে ধাঁধা লাগিয়ে দিত। ভাবতাম হয় ত যা বলছে সবই ঠিক, কোনদিন আমি ওর প্রতি ঐ রকম অমানুষিক ব্যবহারই করেছিলাম।

বিবাহের ছ'সাত বৎসর পরে—তখনও ত বুঝিনি সয়তান ঘুমোয় না। শান্তরূপে মধুর হ'য়ে ওঠা তারই আর এক লীলা। নিজেকে লুকিয়ে ফেলার শক্তি

ছিল তার এত অসাধারণ যে, তার মধুর লীলায় তুষারবালার চোখের মধ্যে আভাষে পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

সে দিন দুপুরে কথায় কথায় তুষারবালা বললে "চাঁপা মেয়েটাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

চাঁপা মুকুন্দের স্ত্রী। এই বছর পাঁচ-ছয় বিবাহ হয়েছে। বয়সে প্রায় তুষারেরই সমবয়সী। দিব্যি গোলগাল চেহারা, গোল মুখের গড়ন, শ্যামবর্ণ রং, ছোট ছোট ভাসা ভাসা চোখ। চোখের নীচে পাতলা ঠোঁট দু'টিতে সব সময়েই যেন কেমন একটা হাসি লেগে থাকত। সেটা বোধ হয় ঠোঁটের গড়নেরই ভঙ্গি। শুনেছি তার বাপের বাড়ীর নাম—"দেখন হাসি"। ভাল নাম চম্পা, চাঁপা ব'লেই সবাই তাকে ডাকে। তুষারবালার কথা শুনে আমি একটু অবাক হ'লাম। চাঁপা মেয়েটকে আমি ভাল ব'লেই জানতাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন ?"

তুষার বলল "বড্ড বেশী অহঙ্কার, কিসের এত জাঁক ?"

বললাম "অহঙ্কার? মুকুন্দর স্ত্রী তোমার কাছে আবার কিসের অহঙ্কার করবে।"

বললে "কি জানি! বোধ হয় সবাই ভাল বলে তাই অহঙ্কারে ফেটে যাচ্ছে।"

মুকুন্দর স্ত্রীর আমাদের সমাজে সুখ্যাতি ছিল। অত্যন্ত কর্মপটু, বিশেষতঃ রন্ধনে তার সুনাম এতই বেশী হ'য়ে উঠেছিল যে গ্রামের সকল বাড়ীরই কাজকর্মে রন্ধনের ভার মুকুন্দর স্ত্রীর উপরেই পড়ত। এ ছাড়া শাশুড়ী, দেওর প্রভৃতি সকলেরই যথাসাধ্য যত্ন-আদর করতে একটুও নাকি ক্লান্তি বোধ করত না। বেশ মনে আছে, মার মুখে মুকুন্দর স্ত্রীর কথা উঠলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমি বড় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠতাম। মনে হ'ত পরোক্ষে তুষারকেই অবমাননা করা হচ্ছে। সমস্ত চাহনিতে তুষারের দিকে চেয়ে দেখতাম। কিন্তু আশ্চর্য এ সব কথা যে তাকে এতটুকুও স্পর্শ করেছে তুষারের ধরণে তার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেত না। আপন মনে গম্ভীরভাবে নিজের কাজ ক'রে যেত, ওসব কথা যেন তার কানেও আসেনি।

কেন জানি না চাঁপার বিষয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি কোন কথা তুষারের সঙ্গে এতদিন আমার হয়নি। চাঁপার কথা উঠলেই তুষার কেমন যেন চুপ হয়ে যেত, কথা বাড়তে দিত না। চাঁপার সঙ্গে তুষারের প্রায়ই দেখা হ'ত—যতদূর লক্ষ্য করেছিলাম, চাঁপা অত্যন্ত সশ্রদ্ধ মধুর ব্যবহার তুষারের সঙ্গে—

যেন বড্ড বেশী আপনার ক'রে নিতে চায়। তুষারও কিছু খারাপ ব্যবহার করত না। কিন্তু তবুও যেন ভাব জমল না।

বললাম "কেন? তোমার সঙ্গে ত খুব ভাল ব্যবহার করে।"

বললে "ব্যবহারে খারাপ নয়—তবে- -সে তোমরা পুরুষমানুষ ঠিক বুঝতে পারবে না। ব্যবহারের মধ্যে নিজের আহ্লাদেই যেন গড়িয়ে যাচ্ছে। আমার তা ভাল লাগে না।"

বললাম "মরুকগে যাক্, ওদের ঘরের বৌ ওদের ভাল লাগলেই ভাল।"

বললে "ঠাকুরপোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না।"

বললাম, "সে কি কথা! মুকুন্দকে দেখে ত মোটেই মনে হয় না।"

বললে "তোমার কাছে আর কি বলবে? চাপতে পারে না আমার কাছে। মাঝে মাঝে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। হাজার হ'লেও ত ঠাকুরপো বুদ্ধিমান, বাইরে দেখে বুঝতে পারবে কেন?"

বললাম "কি জানি হবে।"

সত্য কথা বলতে গেলে কথাটা আমার ঠিক যেন বিশ্বাস হ'ল না। তুষারকেই যে ঠিক অবিশ্বাস করেছিলাম তা নয়, কথাটা দু'তিন মুখে মুখে ঘুরে এসে বোধ হয় তিলে তাল হয়ে উঠেছে। একটু চুপ ক'রে রইলাম। হঠাৎ তুষারবালা বললে,—"ঠাকুরপো শুনেছে আমার এই অসুখের কথা?"

বললাম "বোধ হয় না। শুনলে নিশ্চয়ই একবার এসে তোমায় দেখে যেত। বিকেল বেলা তাকে ডেকে পাঠাব এখন।"

তারপর দু'একটা কথা কইতে কইতে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

## তিন

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেলা প্রায় ঢলে পড়েছে। আমাদের শোবার ঘরের পশ্চিমের জানালা দুটি দিয়ে দুই ঝলক ম্লান রৌদ্র আমাদের ঘরের মধ্যে এসে খানিকটা খাটের উপরে খানিকটা মেজের উপরে লুটিয়ে পড়েছিল।

তুষারবালাই আমাকে ঠেলে তুললে। বললে "ওঠ, ওঠ, বেলা যে গেল।"

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে—"উঃ বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি এখন আছ কেমন"—এই ব'লে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে গিয়ে ঘটি ক'রে মুখে-চোখে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিয়ে বংশী চাকরটাকে ডেকে চায়ের জল চড়াতে বললাম। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে খাটের উপর বসেছি, এমন সময় আমাদের বাড়ীর বাইরের একজন বরকন্দাজ দরজার কাছে এসে আমাকে সেলাম দিয়ে বললে "হুজুর, মহল থেকে একজন লোক এসেছে। বিশেষ জরুরী কাজ, আলী মিঞা বল্লেন হুজুরকে একবার বাইরে যেতে।"

"আচ্ছা, একটু পরে যাচ্ছি।" ব'লে লোকটাকে বিদায় দিলাম। তুষারবালা আমার কোঁচার খুঁট চেপে ধরে বললে "তোমাকে এখন কিছুতেই যেতে দেব না। এই যাবে আর সমস্ত সন্ধ্যাটা কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে থাকবে। এই শরীর সারা সন্ধ্যা একলা কি ক'রে থাকি বল?"

আমি বললাম "চা-টা খেয়েনি। যাব আর আসব। আজ মোটেই দেরী করব না!"

তুষারবালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "না না, তা কেন, আমার জন্য তুমি তোমার কাজ নষ্ট করবে কেন? তার চাইতে এক এক কাজ কর—বংশী চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দাও ঠাকুরপোর কাছে, আমাকে দুখানা বই দেবে বলেছিল, চেয়ে নিয়ে আসুক।"

আমি বললাম "তুমি এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছ ত?"

বললে—"বড্ড কাহিল বোধ হচ্ছে। মাথাটা ঘুরছে এখনও। দেখি, উঠি এবার—তোমার চায়ের বন্দোবস্ত করি।" এই ব'লে আস্তে আস্তে উঠে বসল।

আমি বললাম "তুমি ব্যস্ত হয়ো না। বংশীকে আমি এইখানেই চা আনতে বলেছি।"

একটু পরে বংশী কেট্‌লীতে গরম জল, দু'টা চায়ের বাটি, দুধ চিনি চা ইত্যাদি নিয়ে এসে হাজির করল। মেজেতে একখানা আসন পেতে দিয়ে তার সামনে চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখলে। তুষারবালা অতি সন্তর্পণে উঠে ধীরে ধীরে গিয়ে বসল সেই আসনের উপরে। আমিও একটা আসন নিয়ে মেজেতে তার কাছে গিয়ে বসলাম।

তুষারবালা বললে "শুধু চা খাবে? সরলাকে ডেকে দুই-একখানা লুচি করতে বলি না?"

আমি বললাম "না না, দরকার নাই। অনেক বেলায় খেয়েছি। এখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি কিছু খাবে এখন ?"

বললে "না, থাক্।"

চা খেতে লাগলাম। চা খেতে খেতে তুষারবালা জিজ্ঞাস' করলে "তুমি বুঝি চা খেয়েই বাইরে চ'লে যাবে ?"

বললাম "হ্যাঁ, এই যাব'খন একটু পরে।"

তুষারবালা বললে, "সমস্ত দিন মার খাওয়া-দাওয়া কিছু দেখা হ'ল না! হয় ত আমার উপর মনে মনে কতই না রেগে যাচ্ছেন। বংশীকে একবার ডাক না, আর একটু গরম জল নিয়ে আসুক।"

বংশী এল, তাকে গরম জল আনতে বলা হ'ল। তুষারবালা চা খেতে খেতে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তন্ময় হয়ে কি এত ভাবছ ?"

বললে, "না, কিছু না।"

বললাম, "তবুও শুনি না।"

বললে, "শরীরটা এখনও ঠিক হ'ল না, সারা সন্ধ্যাটা শুয়েই থাকতে হবে। একলা একলা কি করে কাটবে ভাবছি।"

বললাম "বংশীকে মুকুন্দর কাছে পাঠাই !"

বংশী গরম জল নিয়ে ঘরে এল।

আমি বললাম, "বংশী ! এক কাজ কর, ও-বাড়ী গিয়ে ছোটবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।"

তুষারবালা তাড়াতাড়ি বললে, "না না, ডাকবার দরকার কি।" বলিস বৌঠাকুরাণীর অসুখ করেছে, আপনি যে বই তুখানা দেবেন বলেছিলেন দিন্ !"

আমি বললাম, "আসুক না, গল্পে-সল্পে একটু অন্যমনস্ক হবে।"

বললে, "না না, হয় ত কোন কাজকর্ম আছে।"

চা খাওয়া হ'য়ে গেলে তুষারবালা বললে, "তুমি আর একটু বস, আমি চট্ ক'রে কাপড়খানা ছেড়ে চুলটা বেঁধেনি। ঘাটের উপর প'ড়ে গিয়ে কেমন যেন একটা ভয় হয়েছে আমার। ভাবি, আবার তেমনি মাথা না ঘুরে ওঠে।"

আমি বললাম, "বেশ ত নাও না।"

তুষারবালা কোন রকমে উঠে তোরঙ্গ থেকে একখানি রঙ্গিন শাড়ী যার

করলে। তারপর দেওয়ালে টাঙ্গান আর্সির সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধলে। বেঁধে বললে, "যাই, মুখটায় একটু সাবান দিয়ে আসি সমস্ত দিন কি ভাবেই আছি। আমাকে দেখতে বড্ড খারাপ লাগছে না ?"

আমি বললাম, তুমি যেমন থাক, তাতেই তোমায় ভাল দেখায়।"

"যত বাজে কথা"—ব'লে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে সেই রঙিন শাড়ীখানা পরলে। তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বললে, "চুলটা ঠিক ক'রে দাও না, তুমি যেমন পছন্দ কর।"

আমি উঠে তুষারবালার চুল কপালের উপর একটু ঢেউ খেলিয়ে ঠিক করে দিলাম। তারপর সে কপালে সিঁদুরের টিপ্ পরলে; তার খানিকটা গুঁড়া ঈষৎ ঝরে এসে পড়ল নাকের উপরে।

আমি বললাম "নাকটা মুছে ফেল, সিঁদুর পড়েছে।" একটু হেসে বললে "না থাক। জান ত ওটা স্বামীসোহাগিণীর লক্ষণ।"

এই ব'লে ক্লান্তিভরে এসে বিছানায় এলিয়ে পড়ল: মাথাখানা তুলে রাখলে হাতের উপরে। আমি যাওয়ার জন্য চটি পায়ে দিয়ে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি, অমনি তুষার বললে, "বস, আর একটু বস। ঘোরাঘুরি ক'রে মাথাটা কি রকম করছে। একটু সুস্থ হয়ে নি, তারপর যেও।"

আমি বসলাম। কিন্তু কথাবার্তা আর বিশেষ কিছু জমল না। বোধ হয় সমস্ত দিন ঐ ভাবে থেকে থেকে আমার মনটা তখন একটু বাইরে বেরুবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তুষারবালাও আর বিশেষ কিছু বললে না। চোখ বুজে রইল, যেন তার শরীরে যথার্থই একটা যন্ত্রণা তাকে অভিভূত ক'রে ফেলছে। কিছুক্ষণ পরে বংশী এল।

বললে, "ছোটবাবু এখুনি আসছেন।"

আমি বললাম, "আচ্ছা আমি এখন ঘুরে আসি। বেশীক্ষণ দেরী করব না।"

অন্দরমহল থেকে সদরের দিকে যেতে যেতে মুকুন্দর সঙ্গে দেখা হ'ল।

মুকুন্দ ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "বৌঠানের কি হয়েছে ?"

বললাম, "বিশেষ কিছু নয়। সকালবেলা চান করতে গিয়ে ঘাটে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল। তুই যা, শোবার ঘরে শুয়ে আছে, একটু গল্প-সল্প করগে। আমি বাইরে একটু কাজ সেরে আসি।"

মুকুন্দ ভিতরের দিকে চলে গেল।

কাজকর্ম সারতে আমার বেশ খানিকক্ষণ সময় গেল। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে পুকুরের ধারে দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল। দাদা তখন সন্ধ্যা স্নান সেরে উঠে আসছেন। তিনি কি শীত, কি গ্রীষ্ম বার মাসই তিনবেলা স্নান করতেন। দাদা জিজ্ঞাসা করলেন "সুশন! বৌমা এ বেলা ভাল আছেন ত?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

ভাল যে ছিলেন সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই তুষারকে ছেড়ে এসে আমি তার জন্য কোন রকম উদ্বেগ বা চিন্তা অনুভব করিনি!

দাদা এক প্রস্তাব ক'রে বসলেন। বললেন, "দেখ সুশন, মার বড্ড কাশী যাওয়ার সখ হয়েছে। আজ বিকেল বেলা আমাকে বলছিলেন। এক কাজ করিনা, মাকে নিয়ে আমি দিন কতক কাশী থেকে আসি।"

কথাটা শুনে আমি বোধ হয় একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। মার যে এ সংসারে শান্তি ছিল না তা আমি জানতাম। তবুও ভিতরে ভিতরে যে এতখানি হ'য়ে উঠেছিল, মা আমাদের সংসার ত্যাগ ক'রে কাশীবাসী হ'তে চাইছেন এতটা বুঝতে পারিনি। বুকে একটা ব্যথা লাগল। হঠাৎ কি জবাব দেব খুঁজে পেলাম না। বললাম, "আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে এখন। তুমি এখন এই শীতে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগিও না।

দাদা আর কিছু না ব'লে ভিতরে চলে গেলেন। আমিও প্রাণের ভিতর কেমন যেন একটু ব্যথা বয়ে নিয়ে ভিতরের দিকে চলতে লাগলাম। উপরের বারান্দায় এসে দেখি তুষারবালার ঘরের সামনে দরজার পাশে হ্যারিকেনটা কমান রয়েছে। ঘরের ভিতর হ'তে গড়িয়ে-পড়া তুষারবালার চিরপরিচিত উচ্চ হাস্য কানে এল। হঠাৎ কি ভেবে আমি ঘরে না গিয়ে মার সন্ধানে নীচে গেলাম।

মুকুন্দর সঙ্গে তুষারবালার সম্পর্ক ক্রমেই মধুর হ'তে মধুরতর হ'য়ে উঠছিল —আমার বড় ভাল লাগত। বিবাহের পরে প্রথম যেদিন মুকুন্দর সঙ্গে তুষারবালার পরিচয় হ'ল, মুকুন্দ নানান রকম মিষ্টি কথায় এমন করে নিজেকে তুষারবালার কাছে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ফেলল যে, আমি অবাক হয়েছিলাম। মুকুন্দটা ঢং কম জানে না ত! তুষারবালা প্রথমে কিছুতেই কথা কইবে না। মুকুন্দ মেজের একটা আসন টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে, "এই বসলাম বৌঠান্! কথা যতক্ষণ না কইবে, এখান থেকে উঠবও না, জলস্পর্শও ক'রব না। এ

দেওরটির সঙ্গে পেরে উঠা খুব সহজ হবে না বৌঠান্! আপনার ক'য়ে নিতেই হবে একে!"

এইরকম ধরণের নানান রকম কথার মধ্যে তুষারবালাকে কথা কইয়ে নিজের গান শুনিয়ে প্রথম দিনই একেবারে জমিয়ে দিয়ে গেল তারপর থেকে প্রথম প্রথম প্রায় রোজই আসত এবং নানান রকম ঠাট্টা তামাসা রসিকতার মধ্য দিয়ে তুষারবালার সঙ্গে পরিচয়টা বিশেষ রকম মধুর ক'রে তুলল। লক্ষ্য করেছিলাম মুকুন্দকে তুষারবালার শুধু যে ভাল লাগত তা নয়, তার প্রতি একটা আন্তরিক টানের সৃষ্টি হয়েছিল। কতদিন আমাকে বলেছে "মুকুন্দঠাকুরপোর মত দেওর পাওয়া অনেক জন্মের পুণ্যের ফল। কি মিষ্টি ধরণ-ধারণ কথাবার্তার। আমার ছোট ভাই নেই, মুকুন্দঠাকুরপো সে অভাব পূরণ করল।"

শুনে আমার বড় ভাল লাগত। মুকুন্দকে আমিও ত চিরকাল স্নেহ ক'রে এসেছি। লেখাপড়ায় মুকুন্দ আমার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পর পর দু'বার যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল ক'রে বসল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেও মুকুন্দর যাতে রীতিমত শিক্ষালাভ হয়, আমি তার বিশেষ চেষ্টা করে-ছিলাম। ছুটীতে ছুটীতে নানান রকম বই কিনে রুটিন ক'রে মুকুন্দকে পড়াবার ব্যবস্থা করতাম। ভাল ভাল ইংরাজী উপন্যাস পড়ে তর্জমা ক'রে মুকুন্দকে শোনাতে আমার ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু ফলে বিশেষ কিছু যে হয়েছিল এমন কথা বলতে পারি না।

মুকুন্দর বুদ্ধিটা কিন্তু লেখাপড়ায় যতটা খেলুক বা নাই খেলুক, জমিদারীর কাজকর্মে বেশ কাজে লাগতে লাগল। পর পর দুই মাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ার দরুণ, তার বাপ যখন তাকে লেখাপড়া ছাড়িয়ে জমিদারীর কাজকর্ম শেখাতে লাগলেন, তখন অল্পদিনের মধ্যেই জমিদারীর কাজকর্মে সে বেশ পাকা হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে বার-দুই জমিদারীর সরিকানা ব্যাপারে আলী মিঞার মত তোখড় লোকের সঙ্গে সমান টক্কর দিতে সে একটুও পিছপাও হয়নি; এবং নেহাৎ আমি মধ্যে না থাকলে, মুকুন্দর সঙ্গে আলী মিঞার বিরোধটা বেশ গুরুতর রকমেই হয়ে উঠত। আলী মিঞা অনেক দিন কথায় কথায় আমাকে বলেছেন-"বাবু ও-বাড়ীর ছোট বাবুকে মোটেই বিশ্বাস ক'রবেন না। দরকার হলে আপনাকে পর্যন্ত ছোবল মারতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করবেন না।

আমি কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতাম। কথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হ'ত। ভাবতাম—আলী মিঞা মুকুন্দকে ভুল বিচার করছেন।

বিশেষতঃ তুষারের সঙ্গে মুকুন্দর সম্পর্কটা যতই মধুর হয়ে নিবিড় হয়ে উঠতে লাগল, ততই যেন আমার প্রাণে-প্রাণে মুকুন্দর সঙ্গে স্নেহের বন্ধনটা আরও দৃঢ় হ'ল। ভাবতাম মুকুন্দ সত্যিই যেন আমার মায়ের পেটের ছোট ভাই। তার উপর যেন সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে নির্ভর করা চলে। ছোট বেলা থেকেই সে আমার অনুগত এবং আজও পর্যন্ত সে কোন দিনই আমার সম্মুখে আমার এতটুকুও অমর্যাদা করেনি। সেই জন্যই বোধ হয় আলী মিঞার কথাটা কোনোদিক দিয়েই আমাকে এতটুকু স্পর্শ করল না। তাই—আলী মিঞার কথাটা রাতে বিছানায় শুয়ে হাসতে হাসতে তুষারের কাছে গল্প করলে, তুষার যখন আলী মিঞার উপর রেগে গেল, তখন আমার ভালই লেগেছিল। ভেবেছিলাম অন্য দিকে যাই হোক, মুকুন্দর প্রতি মনোভাবে আমার আর তুষারের মনে সুর মিলেছে!

সে সব যাই হোক, মার সন্ধানে নীচে গিয়ে প্রথমেই খবর নিলাম ঠাকুরঘরে মা সন্ধ্যার সময়টা হয় পূজোর ঘরে, না হয় নীচের তলায় তাঁর একখানা শোবার ঘর ছিল সেইটেতে শুয়ে কাটিয়ে দিতেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে প্রথম পূজোর ঘরের দিকে গেলাম; দেখলাম ঘরে পিতলের পিলসুজের উপরে একটি তেলের প্রদীপ জ্বলছে—ঘরে কেউ নাই। সেখান থেকে মার একতলার শোবার ঘরের দিকে চললাম। ঘরে দরজার কাছে গিয়ে দেখি মা অন্ধকার ঘরে খাটের উপর চুপ ক'রে শুয়ে আছেন।

মার ঘরের দিকে এগুতে প্রাণে কেমন যেন লজ্জা বোধ হচ্ছিল। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ ভাব। কেন যে এ সঙ্কোচ কিছুই তার কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। সমস্ত দিনটা মার কোন খবরই নিইনি—তাই কি? কিন্তু কতদিন ত এমন চলে যায়, মার কোন খবরই নেওয়া হয় না। তবে? তুষারবালাকে নিয়ে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিয়েছি বলে কি? কিন্তু তাতেও ত দোষের কিছুই ছিল না। তবুও কেন যে সঙ্কোচ কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মার দরজার কাছে গিয়ে মাকে ডেকে বললাম "মা, তুমি এ সময় এ রকম চুপচাপ শুয়ে আছ কেন? শরীর খারাপ হয়েছে কি?"

মা আমার গলা শুনে খাটের উপর উঠে বসে ডাকলেন "কে, সুশন? আয়, বোস।"

আমি ঘরের মধ্যে গিয়ে খাটের উপর বসে পড়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে, মা?"

বললেন "না, এমনিই শুয়েছিলাম।"

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম। মা সহসা জিজ্ঞাসা করলেন, "বৌ ভাল আছে ত?"

আমি বললাম "হ্যাঁ, কি আর এমন হয়েছিল।"

কথার সুরের মধ্যে বোধ হয় একটু তাচ্ছিল্য ছিল। বোধ হয় ভেবেছিলাম বৌয়ের বিষয় একটু তাচ্ছিল্যের সুরে কথা কইলে মা হয় ত খুসী হবেন। কি জানি! মা সে কথার আর কোন উত্তর দিলেন না। আমি একটু পরে জিজ্ঞাসা করলাম "মা! তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে কাশী যেতে চাও?"

মা একটু হেসে বললেন, "কে বল্লে রে?"

আমি বললাম "কেন? এই ত দাদা বলছিল?"

মা বললেন, "ইচ্ছেটা তোর দাদারই বেশী। তবে আমারও কিছু অনিচ্ছে নেই।"

বললাম, "তুমি আমাদের ছেড়ে কাশীবাসী হবে?"

মা একটু চুপ ক'রে রইলেন। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি মার চোখ দু'টো সজল হ'য়ে উঠেছিল কিনা। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন "একদিন ত সকলকে ছেড়ে যেতেই হ'বে। আর কি নিয়েই বা এ সংসারে থাকব? প্রশান্তটা ত কিছুতেই আর বে-থা করলে না—তোরও ত ছেলেপুলে হ'ল না।"

বললাম, "তাই ব'লে তোমার এখন কাশীবাস করার সময় হয়নি! তোমার কাশী যাওয়া হবে না মা। নেহাত বেড়াতে যেতে চাও, আমি না হয় একবার তোমায় নিয়ে বেড়িয়ে আসব।"

মা একটু হাসলেন। হেসে বললেন "আচ্ছা, তাই হবে।"

মার সঙ্গে খানিকক্ষণ এটা ওটা সেটা দু'চারটে বাজে কথায় কাটিয়ে নিজের শোবার ঘরে ফিরে এলাম।

পথে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মুকুন্দর সঙ্গে দেখা হ'ল। সে নেমে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম "মুকুন্দ! এরই মধ্যে চললি?" মুকুন্দ বললে "হ্যাঁ শান্তদা, বড্ড রাত হ'য়ে গেছে, এখন বাড়ী যাই। বৌঠান এখন ভালই আছেন। পারি ত কাল আবার আসব।"

মুকুন্দ চলে গেল। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরে এসে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

মনটা কেন জানিনা কেমন যেন ভারি বোধ হচ্ছিল। মার সঙ্গে কথাবার্তা

হওয়ার পর থেকেই মনের হালকা ভাবটা কেটে গেছে। কোথায় যেন প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা পাচ্ছিলাম। মা ত কথাবার্তার মধ্যে কোন রকম অশান্তির সৃষ্টি করেননি বরং বেশ সহজ সরল ভাবেই কথাবার্তা করেছেন আমার সঙ্গে। কাশীও ত যাবেন না বললেন। তবুও মার ঘর থেকে বেরিয়েই প্রাণটা কেমন যেন ভারী হ'য়ে উঠতে লাগল। যেন জীবনের কোথায় কোন একটা দিক ধ্বসে ভেঙ্গে যাওয়ার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে ঠেকান দায়।

তুষারবালার ঘরে যখন গিয়ে ঢুকলাম, তখন মনটাকে নানান রকম এলোমেলো চিন্তায় পেয়ে বসেছে। কোন কিছুই যেন মন আঁকড়ে ধরতে পারছে না—এমনি ক্লান্ত শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। যেন কিছুতেই তার উৎসাহ নাই।

তুষারবালা বললে, "বেশ লোক ত! এতক্ষণে আসবার সময় হ'ল?" একটু আবদারের সুরেই বললে "কেন এত দেরী করলে?"

অন্যমনস্ক ভাবে বললাম, "কাজের ঝঞ্ঝাট কি কম।"

তুষারবালা বললে, "কাজের ঝঞ্ঝাট তোমার অনেকক্ষণ মিটে গেছে। দুয়ার পর্যন্ত এসে ফিরে গেলে কেন?"

"মার সঙ্গে একটু দেখা করে এলাম।"

বললে, "বেশ, আমি উৎসুক হয়ে আছি—এই আসে, এই আসে—যাও, তুমি ভারী নিষ্ঠুর।"

এই বলে একটু অভিমানের ভঙ্গিতে অন্যদিকে মুখ ফেরালে। তুষারবালার অভিমানটুকু আমি যেন লক্ষ্য করেও করলাম না। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে আর্সির সামনে দাঁড়িয়ে চিরুণী দিয়ে চুলই আঁচড়াতে লাগলাম। তুষারবালা একটু চুপ ক'রে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে, "কী এত ভাবছ? কাছে এস না।"

আমি "হাঁ যাই"—ব'লে তুষারবালার পাশে খাটের উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লাম। নেহাত কিছু বলা দরকার ব'লে বোধ হয় জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি ত এখন বেশ ভালই আছ, না?"

তুষারবালা বললে, "কি জানি।" ব'লেই খাটের উপর বসে সেও কি যেন ভাবতে লাগল।

শুয়ে পড়ে আমার মন অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যেন এলিয়ে পড়ল। ভাবলাম সকাল থেকে কত কাণ্ডই না হ'ল আজ। এখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচি।

খেয়ে-দেয়ে রাত্রে আলো নিভিয়ে যখন তুষারবালার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, তুষারবালা কেমন একটু অতিরিক্ত আমার বুকের মধ্যে এগিয়ে এল।

আস্তে আস্তে বললে "ওগো, যদি রাগ না কর ত একটা কথা বলি।"

এ সোজা কথাটায় আমি যেন কেমন চমকে উঠলাম। বুকটা একটা অজানা ভয়ে কি রকম যেন কেঁপে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলাম "কি, কি কথা?"

তুষারবালা তেমনি শান্তভাবেই বললে, "রাগ করবে না বল?"

আমি ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কথা বলই না?"

তুষারবালা আস্তে আস্তে বললে, "ঠাকুরপো অতি জঘন্য লোক। আগে কি জানতাম!"

জিজ্ঞাসা করলাম "কেন? কেন?"

বললে "আমার প্রতি ওর ভাব-সাব মোটেই ভাল নয়। ছিঃ, ভাবতেও ঘেন্না করে। আমি আর ওর সঙ্গে মিশব না।

আমার বুকের উপর দিয়ে সহসা যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল।

## চার

এখন ভাবি, জীবনটাকে আমি কোনও দিনই চিনতে পারিনি। সেই সব দিনের কথা ভাবলে, এখন খালি মনে হয়—জীবনটার পরিচয় যদি একটু নিবিড়-ভাবে পেতাম, তাহ'লে হয় ত জীবনের সোজা পথ খুঁজে নিতে পারতাম। জীবনটার দিকে চেয়ে চেয়ে তারই নেশায় চোখ দু'টো আমার হয়ে উঠেছিল ঘোলাটে। আর ঠিকরূপে তাকে দেখলামই না কখনও। বড্ড বেশী ভাল লেগেছিল জীবনটাকে, তাই বড্ড বেশী আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম। তাই পদে-পদে ঘটল বাধা, পদে-পদে লাগল বিরোধ। জীবনটা যে প্রকাণ্ড একটা মায়া—ধরা দেয় না, খালি জড়ায়, একি ছাই একবারও কোনও দিন ভেবেছি। জলে তেলের মত, জীবনে ভেসে ভেসে প্রাণটাকে নির্লিপ্ত স্বতন্ত্র রাখতে পারলেই

জীবনের সঙ্গে সমান বোঝা-পড়া সহজ হয়ে ওঠে, তার গতির সঙ্গে সমান তালে চলে যাওয়া যায়, অথচ তার ভিতরের ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না—একথা যে ছাই আজকেই বুঝতে পারছি।

তুষার বললে, মুকুন্দর মনোভাব তার প্রতি ভাল নয়—সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা কাল-বৈশাখীর রুদ্র নাচন লাগল। একটা প্রচণ্ড লড়াইয়ের জন্য প্রাণ-মন-শরীর হ'রে উঠল উন্মুখ। সকল দিক দিয়ে জীবনটাকে, আষ্টে-পৃষ্ঠে ললাটে, এমন করেই বাঁধতে চেয়েছিলাম, যে কোথাও কোনও দিকে এতটুকু ফস্কে গেলে , একটা বিরাট পরাজয়ের গ্লানিতে অস্থির হ'য়ে উঠতাম। জীবনটাকে বাঁধা, সে যে অসম্ভব—এ কথা ত একবারও মনে হয়নি। আমি আজ এসেছি, কাল চলে যাব। জীবনটা ত চিরদিনই আছে, চিরকালই রইল। তাকে কি বাঁধা যায়। বন্ধন ত নয়, মুক্তির মধ্য দিয়েই অনন্ত শান্তি—এ কথা ত আজই বুঝতে পারছি। সেদিন ত একবারও ভাবিনি জীবন-রহস্যের কোনও অজানা লীলায় যদি মুকুন্দর মনে বিকৃতিরই সৃষ্টি হ'য়ে থাকে—লড়াই ক'রে ত তাকে পরাস্ত করা যাবে না। লড়াই করতে গেলে সেই বিকৃতির ঘূর্ণিপাকে আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলব।

জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ আর আমার কিছুই নেই—তাই বোধ হয় এসব কথা অতি সহজ হয়ে উঠেছে আমার প্রাণে। সেদিন ত সবই ছিল। জীবন-যুদ্ধে একটি একটি ক'রে সবই হারালাম। ফাঁকা—আজ চারিদিকে একটা বিরাট ফাঁকা। চোখ চেয়ে দেখবার ত কিছুই নেই! আকুল হ'য়ে নিজের দিকেই ফিরে ফিরে চাই। তাই কি পেলাম মুক্তি?

* * * *

তুষারবালার সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল—প্রাণখানা তখন একটা প্রচণ্ড ক্রোধে ভরা। রাগটা ষোল আনা মুকুন্দর উপর। এতবড় অপমান সে আমাকে করলে। আমারই স্ত্রীর প্রতি কুৎসিত তার মনোভাব! আমার এত বড় বিশ্বাসের এতটুকু মূল্য সে দিলে না—এত বড় বিশ্বাসঘাতক। সাহসও ত কম নয়। সেই মুকুন্দ, আমার চিরকালের অনুগত মুকুন্দ, তার আজ এত বড় স্পর্ধা! সমস্ত শরীর যেন আমার রাগে জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল।

পরদিন সকাল বেলায় তুষারবালার ব্যবহার প্রত্যেক পদে-পদে আমার প্রতি

হয়ে উঠল অত্যন্ত মধুর। আমার মনের প্রত্যেক প্রবৃত্তিগুলিকে শ্রদ্ধায় মাথায় তুলে নেওয়ার জন্য সে যেন আকুল হয়ে উঠেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়ার আগে, লেপের নীচে শুয়ে শুয়েই বললে, "আমার একটা কথা রাখবে ?"

বললাম "কি ?"

বললে " আজ এক কাজ করা যাক, বিকেল বেলা একটা নৌকা ঠিক কর,—চল আমরা দু'জনে নদীতে খানিকটা বেড়িয়ে আসি।"

বললাম, "আজ আমার অনেক কাজ—আজ হবে না।"

বললে "তোমার কাজকর্ম শেষ হলে ? আজ ত চাঁদের আলো আছে।"

বললাম "বড্ড শীত, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

তাড়াতাড়ি বললে, "হ্যাঁ—তা বটে। তবে থাক। তোমার সঙ্গে নিরিবিলি বেড়াতে কেমন যেন ইচ্ছে করছে। অনেকদিন ত ওরকম বেড়ান হয়নি।"

তুষারবালা একটু পরেই উঠে গেল। আমি খানিকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইলাম। মনের মধ্যে তখন আমার আকাশ-পাতাল চিন্তা। এত বড় অপমান সইব ? কখনই না। এ অপমান নীরবে সহ্য করা মনের একটা প্রকাণ্ড দুর্বলতা—মোটেই পুরুষোচিত নয়। আমি যদি পুরুষ হই মুকুন্দকে উচিত শিক্ষা দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু কি করা যায় ? একটা চাবুক হাতে ক'রে, মুকুন্দর বাড়ীতে গিয়ে দশজনের মধ্যে তাকে চাবুক মারাই বোধ হয় তার উচিত শাস্তি। কিন্তু কেমন যেন একথায় মন সায় দিল না। ব্যাপারটার বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যেই যেন তার সবটুকু শেষ হয়ে যায়—ভিতরের ক্রিয়ার লঘুত্বই প্রকাশ পায় আর কিছু নয়। কেমন যেন মনে হ'ল মোটের উপর ব্যাপারটা কুৎসিত—আমার মত শিক্ষিত লোকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত—অথচ তাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। কি করা যায় ? ভাবলাম,—না অসংযমের পরিচয় দিয়ে, মুকুন্দর এই কুৎসিত মনোভাবের প্রতি আমার প্রাণের তীব্র ঘৃণার অমর্যাদা, করব না। শান্ত সংযত ভাবে মুকুন্দকে জানিয়ে দেব তার মনের এই কুৎসিত দৈন্যকে সম্পূর্ণ অবহেলা করবার শক্তি আমার আছে। বলে দেব সে যেন আর কখনও আমাদের বাড়ীতে না আসে—তুষারবালা তার মত ঘৃণ্য লোকের মুখও দেখতে চায় না। তারপর, এ জীবনে আর তার সঙ্গে কথা কইব না, তার মুখ পর্যন্ত দেখব না।

মোটের উপর এই রকম ধরণের একটা মীমাংসায় মন সায় দিল।

ঘাটের পাড়ে গিয়ে মুখ-হাত ধুতে ধুতে ক্রমে একটা যেন তৃপ্তি, এমন কি একটা যেন আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম প্রাণে। গায়ে এসে শীতকালের সকাল বেলার রোদটুকু লাগছিল আর আমার মনে হচ্ছিল—জীবনের কোথায় যেন কি একটা অকূলে ভেসে যাওয়ায় আজ কূল পেয়েছি। মনে হ'ল ভগবান যা করেন, ভালর জন্যই করেন। আজ যেন তুষারবালাকে ঠিক চিনেছি। এই এত বড় আঘাত না পেলে তুষারবালাকে ঠিক চিনতেই পারতাম না কোনদিন। ভগবান "ঘা" দিয়ে চিনিয়ে দিলেন—তুষারবালা আসলে খাঁটী সোণা। তার বাহিরটা সময়-সময় যতই রুক্ষ হ'য়ে প্রকাশ পাক না কেন, তার ভিতরের সত্যটুকু অচল, অটল, দৃঢ়। যে মুকুন্দকে তুষার এতখানি স্নেহ করত, সত্যের পথ থেকে সে যেমন এতটুকু বিচলিত হ'ল—অমনি তুষার তাকে ক্ষমা করলে না,—দারুণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। কতখানি দৃঢ়তা, কতখানি তেজ; কতখানি নিষ্ঠা, প্রকাশ পেয়েছে কাল রাত্রে তুষারবালার ঐ দুটো চারটে কথায়। এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে আমার সহিত তুষারের সত্যিকারের বন্ধন যেন দৃঢ় হ'ল—চিরদিনের জন্য। মুকুন্দ! অতি তুচ্ছ সে—নিমিত্ত মাত্র। দুটো চারটে কথায় তাকে জীবন থেকে দূর ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দেব—কি এমন কঠিন কাজ।

নীচের বারান্দায় একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপর বসে চায়ের জন্য অপেক্ষা করছি এমন সময় তুষারবালা এক হাতে পেয়ালায় চা ও আর এক হাতে একটি রেকাবীতে কিছু হালুয়া নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। তুষারবালার দিকে চেয়ে যেন নতুন ক'রে মুগ্ধ হ'লাম আজ। সদ্য স্নান ক'রে একখানি কাল চওড়া লতা পেড়ে মিহি-সাড়ী পরিধান ক'রে মাথার উপর ঘোমটা দিয়েছে তুলে। ঘোমটার ডান দিক দিয়ে, একটু হেলিয়ে একরাশ চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠের উপরে। কপালে পরেছে সিঁদুরের টিপ্। মুখের মধ্যে একগাল পানে ঠোঁট দু'টি রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বললে "এত দেরী কেন? আমি কখন থেকে চায়ের জল ফোটাচ্ছি।"

বললাম "তোমার চা খাওয়া হ'য়ে গেছে বুঝি?"

বললে "বেশ ত কথা। তুমি খেলে না, আমি আগে থাকতে খেয়ে বসে থাকব? সেই রকম ভাব বুঝি আমাকে?"

বললাম "না—না। মুখে পান রয়েছে তাই ভাবলাম তোমার চা খাওয়া হ'য়ে গেছে বুঝি।"

তুষার একটু হেসে বললে "ওঃ সেইজন্যে? জান ত—"

এই ব'লে একটু হেসে ঈষৎ মাথা তুলিয়ে চাপা গলায় সুর ক'রে বললে,

"নাইয়া উঠ্যা যেবা নারী গালে ছায় পান,
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমারই সমান।"

তুষারের সমস্ত ভাবে ভঙ্গিতে একটা কথাই প্রকাশ হচ্ছিল—যেন কিছুই ঘটে নাই। জীবন যেন চলেছে সহজ সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে, কোথাও তাতে যেন এতটুকু বাধা নাই।

বললাম "তা হ'লে ত স্বয়ং লক্ষ্মী হ'য়ে উঠেছ আজ সকাল বেলা। তা লক্ষ্মীদেবী! একটা বুদ্ধি দাও ত।"

বললে "আমি তোমাকে বুদ্ধি দেব! তবেই হয়েছে! লক্ষ্মী কেন স্বয়ং ভগবতী হ'লেও সে শক্তি আমার কখনও হবে না।"

বললাম "না—না। তুমিই ঠিক বলতে পারবে। আমি কিছু ঠিকই করতে পারছি না!"

বললে "যাই হোক—ব্যাপারটা কি শুনি?"

বললাম "কাল রাত্রে যা বলেছিলে না—সে বিষয় কি করি বল ত? মুকুন্দকে কিছু বলা দরকার না?"

সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর দিলে "সে আমি কি জানি। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি তোমাকে জানিয়ে দিয়েই খালাস।"

এই ব'লে চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই বললাম "যাচ্ছ কোথায় একটু বস না। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করি।"

বললে "না—না, এখন বসতে পারব না। সকাল থেকে মার শরীর বড্ড খারাপ হয়েছে। শুয়ে আছেন ওঠেননি।"

বললাম "সে কি?"

বললে "মার বিষয় ত কোনও খবর রাখবে না। দিন দিন যে মার শরীর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে তার কি কোনও ব্যবস্থা করছ?"

মার প্রতি তুষারবালার এই রকম দরদমাখান কথা আগেও দু-একবার শুনেছি। কিন্তু কেমন যেন কোন দিনই বিশ্বাস হয়নি যে মার প্রতি তুষারবালার এতটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা বা ভালবাসা আছে। যখনই শুনেছি তখনই ভেবেছি ওসব একান্ত মুখেরই কথা। পাঁচজনার মধ্যে, কি শরীরের দিক দিয়ে, কি মনে দিক দিয়ে নিজেকে জাহির করার প্রচেষ্টা তুষারবালার যথেষ্ট ছিল—এসব কথা তারই অভিব্যক্তি মাত্র।

কিন্তু আজ যেন কেমন বিশ্বাস হ'ল। কেমন যেন মনে হ'ল—ভিতরে ভিতরে তুষারবালার মনটা সকলের জন্য দরদে ভরা। বাইরেটা রুক্ষ, তাই সব সময় ঠিক ধরা যায় না। ক্রমেই খুশীতে ভরে উঠতে লাগল প্রাণ।

বললাম "সেকি? আজ এখনও ওঠেননি?"

তুষার বললে "আমি কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি। ক্রমেই ওঁর শরীর যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে। ওঁকে একজন ভাল ডাক্তার দেখান দরকার।"

বললাম "ওষুধ-পত্র ত খেতেই চান না। নিয়ম মত ক'দিন যদু কবরেজের ওষুধ খেলেও ত হয়।"

বললে "যদু কবরেজের ওষুধে ছাই হবে। আমি বলি এক কাজ কর, তুমি সকাল সকাল স্নান ক'রে দুটি খেয়ে নিয়ে সদরে চ'লে যাও। দেখে-শুনে একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে এস।"

বললাম "দেখি মার সঙ্গে কথা বলে যা হয় একটা করতেই হ'বে।"

এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বললে "মা হয়ত বারণ করবেন, সে কথা শুনলে ত চলবে না।"

বললাম "তা অবশ্য একজন ভাল ডাক্তার দেখানর কথা তুমি মন্দ বলনি।"

বললে "আমার কথা যদি শোন, তুমি নিজে গিয়েই ডাক্তার নিয়ে এস। তুমি যেমন বুঝে-সুঝে ভাল ডাক্তার নিয়ে আসতে পারবে আর কেউ তা পারবে না। আর মার জন্য করা—যে করবে তারই মঙ্গল।"

বললাম "কিন্তু আজকে আমার পক্ষে যাওয়া ত সম্ভব হ'বে না। আজ সেরেস্তায় বড্ড কাজ।"

একটু উত্তেজিত সুরে বললে "মার চেয়ে কি অন্য কোনও কাজ বড় হ'তে পারে? দেরী করা একেবারেই উচিত নয়। আজই যাওয়া উচিত। দিন দিন ওর যে রকম শরীর হ'য়ে যাচ্ছে হঠাৎ একটা ভাল মন্দ কিছু হ'লে আপশোষের সীমা থাকবে না। ওর শরীরকে আমার ত আর এতটুকুও বিশ্বাস হয় না।"

* * *

মার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাইরে যেতে যেতে মনে হ'ল তুষার যতটা ভয় পেয়েছে, অতটা ভয় পাওয়ার কিছুই হয়নি। তবুও ঠিক করলাম দু'চার দিনের মধ্যেই সদর থেকে একজন ভাল ডাক্তার আনিয়ে মার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

বৈঠকখানা বাড়ীতে দোতলার উপরে বাবার যে ঘরে সেরেস্তা ছিল, আমি

এখন সেই ঘরে বসেই জমিদারীর কাজকর্ম দেখি। ঘরে সরঞ্জাম বিশেষ কিছু ছিল না। আমার বসবার চেয়ারের সামনে একখানা টেবিলের অপর দিকে একখানা বেঞ্চি পাতা ছিল, এবং একপাশে ছিল একখানা তক্তাপোষ এবং তার উপর একখানি সাদা-চাদর বিছানো থাকত। ঘরের এককোণে একটা তালা দেওয়া আলমারী ছিল—জরুরী কাগজপত্র থাকত এবং দেওয়ালের গায়ে লাগান আর একপাশে ছিল একটা লোহার-সিন্দুক।

এই ঘরে গিয়ে দেখি আলী মিঞা তক্তাপোষের উপর বসে নিবিষ্ট মনে কি একখানা চিঠি পড়ছেন। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার ক'রে বললেন "পীরতলা থেকে একটি লোক এসেছে—একখানা জরুরী চিঠি নিয়ে।"

আমি গিয়ে আমার চেয়ারে বসলাম। আলী মিঞা আমারই টেবিলের অপর দিকে বেঞ্চির উপর বসে হাতের চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "চিঠিখানা পড়ে দেখুন বাবু!—কি সব ব্যাপার।"

চিঠিখানা ছোট ছোট জড়ান বাংলা হাতে লেখা—পুরো চার-পৃষ্ঠা। নীচে নাম সই র'য়েছে "শ্রীভৈরব চরণ ঘোষাল।"

জিজ্ঞাসা করলাম "এই ভৈরব ঘোষাল লোকটি কে?"

আলী মিঞা বললেন "কেন আপনি ত চেনেন বাবু। আমাদের পীরতলা মহলের গোমস্তা।"

চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়লাম। আলী মিঞাকে জিজ্ঞাসা করলাম "ভৈরব ঘোষালের এ-সব কথা কি সত্য?"

আলী মিঞা বললেন "সে বিষয় আমার কোনই সন্দেহ নাই; পীরতলা আমাদের ভাল মহল। আমি যতদূর জানি সেখানকার প্রজারাও খারাপ নয়। অথচ নবীনমুন্সী পীরতলার নায়েবী নেওয়ার পর থেকেই পীরতলার আদায় তহশীল ক্রমেই শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে। গত বৎসর পীরতলা থেকে ত বিশেষ কিছুই আমদানী হয়নি।"

আমি বললাম "আপনি নায়েবের কাছে কৈফিয়ৎ চাননি? আদায় তহশীলের হিসাব পাঠায়নি সে?"

আলী মিঞা বললেন "হিসেব গত দু'বছর থেকে সে দেয়নি। পঞ্চাশবার কৈফিয়ৎ চেয়েছি। ঐ এক কথা, দেশের অবস্থা খারাপ, ধান চালের অবস্থা খারাপ—প্রজারা খাজনা দেয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ দেখুন এই চিঠি।"

আমি বললাম "তা ভৈরব ঘোষালের কথা যে সত্য, তারই বা প্রমাণ কি?

হয়ত নায়েব নবীন মুন্সীর সঙ্গে কোনও বিবাদের দরুণ সে এই রকম চিঠি লিখেছে।"

আলী মিঞা বললেন "না বাবু। ভৈরব ঘোষাল বুড়ো-মানুষ অতি সজ্জন আর সে ত সেধে এ চিঠি লেখেনি। নবীন মুন্সীর কাজে কর্মে আমার মনে অনেক দিন থেকে সন্দেহ এসেছিল। তাই আমি চুপি চুপি মহলের ঠিক অবস্থা জানাবার জন্য ভৈরব ঘোষালকে চিঠি দি। বিশেষ করে অভয় দিয়েছিলাম যে সত্য অবস্থা জানালে তার ভয়ের কোনও কারণ থাকবে না। তাই সে আমাকে এই চিঠি লিখেছে।

একটু বিবেচনা ক'রে বললাম "তা বটে। জানে ত তারা সবাই এ-বছর মাঘ-মাসেই আমার মহল দেখতে বেরুবার কথা। এসব কথা মিথ্যে হ'লে যে হাতে হাতে ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু নবীন মুন্সীর ভরসা ত কম নয়। দু'দিন বাদেই আমি গিয়ে হাজির হব। তখন—"

আলী মিঞা বললেন "আপনি যাবেন বলেই অবস্থা এতটা জটিল হ'য়ে উঠেছে। প্রজাদের কাছ থেকে টাকাকড়ি ত বরাবর রীতিমত আদায় করে খেয়ে বসে আছে। এখন আপনি স্বয়ং গেলে, কিছু টাকার বুঝ আপনাকে দিতে পারলে, অবস্থাটা কতকটা আপনার সামনে সামলে নিতে পারবে। এই ভাবছে।"

আমি বললাম "তাই প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায়ের জন্য, তাদের উপর এই সব অমানুষিক অত্যাচার হ'চ্ছে।"

আলী মিঞা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে নতমুখে মাটীর দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন "এ জিনিষ এখুনই বন্ধ করা দরকার। নইলে পীরতলা মহলটা চিরদিনের জন্য মাটী হ'য়ে যাবে। ভৈরব ঘোষাল ত লিখছে—প্রজারা "জোট" করবে মনস্থ ক'রেছে! নায়েবের নামে থানায়ও দু-একটা ডায়রী হ'য়েছে, তবে দারোগাকে কিছু টাকা খাইয়ে হাত ক'রে রেখেছে বলে বিশেষ কিছুই হয়নি।"

আমি বললাম "তা আপনার মতে এখন কি করা উচিত?"

আলী মিঞা তৎক্ষণাৎ বললেন "আমার মতে? আমার মতে আপনার স্বয়ং এখনই একবার পীরতলা মহলে যাওয়া উচিত। যদি কাল রওনা হ'তে পারেন ত পরশু না করাই ভাল। হঠাৎ চলে যান, সেখানে কোন খবর না দিয়ে। সেখানে গিয়ে ভৈরব ঘোষালের সাহায্যে গ্রামের মাতব্বর প্রজাদের ডাকিয়ে পাঠান। ডাকিয়ে তা'দের সব জিজ্ঞাসা করুন। ব্যাপারটার তদন্ত করুন তারপর যদি

ব্যাপারটা সত্য হয়, সকলের সামনে নবীন মুন্সীকে বরখাস্ত করে আপাততঃ ভৈরব ঘোষালকে নায়েবী দিয়ে আসুন। প্রজাদেরও জানিয়ে দিয়ে আসুন—এ বছর তাদের আর একটি পয়সাও দিতে হবে না। তা'হলেই দেখবেন প্রজাদের "জোট" করা ত দূরের কথা, তারা আপনার গোলাম হ'য়ে পড়বে। ঘটী-বাটী বিক্রী করেও আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে তারা পিছপাও হ'বে না। আর ভৈরব ঘোষাল! তাকে একটু অভয় দিলেই সে আপনার জন্য প্রাণ দেবে। সে নেমকহারাম নয়।"

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। আলী মিঞার কথার মধ্যে যে যুক্তির অভাব ছিল না, সেটা বোঝা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হয়নি। কিন্তু কালই মফঃস্বল রওনা হওয়ার পক্ষে আমার মন প্রস্তুত ছিল না। তাই ভাবছিলাম —আমি না গিয়ে আর কোনও দিক দিয়ে কোনও উপায় করা যায় কিনা! অথচ কিছু করবার আগে একটা তদন্ত করা দরকার। সেখানে না গিয়ে তদন্তই বা হয় কি করে।

বললাম "আমাকে ত এই পৌষ-মাসটা গেলেই সব মহল দেখবার জন্য মফস্বল বেরুতেই হ'বে। এতদিনই গেছে, এই ক'টা দিন দেরী করলে কি বিশেষ ক্ষতি হ'বে?"

আলী মিঞা বললেন "বাবু। প্রজারা একবার ক্ষেপে গেলে আর ফেরান যাবে না। প্রজারা যদি একবার খাজনা দেবনা বলে "জোট" বাঁধে—তখন মহলটাই একেবারে উচ্ছন্নে যাবে। আমাদের সোনার-মহল পীরতলা।"

বললাম "আচ্ছা, আপাততঃ আপনি গেলে হয় না?"

বললেন "না। অন্য কোনও মহল হ'লে আমি অনায়াসে যেতে পারতাম। আপনি পরে গেলেও হ'ত। কিন্তু এখানে নয়।"

জিজ্ঞাসা করলাম "কেন?"

বললেন "নবীন মুন্সী যে ও বাড়ীর ছোটবাবুর সম্পর্কে কি রকম শালা হন। তাই'ত তার এতখানি সাহস। অন্য কেউ হ'লে ত আমি কোন কালেই—"

আলীমিঞা হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন, না বাকী কথা আমার কাণে গেল না—ঠিক মনে নাই। মনে আছে কথাটা শোনা মাত্র আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন তড়িৎ খেলে গেল। নবীন মুন্সী মুকুন্দর শালা—ছ'-আনি অংশের বড়-কুটুম্ব—তাইতেই তার এতখানি আস্পর্দ্ধা—।

ঠিক করে ফেললাম কালই পীরতলা রওনা হ'ব। পৌষ-মাস বলে মা আপত্তি করবেন? কিন্তু পৌষ-মাসের মধ্যেই ফিরে এলে ত পৌষ-মাসে রওনা হ'তে কোনও বাধা নাই। যাওয়া-আসা, এবং সেখানে দু' একদিন থাকা—মোটের উপর পাঁচ-ছ' দিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

দুপুরবেলা স্নান ক'রে খেতে বসে মাকে পীরতলা যাওয়ার কথা বলাতে মা পৌষ মাস বলে কোনও আপত্তি করলেন না। অবশ্য মাকে বলেছিলাম পাঁচ-ছ দিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

খেয়ে উঠে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়লাম। তুষার তখনও খেয়ে আসেনি। শুধু মুকুন্দ নয়, মুকুন্দর শ্যালকেরও যে কতখানি স্পর্দ্ধা হ'য়েছে তুষার এলে তাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বুঝিয়ে দেওয়াই উচিত। এবং সমস্ত ব্যাপারটা তদন্তের পর যদি সত্য হয়, নায়েব নবীন মুন্সীকে দশজনার মধ্যে অপদস্থ করে, মুকুন্দকে কিছু না জানিয়ে, তাকে বরখাস্ত করতেও আমি এতটুকু দ্বিধা করব না—এ সমস্তই তুষারকে খুলে বলবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তুষার ঘরে এল। রূপার পানের ডিবায় এক ডিবা পান হাতে নিয়ে। এসে খাটের উপর বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে "হাঁ করে চিত হয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল কি ভাবছ?"

আমি তাকে ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম, চুপ ক'রে সমস্ত কথা শুনে তুষার বললে "ঠাকুরপোকে না ব'লে তার আত্মীয়কে অমন করে বরখাস্ত করলে ঠাকুরপো রেগে যাবেন না?"

উত্তেজিত হ'য়ে বললাম "আমার বয়েই গেল। তাই'ত আমি চাই। সে বুঝুক প্রয়োজন হ'লে তাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করবার শক্তি আমার আছে।"

তুষার আবার বললে "ঠাকুরপোরাও ত মালিক! ঠাকুরপো যদি বলেন আমি ওকে বরখাস্ত করব না।"

বললাম "বরখাস্ত না করেন, তিনি রাখুন তাঁর ছ'আনির জন্য। বর্তমান কাছারী বাড়ী আমাদের। করুন তিনি আলাদা ছ'-আনি কাছারী বাড়ী পীরতলায়। তারপর দেখা যাক্!"

এসব কথাই সকাল বেলা চারিদিক থেকে আলী মিঞার সঙ্গে আলোচনা হ'য়ে গেছে। আলী মিঞার মতেও মুকুন্দ বা তার বাপকে এখন কিছুই বলা সমীচীন নয়। আমার একলা গিয়েই সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা উচিত প্রথমতঃ তা হ'লে নিরপেক্ষ তদন্ত হ'বে এবং ফলে প্রজারাও খুশী হ'বে। এবং

দ্বিতীয়তঃ আমি গিয়ে এখন যদি মহলে একটা সুবিচার করি, প্রজারা আমাকেই চিনবে, ফলে দশআনিরই বাধ্য হ'বে বেশী। এবং সর্বোপরি আলী মিঞার মতে, ছ'-আনির সঙ্গে জমিদারী ব্যাপারে আমার দিক দিয়ে একটু দৃঢ়তা দেখান অনেক দিন উচিত ছিল।

"কি জানি বাপু! তোমাদের ব্যাপার তোমরাই জান।"

এই বলে তুষার একরাশ চুল মাথার বালিশে ছড়িয়ে দিয়ে আমার পাশে শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ খেয়াল হল—পীরতলায় তুষারবালাকেও সঙ্গে নিয়ে যাইনা কেন? বেশ ত হয়। কোনও ত অসুবিধা নেই। প্রকাণ্ড সবুজ আমাদের বজরাতে, লোকজন সমস্ত বন্দোবস্তই ত থাকবে আমার! পাঁচ-সাত দিন নদীতে নদীতে তুষারবালাকে নিয়ে বেড়ান, এর চাইতে বেশী আনন্দ, সেদিন দুপুর বেলা আমার পক্ষে কল্পনাও করা ছিল অসম্ভব।

বেশী কিছু বিবেচনা না করেই বললাম "তুষার! কালই ত পীরতলায় যাচ্ছি চলনা তুমিও আমার সঙ্গে।"

কথাটা শুনে আনন্দে সে যেন নেচে উঠল।

বললে "সত্যি! নিয়ে যাবে আমাকে?"

আমি বললাম "বাধা কি? কোনই ত অসুবিবে হ'বে না তোমার।"

* * *

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রাণের মধ্যে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ব্যথা। কেন যে এ বেদনা, হঠাৎ কিছু ঠিক করতে পারলাম না। বিছানা ছেড়ে উঠে, চুপ করে খানিকক্ষণ জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে সমস্ত প্রাণখানা নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন চোখ পড়ল প্রাণের নিভৃত কোণে আহত জায়গাটির উপর। মুকুন্দ—মুকুন্দ শেষটা আমায় এমন দাগা দিলে।

ঘর থেকে বেরিয়ে পুকুর ঘাটে এসে আবার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। প্রাণ, মন, শরীর সবই যেন একটা নিদারুণ আলস্যে ভরা। চারিদিকে শীতকালের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অপরাহ্নের রৌদ্রটুকু। তাও যেন বড় নিরলস, বড় নির্জীব—যেন আমারই প্রাণের সুরে বাঁধা।

সকাল বেলার সেই প্রচণ্ড রাগ তখন আমার মনে একেবারেই নাই। বরং

মুকুন্দকে এ রকম একটা কুৎসিত ব্যাপার নিয়ে কিছু বলতে মন যেন আপনা থেকে সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছিল। ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল এ ব্যাপারটা নিয়ে আমার কিছু বলতে যাওয়ার মধ্যে কেমন যেন একটা দৈন্য আছে। এটা ত তুষারের ব্যাপার, সেই যদি সতর্ক হ'য়ে, একটু কঠোর ইঙ্গিতে মুকুন্দকে সাবধান ক'রে দিত—তাহ'লে ব্যাপারটা মোটের উপর সহজ হ'ত—শোভন হ'ত। তাহ'লেই মুকুন্দ নিজের লজ্জায় সমঝে চলবার পথ পেতনা। তারপর সব সহজ হ'য়ে গেলে আমাকে চুপি চুপি যদি সব বলত,—কিছুই যেন আমার কাণে আসেনি, আমার কানে পৌছবার পক্ষে এ ব্যাপার তুচ্ছ, অতি ঘৃণ্য—এই রকম একটা উদার গর্বিত মনোভাব নিয়ে মুকুন্দর সঙ্গে ব্যবহারে সহজতা রক্ষা করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হ'ত না। আমার আত্মসম্মানও বজায় থাকত।

কিন্তু ততখানি বুদ্ধি, ততখানি আত্মশক্তি তুষারের কাছে আশা করা চলে না। মনে হয়েছিল, আসলে তুষার অতিশয় সরল, নিতান্ত ছেলেমানুষের মত তার মন। তাই যা ঘটেছে, আমাকে বলেই সে খালাস—প্রতিবিধানের ভার এখন সম্পূর্ণ আমারই উপর। তাইত এখন আমার কিছু করা দরকার। নইলে মুকুন্দকে শিক্ষা দেওয়া হ'বে না, তুষারের কাছেও আমার পুরুষোচিত গর্বে লাগবে বিষম-ঘা।

এই রকম ধরণের নানান চিন্তায় অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি মুকুন্দ আসছে আমাদের বাড়ীর দিকে। মুকুন্দকে দেখেই বুকটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

মুকুন্দ ঘাটের কাছে এসে আমার দিকে চেয়ে বললে "একি শান্তদা! অমন চুপ চাপ বসে এখানে? এই ঘুম থেকে উঠলে বুঝি?"

ঠিক সেই সময় বাড়ীর ভিতর থেকে চাকর এসে আমাকে বললে "চা অনেকক্ষণ তৈরী হয়ে গেছে বাবু! জুড়িয়ে গেল। বৌঠাকরুণ আপনাকে এখুনি ভিতরে ডাকছেন।"

গম্ভীর ভাবে বললাম "আচ্ছা যা। যাচ্ছি।"

মুকুন্দর দিকে গম্ভীর-দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম, "মুকুন্দ। বোস ঐখানে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মুকুন্দ সত্যিই যেন একটু অবাক হ'ল। চুপ ক'রে গিয়ে বসল—আমার থেকে খানিকটা দূরে। অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ! সেও কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না।

হঠাৎ বললাম "পরের-স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশায় সব সময়ই একটা সীমা থাকা উচিত, তা সে স্ত্রী যতই নিকট আত্মীয় হোক না কেন।

মুকুন্দ যেন একটু চমকে উঠল। একটু অবাক হ'য়ে আমার দিকে চাইলে। বললে "তার মানে ?"

বললাম "আমি সব শুনেছি। তুষার তোমার মতন পুরুষের মুখ দেখতেও ঘৃণা বোধ করে।"

কথাগুলি বলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল। পুকুরের দিকে খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চুপ করে চেয়ে রইল। পরে বললে "তোমার মন যে এত নীচ. এত সংকীর্ণ তাত জানতাম না।"

শরীর জ্বলে উঠল। আবার আমাকেই অপরাধী করতে চায়। আশ্চর্য বেহায়া। উত্তেজিত-কণ্ঠে বললাম "আমার মনের বিচার করতে তোমাকে কেউ ডাকেনি এখানে। আর সে যোগ্যতা তোমার মত জঘন্য লোকের এ জীবনে কখনও হ'বে না।"

মুকুন্দ একটু স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল—বলল না! হন্ হন্ ক'রে আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

## পাঁচ

মুকুন্দর সঙ্গে কথা হ'ল সোমবার দিন বিকেল বেলা। মঙ্গলবারটা মাঝে গেল ; মঙ্গলবার রাত পোহানর সঙ্গে সঙ্গে, বুধবার ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমি বজরা যোগে রওনা হলাম পীরতলা অভিমুখে।

"মঙ্গলের ঊষা বুধে পা,
যথায় ইচ্ছা তথায় যা।"

এই বচনটি আউড়ে মা বিধান দিয়েছিলেন যে যদি দু'এক দিনের মধ্যে আমাকে বাড়ী ছেড়ে যেতেই হয় ত, মঙ্গলবারের রাত্রি পোহানর সঙ্গে সঙ্গেই

আমার রওনা হওয়া উচিত। "উষা" কথাটির অর্থও মা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—

"ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা,
তারেই বলে শ্রীশ্রীউষা।"

ছেলেবেলা থেকেই মার এই সব কথার উপর আমার কেমন যেন একটা অন্ধ-বিশ্বাস ছিল। কেবলই মনে হ'ত, জীবনের সকল কর্মে, মার ইচ্ছা মান্ত ক'রে চললে, আমার মঙ্গলই হবে। যুক্তি, তর্ক বিচার দিয়ে, মার ইচ্ছা যাচাই করার প্রবৃত্তি আমার কোনও দিনই মনে আসে নি, যেন তার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। মঙ্গলের উষায় যাত্রার যথার্থই কোনও শুভযোগের কারণ ছিল কিনা —এ প্রশ্ন আমার মনে একেবারও ওঠেনি। মা যখন বিধান দিয়েছেন, মার যখন ইচ্ছা আমি মঙ্গলের উষায় রওনা হই, তখন আর অন্য বিচারের প্রয়োজনই বা কি? আমার মনের দিক দিয়ে শুভযাত্রার পক্ষে সেইটুকুই ছিল যথেষ্ট অনুপ্রেরণা!

পীরতলা অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম, কিন্তু তুষার সঙ্গে যায় নি। সোমবার দিন দুপুরবেলা হঠাৎ কেমন একটা খেয়ালের মাথায় তুষারকে সে কথাটা বলাই অন্যায় হয়েছিল। এই ছয়-সাত বৎসর ত আমার বিবাহ হয়েছে। এর মধ্যে তুষারের সম্পর্কে নানান অশান্তিতে জর্জরিত হ'য়ে কতবার মর্মে অনুভব ক'রেছি তার সঙ্গে কথাবার্তায় আমার প্রত্যেক কথাটা বিশেষ বিচার ও বিবেচনা সাপেক্ষ হওয়া উচিত। তার সঙ্গে বেফাঁস কথার ফল বেশীর ভাগ সময়ই দারুণ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু তবুও ছাই, তার সঙ্গে ব্যবহারে কথাবার্তায় বিশেষ কিছু বিবেচনা না ক'রে হঠাৎ একটা কথা বলবার অভ্যাস আমার তখনও যায় নি।

ফলে এবারও বেশ একটু অশান্তি ঘটল। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুতে গিয়ে প্রথমেই তুষারকে মুকুন্দর সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল বিস্তারিত সবই বললাম। তুষার চুপ ক'রে শুনল, কোনও কিছু উচ্চবাচ্য ক'রল না। সমস্ত কথা শেষ হওয়ায় পরেও সে যখন চুপ ক'রেই রইল তখন আমিই তাকে প্রশ্ন করলাম—

"কি বল? কাজটা ঠিক হয়েছে ত?"

"কি জানি! আমি ওসব বুঝিনা!"

এই বলে পাশ বালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে রইল।

তুষারের ব্যবহারে মোটের উপর আমি একটু হতাশ হলাম। জীবনের এতবড় ব্যাপার, এবং বিশেষ করে যার সঙ্গে সেই অত নিবিড় ভাবে জড়িত, তার

প্রতি তুষারের এই উদাসীন তাচ্ছিল্যে বোধ হয় আমি একটু বিরক্ত হয়েছিলাম। বোধ হয় একটু উত্তেজিত সুরেই বলেছিলাম—"তার মানে কি? তোমাকে নিয়েই ব্যাপার, তোমার সঙ্গেই ত এ বিষয় আলোচনা হওয়া উচিত।"

"এর আবার আলোচনার কি আছে। বলেছ, বেশ করেছ! আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে!"

এই বলে পাশ ফিরেই চুপ করে শুয়ে রইল। আমিও খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলাম। মনটা ক্রমেই বিরক্তিতে ভরে উঠতে লাগল। বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বললাম—"আলোচনা কর আর নাই কর, একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রেখে দি। মুকুন্দদের বাড়ীতে আর তোমার না যাওয়াই ভাল।"

কেমন যেন একটা অবহেলার সুরে বললে "বেশ গো বেশ।"

আবার একটু চুপ করে রইলাম। তুষারের ভাবভঙ্গী দেখে মনটা ক্রমেই যেন জ্বলে উঠছিল। হঠাৎ আবার বললাম—"কথাগুলো কাণে গেল?"

কোনও কথা কইলে না। একটু ঠেলে বললাম "কথা কইচ না যে—কথাগুলো শুনলে ত?"

একটু বিরক্তির সুরে বললে—"আমি ত কালা নই। ঘুমুতে দেবেনা নাকি?"

"এর মানে কি? তুমি এরকম ব্যবহার ক'রছ কেন আমার সঙ্গে?"

"কি ব্যবহার? আমি কি খারাপ ব্যবহার করলাম তোমার সঙ্গে?"

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলাম। মন কিন্তু কিছুতেই শান্ত হ'ল না। বোধ হয় এটু 'ঘা' দেওয়ার জন্যই গম্ভীর ভাবে বললাম—"হ্যাঁ, একটা কথা বলি। তোমার পীরতলা যাওয়া হ'বে না।"

"সে আমি জানতাম।"

"তার মানে?"

"মানে আবার কি?"

"কিসে জানলে?"

"তুমি যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না সে আমি জানি। তোমাকে ত আমি চিনি।"

"ছাই চেন।"

"বেশ তাই।"

এই বলে চুপ ক'রে রইল। আসল কথাটা, হ'চ্ছে তুষারকে সঙ্গে করে নিয়ে পীরতলা যেতে আমার মনের দিক দিয়ে কোনও বাধা ছিল না। বাধা

ছিল বাইরের দিক দিয়ে। প্রথমতঃ মার শরীর ভাল নয়, তিনি একলা বাড়ীতে থাকবেন, আর ঘরের একমাত্র বউ বজরায় আমার সঙ্গে হাওয়া খেতে যাবে—জিনিষটা মনের মধ্যে কেমন যেন অশোভন বলে মনে হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ বাবা কিংবা আমাদের পূর্বপুরুষে কেউ কখনও স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে মহল পর্যবেক্ষণে মফস্বল যান নি, তাই হঠাৎ সস্ত্রীক মহলে বেরুলে জিনিষটা সমাজের দিয়েও বিশেষ কটু দেখাবে—এ বিষয় যতই ভাবতে লাগলাম ততই আমার মনে আর কোন সন্দেহই রইল না। এবং সব চেয়ে বড় কথা, কেমন যেন মনে হচ্ছিল, এ বিষয় মা কখনই মত দেবেন না। এবং আমার বিশেষ পেড়াপীড়িতে মুখে 'না' না বললেও মনে মনে যে খুসী হবেন না এটা নিশ্চিত।

কিন্তু তুষারকে একবার আশা দিয়েছি, এখন তাকে আবার নিরাশ করি কেমন করে। তুষারকে ত আমি চিনি। দুপুরবেলা কথাটা শোনা মাত্র সে যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল, "না" বললে সে তেমনি রাগে দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে ; কোনও কথা শুনবে না, কোনও যুক্তি মানবে না। তাই মনে মনে যখনই ঠিক ক'রে ফেললাম যে তুষারকে সঙ্গে নেওয়াই চলে না, তখন থেকেই সহজ, সরল ভাবে তুষারের মনটা বিক্ষিপ্ত না ক'রে, কেমন ক'রে তুষারকে আবার কথাটা বলা যায়, সারা-সন্ধ্যাটা কেবল সেই চিন্তাই ক'রেছি। কিন্তু অনেক চিন্তা ক'রেও কথাটা তুষারকে বলা কোনও দিক দিয়েই সহজ ব'লে মনে হয়নি।

এই সব কারণে যে কথাটা বলতে প্রাণে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছিল অতি সহজভাবে বেশ জোরের সঙ্গেই তুষারের সেই কথাটা জানিয়ে দিলাম। কারণটাও শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করিনি। বললাম—

"মার শরীর ভাল না। তিনি একলা বাড়ীতে থাকবেন, আর তুমি বজরায় আমার সঙ্গে হাওয়া খেতে যাবে—অত্যন্ত অন্যায়।"

বেশ একটু তীক্ষ্ণ সুরে বললে—"তোমার ন্যায়, অন্যায় নিয়েই তুমি থাক। এখন আমাকে একটু রেহাই দাও—দোহাই তোমার।"

আমার মাথায় কেমন যেন সেদিন সুবুদ্ধি এল—আমি আর কিছু বললাম না। নইলে বিরোধটা ক্রমেই কুৎসিত কলহে পরিণত হ'য়ে একটা দারুণ অশান্তির আগুনে জ্বলে উঠত—পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিত প্রাণখানা।

পরের দিন সমস্ত দিনটা তুষারের ব্যবহারে সেই একটা উদাসীন তাচ্ছিল্য আননে সেই একটা মর্মভেদ বিরক্তি ও বিষাদে ভরা নিরলস চাহনি, যেরূপ পূর্বে বহুবার দেখেছি।

সংসারে সমস্ত কাজই ক'রে যাচ্ছে এমন কি আমার কাপড় চোপড় গোছান থেকে আমার যাত্রার কোন আয়োজনই বাদ দেয়নি—কিন্তু সকল কর্মের মধ্যেই পদে পদে ফুটে উঠছিল একটা নির্লিপ্ত অবহেলা, যেন এ সব কোন কাজেরই এতটুকু মূল্য দিতে তার প্রাণ একেবারেই বিমুখ।

রাত্রে শুতে গিয়ে বিশেষ সাবধানে তুষারের সঙ্গে কথাবার্তা সুরু করতাম—মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম, যেমন করেই হোক, কোনরূপ কলহ, দ্বন্দ্ব আজ এড়িয়ে চলতেই হ'বে, কেননা রাত পোহানর সঙ্গে সঙ্গেই ত আমার যাত্রার সময়। এবং বোধ হয় মনে মনে একবার স্বস্তির-নিশ্বাস ছেড়েছিলাম, যখন দেখলাম, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তুষারের ব্যবহার বেশ সহজ হ'য়ে উঠল। একবার শুধু অভিমানের সুরে বললে "যদি নিয়ে নাই যাবে, আশ্বাস দিলে কেন? আশা দিয়ে নিরাশ কর—বড় নিষ্ঠুর তুমি। আমি ত সেধে যেতে চাইনি।"

* * *

পীরতলা একলা যাইনি। সঙ্গে গিয়েছিলেন—দাদা।

মঙ্গলবার দিন সকাল বেলা দাদা হঠাৎ আমাকে বললেন "সুশন"। তুই নাকি চার-পাঁচ দিনের জন্য মহলে যাচ্ছিস? আমিও যাব।"

আমি আবাক হ'লাম। দাদা নিজে ইচ্ছে করেই জমিদারীর কাজকর্ম দেখা ছেড়ে দিয়েছেন; অনেক অনুরোধ ক'রেও মহলে দাদাকে পাঠান যায়নি। সেই দাদা হঠাৎ স্বইচ্ছায় মহলে যেতে চাইছেন—কিছুই মানে বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমার হঠাৎ এ সুবুদ্ধি হ'ল?"

"মনটা অনেক দিন ধরেই কি রকম যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। একটু বেরুতে ইচ্ছে ক'রছে। আর তোর সঙ্গে একটু বিশেষ পরামর্শও আছে।"

"কি বিষয়?"

"সে বলব এখন।—একটু নিরিবিলি সময়ের দরকার। তোর সঙ্গে গেলে বেশ হ'বে।"

দুপুরবেলা খেতে বসে মাকে যখন কথাটা বললাম, মা খুসীই হ'লেন! বললেন "বেশত! ভালইত। প্রশন যদি আবার একটু কাজে কর্মে মন দেয়—সে ত অতি সুখের কথা। আহা বেচারী! আপন মনে কেমন যেন দিশেহারা হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়—ওর মুখের দিকে চাইলে কষ্ট হয়।"

দাদার কথা ভাবলে, দাদার বর্তমান অবস্থায়, আমি কিংবা মা কেউই মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করতাম। আপন মনে

সংসারের কোণে কোণে পাশ কাটিয়ে কোনও রকমে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিল—কী ভাবে, কী করে, তার সঙ্গে পরিবারের কারও কোনও যোগই ছিল না। কি সংসারের কি সমাজের ছোট বড় কোনও কাজেই কেউই দাদাকে কোনও বিবেচনার মধ্যেই নিত না—যেন ওর অস্তিত্বটার কোনও মূল্যই নেই ইহজগতে। তাই মার কথাগুলিতে আমার মন সম্পূর্ণ সায় দিল এবং দাদাকে সঙ্গে নিয়েই আমি রওনা হ'লাম।

শীতকালের সকালবেলা। চারিদিকে তাজা সোণালী রোদটুকু ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের বজরাখানি বেগবতী নদী দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে পূর্বমুখে। মুখ হাত ধুয়ে, আমি ও দাদা বজরার ছাদের উপর একটা ফরাস পাতিয়ে নিয়ে তার উপর বসে রোদ পোহাচ্ছিলাম। মাধবপুর গ্রাম অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছি আর কিছু দূর এগিয়ে গেলেই সামনে বড় নদী।

দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি একটা পরামর্শ ছিলনা তোমার আমার সঙ্গে ?"

দাদা বললেন "হ্যাঁ সেই কথাটাই ভাবছি।"

"কি কথা ?"

একটু চুপ করে থেকে দাদা বললেন—"আমি একটা বই লিখছি।—"

একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম "তুমি বই লিখছ ? কি বই ?"

স্কুল ছাড়বার পরে বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে পড়ে দাদা বাংলা ভাষাটা বেশ ভালই শিখেছিলেন এ খবর আমি জানতাম। শুধু তাই নয়, আমি যখন কলেজে পড়ি, ছুটীতে বাড়ীতে এলে দাদা একবার তাঁর একখানি রচনা খাতা আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে বেশীর ভাগই পদ্য এবং কয়েকটি গদ্য রচনা। খাতাখানির একটি কবিতা, সে বয়সে আমার কিন্তু বেশ ভালই লেগেছিল এবং সে কথা দাদাকে আমি বলেছিলামও। কবিতাটী সে বয়সে পড়ে পড়ে আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল, আজও কয়েক লাইন মনে আছে।

আঁধার আঁধার বিশ্ব সবই অন্ধকার
আঁধারেই গড়া এই জগৎ বিমান।
সূর্যখানি এসে শুধু আলোকে তাহার
আঁধার ডুবায়ে দেয়, আবার যেমন
সবিতা ডুবায়ে যায় আলোক তাহার
সবি অন্ধকার।

সোণার কিরণ লয়ে আসে চাঁদখানি
ক্ষণেক জাগিয়া ওঠে বিশ্ব প্রকৃতি।
নিমেষের তরে হাসে তড়িৎ যেমনি
ধরণী জাগিয়া ওঠে; আপন মুরতি
আপনি ফিরিয়া পায় তখনি আবার
আবার আঁধার।
তবে কেন কাঁদ তুমি অভাগা মানব,
শান্তি নাই, সুখ নাই মোদের জীবনে?
আঁধারে মোদের ঘর, আঁধারেই সব
আঁধার আপন তব, আলোক এখানে
অতীতের স্মৃতিটুকু, ওপারের ছায়া
দেবতার মায়া।
এ জীবনে তাই কিগো যা কিছু মলিন
যা কিছু করুণ যাহা অশ্রু দিয়ে ঘেরা
আমার আপন যেন, হাসি ত দু'দিন—

তারপর আর মনে নাই। তবে এটুকুও স্পষ্ট মনে আছে, কবিতাটী টুকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে এক মাসিক পত্রে পাঠিয়েছিলাম—কিন্তু ছাপান হয়নি।

যাক, সে সব অনেকদিন আগেকার কথা। ইতিমধ্যে দাদার সাহিত্য চর্চা কিছু ছিল বলে আমার জানা ছিল না। তাই হঠাৎ আজ সকালে দাদা বই লিখছেন শুনে আমি সত্যই অবাক হয়েছিলাম।

দাদা বললেন, "বইখানির নাম এখনও কিছু ঠিক করিনি। বিবাহ ও সামাজিক সমস্যা—এই রকম ধরণের নাম দেব।"

আমি বললাম "ও—তাহ'লে কবিতার বই নয়!"

বললেন "না। বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা করে বইখানি আমি লিখেছি। কিন্তু একটা বিষয় আমার দারুণ সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে। তুইত অনেক লেখাপড়া করেছিস্—তোর সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই।"

কৌতূহল হ'ল। জীবনের কোন জটিলসমস্যার বা চিন্তাজগতে দাদার যে কোনও দখল আছে, এ আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলাম—"সমস্যাটা কি শুনি?"

বললেন "প্রথমতঃ আমার বিশ্বাস বিবাহ জিনিষটা শুধু পুরুষ ও স্ত্রীর একটা

সামাজিক বন্ধনই নয়, এ সম্পর্কের মধ্যে যথার্থ একটা ধর্মের বন্ধনও আছে। এ বিষয় আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের আদর্শই খাঁটি আদর্শ।"

"বেশ তারপর?"

"আমার আরও বিশ্বাস, ভগবান যখন পুরুষ তৈরী করেন, তারই যথার্থ উপযোগী একটি রমণীও সৃষ্টি করেন এবং তাদের পরস্পরের মিলনের মধ্য দিয়েই উভয়ের জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করেন।"

"বুঝলাম। তারপর?"

"এখন কথা হ'চ্ছে পুরুষের জীবনের দিক দিয়ে প্রথমবার বিবাহে যদি কোনও রকম অমিল হয়, অর্থাৎ যদি যথার্থ সহধর্মিণীর সঙ্গে মিলন না হয়, তবে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণে কোনও বাধা নেই আমাদের হিন্দুধর্মে। শুধু বাধা নেই নয়, আমার মতে করাই উচিত। কেননা নিজের জীবনের পরিপূর্ণতা লাভই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।—কেমন?"

"বলে যাও—শুনি।"

"কিন্তু রমণীর জীবনের দিক দিয়ে ত এ নিয়ম প্রয়োগ করা চলে না। রমণীর জীবনে ত একাধিক বিবাহ অসম্ভব। কিন্তু জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করবার অধিকার তাদেরও ত আছে।"

"এই তোমার সমস্যা?"

"হ্যাঁ। আমি অনেক দিক দিয়ে জিনিষটা চিন্তা ক'রে দেখেছি। কিন্তু কোনও দিকেই কোনও কুলকিনারা পাচ্ছিনা।"

"কেন, এ সমস্যার সমাধান ত অতি সোজা। তোমার গোড়ার কথাগুলো যদি সব সত্য হয়—অবশ্য আমি সেগুলি সব মেনে নিচ্ছি না—তাহ'লে রমণীদেরও সে অধিকার দিতে হ'বে। অর্থাৎ প্রথম বিবাহে যদি তাদের মিলন সার্থক না হয়, যদি তাদের জীবনের পরিপূর্ণতা লাভে বাধা হয়, তবে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করতে হ'বে। ওদের দেশের মত, সে প্রথা আমাদের সমাজেও চালাতে হ'বে।"

"না—না। সে ত একেবারেই অসম্ভব।"

"কেন? অসম্ভব কেন? একবার মন্ত্র পড়ে দু'জনকে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'য়েছে বলে, সে মিলন সত্যই হোক বা মিথ্যাই হোক চিরকাল সেটাকে মেনে চলতে হ'বে তারই বা কি মানে আছে? এই রকম একটা মিথ্যা বন্ধনের মধ্যে দিয়ে সত্যকারের ভাল ভাল জীবন যে কি রকম ধ্বংস হ'য়ে যায় তারও ত দৃষ্টান্তের অভাব নেই।"

এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে আমার সত্যিকারের মনের কথা সেদিন সকালে দাদাকে ঠিক বলেছিলাম কিনা—এখন আমার মনে নাই। এবং দাদার গোড়ার দিককার কথাগুলির মধ্যে যে সমস্ত ভুল আমার মতে স্পষ্ট ভাবে ধরা যাচ্ছিল, তা নিয়েও কোন তর্ক তুলিনি। বিবাহ যে ইহকাল পরকাল নিয়ে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন—এ বিশ্বাস আমার আদৌ ছিল না। সহধর্মিণী না হলে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভে বাধা ঘটে, এ বিষয়ও আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু তবুও এ সব নিয়ে কোনও তর্ক তুলিনি। কেন না দাদার মনের দিক দিয়ে এ সব নিয়ে তর্ক করার কোনও সার্থকতা ছিল না। দাদার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, যদি হিন্দুধর্মের প্রতি দাদার অগাধ অন্ধবিশ্বাসে কোনও দিন একটু 'ঘা' মেরে দাদার মনটাকে সামান্য একটু মুক্তি দেওয়াও যায় তাহ'লেই দাদার সত্যিকারের উপকার করা হ'বে। এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে দাদার সমস্যায় দাদার মনের চিন্তাধারার অনুসরণ ক'রে যেখানে তাতে বাধা পড়েছে সেইখান দিয়েই তার গতির মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। তাই যেখানে দাদার সমস্যা, সেইখান দিয়েই তর্কটা তুললাম—বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

বললাম "যদি নিজের মন সায় না দেয়, কোনও কিছুর প্রতিই অন্ধ বিশ্বাস ভাল নয়। হিন্দু-শাস্ত্র অবশ্য আমার ভাল পড়া নেই। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যদি বারণও করে থাকে তবুও আমি বলব—বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা সমাজে থাকাই উচিত। তাতে সমাজের মানুষের মঙ্গলই হয়।"

দাদা বললেন "কিন্তু—"

বললাম "এর মধ্যে কোনও 'কিন্তু' নাই।"

কিন্তু থাকতেও পারে না। তোমার ও 'কিন্তু'টা আমাদের একটা বহুকালের পুঞ্জীভূত সংস্কারের ছোট্ট একটা 'কিন্তু' মাত্র। ও 'কিন্তু'র পিছনে যুক্তি নেই।

"কিন্তু—মেয়েদের সতীত্ব যে একটা মস্ত বড় ধর্ম।"

"সে কথা ত আমি একবারও অস্বীকার করছিনা। কিন্তু সতীত্ব কথাটার প্রতি অন্ধ, অচলা-ভক্তিতে আমার আপত্তি আছে। ভক্তির আগে সতীত্ব জিনিবটা যে কি, সেটা ভাল করে বোঝা দরকার। না বুঝে ভক্তিইত অন্ধ ভক্তি।"

"তার মানে?"

"আমি বলতে চাই সতীত্ব তখনই বড় ধর্ম যখন সেটা কায়মনোবাক্যে খাঁটি—

অর্থাৎ তার মধ্যে কোনও ভেজাল নেই। মনের মধ্যে ঘোর অমিল, কিন্তু বাইরের দিক দিয়ে ষোল-আনা সতীত্ব বজায় রেখে চলার মধ্যে বাহাদুরী থাকতে পারে, ধর্ম নেই।"

"কথাটা ঠিক বুঝলাম না।"

"আমার কথা হচ্ছে সতীত্ব ধর্মের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা মেয়েদের পুনর্বার বিবাহের বিরোধ নেই, তুমিই ত বলেছিলে বিবাহ বন্ধনটা সব সময়েই যে ঠিক সত্য হয়ে ওঠে তার মানে নাই। যেখানে তুমি পুরুষদের পুনর্বার দার পরিগ্রহণের বিধি দিচ্ছ, আমি বলি মেয়েদের বেলায়ও তাই। কথাটা হচ্ছে বিবাহ-বন্ধন যদি সত্য হয়, তখন প্রাণের নিষ্ঠা দিয়ে তাকে কায়মনোবাক্যে সার্থক করে তোলা, সুন্দর ক'রে তোলার নামই সতীত্ব। কেন—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, এই পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করলেই সর্বপাপ বিনষ্ট হয়—এই কথাই ত হিন্দু-শাস্ত্রে বলছে না?"

দাদা খানিকক্ষণ চুপ করে দূরের দিকে চেয়ে রইলেন। যেন আকাশ পাতাল কি সব ভাবছেন। আমি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম। ভাবলাম—এ রকম ভাবে দাদার সঙ্গে কখনও কথা কইনি। এই রকম ভাবে আলোচনায় দাদার মনের অন্ধ-সংস্কার যদি কিছুমাত্রও দূর হয়, সত্যই দাদার মনের অনেক উপকার হবে। দাদার বিষয় ভাবলে আমার কেমনই মনে হোত, দাদার ভিতরের কিছুই জীবনে পরিস্ফুট হ'ল না, কতকগুলি অন্ধ-সংস্কারের চাপে। কিছুক্ষণ পরে বললাম "আচ্ছা দাদা! তোমার মতে ত সহধর্মিণী না হ'লে জীবন পরিপূর্ণই হয় না কেমন?"

বললেন "হ্যাঁ। ভগবানই ত মানুষকে দুইভাগে ভাগ করেছেন—পুরুষ ও রমণী। এদের মিলনের মধ্যে দিয়েই মানুষের পূর্ণতা লাভ হয়।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললাম "তাহ'লে—তাহ'লে তোমার আবার বিবাহ করা উচিত?"

ভেবেছিলাম কথাটা এই দিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে হয়ত বা দাদাকে বিবাহ করতে রাজী করানও যেতে পারে। মনের মধ্যে কেমন যেন একটু আশাও হয়েছিল,—দাদা নিজেই বিবাহের বিষয় এত চিন্তা করেছেন, পুরুষের একাধিক বিবাহে যখন তার এত আগ্রহ হয়ত বা নিজের বিষয় চিন্তা করে বিবাহ করতে এখন তিনি রাজী। একটু চুপ করে থেকে শান্ত-সুরে দাদা বললেন:

"আমার কথা স্বতন্ত্র। প্রথমবার বিবাহেই ত আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়েছিল—ষোল আনা। সইল না। ভগবান সে পরিপূর্ণতা ছিন্ন করলেন স্বহস্তে। আমার জীবন যে অভিশপ্ত। আর কোন উপায় নেই।"

এই কথা কয়টি বলে দাদা কেমন যেন একরকম করুণ-হেসে আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমার বুকের মধ্যটা দুলে উঠল।

* * *

পীরতলায় কাজ আমার একবেলায়ই শেষ হ'ল। পীরতলা গিয়ে আমাদের বজরা নোঙর ফেলল শেষরাত্রে—ভোরের একটু আগে। সকালবেলা উঠে মুখ হাত ধুয়ে পীরতলার কাজটুকু শেষ করতে বেলা ১১টা বাজল। গোমস্তা ভৈরব ঘোষালের কাছে শুনলাম নায়েব নবীন মুন্সী কাছারী বাড়ী নেই! আমরা যেদিন পীরতলা পৌঁছলাম, তার আগের দিন বিকেলে তিনি হঠাৎ দেশে রওনা হয়ে গেছেন! নবীন মুন্সী না থাকার দরুণ কাজটা সহজেই হ'ল। ভৈরব ঘোষালের কাছ থেকে সমস্ত অবস্থাটা শুনে খাতা-পত্র দেখে সহজেই বুঝতে পারলাম ভৈরব ঘোষালের কথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। দু'চার জন মাতব্বর প্রজাকে ডাকিয়ে তাদের সামনে নবীন মুন্সীর বরখাস্তনামা লিখে দিয়ে চারিদিকে ঘোষণা করে দেওয়ার কথা বললাম। এবং আলী মিঞার বুদ্ধি অনুযায়ী প্রচার ক'রে দিলাম—এ বছরের মত পীরতলা মহলের প্রজাদের খাজনা মাপ করা হ'ল।

ছোট একটি নদীর তীরে কাঁচা চারচালা একখানা বড় ঘরে আমাদের কাছারী বাড়ী। ঘরটাতে দু'খানি কামরা সামনে একটি বারান্দা। ঘরটির মাটির দেয়ালে চুনকাম করা—মেঝে পাকা। কাছারী বাড়ীর পিছনেই বেশ বড় একটা পুষ্করিণী এবং তারই কিনারায় একটি দোচালা রান্নাঘর। পুষ্করিণীটির চারিদিকে তরি-তরকারী ফলের বাগান। আমাদের কাছারী বাড়ীর কিছুদূরে নদীর ধারে ধারে খানকয়েক দোকান ঘর। এ ছাড়া আশে পাশে আর কোনও বাড়ী নাই। চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত চষা ক্ষেতের মাঠ। এবং মাঠের ওপারে দূরে দূরে বড় বড় বৃক্ষ শ্রেণী মণ্ডিত ছোট বড় সব ঘর দেখা যায়—ঐ খানেই গ্রাম।

কাজ শেষ করে আমি ও দাদা কাছারী বাড়ীর পুষ্করিণীতে নেমে স্নান ক'রে কাছারী বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করলাম। দুপুরবেলা একটু বিশ্রাম করার পর সূর্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলে পড়লে আমাদের নৌকা ছাড়া হ'বে। বিকেলের দিকে রওনা হয়ে আসার পূর্বে অনেক প্রজা কাছারী বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিল

এবং যাত্রার পূর্বে বরকন্দাজটা 'দুম্-দাম্' ত্বচারটে ফাঁকা-বন্দুকের আওয়াজ করল এবং প্রজাদের কাছ থেকে "নজর"ও পাওয়া গেল মোটামুটি মন্দ নয়।

ফিরবার পথেও দাদার সঙ্গে অনেক বিষয়ে নানান রকম আলোচনা করতে করতে ফিরলাম। রাত্রে দারুণ শীতে বোটের জানালাগুলি সব বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় বসে দাদার সঙ্গে গল্প সুরু হল। একথা ওকথার পর দাদা বললেন—"তোর সঙ্গে দুদিন কথা বলে আমার মনে হচ্ছে, ইংরাজী লেখাপড়া শিখলে আর কিছু হোক না হোক বুদ্ধিটা নানান দিকে খেলে।"

বললাম, "অন্ততঃ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক চোখ বুজে কিছু নেয় না। সব জিনিষই যাচাই করে দেখে। যাচাই করলেই ত প্রত্যেক জিনিষের ঠিক মূল্য ধরা যায়।"

"তবে ইংরাজী লেখা পড়ায় মনটা কেমন যেন একটা বিদেশী ভাবাপন্ন হ'য়ে যায়। আমাদের সনাতন আদর্শের প্রতি আস্থা হারায়।"

"জানি না। আদর্শটা আসলে খাঁটি কিনা একবার পরখ করে দেখো, এই মাত্র।"

"আমাদের যে সব সনাতন আদর্শ তার মধ্যে পরখ করবার কিছুই নাই। সেকালে মুনি ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না বা আমাদের চেয়ে বুদ্ধি তাঁদের কোন অংশেই কম ছিল না।"

"ওটা ত একটা নিতান্ত মামুলী কথা। তাঁরা মূর্খ ছিলেন একবারও ত বলছি না। তাঁদের শিক্ষা বুঝতে হ'বে, প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে হ'বে—তবেই ত সেটা আমার কাছে সত্য হয়ে দাঁড়াবে।"

"তাতে বটেই।"

"তবে? বুঝতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁদের কোনও আদর্শে যদি আমার প্রাণ সায় না দিল, তবে অন্তত সেটা আমার কাছে সত্য হ'ল না।"

"সত্য যেটা চিরকালের সত্য, সকলের জন্যই সত্য। আমার কাছে যেটা সত্য সেটা তোমার কাছে নয়, এ কথার কোনও মানে নাই।"

কথাটা শুনে মনে মনে খুসী হলাম। এসব কথা নিয়ে দাদা যে ঠিক এরকম ভাবে কথা কইতে পারেন—এ আমি কোন দিনই ধারণা করি নি।

বললাম "তাত বটেই। সত্য নিয়ে ত বিবাদ নয়, বিবাদ হচ্ছে সত্যের উপলব্ধি নিয়ে। কোনও সত্য যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে ধরা না দিল ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হ'ল না। ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মানলে নিজের কাছেই নিজে

অবিশ্বাসী হতে হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যে তাকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছে বলেই সেটা সত্য তারই বা বিশ্বাস কি ?"

দাদা চুপ করে ভাবতে লাগলেন। কোনও উত্তর দিলেন না।

বললাম "যাক ও সব বড় বড় কথা। তোমার সমস্যার মীমাংসা হ'ল ?"

বললেন "আমার মীমাংসা যে ভাবে তুই করেছিস যুক্তির দিক দিয়ে মন তাতে সায় দেয়। কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি ?"

"কিন্তু সতীত্ব কথাটা বলতে তুই যা বুঝিস্ তাতে মন কি রকম সায় দেয় না।"

"কেন ? সায় না দেওয়ার মধ্যে সংস্কার ছাড়া কোনও যুক্তি আছে কি ?"

"মেয়েদের দেহেরও ত একটা পবিত্রতা আছে।"

"আছে অবশ্য। সেই জন্যই বারবনিতাদের জীবন এত ঘৃণিত ; কিন্তু দেহের পবিত্রতা রক্ষা শুধু মেয়েদেরই ধর্ম নয়। পুরুষদেরও। এবং একাধিক বিবাহে পুরুষ কি রমণী কারুরই দেহের পবিত্রতা নষ্ট হয় না !"

দাদা আবার চুপ করে ভাবতে লাগলেন ! আমিও কিছুক্ষণ কোনও কথা কইনি ! খানিকক্ষণ এই ভাবে কাটল ! বংশী চাকরটা এসে জিজ্ঞাসা করলে— "রান্না হয়েছে। খাবারের ব্যবস্থা করব কি ?"

দাদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কি বল ? খাবে এখন ?"

দাদা বললেন "দিক।"

বংশী চলে গেল।

বললাম "আসল কথাটা কি—পবিত্রতাই বল, ধর্মই বল, সে সব দেহে নয়, মনে। যেখানে মন পবিত্র, খাঁটি, সেখানে অপবিত্রতা দেহকে স্পর্শই করতে পারে না। আর মনই যদি অশুচি হয়, খোলসটাকে পবিত্র রাখার মূল্য বেশী কিছু নয়। মেয়েদের সতীত্ব কথাটা নিয়ে আমাদের দেশে চিরকালই একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। তা'তে মোটের উপর লোকসানই হয়েছে—লাভ হয় নি।"

* * *

যেদিন রওনা হ'লাম তার পরের দিন রাত-আটটা আন্দাজ বাড়ীর ঘাটে এসে নৌকা লাগল। মোটের উপর তিন দিনেই পীরতলা ঘুরে এলাম। এত শীত যে ফিরে আসতে পারব এ আমরা কেউই আশা করি নি। সবাই ভেবেছিলাম… পীরতলা গিয়ে কাজকর্ম সেরে ফিরে আসতে অন্ততঃ পাঁচ-দিন লাগবে।

অন্দরে গিয়ে মার সঙ্গে প্রথমে দেখা হ'ল। মা অবাক হ'লেন।

বললেন "এর মধ্যে ফিরে এলি?"

বললাম "কাজ হ'য়ে গেল ফিরে এলাম। মোটের উপর ২৪ ঘণ্টা ত যেতে লাগে।"

মা আর কোন কথা কইলেন না। আমি এদিক ওদিক নজর দিয়ে ওপরে শোবার ঘরে গেলাম—কিন্তু তুষারকে কোথাও দেখতে পেলাম না। কাপড় ছেড়ে খানিকটা চুপ করে শোবার ঘরে বসে রইলাম তুষার এল না। একটু অবাক হ'লাম—কোথায় কি এমন কাজে ব্যস্ত যে আমি এলাম, আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে এল না। আবার নীচে এলাম। এ ঘর ও ঘর চারিদিকে একবার ঘুরে এলাম। কোথাও নেই। এর মানে কি? এত রাত্রে গেল কোথায়?

নীচে বারান্দায় মার সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। মা রান্না-ঘরের দিক থেকে ফিরে আসছেন মা জিজ্ঞাসা করলেন—"এখন খাবি ত? ভাত দিতে বলি কেমন? তোর দাদা এখন খাবে?"

বললাম "হ্যাঁ। দাদা ত সন্ধ্যা-আহ্নিক বোটেই সেরে এসেছেন।"

মা রান্না-ঘরের দিকে আবার ফিরে যাচ্ছেন দেখে ডাকলাম "মা!" মা ফিরে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞাসা করলাম "বউ কোথায়?"

মা জবাব দিলেন "ও বাড়ী গেছে।"

"ও বাড়ী" বলতে মুকুন্দর বাড়ীই বোঝায়। আমার শরীর হঠাৎ কেমন শিউরে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলাম "কেন?"

মা যেমনি নির্লিপ্ত সুরেই জবাব দিলেন "মুকুন্দর বউয়ের নাকি কি অসুখ করেছে।"

মার গলার সুরে এবং কথা বলার ভঙ্গিতে স্পষ্টই বোঝা গেল তুষারের ওবাড়ী যাওয়ার দরুণ কোথায় যেন কি একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে মার মনে।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম "কি অসুখ?"

বললেন "বুধবার দুপুর থেকে জ্বর হয়েছে। এমন বিশেষ কিছু নয়।"

"কখন গেছে?"

"এই তিন দিন ধরে বেশীর ভাগই ত সেখানেই থাকে। আজও ত দুপুর-

বেলা খেয়ে উঠেই গিয়েছিল। বিকেলে ফিরে এসে কাপড় চোপড় কেচে সন্ধ্যাবেলা আবার গেছে। কত রাত্রে ফিরবে কে জানে!"

"ওর যাওয়ার এত কি দরকার?" আমার গলার সুরে যে ঠিক কি ভাব প্রকাশ হয়েছিল আমার এখন আর ঠিক মনে নাই।

মা বললেন "তার নাকি সেবা করবার লোক কেউ নেই।"

হঠাৎ কেন জানি না জিজ্ঞাসা করলাম—"রাত্রে আলো নিয়ে লোক যাবে আনতে?"

"কখন আসবে তার ঠিক নেই। মুকুন্দই আলো নিয়ে পৌছে দিয়ে যায়।"

আর কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। মা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে রান্না-ঘরে অভিমুখে চলতে লাগলেন। হঠাৎ একটু চেঁচিয়ে মাকে বললাম—"থাক মা! খাবার একটু পরেই দেবে! আমি মুকুন্দর স্ত্রীর খবরটা নিয়ে আসি।"

এই বলে তখুনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

মুকুন্দর বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ মনে কেমন যেন একটা দ্বিধা হ'ল। যে মুকুন্দকে দু'দিন আগে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি—জীবনের মুখ দেখব না বলে, আমিই চলেছি তার বাড়ীতে! একথা বাড়ী থেকে বেরুবার সময় মনে হয়ইনি, পথে চলতে চলতেও একবারও মনে আসে নি। কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন প্রাণ নিয়ে হন হন করে চলে এসেছি—মুকুন্দর বাড়ীর দিকে।

একটু থমকে দাঁড়ালাম। একবার ভাবলাম—না, যাব না, বাড়ী ফিরে গিয়ে একটা লোক পাঠিয়ে তুষারকে ডেকে পাঠাই! আবার মনে হ'ল—মিথ্যা আমার এ অভিমান। এ অভিমান রাখবার ঠাঁই নেইত আমার এ জগতে। সোজা হেঁটে মুকুন্দদের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। এক তলার বাইরের বড় ঘরটায় কোনও লোকজন ছিল না। দু'একজন গোমস্তা যারা বাড়ীতে থাকে তারা বোধ হয় খেতে ভেতরে রান্না বাড়ীতে গিয়েছিল, ঘরে একটা আলো কমান ছিল মাত্র।

ঘর পেরিয়ে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠতে লাগলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই উপরের বারান্দা এবং তারই পাশে পাশাপাশি তিনখানা ঘরের শেষেরটায় মুকুন্দর শোবার ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উপরের কোনও মানুষের সাড়া-শব্দ পেলাম না। খানিকটা উঠে উপরের কাছাকাছি হওয়া মাত্র মুকুন্দর গলা পেলাম "কে?"

উপরের বারান্দায় কোনও আলো ছিল না। মুকুন্দর শোবার-ঘরে একটা

হারিকেন ক্যান ছিল, তারই একটা ক্ষীণ-রশ্মি বারান্দার অন্যদিকে একটা রেখাপাত করেছিল মাত্র। মুকুন্দর ঘরের সামনে বারান্দায় একটি অন্ধকার কোণে একখানি খাটপাতা ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে মনে হ'ল মুকুন্দ তারই উপর বসে আছে।

তুষার কোথায়? অন্ধকারে ঐ খাটেই বসে আছে নাকি? ভাবতে শরীর কেমন যেন কেঁপে উঠল। তবে বোধ হয় না। মুকুন্দর স্ত্রীর অসুখ যখন, নিশ্চয়ই ঘরের ভিতরে তার স্ত্রীর পাশে বসে তার সেবা কর'ছে। মুকুন্দর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সটান চলে গেলাম একেবারে খাটের কাছে।

তুষার খাটের উপরেই গা এলিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল—আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

আশ্চর্য হয়ে মধুর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "ওমা! তুমি কখন এলে? খবর দাও নি কেন?"

সেই প্রথম, স্পষ্ট মনে আছে, জীবনে সেই প্রথম প্রাণে প্রচণ্ড একটা ঘা লাগল। মনে হ'ল, প্রাণের একটা দিক গেল ধ্বসে! নতুন আলোয় একটা অন্ধকার দিক যেন স্পষ্ট হ'য়ে সজাগ হ'য়ে উঠল।

কেমন যেন একটু অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলাম—

"খুড়োমশাই কোথায়? খুড়ী মা কোথায়?"

কাকে যে প্রশ্ন করলাম জানি না।

মুকুন্দকে ত নয়ই—তুষারকেও নয়।—তুষারই উত্তর দিল। বললে "খুড়োমশাই খেতে গেছেন—খুড়ীমাও সঙ্গে গেছেন। এই ত গেলেন। খুড়ীমা আমাকে বসিয়ে রেখে গেছেন, তিনি এলেই আমি যেতাম।"

একটু চুপ করে থেকে বললে "তা আমি এখন যাই ঠাকুরপো। এই ত একটু আগে Temperature নিলাম। জ্বর যখন এখনও আসেনি, তখন আজ আর আসবে না।"

দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে বললে "না—বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে।"

উঠে দাঁড়িয়ে, গায়ের কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে "চল"। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বললে,—"খুড়োমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে বুঝি?"

কিছুই বললাম না। চলতে লাগলাম। তুষারও আমার সঙ্গে চলল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে, পথে চলতে চলতে মুকুন্দর স্ত্রীর অসুখের কথা সেবার দিক দিয়ে খুড়ীমার অপদার্থতার কথা—কত যে কি সব বলে যেতে লাগল, কিছুই আমার কাণে গেল না—তবে এইটুকু মনে আছে, বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত্রে সেই নির্জন-পথে দুই একবার আমার গা ঘেঁসে এগিয়ে এসেছিল, আমি কেমন যেন চমকে সরে গিয়েছিলাম—কোনও কথা বলিনি।

## ছয়

মাঘ মাসের গোড়াতেই মহল পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে, মফস্বলের কাজ শেষ বাড়ী ফিরে এলাম, ফাল্গুনের ৮ই কি ৯ই! ফাল্গুন-মাসের শেষাশেষিই মাকে নিয়ে কাশী রওনা হলাম।

* * *

সেদিন রাত্রে মুকুন্দর বাড়ীতে তুষারকে আনতে গিয়ে প্রাণের মধ্যে যে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল, তার বোঝা-পড়া নিজের প্রাণের মধ্যে নিজেই করে নিয়েছিলাম, বাইরের কারুরই সাহায্য নি নাই—এমনকি তুষারেরও নয়। সেদিনকার ব্যাপারটা নিয়ে তুষারের সঙ্গে আমার আলোচনা যে একেবারেই হয়নি, এমন নয়। তবে দু'একদিন অবশ্য কোনও কথাবার্তা হ'য়নি, আমিও কিছু বলিনি, সেও চুপ করেই ছিল; আঘাতটা পেয়েছিলাম একটু—গুরুতর রকমেরই, তাই সেই বেদনায় প্রাণখানা ছিল ভরা, রাগ অভিমানের বিশেষ কোনও ঠাঁইই ছিল না প্রাণে। তাই বোধ হয় নিজের ব্যথায় নিজেই অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি, তুষারের সঙ্গে এ নিয়ে কোনও বোঝা-পড়া করবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত আমার হ'য়নি। তুষারও নিশ্চয়ই আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু সেও যেন কেমন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। নেহাত প্রয়োজনীয় ছাড়া আমার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথাবার্তাই বলেনি, দু' একদিন। তবে এটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে ব্যবহারে আমার প্রতি তার কোনও রাগ বা অভিমানের প্রকাশ ত ছিলই না বরং প্রত্যেক

পদে আমার মনকে শান্ত করে তোলবার জন্য সে যেন প্রাণপাত করতে পর্যন্ত রাজী—এমনই একটা নীরব মাধুর্যে ভার উঠেছিল তার সমস্ত ব্যবহার আমার প্রতি। প্রথম, ব্যাপারটা নিয়ে কথাবার্তা হ'ল আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটবার দু'তিন দিন পরে। কথাটা প্রথমে কে তুলেছিল, আমার মনে নাই। তবে তুষারের কথাগুলি আমার আজও মনে আছে। আমার মনোভাবের একটু ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র সহজ, সরল শিশুর মতন সে একেবারে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। সে যে কোনও দোষ করেছে—এ যেন সে ধারণাই করতে পারেনি। রোগীর যন্ত্রণার কথা শুনলে সে কোন দিনই নিজেকে সামলাতে পারেনা, তাই সে ছুটে গিয়েছিল মুকুন্দদের বাড়ীতে, ভুলেই গিয়েছিল আমার নিষেধবাণী। এবং সে কল্পনাও করতে পারেনি যে আমার নিষেধের মধ্যে এতখানি নিষ্ঠুরতা থাকতে পারে যে অসুখে বিসুখে পর্যন্ত সে নিষেধের ব্যতিক্রম হ'বেনা। আর মুকুন্দর স্ত্রীর অসুখের শুশ্রূষার সঙ্গে মুকুন্দর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তার বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা না বলাটা নেহাত অভদ্রতা, তাই তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে সে বাধ্য হ'য়েছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা—তার স্বভাবে কেমনই একটা দুর্বলতা আছে যে অতি সহজেই সে লোকের অপরাধ ক্ষমা করে ফেলে, ক্ষমা চাইবারও অপেক্ষা রাখে না। লোকের চরিত্রের কুৎসিত দিকটা প্রাণে প্রাণে চিরদিন সে পোষণ করে রাখতে পারে না—তার চাইতে ত মরে যাওয়াই ভাল ইত্যাদি ইত্যাদি। অতি সহজভাবে বুঝিয়ে দিলে, তার মুকুন্দদের বাড়ীতে যাওয়ার মধ্যে যে কোন দিক দিয়ে আমাকে এতটুকু অপমান করা হ'য়েছে—এটা সে একেবারেই বুঝতে পারেনি। তার বুদ্ধিই বা কতটুকু। নইলে আমার সম্মান যে সকলের উপরে—সেই ত তার মাথার মণি।

এসব কথায় মন কি সায় দিয়েছিল? সায় যে দিয়েছিল এমন কথা বলতে পারি না, কিন্তু মন কতকটা শান্ত হয়েছিল—এটা নিশ্চয়। বিশেষ করে এই সব কথা বলতে বলতে সে যখন আকুল হ'য়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল—আমি একটু যেন অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম। একবার ভেবেও ছিলাম—হয়ত বা তুষারের প্রতি আমি নিদারুণ অবিচারই করেছি। যাই হোক, ফলে দু'তিন দিন পরে একটা হালকা মন নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—এটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

কিন্তু ভোর হ'তে না হ'তেই চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল—এ ক'দিন ধরে রোজই কেমন হচ্ছে। কে যেন বুকের উপর একটা সজোরে ধাক্কা মেরে ঘুমটা দিলে

ভাঙিয়ে—একটা অসহনীয় ব্যাথায় বুকের ভিতরটা টন টন করে উঠল। শোবার-ঘরের জানালা খোলাই ছিল বাইরের দিকে চেয়ে দেখলাম—অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ভোরের আভাস সবে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে মাত্র, সমস্ত জগৎ তখন সুষুপ্ত। ব্যথাটাকে বুকের মধ্যে চেপে প্রাণপণ শক্তিতে আবার ঘুমুবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু চোখ দু'টো তখন এক মুহূর্তে একেবারে শুকিয়ে এমন হালকা হ'য়ে উঠেছে যে তাকে চেপে বুজিয়ে রাখাও অসম্ভব হ'য়ে উঠল।

আমার পাশেই তুষার অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। দেহ থেকে লেপ কতকটা সরে গেছে—অসংবৃত তার বসন, আলুলায়িত তার অঙ্গ-ভঙ্গি। তার দিকে চাইতেই কেমন যেন প্রাণ-মন দেহ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। নিজেকে বোধহয় একটু সরিয়েও নিয়েছিলাম।

তুষার অবিশ্বাসিনী! না—না এযে অসম্ভব। অসম্ভব—অসম্ভব—বারে বারে মনকে বোঝাই অসম্ভব, কিন্তু মনের মধ্যে ত জোর পাই না। তুষার, —আমার স্ত্রী তুষার, আমারই বিবাহিত ধর্মপত্নী—নিজের কাছে নিজের এতখানি অপমান কিছুতেই সইতে পারলাম না।

আজও ভোর হ'তে না হ'তে সুরু হ'ল আবার সেই দ্বন্দ্ব সেই মর্মবেদনা—এ ক'দিন ধ'রে যা আমাকে তিলে তিলে পীড়া দিয়েছে, বিষে বিষে ভরিয়ে দিয়েছে সমস্ত প্রাণখানা। মনকে চাবুক মেরে বললাম—এ তোমারই দৈন্য। কিন্তু আমার মনের অহঙ্কারের সীমা নাই। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে তোমার স্ত্রীর সীজারের ( Ceaser ) স্ত্রীর মত হওয়া উচিত, সন্দেহ তাকে স্পর্শই বা করবে কেন।

বেলা হ'ল। রোদ উঠল। সমস্ত জগৎখানি মুখর কলরবে উঠল জেগে। এটা ওটা সেটা নানান কাজে মনটাকে অন্যমনস্ক করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু অন্যমনস্ক হইও বা যদি, থেকে থেকে চমকে উঠি। বুকের মধ্যে যে বিষধর-সাপ বাসা বেঁধেছে, বাইরের কাজে কি তার দংশনের হাত থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায় ?

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, যতদূর মনে পড়ে সাত-আট দিন পরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিলাম। মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মনকে দমন করতে পেরেছিলাম কিনা জানিনা, তবে অবসন্ন-মন কিছুদিন পরে নিজেই যেন নিজের কাছে পরাস্ত হ'ল। দংশনে দংশনে সাপের দাঁতের বিষ গেল ফুরিয়ে।

মফস্বল থেকে ফিরে আসার পর, মা-ই প্রথম কাশী যাওয়ার কথাটা তুললেন। বললেন "সুশন! এইবার ত তোর মফস্বলের কাজ শেষ হ'য়েছে—এইবার আমি কিছু দিনের জন্য কাশী ঘুরে আসি।

কেমন যেন মার কাশী যাওয়ার কথা উঠলেই মনটা খারাপ হ'য়ে যেত। কারণ এ নয় যে মাকে ছেড়ে কিছু দিন থাকতে আমার কষ্টের কোনও কারণ ছিল; তবুও মা চলে যাওয়ার কথা উঠলেই কেমনই মনে হ'ত—মার এ সংসারে শান্তি নেই বলেই মা সরে যাইতে চাইছেন। এবং এ সংসারে শান্তি নেই কেন? কারণ অনুমান করাও আমার পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না, তবুও কেমন যেন নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হ'ত।

বললাম "বেশ ত। আমিই তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে কাশী বেড়িয়ে আসব।"

মার মুখে হাসি ফুটল।

বললেন "বেশত—সে ত ভালই হয়। কিন্তু তোর এদিক ছেড়ে কি যাওয়া চলবে! বউমা র'য়েছে।"

বললাম "তা আর কি! সবশুদ্ধই চল না কিছুদিন কাশী থেকে আসি। ললিতও কাশীতেই আছে। আমি বরং তাকে একখানা চিঠি লিখে দি, আমাদের জন্য একটা বাড়ী ঠিক করতে।"

আমারই সেই কলেজের বন্ধু, সুলোচনা দিদির ভাই ললিত এখন কাশীতে ডাক্তারী করে।

মা কিন্তু কথাটা শুনে শুধু একবার বললেন, "বেশ ত," বিশেষ যে কিছু আগ্রহ দেখালেন এমন নয়।

কেন যে মার আগ্রহের অভাব হ'ল তা বুঝতে আমার একটু দেরী হ'লনা। বুঝলাম তুষার যে সঙ্গে যায়, এটা মার মোটেই ইচ্ছা নয়। কাশীতে গিয়ে মা দিন কতক সমস্ত অশান্তি থেকে নিরিবিলি একটু দূরে থাকতে চান।

কথাটা সমস্ত দিন মনের মধ্যে তোলপাড় হ'তে লাগল। এক একবার মনে হ'ল মার যখন ইচ্ছে নয় তুষারকে সঙ্গে নিয়ে কাশী যাওয়া, তখন তুষারের সঙ্গে না যাওয়াই ভাল। মাকে দিনকতক নিরিবিলি থাকতে দেওয়াই উচিত। কিন্তু তুষারের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যই মা গিয়ে কাশী বাস করবেন, আর আমিও মাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ীতে তুষারকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘরকন্না করব—ভাবতেও মনে যেন কেমন একটা ব্যথা পাচ্ছিলাম, ভাল লাগছিল না। মা এমনি গিয়ে কিছুদিন দূরে কাটিয়ে আসতেন, আপত্তির কোনও কারণ ছিল না।

তুষারের জন্য যাকে দূরে সরিয়ে দিতে আমারই মনে যেন আত্ম-সম্মানে ঘা লাগল। অথচ কি করি তুষারকেও ত ছাড়া যায় না।

যাই হোক মার কাশী যাওয়ার যখন এত আগ্রহ, তখন তা বন্ধ করা কোনও মতেই চলে না। মা হয় একটা ব্যবস্থা হ'বেই এই ভেবে বাড়ী ঠিক করবার জন্য ললিতকে চিঠি লিখে দিলাম।

ব্যবস্থা হ'ল—সবদিক দিয়েই আমার মন তাতে সম্পূর্ণ সায় দিল। ক'দিন ধরে কেবলই ভাবছি কেমন ক'রে আমার মনের সঙ্গে মিলিয়ে মার কাশী যাওয়ার একটা সুব্যবস্থা করি, এমন সময়—ললিতকে চিঠি লেখার পাঁচ-ছয় দিন পরে-তুষারের বাপের বাড়ী থেকে খবর এল, তুষারের মার শরীর বিশেষ খারাপ; তিনি তুষারকে কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দিতে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন। খবর নিয়ে এল, তুষারেরই সম্পর্কে একটি খুড়তুতো ভাই—বয়স বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ, নাম জলধর। এ একেবারে তুষারকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে।

আমার মত না দেওয়ার কোনও কারণ নেই, এবং মাও কোনও অমত করলেন না। দু-তিন দিনের মধ্যেই তুষার বাপের বাড়ী রওনা হ'য়ে গেল।

তুষার বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় কেমন যেন কাতর-ভাবে একবার আমার দিকে চেয়েছিল। বলে গেল—রীতিমত যেন তাকে চিঠিপত্র লিখি, এবং কাশী থেকে ফিরে এসেই যেন লোক পাঠিয়ে তাকে আনাই, দেরী যেন না করি।

তার সেই করুণ চোখ-দু'টোর দিকে চেয়ে আমার মনটায় হঠাৎ কেমন যেন একটা কষ্ট হয়েছিল—আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে হ'ল অভাগিনী একটুকুও বুঝতে পারলে না যে তার এই সময় চলে যাওয়াটা আমাদের বাড়ীর দিক দিয়ে, বিশেষ করে আমার মনের দিক দিয়ে কতখানি বাঞ্ছনীয় হ'য়ে উঠেছিল। তার চলে যাওয়ার দরুণ, এতটুকু ব্যথা, এতটুকু অতৃপ্তি আমাদের বাড়ীর, কৈ, কোথাও ত একটুও লক্ষ্য করা গেল না। চারিদিকেই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস।

তুষার চলে যাওয়ার দিন সাতেক পরেই কাশী রওনা হ'লাম। দাদা কিন্তু কিছুতে সঙ্গে যেতে রাজী হলেন না। বললেন—তাঁর বইখানা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে এ সময় তিনি নিরিবিলি বাড়ীতেই থাকতে চান। দূরে গিয়ে নিজের মনকে বিক্ষিপ্ত করতে তিনি রাজী নন।

*　　*　　*

মাকে নিয়ে কাশী এসে পৌঁছিলাম একদিন সকাল বেলায়—এই বেলা ৮টা আন্দাজ। এর আগে জীবনে আর একবার মাত্র কাশী এসেছিলাম, যখন কলেজে পড়ি—বাবা মার সঙ্গে। সেবার কাশী যে বিশেষ ভাল লেগেছিল বলতে পারি না কিন্তু এবার কাশীতে দিনকতক বাস করে সত্য সত্যই বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কাশী, ভারতের মহামানবের পুণ্যতীর্থ কাশী—তার মধ্যে যে কি আছে সেটা প্রাণে-প্রাণে অনুভব করা যায়, বোঝান যায় না। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কাশীতে দেখার মত বিশেষ কিছুই নেই—অপরিষ্কৃত ধূলোয় ভরা আঁকাবাঁকা সব রাজপথ, সারি সারি, বড় এলো-মেলো সব অট্টালিকা—তার না আছে কোন কারুকার্যের শ্রী, না আছে কোন সামঞ্জস্যের ছন্দ, ছড়ান ছড়ান জীর্ণ খোলার বস্তি—ইতর অপরিচ্ছন্নতার দৈন্যে ভরপুর, হরেক-রকম লোকজন, হরেক-রকম জিনিষের দোকান-পাট, হাট-বাজার ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত। কিন্তু তবুও কাশী, কাশী। অপরাহ্নে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বেড়াতে উচ্চশির কাশী নগরটির দিকে চেয়ে চেয়ে একাধিকবার মনে হয়েছে,—এ যেন এক রুক্ষ, নগ্ন, তপস্যারত সন্ন্যাসী, উর্দ্ধবাহু, ধ্যানস্থ; আধুনিক কালের সমস্ত জগৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, আত্মসমাহিত নিজেরই পরিপূর্ণতায়। এযুগের মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা, আধুনিক সভ্যতা সবই যেন, অনিত্য তুচ্ছ, নিত্যরসের পুণ্যামৃত কাশীর মধ্যেই চির-নূতন চির-সরস। মনে হয়েছে, সনাতন আদি যুগের মহামন্ত্রটি অমর হ'য়ে বাঁধা পড়েছে কাশীর আকাশে বাতাসে, কাশীর ঐ সব সরু সরু গলির পথের মধ্যে মন্দিরে-মন্দিরে, গঙ্গাবক্ষে, চিরদিনের জন্য চিরকালের জন্য।

ললিত ষ্টেশনে এসেছিল, আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে নিতে। বললে— "এ বেলাটা আমার ওখানেই চল। তোমাদের জন্য যে বাড়ী ঠিক হ'য়েছে, খাওয়া দাওয়া করে বিকেল বেলা সেখানে যেও।"

একা যোগে ষ্টেশন থেকে ললিতদের বাড়ী এসে পৌঁছলাম। গোধূলিয়ার বড় রাস্তার উপরেই একটি ছোট জীর্ণ-দোতলা বাড়ীর সামনে একা এসে দাঁড়াল। এইটে ললিতের বাড়ী। নীচের তলায় বড় রাস্তার উপরে বাইরে একখানি ঘর...ললিতের ডাক্তরখানা। এই ঘরটির পাশ দিয়ে সরু-পথ...অন্দর মহলে যাওয়া যায়। আমাদের একা এসে দাঁড়ান মাত্র কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ছুটে এল বাড়ীর সদর দরজার কাছে...রাস্তার ধারে। তাদেরই পিছনে এসে দাঁড়ালেন একটি মধ্য-বয়সী স্ত্রীলোক, একটু অতিরিক্ত স্থূলকায়া

পরিধানে তাঁর একখানি চওড়া লালপেড়ে মিহি তাঁতের-সাড়ী, তুইহাতে কব্জীর কাছে ঝক্ ঝক্ ক'রছিল একরাশ সেণার-চুড়ী—উজ্জল গায়ের বর্ণের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছিল।

আমরা নেমে অন্দরের পথে প্রবেশ করতেই মহিলাটি হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে সুশান্ত! কেমন আছিস? চিনতে পারছিস ত?"

"সুলোচনা দিদি যে" তারপর ললিতের দিকে চেয়ে বললাম "বারে—ললিত। তুই এতক্ষণ বলিস নি, সুলোচনা দিদি এখানে আছেন।"

ললিত একটু হেসে বললে "দিদিইত মানা করে দিয়েছিলেন—বলতে।"

সুলোচনাদিদি বললেন—"ইনি তোর মা বুঝি সুশান্ত? আসুন মা ভিতরে আসুন। আপনার সঙ্গে ত কখনও আমার দেখা হয়নি, কিন্তু সুশান্তর কাছে আপনার কথা কত শুনেছি। সুশান্তকে ত আমি পর মনে করি না। আমার কাছে ললিত যা—সুশান্তও তাই।"

এ ধরণের কথা সুলোচনাদিদির মুখে আগেও অনেকবার শুনেছি। কলকাতার কলেজ জীবনে অবশ্য সুলোচনাদিদির আন্তরিক স্নেহের পরিচয় অনেকবার পেয়েছি এবং চিরকালই সুলোচনাদিদির এই ধরণের কথাবার্তায় এমনিই একটা স্বচ্ছ সরলতার অভিব্যক্তি ছিল যে সুলোচনাদিদির এসব কথা একটা অতিরিক্ত বাহুল্য বা অতিরঞ্জিত ভদ্রতা বলে কোনও কালেই মনে হয়নি।

সুলোচনাদিদি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "তা বউকে সঙ্গে আনিস নি সুশান্ত?"

আমি বললাম "না। তার আসা হ'ল না। হঠাৎ তার মার অসুখ করাতে বাপের বাড়ী যেতে হ'ল।"

সুলোচনাদিদি সত্যিই যেন বিশেস তুঃখিত হলেন। বললেন "এঃ। আমি কত আশা ক'রে বসে আছি সে আসবে। ক'টা দিন তাকে নিয়ে আমোদে কাটাব। কতদিন তাকে দেখিনি—না জানি এখন দেখতে কি ভালই হয়েছে।"

সুলোচনাদিদির সঙ্গে তুষারের অবশ্য পূর্বেই আলাপ হয়েছিল। আমার বিবাহের বছর তুই পরে, সুলোচনাদিদির বিশেষ অনুরোধে একবার তুষারকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলাম। উঠেছিলামও ললিতদের বাড়ীতেই।

সুলোচনাদিদির আদর-যত্নে সমস্ত দিনটা চমৎকার কাটল। নানান কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে সুলোচনাদিদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কথাই না আমাকে

জিজ্ঞাসা করলেন, কত কথাই না আমাকে বললেন। ললিতের স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা, মা নাই, সুলোচনাদিদি এলাহাবাদ থেকে ভায়ের বাড়ীতে এসে কিছুদিন আছেন। সুলোচনাদিদির দু'টি ছেলে দু'টি মেয়ে। ছোট ছেলেটিকে এবং মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, বড়দের রেখে এসেছেন এলাহাবাদে—সেখানে তাঁর শাশুড়ী আছেন কি না। তা শাশুড়ী ছেলে মেয়েদের যত্ন করেন খুব। সে বিষয় সুলোচনাদিদি নিশ্চিন্ত। এদিকে কাশীতে তাঁকে ত মাঝে মাঝে আসতেই হয়, কেননা সময়ে সময়ে ললিতের সংসার প্রায় অচল হ'য়ে ওঠে। বউটা—নাম তার নলিনী,—সে ত একরকম চিররুগ্না তার উপরে, মা-ষষ্ঠির অযাচিত কৃপায় ললিতের স্ত্রীর সুস্থ হ'য়ে সহজ মানুষের মত জীবনযাপন—এ ত ললিতের আত্মীয়স্বজন, বাড়ীর লোকজন একরকম ভুলেই গিয়েছে। এক ফাঁকে মাকে বললেন আমার কানে গেল, "তা সুশান্তর ছেলেপুলে হলনা এ কি রকম অন্যায় কথা। আপনি কোনরকম শান্তি-স্বস্ত্যয়ন···যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা করুন।"

খাওয়া দাওয়া সেরে গুছিয়ে গাছিয়ে নিজেদের ভাড়াটে বাড়ীতে যেতে বিকেল হ'ল। যাওয়ার সময় সুলোচনাদিদি বললেন "তা আলাদা বাড়ী না করে কিছুদিন এখানে থাকলেই ত বেশ হ'ত।"

ললিতের স্ত্রী একটু আড়াল থেকে ঈষৎ চাপাগলায় বললে "আমাদের ত ভালই হ'ত। যে ছোট বাড়ী ওদের কত কষ্ট হ'ত।"

বাঙ্গালীটোলায় দশাশ্বমেধ ঘাটের খুব কাছাকাছি আমাদের জন্য একটি ত্রিতল অট্টালিকা ভাড়া হয়েছিল। দোতলা এবং তিনতলাটা আমাদের ব্যবহারের জন্য এবং একতলায় বাড়ীওয়ালা থাকতেন। দোতলায় চারখানা এবং তিনতলায় রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর আরও একখানি ঘর এবং ঘরগুলির সামনে একটি বারন্দা। একটি ব্রাহ্মণী এবং একটি দাসী আগে থাকতেই ললিত বন্দোবস্ত করে রেখেছিল—আমাদের সেবার জন্য।

সুলোচনাদিদির সঙ্গে পরামর্শ করার দরুণই হোক, বা মার প্রাণের একান্ত বাসনার ফলেই হোক, কিছুদিনের মধ্যে এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন হ'ল আমাদের বাড়ীতে। ব্রাহ্মণ এল, পূজা হোল, হোম হোল, বিশ্বনাথের বাড়ীতে ঘটা ক'রে পূজা দেওয়া হোল, আমাকে গরদের ধুতি পরান হলো, সুলোচনাদিদি স্বহস্তে কপালে পরিয়ে দিলেন চন্দনের তিলক, এবং বিশ্বনাথের চরণামৃত মা নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিলেন, মাথায় দিলেন আশীর্বাদী ফুল।

## সাত

কাশীতে দু'টো-মাস ত থাকবই এবং যদি বিশেষ কোনও অসুবিধা না হয় ত তিন-মাসও থাকতে পারি—এই রকম একটা ইচ্ছা নিয়ে কাশী এসেছিলাম। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই বাড়ী থেকে দাদার এক চিঠি এসে হাজির হ'ল—পত্রপাঠ আমাদের রওনা হ'য়ে যাওয়ার জন্য লিখেছেন। কারণ বউমা অর্থাৎ তুষার, হঠাৎ বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছেন, এবং যদিও সরলা ঝি আছে, তবু আমরা ফিরে না গেলে তাঁর পক্ষে একলা ও-বাড়ীতে থাকা একরকম অসম্ভব।

আমি এবং মা দু'জনেই চিঠি পেয়ে অবাক হলাম। তুষারের হঠাৎ এরকম ফিরে আসার কোনও কারণই আন্দাজ করা গেল না। এই ত চার-পাঁচ দিন হ'ল আমি তুষারের চিঠি পেয়েছি, কিন্তু সে চিঠিতে ফিরে আসার কথা ত কিছুই লেখেনি।

মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। কাশীতে এই একমাসেই আমার প্রাণ ধীরে ধীরে যেন হাঁপ ছেড়ে মুক্তি পাচ্ছিল—আবার যেন ফিরে পাচ্ছিল তার সেই নিজস্ব আনন্দটুকু, যা সে একটু একটু করে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল দেশের পারিবারিক জীবনের সেই ঘাত প্রতিঘাতের পঙ্কিল আবর্তে।

দাদার চিঠি পড়ে মা বললেন "কিন্তু আর ত সাত-আট দিন থাকতেই হ'বে। কি একটা বিশেষ পুণ্যযোগের কথা তুলে বললেন "সেই শুভদিনের আর ত মোটে দিন সাতেক বাকী! কাশীর মত যায়গা থেকে অমন দিন পিছনে ফেলে গেলে যে মহাপাপ হবে।"

সমস্ত দিন মনটা খারাপ হ'য়ে রইল। বিকেলে ৪-টের মধ্যেই ললিতদের বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল। সাধারণতঃ বিকেলটা ললিতদের বাড়ীতেই 'চা' খেয়ে আমি ও ললিত একসঙ্গে বেড়াতে বেরুতাম এবং প্রায়ই সুলোচনাদিদিও আমাদের সঙ্গে যেতেন। কিন্তু আজ বিকেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ললিতের বাড়ী না গিয়ে আমি গঙ্গার ঘাটের দিকে চললাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলাম···একটা ভারী প্রাণ নিয়ে।

বসে বসে নানান দিকের নানান এলোমেলো চিন্তা মনটাকে পেয়ে বসল।

ভাবতে লাগলাম। একবার মনে হ'ল মনটাকে আরও কিছুদিন বিশ্রাম দেওয়া দরকার। মন এখনও ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। কিন্তু ফিরে না গিয়েই বা উপায় কি? তুষার ফিরে এসেছে—একলা থাকবেই বা কি করে? হঠাৎ শরীর, মন একসঙ্গে কেমন শিউরে উঠল। মনে হ'ল সেই মুকুন্দ—একলা তুষার। সমস্ত দিন ত কই একথাটা ঠিক এ ভাবে মনে হয় নি। ছিঃ ছিঃ ভাবতেও লজ্জা হয়—সেই মুহূর্তেই ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। আর যেন এক মুহূর্ত কাশীতে থাকা চলে না।

সন্ধ্যা ঘোর হ'তে না হ'তে বাড়ী ফিরে এলাম। মা বিশ্বনাথের আরতি দেখতে যাওয়ার জন্য তৈরী ছিলেন। রোজই সন্ধ্যার পর আমি ও ললিত মাকে বিশ্বনাথের আরতি দেখাতে নিয়ে যেতাম। মা আমাকে একলা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "কই ললিত এল না? সুলোচনাও যে আজ আরতি দেখতে যাবে বলেছিল?"

বললাম "ললিতদের বাড়ীতে আজ আর যাইনি।" একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বললাম "মা আমার মনে হয় কালই আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।" মা আমার মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে থেকে শান্তস্বরে বললেন "বেশ।"

বললাম "কালই দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া ক'রে দু'টোর গাড়ীতে রওনা হওয়া যাবে—কি বল?"

ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ললিত ও সুলোচনা দিদি এসে হাজির হলেন। বিকেলে কেন আমি ললিতদের বাড়ী যাইনি… সুলোচনাদিদির কাছে সেই কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমরা সবাই বিশ্বনাথের মন্দির অভিমুখে রওনা হলাম।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে আবার আকাশ পাতাল চিন্তায় মনটাকে পেয়ে বসল। সবাই বাধা দিচ্ছে, সবাই আমাকে পিছু থেকে ডাকছে। সকলকেই দুঃখিত করে কাল রওনা হ'ব? সামনেই শুভ-যোগ—কাশীতে এসে যদি গঙ্গাস্নান না ক'রে ফিরে যেতে হয়, মা যদিও মুখে কিছু বলবেন না, মনে মনে যে মর্মান্তিক বেদনা পাবেন—বুঝতে আমার একটুও বাকী ছিল না। তবুও কালই যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি—কেন? ভাবলাম—নিজেরি মনের একটা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য; আর ত কিছু নয়। দুর্বলতা, নিতান্ত দুর্বলতা! কালই রওনা হই বা দু'দিন পরেই রওনা হই, বাইরের দিক দিয়ে তাতে ত বিন্দুমাত্রও আসে যায় না। সত্যই যদি তুষার অবিশ্বাসিনী হ'য়ে থাকে, কাল রওনা হলেও

যা দু'দিন পরে রওনা হ'লেও তাই। যদি তার প্রতি অন্যায় সন্দেহই করে থাকি, এত বাধা সত্ত্বে কালই রওনা হ'য়ে ত তাকে অপমানই করছি। সুতরাং কালই রওনা হ'তে চাইছি, নিজের দুর্বল অন্তরের অন্যায় প্ররোচনায়—নিজেরি মনের তুষ্টির জন্য। ভাবলাম—না, মনকে সংযত করা দরকার।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, মনটা বড়ই ক্লান্ত, বিশেষ ভারী হ'য়ে রয়েছে! এত ক্লান্ত যে সেই দিনই রওনা হওয়ার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত নয়! তবুও মাকে কিছুই না বলে মুখ হাত ধুয়ে গঙ্গার ধারে একবার বেড়াতে গেলাম। বাড়ী ফিরে সদর দরজায় পোষ্ট পিওনের সঙ্গে দেখা হলো! সে আমার হাতে একখানা চিঠি দিলে। আমারই চিঠি, তুষার লিখেছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পড়ে ফেললাম। পত্রপাঠ বিশেষ অনুরোধ ক'রে আমাকে রওনা হ'তে লিখেছে। তুষার লিখছে :—

দেবতা আমার,

ওগো! আমি হঠাৎ আজকে পলতা থেকে ফিরে এসেছি। আজ দুপুর বেলা এসে পৌঁছেচি।—জান ত, নৌকায় চড়লেই আমার কি রকম মাথা ঘোরে। তাই এখানে এসে সমস্ত দিনটা প্রায় শুয়েই ছিলাম। রাত্রে উঠে এখন একটু সুস্থ বোধ করছি, তাই এখনই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

পলতায় হঠাৎ "মার অনুগ্রহ" দেখা দিয়েছে। আমাদের বাড়ী ত গ্রামের পশ্চিম পাড়ায়। পূর্বের পাড়ায় একটা লোক মরেছে মা এ অবস্থায় আমাকে আর পলতায় রাখতে সাহস করলেন না। জলধরের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

এখানে এসে প্রাণের মধ্যে যে কি রকম হু-হু করছে, তোমাকে আর কি জানাব? শূন্য বাড়ী, তুমি নেই, আমি যেন এক মুহূর্তও এ বাড়ীতে টিঁকতে পারছি না। প্রত্যেক পদে পদে তোমার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠছে। চমকে উঠছি, খালি যেন শুনছি বাইরের বারান্দায় তোমার পায়ের শব্দ। ওগো প্রিয়তম! তুমি যে আমার কতখানি তুমি কি তা বোঝ?

ওগো! তুমি পত্রপাঠ মাত্র চলে এস। তোমাকে ছেড়ে আর আমি একমুহূর্তও থাকতে পারছি না। কোনদিন ত এ বাড়ীতে তোমাকে ছেড়ে একলা থাকিনি। তাই তোমার অভাবটা এতটা অসহ্য বোধ হচ্ছে। তুমি চিঠি পাওয়া মাত্র রওনা হ'য়ে আসবে ত?

ভাসুরঠাকুর বললেন, তিনি আজকের ডাকেই তোমাকে চিঠি লিখে দিয়েছেন পত্রপাঠ চলে আসবার জন্য। ভাসুরঠাকুর যে আমার কি রকম যত্ন করছেন, সে

আর তোমাকে চিঠিতে কি জানাব? আমার যাতে কোনও দিকে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য সমস্ত দিনটা আজ অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পাছে আমার একলা শুতে ভয় করে, সেইজন্য বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন সরলা-ঝি ত আমার ঘরে শোবেই তা'ছাড়া বারান্দায় আমার ঘরের ঠিক সামনেই দু'জন চাকর শোবে। সত্যি, অনেক পুণ্যের ফলে এ রকম ভাসুর পেয়েছিলাম। তুমি ঠিকই বলতে— উনি মানুষ নন, দেবতা।

কিন্তু সত্যাই যা ব্যবস্থা হোকনা কেন, তুমি নইলে সবই ফাঁকা। তুমি দুই-এক দিনের মধ্যে না এলে, আমি এরকম ভাবে একলা এ বাড়ীতে থাকলে বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। সমস্ত দিন কি ক'রে কাটাই বল ত? তাই বলি চিঠি পাওয়া মাত্র রওনা হও, লক্ষ্মীটি। এস কিন্তু, আমার বিশেষ অনুরোধ দু'টি পায়ে পড়ি।

মার শরীর ভাল আছে ত? মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও। তুমি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং প্রাণভরা ভালবাসা নিও। ইতি

তোমারই তুষার।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে তুষারের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে পড়ে গেল আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার বেলায় তার সেই কাতর চোখ দু'টো। সকাল বেলায় ভারী মন, সহসা আপনা থেকে হালকা হ'য়ে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম ললিত আসছে। ললিত এসে বললে "দিদি পাঠিয়ে দিলেন। রাত্রে তোমার আমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ।"

বললাম "বেশত। কি খাওয়াবেন দিদি?"

ললিত বললে "তাহ'লে তোমরা আজ আর যাচ্ছ না ত?"

একটু হেসে বললাম "পাগল, আজ যাওয়া হয় না, মার একান্ত ইচ্ছা, সামনের স্নানটা সেরে যান।"

ললিত বললে "তাহ'লে চল না আমাদের বাড়ীতে।"

বললাম "তুমি যাও, আমি একখানা চিঠি লিখে একটু পরে যাচ্ছি।"

বললে "আচ্ছা। আমার পথে একটু কাজও আছে সেরে বাড়ী যাব।"

ললিত চলে গেল। ভিতরে গিয়ে মাকে ডেকে বললাম "মা, থাক আজ, আর যাব না। স্নানটা সেরে সাত-আট দিন পরেই রওনা হওয়া যাবে।"

* * * *

এক সপ্তাহ কাটল। কালই সেই শুভদিন। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক হিন্দু নরনারী কাশীতে এসেছে, এই শুভযোগে গঙ্গাস্নান ক'রে বিশ্বনাথকে একবার

দর্শন করবার জন্য। কি যে যোগটা ঠিক নাম এখন আমার মনে নাই। তবে এইটুকু মনে আছে, সবাই বলেছিল, পঁচিশ-ত্রিশ বছর অন্তর এই শুভদিনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং এমন দিনে কাশীর মত তীর্থক্ষেত্রে থাকা বহু জন্মের তপস্যার ফল।

শুভযোগের সময়টাও মনে আছে, রাত ১১টা ২০ মিনিট ১০ সেকেণ্ড গতে ১২টা ৩৯ মিনিট ১৮ সেকেণ্ডের মধ্যে। শুনেছিলাম এই সময়ের মধ্যে গঙ্গাস্নান ক'রে বিশ্বনাথের দর্শন করলে সপ্তজন্মের পাপ-স্খলন হয়! ঐ সময় গঙ্গার ঘাটে এবং বিশ্বনাথের মন্দিরে অসম্ভব ভীড় হ'বে, এটা সহজে অনুমান করা গেল। কি রকমে কি বন্দোবস্ত করলে মোটের উপর সহজে সব সুসম্পন্ন করা যায়, এই নিয়ে সাত দিন ধরে আমাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। সুলোচনাদিদির মতে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্ব হতেই গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকা উচিত, নইলে রাস্তার ভীড় ঠেলে ঠিক সময়ের মধ্যে হয় ত গঙ্গাস্নান হ'য়ে উঠ্‌বে না। ললিতের মতে ঐ ভীড়ে, কাশীর মত স্থানে অত রাত্রে মেয়েদের নিয়ে না বেরুনই ভাল, এবং যদি বেরুতেই হয় ত প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গে অন্ততঃ চারজন ক'রে পুরুষ থাকা দরকার। অত পুরুষ লোক যখন আমাদের মধ্যে নাই, তখন সুলোচনাদিদির না যাওয়াই উচিত। আমি এবং ললিত মাকে নিয়ে কোনও রকমে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে আনা যাবে। আর গঙ্গাস্নান? এক ঘটী গঙ্গা জল আগে থাকতে নিয়ে এসে মাথায় একটু ছিটিয়ে নিলেই হবে। এই কথা শুনে সুলোচনাদিদি রেগে উঠে বলেছিলেন, এমন দিনে কাশীতে থেকে তিনি চুপ ক'রে ঘরে বসে থাকতে পারবেন না। ললিত যদি একান্তই নিয়ে না যায়, এবং আমিও যদি সাহস না করি, তিনি টেলিগ্রাফ করিয়ে বিমলবাবু অর্থাৎ তাঁর স্বামীকে আনবেন। আমি সুলোচনাদিদিকে ভরসা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম "দিদি! ব্যস্ত হবেন না, যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবেই।"

যাই হোক, শুভযোগের আগের দিন তুষারের কাছ থেকে আমার চিঠির জবাব পেলাম। বেশ চিঠিখানা লিখেছে। আমার যেতে দেরী হওয়ার দরুণ প্রাণে ব্যথা পেয়েছে খুবই, কিন্তু তবুও সে যে অবুঝ নয়, এটা আমাকে চিঠিতে বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে; এবং বারে বারে অনুরোধ করেছে শুভযোগের পরের দিনই যেন রওনা হই আর যেন কোন বাধা না হয়। চিঠিতে কত দুঃখ করেছে নিজের দুরদৃষ্টের জন্য। এমন দিনে আমার হাত ধরে গঙ্গাস্নান করবার মহাপুণ্য থেকে সে বঞ্চিত হলো, না জানি কত পাপই করেছিল পূর্বজন্মে।

কিন্তু সেই দিনই বেলা ৩টা আন্দাজ দাদার এক 'তার' এসে হাজির হলো। তার পাওয়া মাত্র আমাদের রওনা হ'য়ে যেতে লিখেছেন। কোনও কারণ দেখাননি এবং কেন যে সব জেনে-শুনে হঠাৎ আমাদের যাওয়ার জন্য তার করলেন, তার কোনও ইঙ্গিত পর্যন্ত দেননি তুষারকে এবং দাদাকে আগেই সব খুলে লেখা হয়েছে এবং জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কালকের দিনটা কাটিয়ে পরশুই আমরা রওনা হবো। তবুও এক তার এসে হাজির হলো।

কিছুই বুঝলাম না। মনটা বিশেষ খারাপ হ'য়ে গেল। মাও একটু কেমন স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

বললেন, "ত চল, আজই রাত্রের গাড়ীতে ফিরে যাই।"

যদিও ভীষণ একটা দুর্ভাবনা হলো হয় ত বা হঠাৎ কারো সাংঘাতিক অসুখ করেছে, তবু আজই রাত্রে ফিরে যেতে কোন রকমেই মন সায় দিল না। পুণ্য করার লোভ, আমার নিজের অবশ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। তবুও সব দিক রক্ষা ক'রে, একটা সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে, হঠাৎ একটা অর্থহীন টেলিগ্রাফের জন্য সব উল্টে নেব? বিশেষতঃ, মার মনের দিক দিয়ে তার ফল যে কতদূর শোচনীয় হবে, অনুমান করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হ'ল না। দাদার উপর মনে মনে একটু রাগও হলো, হঠাৎ এক তার ক'রে বসেছেন, অথচ কোন কারণ দেখান নি!

ললিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, দাদার তার পাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরেই এক তার দিলাম দাদার কাছে। তারটি এবার সাধারণ নয়, জরুরী। উত্তর দেওয়ার টাকাও সঙ্গে দিলাম। দাদাকে প্রশ্ন ক'রে পাঠালাম "কেন?, কারও কী ভীষণ অসুখ?"

সেদিন রাত্রে অবশ্য কোনও জবাব পেলাম না। সমস্ত রাতটা নানান দুর্ভাবনায় ভাল ক'রে ঘুমুতেই পারলাম না ছটফট ক'রে কাটিয়ে দিলাম। মাকে দাদার কাছে তার পাঠানর কথা বলেছিলাম এবং মুখে কিছু না বললেও মাও যে সমস্ত রাত বিশেষ অস্থিরতায় কাটিয়েছেন, বুঝতে আমার এতটুকু বাকী ছিল না।

জবাব এল, তার পরের দিন বেলা প্রায় বারোটা আন্দাজ। জবাব পেয়ে সত্য সত্যই আমি একেবারে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। দাদার কি মাথা খারাপ হয়েছে? লিখেছেন "সবাই ভাল আছে, ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই।"

তবুও মনটা কিন্তু শান্ত হ'ল না। আগের তার যে কেন করেছিলেন, কোন সন্তোষজনক কারণই খুঁজে পেলাম না। নানান চিন্তা মনটাকে পেয়ে বসল। একটি একটি ক'রে, যা কিছু কল্পনা করা যায়, সমস্ত রকম কারণ ভেবে দেখলাম।

শেষ পর্যন্ত নানান রকম ভেবে মোটামুটি একটা কারণ মনে ঠিক ক'রে নিলাম। তুষার হয় ত কোনও কারণে রেগে দাদাকে বিশেষ কিছু অপমান করেছে, তাই দাদা দুঃখে-কষ্টে, অভিমানে হঠাৎ ঐ রকম তার পাঠিয়েছেন। কিন্তু তুষার ত দাদার সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলে না। হয় ত ব্যবহারে কিছু অমর্যাদা দেখিয়েছে, কিম্বা আড়াল থেকে শুনিয়েই কোনও অপমানসূচক কথা বলেছে।

তারের কথা শুনিয়ে মাকে বললাম "মা! দাদার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

মা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন "যাই হোক, কালকেই দুপুরের গাড়ীতে ফিরে চল, আর কাশীতে থেকে দরকার নেই।"

সমস্ত দিন মনটা ভারী হয়েই ছিল, কিন্তু সূর্যদেব অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগস্নানের আয়োজনে, ভারটা মনের মধ্যে চাপা পড়ে গেল, একটা উত্তেজনায় ভরে উঠল প্রাণ। ললিত, জানা-শোনা দু'চারজন ভলান্টিয়ারের সঙ্গে কথা ব'লে, কি ভাবে কি বন্দোবস্ত করলে ভাল হয়, চারটের মধ্যেই আমাকে খবর দেবে, এই ছিল ব্যবস্থা; কিন্তু সূর্য অস্ত গেল, তবুও ললিতের বাড়ীর কোনও খবর নেই দেখে আমিই ললিতদের বাড়ী অভিমুখে রওনা হ'লাম।

কিন্তু সেইখানে গিয়ে দেখি, ললিতের স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত—ললিতদের বাড়ীতে ভীষণ চাঞ্চল্য! সকাল থেকেই নাকি ললিতের স্ত্রীর শরীরটা খারাপ হয়েছিল এবং দুপুরের পর থেকেই বেদনা বেশ স্পষ্টভাবে আরম্ভ হয়েছে। ললিত স্ত্রীর অবস্থাটা বিস্তারিত বর্ণনা করে বললে "এই ত অবস্থা ভাই। আমাদের ত কারও যাওয়া হয় না।"

আমি বললাম "তা এতক্ষণ আমাদের বাড়ীতে একটা খবর দাওনি কেন।" মা এসে একবার দেখে যেতে পারতেন।"

ললিত বললে "সে কথা ত অনেকক্ষণ ধরে ভাবছি। কিন্তু কে যায় বল? চাকরটাকে ত প্রায় এক ঘণ্টা হ'ল ধাত্রী আনতে পাঠিয়েছি, এখনও এল না। এদিকে এই অবস্থা, আমি ত বাড়ী ছেড়ে যেতে পারছি না, দিদি ও বামুনঠাকরুণ নলিনীকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন।

সুলোচনাদিদি বোধ হয় আমার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। কোণের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন "কে? সুশান্ত না কি? দেখলে ত ভাই, অদৃষ্টের খেলা। নইলে আজকের দিনেই ঠিক এ রকম হবে কেন?"

কথাটা সত্য। এই যোগ উপলক্ষে সুলোচনাদিদির উৎসাহ, আগ্রহ বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী ছিল। অবস্থা দেখে, সুলোচনাদিদির জন্য আমার সভ্য

সত্যই একটা কষ্ট হ'ল। কিন্তু উপায় ত কিছুই নাই। সুলোচনাদিদি নিজের মনেই যেন বলতে লাগলেন "কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। নইলে কাশীর মত জায়গায় থেকে এত বড় স্নানটা পর্যন্ত করতে পারলাম না। হবি ত হ' আজকের দিনেই। ঠিক সময়ে হ'লে এখনও ত প্রায় একমাস দেরী। সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্টে না থাকলে কিছুই হয় না।"

সুলোচনাদিদির চোখ দুটো ছল ছল ক'রে উঠল।

কিছুক্ষণ ললিতের বাড়ীতে থেকে বাড়ী ফিরে এলাম। ব'লে এলাম, পার ত স্নানে যাওয়ার আগে মাকে নিয়ে এসে একবার দেখে যাব।

কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠল না। রাত দশটা আন্দাজ স্নান যাত্রায় মাকে নিয়ে বেরুলাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সেরে—বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে জনতার অবস্থা দেখে এক পাণ্ডা নিযুক্ত করতে বাধ্য হ'লাম।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে কাশী ছেড়ে দেশের অভিমুখে রওনা হ'লাম। সম্মুখেই আমার আবার চির-পুরাতন দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত।

ট্রেনে যেতে যেতে হঠাৎ মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "মা! সাবির খবর কি? বহুকাল ত আর কোনও খবর পাইনি!"

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন "বছর পাঁচেক আগে বিধবা হয়েছে খবর পেয়েছিলাম—তারপর আর কোন খবর পাইনি।"

আট

বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলাম, সবই ঠিক আছে; কোনও দিকে কোনও কিছু গোলমাল হয়েছে ব'লে ত একেবারেই মনে হ'ল না অথচ দাদা হঠাৎ ও রকম তার যে কেন করেছিলেন অনেক অনুসন্ধানেও তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

দাদাকে জিজ্ঞাসা করাতে দাদা একটু হেসে বললেন, "এমনি করেছিলাম। তোমরা আসতে বড্ড দেরী করছিলে কিনা তাই।"

বললাম, "বেশ ত, চিঠিতে সব খুলে বুঝিয়ে লিখেছি, কবে রওনা হব তা পর্যন্ত ঠিক জানিয়ে দিয়েছিলাম—তবুও শুধু শুধু হঠাৎ এক টেলিগ্রাফ ক'রে বসলে? এর মানে কি?"

আবার একটু হেসে দাদা বললেন, "বউমা একলা থেকে থেকে বড্ড অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন কিনা তাই।"

যাই হোক, দাদার কাছে থেকে কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পাওয়া গেল না। তুষারকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একেবারে অবাক হ'য়ে গেল। বললে—সে তারের খবর কিছুই জানত না। কেন যে দাদা হঠাৎ ও রকম তার করেছিলেন তার কোনও কারণ আন্দাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

জিজ্ঞাসা করলাম "দাদার সঙ্গে তোমার কি কোনও কথাবার্তা হয়েছিল? কিছু বলেছিলেন তোমাকে?"

একটু ভেবে বললে, "কই—না। এমন ত কোনও কথাই হয়নি।"

বললাম, "এ ত ভারী মজার ব্যাপার।"

একটু ভেবে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "তা তুমি কি কোনও রকম অস্থিরতা রাগ কি দুঃখ প্রকাশ করেছিলে দাদার কাছে—একলা থাকার দরুণ?"

অতি সহজভাবেই তুষার বললে, "বা রে। আমাকে ভাব কি? আমি কেন দাদার কাছে কোনও রকম রাগ বা দুঃখ প্রকাশ করতে যাব! কিছুই ত হয়নি।"

কিছুই বোঝা গেল না। তবে এইটুকু দাদার সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে আগেই আমার মনে হয়েছিল যে, ব্যাপারটা যাই ঘটে থাকুক, দাদা এখন আর তা আমার কাছে প্রকাশ করতে রাজী নন। ইতিমধ্যে তুষারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার আগেই আমি মুকুন্দদের বাড়ীর খবর সবই নিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিক দিয়েও এ-সমস্যা সমাধানের কোনও কিছু আভাষ ইঙ্গিত পর্যন্ত পাইনি। শুনেছিলাম, মুকুন্দর স্ত্রীর শরীর অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে পড়াতে মুকুন্দ মফঃস্বল থেকে ফিরে এসেই স্ত্রীকে ভাল ডাক্তার দেখাবার জন্য সস্ত্রীক কলকাতায় চলে গেছে, এখনও ফেরেনি।

যাই হোক, ব্যাপারটা কোনদিনই আমার কাছে পরিষ্কার হ'ল না। আজ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, পিছন ফিরে সমস্ত জীবনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—

কোনও আবরণ নাই, কোনও আড়াল নাই। কিন্তু কেন যে দাদা হঠাৎ ও রকম তার করেছিলেন আমার কাছে, তার কোনও কারণ সঠিক এখনও প্রকাশ হ'ল না। একটা অনুমান করেছি মাত্র—থাক সে সব অনেক পরের কথা।

কাশী থেকে ফিরে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একটা জিনিষ ক্রমেই বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, তুষারের শুধু যে শ্রদ্ধা-ভক্তি দাদার উপর বেড়ে গিয়েছে তা নয়, প্রাণ-মন দিয়ে সে দাদার উপর নির্ভর ক'রতে শিখেছে, যেন সবাই তাকে ঠেলে ফেলে দিলেও, দাদা কখনও তাকে ঠেলে দিতে পারেন না—এই রকমের একটা মনোভাব।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বেশ লক্ষ্য করলাম,—শুধু দাদার প্রতি ব্যবহারেই নয়, পারিবারিক জীবনের সকল কাজে-কর্মে, দাদার প্রতি একটা সশ্রদ্ধ আন্তরিকতা, তুষারের মধ্যে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠতে লাগলো। সাংসারিক কোনও কাজে দাদার প্রতি কোনও দিক দিয়েই যেন এতটুকু ত্রুটি বা অবহেলা না হয়—এ বিষয়ে তুষার দিন দিন যেন হয়ে উঠল সজাগ। দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম, যে-তুষার কোনও দিনই খুব ভোরে উঠতে পারেনি, ভোরে বিছানা ছেড়ে ওঠা চিরদিনই যার একটা দারুণ বিরক্তির কারণ ছিল, সে আজকাল ভোর হ'তে না হ'তে বিছানা ছেড়ে উঠে স্নান ক'রে দাদার পূজোর যোগাড় ক'রে দেয়—তাতে এতটুকু আলস্য বা বিরক্তির আভাষ পর্যন্ত লক্ষ্য করিনি। দু'বেলাই দাদার পূজো-আহ্নিকের যোগাড় ক'রে দেওয়া তার জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। আগে আগে আমিও দাদা খেতে বসলেই দু'বেলাই মা আমাদের সামনে বসতেন, তুষার বড় একটা থাকত না, কিন্তু আজকাল দু'বেলাই তুষার যেখানেই থাকুক না কেন, আমরা খেতে বসলেই এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাথার ঘোমটা মুখের উপর একটু টেনে দিয়ে আমাদের খাওয়া লক্ষ্য করত এবং দাদার ভোজনটা পরিপাটী হ'লো কিনা এদিকেও যে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, সেটুকুও আমি লক্ষ্য করেছিলাম।

প্রথম প্রথম কিছুদিন, তুষারের দাদার প্রতি এই মনোভাব আমি বিশেষ শান্তি পেয়েছিলাম প্রাণে। আমার দাদাকে তুষার যে এত দিন পরে চিনেছে, প্রাণ-মন দিয়ে ভক্তি করতে শিখেছে, দাদার ঐ রকম নিরাসক্ত জীবনটা যে প্রাণ-ভরা মমতা দিয়ে পরিপাটী ক'রে তুলবার চেষ্টা করেছে—দেখে প্রাণে-প্রাণে যথার্থই একটা তৃপ্তি অনুভব করতাম।

কিন্তু কিছুদিন পরে একদিনের একটা ব্যাপারে আমি সত্য সত্যই মর্মাহত

ও বিস্মিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল—জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কি তুষার স্বাভাবিক সীমারেখা টেনে চলতে জানে না? শিখলেও না কোনদিন? ব্যাপারটা বলি।

আমরা কাশী থেকে ফিরে আসবার বোধ হয় মাসখানেক পরই একদিন খবর পেলাম মুকুন্দ সস্ত্রীক কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এসেছে। মুকুন্দ ফিরে আসবার পাঁচ-সাত দিন পরেই একদিন সকালবেলা খুড়োমশাই আমাদের বাড়ী এসে হাজির। আমাদের বাড়ীর বাইরের উঠানেই খুড়োমহাশয়ের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল।

তিনি বললেন, "এই যে সুশান্ত! তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম। বাড়ীর সব খবর ভাল ত?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তাঁর বাড়ীর খবর কিছু না জিজ্ঞাসা ক'রে শুধু প্রশ্ন করলাম, "আপনার শরীর ভাল আছে ত?" বললেন, "ঐ এক রকম। বয়স ত কম হ'ল না—ভাল থাকার বয়স আমাদের পেরিয়ে গেছে, কোনও রকমে বেঁচে থাকতে পারলেই যথেষ্ট। চল পুকুর ঘাটে বসা যাক।"

এই ব'লে পুকুরের পুবের পাড়ের ঘাটের দিকে চলতে লাগলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চললাম। চলতে চলতে বললেন, "প্রশান্ত কোথায়? তাকেও একবার ডাক। তোমাদের দুই ভায়ের সঙ্গেই আমার একটু কথা আছে।"

আমি বাইরের একটা চাকরকে ডেকে দাদাকে ডাকতে বললাম।

খুড়োমশাই হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে আসতে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম কোনও একটা কিছু জরুরী কথা বলবার জন্যই তিনি এসেছেন। কেননা, মুকুন্দর সঙ্গে মনোমালিন্যের পরে যখন আমি মহলে গিয়ে নবীন মুন্সীকে বরখাস্ত করলাম, তার পর থেকে মুকুন্দর বাড়ীর সঙ্গে আমাদের বাড়ীর কিছু অভিব্যক্তি না থাকলেও দুই বাড়ীর মধ্যে যাওয়া-আসা একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেল। যে খুড়োমশাই বাবার মৃত্যুর পরে, সপ্তাহে অন্ততঃ দু'বার আমাদের বাড়ী এসে আমাদের সকলের খোঁজ-খবর নিয়ে যেতেন, তিনিও আমাদের বাড়ী আসা ক্রমে বন্ধ ক'রে দিলেন। বেশ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম, মুকুন্দকে কিছু না বলে নবীন মুন্সীকে ও রকম বরখাস্ত করার অপমান মুকুন্দ একেবারেই সইতে পারেনি। ছেলেকে অসন্তুষ্ট করে ছেলের মতের বিরুদ্ধে জোর ক'রে কিছু করবার শক্তি যে খুড়োমশায়ের আদৌ ছিল না, এ আমি আগেই জানতাম।

এইতিমধ্যে খবর পেয়েছিলাম, নবীন মুন্সীকে মুকুন্দ সদরে নিয়ে এসে নিজেদের বাড়ীর সদর সেরেস্তার প্রধান কর্মচারী করেছে এবং সে এখন মুকুন্দদের বাড়ীতেই থাকে—জমিদারীর কাজকর্মে মুকুন্দর দক্ষিণ হস্ত।

আমিও খুড়োমশাই ঘাটে গিয়ে বসার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদাও ঘাটে এসে বসলেন। কথাবার্তা সুরু হ'ল।

খুড়োমশাই বললেন, "তোমরা দু'ভাইই এখানে উপস্থিত। তোমাদের দু'জনকেই আমি একটি কথা বলতে চাই।" এই ব'লে চুপ করলেন। আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম।

দাদা বললেন, "বেশ ত। বলুন।"

খুড়োমশাই জামার পকেট থেকে নস্যির-শিশি বার ক'রে দুই নাকে জোর নস্যি টেনে নিয়ে, একটা অত্যন্ত ময়লা রুমাল কিংবা ন্যাকড়া দিয়ে সশব্দে নাক মুছে দু'একবার গলা খাঁকরী দিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "দেখ, তোমরা আমার 'পর' নও। আমার মুকুন্দও যেমন, তোমরাও তেমন। যাতে ক'রে তোমাদেরই সকলেরই মঙ্গল হয়, সবাই বেশ সুখ-শান্তিতে থাকতে পার, এইটুকু দেখা আমার বুড়োবয়সের একমাত্র কর্তব্য।

এইটুকু ব'লে আবার একটু চুপ ক'রে বলতে লাগলেন. "বাবা সুশন। তুমি রাগ করোনা। তুমি যে ভাবে পীরতলায় গিয়ে আমাদের কিছু না জানিয়ে নবীন মুন্সীকে বরখাস্ত ক'রেছ, তাতে মুকুন্দ বিশেষ মর্মাহত হয়েছে। জান ত, হাজার হ'লেও নবীন আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে। মুকুন্দর শ্বশুরবাড়ীর কাছে মাথা একেবারে হেঁট হয়ে গেছে।" এই ব'লে চুপ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললাম, "কি করব খুড়োমশাই; বরখাস্ত না ক'রে আমার উপায় ছিল না।"

খুড়োমশাই বললেন, "অপরাধ যদি সে ক'রে থাকে তাকে শাসন করা অবশ্য কর্তব্য। আমি অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ারই পক্ষপাতী। কিন্তু সে যখন আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার আগে একবার আমাকে যদি বলতে, আমিই তাকে সরিয়ে দিতাম। তাহ'লে জিনিষটা অতটা বিসদৃশ হয়ে উঠত না।" আবার চুপ করলেন।

আমি বললাম, "সে যে অপরাধ করেছে তাতে তাকে ফৌজদারীতে দেওয়া উচিত ছিল। আত্মীয়ের মধ্যে ব'লেই সেটা আমি করিনি।"

খুড়োমশাই বললেন, "থাক, থাক। যা হবার হয়ে গেছে। তা নিয়ে আর এখন আলোচনা ক'রে লাভ নেই। তবে কথাটা কি জান, যেমন জমিদারী শাসন ক'রে রক্ষা করা কর্তব্য, তেমনি সরিকে সরিকে পরস্পরের মান রক্ষা করে চলাও বিশেষ কর্তব্য নইলে সরিকি বিবাদে জমিদারীতে অঘটন ঘটে। ছেলেমানুষ তোমরা, রক্ত এখনও গরম, এখনও ত ততটা বোঝনা।"

একটু রাগ হ'ল। বললাম, "তাই বুঝি আমার মান রক্ষা করবার জন্য আমার বরখাস্ত করা কর্মচারীকে সদর সেরেস্তায় এনে ম্যানেজার করেছেন।"

খুড়োমশাই হা হা ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, "না, না। সেদিক দিয়ে ব্যাপারটা আমরা ভাবিইনি মোটে। তুমি আপত্তি করলে কি আমরা তাকে রাখতে পারি? তা' নয়। তবে শ্বশুরবাড়ীতে ত মুকুন্দর মুখ রক্ষা করতে হবে। তাই তাকে সদরে রাখা হয়েছে।"

এ কথার জবাব দেওয়ার প্রবৃত্তি হ'ল না। চুপ করে রইলাম। খুড়োমশাই একটু পরে আবার বলতে লাগলেন, "এখন মুকুন্দর ইচ্ছা, যখন সামান্য ব্যাপার নিয়েই এতটা মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়েছে, তখন জমিদারী পৃথক ক'রে নেওয়াই ভাল। কথাটা আমিও ভেবে দেখেছি। দুই পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব রাখতে গেলে ভাগ-বাটরা হ'য়ে যাওয়া মন্দ নয়। বিশেষতঃ, আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই যদি সব সুবন্দোবস্ত হ'য়ে যায় ত সকল দিক দিয়েই মঙ্গল।"

দাদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "সে কি কথা খুড়োমশাই? আপনি বেঁচে থাকতে থাকতেই জমিদারী ভাগ-বাটরা হয়ে যাবে? তা কিছুতেই হ'তে পারে না।"

দাদার কথায় কান না দিয়ে আমি একটু জোরের সঙ্গে বললাম, "তা বেশ ত। এ প্রস্তাবে আমার এতটুকুও অমত নেই। বরং সম্পূর্ণ মত আছে। কি ভাবে কি বন্দোবস্ত হবে বলুন।"

দাদা একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন, আর কোনও কথা কইলেন না। খুড়োমশাই আবার একবার ঘটা ক'রে নস্যি নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "দু'-একজন মধ্যস্থ লোকের উপর এসব ভাগ-বাটয়ার ভার দেওয়া উচিত।"

বললাম "বেশ ত, কার উপর ভার দিতে চান আপনারা, বলুন।"

বললেন, "এই ধর, হরিশ সেন, খুলনায় ওকালতি করে। বেশ পসার হয়েছে শুনি। সে এবং তার মত দু'-একজন লোক যদি এ কাজের ভার নেয়।"

আমি বললাম, "চমৎকার। এ কাজের ভার নিলে আমার কিছু বলবার নেই। তা'হলে তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।"

কথায় কথায় খুড়োমশাইয়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল, তিনি দু'চার দিনের মধ্যেই সদরে গিয়ে হরিশ সেনকে অনুরোধ করবেন। যত শীঘ্র সম্ভব এর একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে।

খুড়োমশাই চলে যাওয়ার পরে দাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এর মানে কি সুশন? কাজটা কি ভাল হচ্ছে? খুড়োমশাই এখনও বেঁচে—"

বললাম, "হ্যাঁ—এছাড়া এখন আর কোনও উপায় নেই দাদা।"

দাদা আর কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে চলে গেলেন।

* * *

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম ক'রেই বাইরে সেরেস্তায় এসে আলী মিঞার সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলাম। ভাগ-বাটরা হ'লে কি ভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়, কোন কোন মহলের কি রকম অবস্থা—এই সব নিয়ে আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যা হ'ল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর ভিতর যাওয়ার পথে দেখলাম, দাদা উত্তর পাড়ের ঘাটের উপর চুপ ক'রে বসে আছেন। আমি গিয়ে ঘাটে বসলাম।

দাদা বললেন, "দেখ সুশন! ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না।"

বললাম, "কোন ব্যাপার? জমিদারী ভাগ-বাঁটরা হওয়ার ব্যাপারটা?"

দাদা বললেন, "হ্যাঁ।"

আমি বললাম, "কেন বল দেখি? তোমার এত আপত্তি কেন?"

দাদা বললেন, "ব্যাপারটা মোটেই ভাল দেখাবে না? খুড়োমশাই এখনও বেঁচে। সবাই আমাদের নিন্দে করবে।"

আমি বললাম, "তা কেন। খুড়োমশাই নিজেই ত সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন। জমিদারীর খবর ত কিছু রাখনা। যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ভাগ-বাটরা হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বাইরের লোকের নিন্দার কোনও মানে নেই। তারা ত ভেতরের খবর কিছু রাখে না।"

দাদা বললেন, "কিন্তু ওদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারলেই হ'ত ভাল।"

বললাম, "হয় ত হ'ত। কিন্তু তা হবার নয়।"

দাদা বললেন, "কিন্তু বাবা বেঁচে থাকতে ত কোনও দিন কোনও গোলমাল হয়নি। এখনই বা হচ্ছে কেন?"

একটু বিরক্তির সুরে বললাম, "কি যা-তা বলছ। তখনকার কথা ছিল স্বতন্ত্র। তখন বাবা যা করতেন, দু'বাড়ীর কেউ তার উপর কথা কইতে সাহস করত না; তিনি ছিলেন সর্বময় কর্তা। এখন ত আর সে অবস্থা নেই।"

দাদার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি জমিদারীর কোন খবর রাখতেন না এবং এ সব ব্যাপারে আমি যা ভাল বুঝেছি তার উপর কথা বলবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণও ছিল না, কিন্তু দাদা যেন কেমন নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলেন।

বললেন, "কেন এখনও ত তাই। এখনও তুমি যা করছ তাই ত হচ্ছে। খুড়োমশাই ত বিশেষ কিছু দেখেনই না, এবং মুকুন্দও তোমার কোনও কাজে কোন কথা কয় না।"

বললাম, "দেখ তুমি যে বিষয় কিছু জান না, সে বিষয় নিয়ে কেন কথা কও বল দেখি? মুকুন্দ জমিদারীর ব্যাপারে কি করছে না করছে তুমি কি তার কোনও খবর রাখ?"

দাদা বললেন, "মুকুন্দর স্বভাব ত আমি জানি।"

একটু উত্তেজিত সুরে বললাম, "মুকুন্দর স্বভাব তুমি ছাই জান। মুকুন্দকে চিনতে তোমার এখনও অনেক দেরী।"

দাদাও কি মনে মনে রেগে যাচ্ছিলেন? জানি না। কিন্তু হঠাৎ বললেন, "আমার মনে হয় তুমি মুকুন্দর প্রতি অবিচার করছ। শুধু শুধু তুমিই একদিন মুকুন্দকে বাড়ী থেকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে। সেই থেকে ছেলেটা আর মনের দুঃখে এ বাড়ী-মুখো হয় না।"

দাদার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। মুকুন্দর সঙ্গে আমার সে সব কথাবার্তার কথা ত কেউ জানে না। পীরতলায় নবীন মুন্সীকে বরখাস্ত করার পর থেকে মুকুন্দ আমাদের বাড়ীতে আসা ত্যাগ করেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "দাদা! তোমার এ কথার মানে?"

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে। দাদার মুখখানা ঠিক দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে লক্ষ্য করলাম দাদা খানিকক্ষণ মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে বসে রইলেন।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "দাদা! তোমার এ কথার অর্থ কি?"

দাদা মুখ নীচু ক'রেই বললেন, "আমি জানি, তুমি অযথা মুকুন্দকে অপমান ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।"

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে প্রাণের ভিতর শিউরে উঠল। উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করলাম; "কি জান, তুমি? বল আমাকে সব।"

দাদা তবুও চুপ ক'রে আছেন দেখে আবার বললাম, "দাদা! তুমি কোথায় কি শুনেছ, সমস্ত আমাকে খুলে বল।—বলতেই হবে।"

দাদা বেশ শান্ত অথচ একটু জোরের সঙ্গে বললেন, তোমার স্বভাব দিন দিন খারাপ হচ্ছে সুশন। স্বভাবে কেমন যেন একটা ঔদ্ধত্য—সব কাজেই একটা জবরদস্তি। বউমা সাধে অত কষ্ট পান, অত কান্নাকাটি করেন। বিনা কারণে অযথা সন্দেহে মুকুন্দকে তুমি কি রকম অপমান করেছ—আমি সব শুনেছি। মুকুন্দ আমাদের নেহাত আপনার লোক ছিল। তোমার স্বভাবে সে শত্রু হয়েছে। তার মত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে অমন ক'রে 'পর' ক'রে দেওয়াতে আমিও মর্মাহত হয়েছি। বউমাও মনে মনে সেজন্য কতখানি কষ্ট অনুভব করেন, তুমি কি তার কোনও খবর রাখ?"

দাদার কথা শুনে শুধু যে যুগপৎ স্তম্ভিত ও মর্মাহত হয়েছিলাম তা নয়, সমস্ত সন্ধ্যাটা বুকের মধ্যে কেমন যেন আগুন জ্বলতে লাগল। মনে হয়েছিল এ আগুন নিভবে না, নিভবার নয়। এতে শুধু যে আমিই পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাব তা নয়, কেউ বাঁচবে না। এতে শুধু যে আমিই পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাব তা নয়, কেউ বাঁচবে না, তুষারকেও পুড়ে ছাই হ'তে হবে। রাত্রে যখন শুতে গেলাম, তুষারের বুকে আগুন ধরিয়ে দেবার একটা পৈশাচিক আনন্দে আমি যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু শুতে গিয়ে একমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, তুষার আত্মরক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ তৈরী হয়েছে। কোথা দিয়ে কেমন ক'রে আমার প্রাণের আগুনটির খবর তার কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল জানি না। কিন্তু শুতে গিয়েই দেখি সে সম্পূর্ণ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে; এবং মাথা ধরার দোহাই দিয়ে আমার সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলতেও সে একেবারে নারাজ।

গম্ভীর-কণ্ঠে বললাম, "তোমার মাথা ধরুক আর যাই হোক, আমার প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে।"

কাতরোক্তি করতে করতে সে বললে, "প্রশ্নটা কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না ?"

তেমনি গম্ভীর সুরে বললাম, "না। আজ রাত্রেই তোমার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।"

"কি লোক বাবা!" এই ব'লে বালিশে মাথা গুঁজে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। শুধু মাঝে মাঝে একটা চাপা কাতরোক্তিতে তার মাথার অসহনীয় বেদনার কথা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল মাত্র।

আমি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলাম।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, "দাদার সঙ্গে মুকুন্দর বিষয়ে তোমার কি কথাবার্তা হয়েছে ?"

সে যেন আশ্চর্য হ'য়ে গেল। একটু তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করলে,—

"দাদার সঙ্গে ? মুকুন্দর বিষয় ? কি আবার কথা হবে ?"

গম্ভীর ভাবে বললাম, "সেইটেই আমার প্রশ্ন। সমস্ত খুলে আমাকে সত্য কথা বল। চাপা দিও না। নইলে ফল অত্যন্ত গুরুতর হবে।"

একটু ঘৃণাভরা উত্তেজিত সুরে বললে, "উঃ! আমাকে শাসাচ্ছেন। কেন কি করেছি আমি। যাও, আমি তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলতে রাজী নই।"

"তোমাকে বলতেই হবে।"

"বলব না। করবে কি ?"

কলহের বিস্তারিত বিবরণটা এখন আর সব ঠিক মনে নাই, এবং যা-ও আছে, তা লিখবার প্রবৃত্তি নাই। তবে যেটুকু নেহাৎ না বললে নয়, সেইটুকুই বলি।

কলহের আগুন বেশ দাউ দাউ জ্বলে উঠেছে, হঠাৎ তুষার এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠল; এবং সশব্দে শোবার ঘরের দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

এটা অবশ্য কিছু নতুন নয়। আগেও দু'-একবার কলহের মধ্যে তুষার ঘর ছেড়ে যে বেরিয়ে যায়নি, তা নয়। কিন্তু নতুন ব্যাপার এবার যেটা ঘটল সেটা হচ্ছে, তুষার বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে সশব্দে দাদার শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। আমি চুপ ক'রে কাঠ হ'য়ে বিছানায় শুয়ে আছি, শুনতে পেলাম দাদার ঘরের দরজা খোলার শব্দ। দাদার কথা অবশ্য কিছু শুনতে পেলাম না, কিন্তু কথা কিছু বুঝতে না পারলেও কান্নার সঙ্গে জড়ান তুষারের গলার ধ্বনি বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিলাম। দাদার সঙ্গে তুষারকে এরকম স্পষ্ট কথা বলতে

এর আগে কখনও শুনিনি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ পাশের ঘরেই মা শুয়ে আছেন। লজ্জায়, দুঃখে, রাগে আমার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে সব চুপচাপ; তুষারের গলা আর পাওয়া যাচ্ছে না। আমি চুপ ক'রে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। এতটুকু নড়তে চড়তেও যেন কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটলো। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি? বোধ হয়। হঠাৎ চমকে দেওয়ালে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত দেড়টা বেজে গেছে। তুষার তখনও ফিরে আসেনি।

উঠলাম। ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দেখি পরিষ্কার চাঁদের আলো সমস্ত আকাশ ছেয়ে আমাদের বারান্দার উপর এসে কেমন স্নিগ্ধ, শান্ত ভাবে লুটিয়ে পড়েছে। বাইরের নির্জন নিস্তব্ধতায় কেমন যেন শিউরে উঠলাম। কিন্তু তুষার কৈ? ভেবেছিলাম বারান্দায় মাটিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু বারান্দায় ত কেউ নেই। লক্ষ্য করে দেখলাম—দাদার ঘরের দরজা খোলা। শান্ত পদক্ষেপে দাদার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দেখলাম, দাদা খোলা জানালার পাশে বাইরের দিকে তাকিয়ে, একটা চেয়ারে চুপ ক'রে বসে আছেন, আর তুষার তাঁরই পায়ের কাছে মাটিতে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে।

### নয়

১৭ই পৌষ রাত্রি ২টা ৪৩ মিনিটের সময় তুষারবালা একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করলেন। মাধবপুরের রতন সা'র বংশরক্ষা হ'ল। বহুকাল পরে মার মুখে হাসি দেখা দিল।

ছয়মাস পরে ঘটা ক'রে অন্নপ্রাশন হ'ল। নাম রাখা হ'ল—শ্রীগগনচন্দ্র সাহা চৌধুরী। ডাক নাম গন্থু।

* * *

ভাবলে অবাক হ'তে হয়, মানুষের জীবনে 'বর্তমান' কথাটার কোনও মানে নাই। জীবনের কোনও একটা মুহূর্তকে 'বর্তমান' ব'লে আঁকড়ে ধরতে গেলেই দেখা যায় যে, বর্তমান কথাটা প্রকাণ্ড মায়া—কখনও ধরা দেয় না, পলকের তরেও না।

আমার ত মনে হয় মানুষের জীবনে এইটেই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। যদি বর্তমান সত্য হ'য়ে সজীব হয়ে মানুষের জীবনে মুহূর্তের তরেও দাঁড়িয়ে যেত, তাহ'লে পৃথিবীর দশা হ'ত কি? ভাবলে আমি ত শিউরে উঠি।

যাই হোক, জীবন দাঁড়ায় না। জীবনের সহজ গতিতে যত বাধা বিপত্তিই উপস্থিত হোক না কেন, এক মুহূর্তের তরে জীবনকে দাঁড় করান অসম্ভব। আমারও দাঁড়ায়নি। দেখতে দেখতে চার-পাঁচ বৎসর কেটে গেল।

জীবনের এই চার-পাঁচ বৎসরের কাহিনী বিস্তারিত লিখতে কেমন যেন প্রবৃত্তি হচ্ছে না। দিন দিন এতই কদর্যতার কালিতে প্রাণখানা ভরে উঠছিল যে, তার সেই বিকৃত রূপটির কথা ভাবলে আজও কেমন যেন ঘৃণায় শিউরে উঠি, মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। তা নিয়ে আলোচনা করা ত দূরের কথা, জীবনের এই সময়ের তুচ্ছ ঘৃণ্য কাহিনীগুলি এবং তা নিয়ে আমার মনের ঘাত-প্রতিঘাতের কুৎসিত গ্লানি—আমি একেবারে ভুলে যেতে চাই, ভুলে গেলে আমি যেন বাঁচি।

সত্য কথা বলতে তুষারের চরিত্রের প্রতি বিশ্বাস আমি তখনও একেবারে হারাইনি। তাই ত হ'ল জ্বালা। যদি ষোল আনা বিশ্বাস হারাতে পারতাম তাহ'লে ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তিই পেতাম। হয় ত সে মুক্তির বিনিময়ে দাম দিতে হ'ত অনেকখানি। হয় ত প্রাণের বারো আনাই কেটে ফেলে দিতে হ'ত—হয় ত একটা ভগ্ন পঙ্গু প্রাণ নিয়ে কোনও রকমে কাটিয়ে দিতাম বাকী জীবনটা। কিন্তু সেও ছিল ভাল। সন্দেহের যে কালব্যাধি আমার প্রাণের মধ্যে ঢুকে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণখানা বিষে জর্জরিত ক'রে তুলেছিল, তার হাত থেকে ত নিস্তার পেতাম সমস্ত প্রাণ বিষিয়ে যাওয়ার চেয়ে প্রাণের বিষাক্ত অংশ কেটে ফেলে দিতে পারলেও ত বাঁচবার একটু আশা থাকত।

দাদাকে আমি ছেলেবেলা থেকে শুধু ভালবাসিনি, শ্রদ্ধাও করেছি। এতখানি নিবিড় ছিল সে শ্রদ্ধা যে, আমার বিবাহের পরে বারে বারে চেয়েছি—তুষার দাদাকে চিনুক, চিনতে শিখুক; বুঝুক,—কত বড় একটা মহৎ-প্রাণ নিয়ে দাদা জগতের উপর ঘুরে বেড়ায়। বুঝে, নুয়ে পড়ুক

তুষারের মাথা দাদার পায়ের তলায় একটা গভীর-শ্রদ্ধায়—আমি দেখে ধন্য হই।

কিন্তু আজ আমারই চোখের সামনে, শুধু মাথা নয়, তুষারের প্রাণ-শুদ্ধ যখন দাদার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল, আমার প্রাণে আগুন জলে উঠল কেন? তুষারকে সন্দেহ করেছিলাম? অস্বীকার করব না। করেছিলাম বৈকি? উঠতে বসতে শুতে কেবলই আমার মনে হ'তে লাগল—দাদার সঙ্গে তুষারের সম্বন্ধটা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—এ সহজ নয়, সরল নয়, স্বাভাবিক ত একেবারেই নয়।

নিজের মনকে যে আমি যাচাই ক'রে দেখিনি এমন নয়। মন শুধু যাচাই করিনি, বারে বারে চাবুক মেরে শাসনও করেছি। বলেছি—এই তোমার দৈন্য; তোমারই নীচতার গ্লানি! এ কখন হ'তে পারে—এ সে অসম্ভব। কিন্তু হ'লে কি হবে, আজ মনকে শান্ত করি, কিন্তু কাল আবার মন মাথা তুলে আঙুল বাড়িয়ে দেয়। বলে "ওরে মূর্খ! ঐ দেখ। এ সত্বেও কি সত্য তোর চোখে ধরা পড়ল না?"

একটা কথা একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের বইতে পড়েছি—"Providence is nothing if not coquetish—" কথাটা নিশ্চয়ই সত্য। আমার জীবনে, বিশেষতঃ এই চার-পাঁচ বৎসরে ভগবানের লীলার এই রূপটির সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। সত্য বটে, একটা সন্দেহের বিষে জর্জরিত প্রাণ নিয়ে সংসারে ঘুরে বেড়াতাম কিন্তু তার মধ্যেও ঘাত-প্রতিঘাতের অদ্ভুত লীলার কথা মনে হ'ল আমি আজও বিস্ময়ে অবাক হই।

দু'-একটা উদাহরণ দিলেও হয়।

* * * *

গনু তখন শিশু। একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বিছানায় শুয়ে গনুর সঙ্গে খেলা করছিলাম। তুষার ইতিমধ্যে এসে মেজেয় বসে তাকে কোলের উপর শুইয়ে ঝিনুক বাটিতে দুধ খাইয়ে আমার কাছে তাকে শুইয়ে দিয়ে নীচে খেতে চলে গেল। গনু একপেট দুধ খেয়ে চিৎ হ'য়ে বিছানায় শুয়ে দিব্যি হাত-পা নেড়ে খেলা সুরু ক'রে দিল,—এবং আমিও নানান রকম ক'রে তাকে হাসিয়ে, 'বা—বা—বা—বা' ব'লে তার মুখ থেকে 'বাবা' কথাটা বার করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম।

খেলা করতে করতে লক্ষ্য করলাম গনু ক্রমে এলিয়ে পড়ছে; তখন শুন

গুন ক'রে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তাকে আস্তে আস্তে একটু একটু দোল দিয়ে ঘুম পাড়াতে লাগলাম। গনু যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে।

এত রাত হ'য়ে গেল তুষার এখনও শুতে এল না কেন? হঠাৎ বুকের মধ্যটা কি রকম দুলে উঠল। একটু কান পেতে শুনলাম বাড়ীর চারিদিকেই চুপচাপ নিস্তব্ধ—কোনও দিকেই ত কোনও সাড়া শব্দ নাই।

বুকের মধ্যে বিষের ক্রিয়া সুরু হয়েছে, চুপ ক'রে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলাম না, উঠলাম। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বারান্দায় এলাম। দাদার ঘরের দিকে চেয়ে দেখলাম, দাদার ঘরের দরজা খোলা ; ঘর অন্ধকার। তুষার ঐ ঘরের মধ্যে নাই ত—ভাবতেই সমস্ত শরীর কেমন শিউরে উঠল। এক-একবার ভাবলাম,—পা টিপে টিপে দাদার ঘরের দিকে এগিয়ে যাই—কিন্তু কেমন যেন প্রবৃত্তি হ'ল না। কিম্বা কেন যে ঠিক এগিয়ে গেলাম না—বলতে পারি না। আবার ঘর থেকে একটি আলোকরশ্মি এসে বারান্দার উপরে একটি রেখাপাত করেছিল। আমি বারান্দার একটি অন্ধকার কোণে, নিজেকে একটু আড়ালে রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম—কি যেন একটা এতদিনের গোপন-রহস্য আমার চোখে আজ অরিষ্কার হ'য়ে ধরা দেবে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, বারান্দার পার্শস্থিত একতালা থেকে দোতলায় ওঠবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। নীচের বারান্দায় একটা দেয়াল-আলো টাঙ্গান ছিল, তারই অস্পষ্ট আলোকে দেখতে পেলাম তুষার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছে।

মুহূর্তের তরে নিজের প্রতি নিজের ঘৃণা হ'ল। অযথা সন্দেহ শুধু নিজেকে নয় তুষারকে শুদ্ধ কলঙ্কিত করেছি। বেচারী হয় ত এতক্ষণ নীচে খেয়ে উঠে অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘরেরই কাজ সমাধান করছিল, আর আমি—ছিঃ ছিঃ!

কিন্তু আশ্চর্য। কেমন যেন এগিয়ে যেতে পারলাম না। চুপ ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত যেন রোধ করতে পারলে ভাল হয়।

কেন? দাদার ঘরের দরজা খোলা, তারই সামনে দিয়ে তুষারের শোবার ঘরে আসবার পথ—তাই কি? জানি না। কেমন যেন এ দৃশ্যের এখনও কিছু বাকী, সব যেন শেষ হয়নি।

হ'লেও তাই। তুষার দাদার ঘরের সামনে এসে থমকে চুপ ক'রে একবার

দাঁড়াল। একবার চেয়ে দেখল আমাদের শোবার ঘরের দরজার দিকে। তারপর নিঃশব্দে দাদার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমার বুকের মধ্যে তখন দ্রুত স্পন্দন সুরু হয়েছে। স্থির থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। দু'-চার পা এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে বারান্দার মাঝখানে দাঁড়ালাম।

মিনিট খানেক কি মিনিট দুই পরে, তুষার দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এসেই সামনে বারান্দায় আমাকে দেখে একটু যেন চমকে উঠল। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, "একি! তুমি এখনও ঘুমোও নি?" একটু যেন আদরমাখান-সুরে বলল, "আমারই জন্য রেগে আছ বুঝি? চল।" এই বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল।

শোবার ঘরে গিয়ে, কালকের কি একটা পূজার কতকগুলো যোগাড় আজ রাত্রেই ক'রে রাখা দরকার, তাই তার শুতে আসতে এত দেরী হ'ল—এই সব কতকগুলো কথা কি সব ব'কে গেল তার বিশেষ কিছুই আমার কানে গেল না। তুষার চুপ করলে, একটু গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদার ঘরে গিয়েছিলে কেন?"

অতি সহজ সরল সুরে বললে, "পান দিতে।"

বললাম, "দাদা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পান খাবেন নাকি?"

তেমন সহজ সুরে বললে, "ঘুমোননি ত। জানালার ধারে চেয়ারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে কি সব ভাবছিলেন। কি সব বই লেখেন সেই সব বিষয় অনেক রাত পর্যন্ত ভাবেন। সেই সময় ওঁর পাশে এক ডিবে পান থাকা দরকার।

এই ব'লে জামা খুলে বেশ সহজ ভাবে শুয়ে পড়ল। আমার হাত ধরে টেনে বললে, "শোও না, বসে রইলে কেন?"

রাত্রে যাই মনের অবস্থা হোক না কেন, পরের দিন সকালবেলা মোটের উপর ব্যাপারটা কিছুই অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল না। মনকে বোঝালাম—এ তোমারি দৈন্য; অন্য মেয়ের পক্ষে যা অস্বাভাবিক, তুষারের পক্ষে অনেক সময় তা সহজ হয়ে ওঠে, কেননা সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে ওর যে চরিত্রগত একটা পার্থক্য আছে।

সমস্ত দিন পরে রাত্রে যখন শুতে গেলাম তখন মনে আর বিশেষ কিছু গ্লানি ছিল না। সমস্ত দিন মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে গত রাত্রের ব্যাপারটাকে মোটের উপর মনে মনে সহজভাবে মেনেই নিয়েছিলাম।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শোবার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তুষার ঘরে এল, হাতে এক ডিবে পান। পানের ডিবেটা ঘরের একপাশের টেবিলের উপর রেখে, বিকেল বেলা জামা পরাবার সময় গন্টুর একটা দুষ্টমীর কথা ব'লে, হেসে গড়িয়ে গেল! হাসতে হাসতে বললে, "বা-বা। তোমার ঐটুকু ছেলের কি বুদ্ধি। কখনও ত এ রকম দেখিনি।"

কথাটা শেষ হ'ল পানের ডিবের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলাম, "আজ এক ডিবে পান নিয়ে শুতে এলে কেন? কি হবে?"

যেন ভুলে গিয়েছিল—বললে, "ও! দাদার জন্যে এনেছিলাম। তুমি যাও না পানটা দাদার ঘরে রেখে এস না—লক্ষীটী!"

বললাম, "তুমি আসার সময় দিয়ে এলেই পারতে?"

বললে, "আসবার সময় লক্ষ্য ক'রে দেখলাম দাদা বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। কাজেই আমি আর ঢুকি কি ক'রে বল? দিয়ে এস না পানটা।"

কথাটা শুনে মনটার যেটুকু ভার ছিল, তাও হঠাৎ এক মুহূর্তে একেবারে হালকা হ'য়ে গেল।

বললাম, "হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর পান দিয়ে কি হবে?"

বললে, "একবারটী দেখে এস না। দরজা বন্ধ করেননি, তাই বোধ হয় ঘুমোননি এখনও;

দাদার ঘরে গিয়ে দেখি দাদা সত্যই বিছানায় শুয়ে আছেন। তন্ময় হ'য়ে কি আকাশ পাতাল ভাবছেন।

ডাকলাম, "দাদা!"

দাদা যেন একটু চমকে উঠলেন, "কে—সুশন?"

বললাম, "তোমার পান রইল।"

বললেন, "থাক—ঐখানটায় রেখে দিয়ে যাও।"

দাদার ঘর থেকে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবলাম—এবার থেকে মনের লাগাম কষে টেনে রাখব। কিছুতেই সোজা পথ ছেড়ে বিপথে যেতে দেব না।

কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই আবার বুঝতে পারলাম,—যতই লাগাম কষে রাখিনা কেন, আমার জীবনের সোজা পথটিও ঠিক সহজ নয়। তাতেও পদে পদে ফোটে কাঁটা, মাঝেমাঝে এপাশে ওপাশে সরে যাওয়া ছাড়া উপায়ই থাকে না।

অনেক ব্যাপার—প্রায় ছোট ছোট দৈনন্দিন নানানরকম ঘটনার মধ্য দিয়ে বিভিন্নমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের কথা বিস্তারিত লিখতে গেলে বোধ হয় একখানা অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের অবতারণা করলেও শেষ হয় না। আর সে সব কথা বিস্তারিত লিখতে কেমন ইচ্ছেও করে না। তবে আর একটা ব্যাপার বলি।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। গন্থুর বয়স তখন বছর আড়াই হবে। কিছুদিন ধরে বিকেল বেলা গন্থুকে মুখ-হাত ধুইয়ে জামা-কাপড় পরাবার সময় বেশ একটা বিভ্রাট সৃষ্টি হ'ত। গন্থুর জামা-কাপড়ের কোনও অভাব ছিল না। নানান রংয়ের নানা কাপড়ের ফ্রক, প্যাণ্ট, মোজা—গন্থুকে অনেক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে তার পছন্দসই দু' একটা জামা ছাড়া অন্য কোনও জামা গায়ে দিতে একেবারে নারাজ। তুষারেরও তাকে নিত্য নতুন নতুন জামা পরিয়ে সাজাবার সখটা এত বেশী যে, প্রায় রোজই বিকেলবেলা এই নিয়ে মায়েতে ছেলেতে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ত। গন্থুর জিদও কম নয়। পছন্দসই জামা না হ'লে হাত-পা ছুড়ে কেঁদে অনর্থ ঘটাত, এবং তুষার প্রথম প্রথম তাকে ভোলাবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত 'দুম দুম' ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে জোর ক'রে নিজের মনের মত সাজিয়ে চাকরের সঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়ে দিত।

যেদিনের কথা বলছিলাম, সেদিন বিকেলবেলা আমি বার-বাড়ী থেকে বাড়ীর ভিতরের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি গন্থুবাবু একটা সুন্দর মেরুণো রংয়ের ফ্রক পরে চাকরের কোলে হাওয়া খেতে বেরুচ্ছেন। আমি দেখেই কাছে এগিয়ে গেলাম।

সে বয়সে গন্থু দেখতে বড় সুন্দর ছিল। টুকটুকে গায়ের রং, একটু মোটা-সোটা গড়ন, গোল-গোল ফুলোফুলো মুখে বেঁটে চ্যাপটা ধরণের নাক, ছোট-ছোট দুষ্টু-দুষ্টু দুটো উজ্জ্বল চোখ, এক মাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া কাল চুল—আমাকে একেবারে মুগ্ধ করত।

আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম গন্থুর মুখখানা বড় বিষণ্ণ—চোখ দুটো যেন একটু ছল ছল করছে। কোলে নেওয়ার জন্য হাত পেতে আদর ক'রে বললাম "কি হয়েছে গন্থুবাবু? কি হয়েছে? মুখখানা যে একেবারে অমাবস্যার চাঁদ।"

গন্থু আমার বড় বাধ্য হ'য়ে উঠেছিল! আমায় কাছে আসতে পেলে, এই বয়সেই সে যেন আর কিছু চাইত না। কিন্তু আশ্চর্য! আমি আজ হাত পাতা

সত্ত্বেও সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে না এসে চাকরের গলা জড়িয়ে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে মুখ গুজে রইল চাকরের কাঁধের উপর।

"ও বাবা—! কি হয়েছে? কিসের এত অভিমান?" এই ব'লে জোর ক'রে আমি চাকরের কোল থেকে নিজের কোলে তুলে নিলাম। কিন্তু আমার কোলে এসেই আমার গলা জড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে আমার কাঁধে মুখ গুঁজে বসে রইল।

"দেখি মুখখানা দেখি"—এই ব'লে জোর ক'রে আমার কাঁধ থেকে মুখখানা তুলে ধরে চুমো খেতে গিয়ে দেখি গন্নুর ঠোঁট ছুটী ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

"কি হয়েছে বাবা! কে বকেছে?" এই ব'লে মুখের দিকে একটু ভাল ক'রে চাইতেই দেখি বাঁ গালের উপর ছুটো আঙুলের দাগ লাল হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

বুঝতে কিছুই বাকী রইল না। তুষারের উপর কেমন যেন একটা হ'ল। গন্নুকে কোলে নিয়েই বাড়ীর ভিতরে গেলাম।

তুষারের সঙ্গে দেখা হলো বাড়ীর নীচের তলায় বারান্দায়।—চুল বেঁধে কাপড় কাচতে চলেছে সে।

একটু রুক্ষ সুরেই বললাম, "তুমি গন্নুকে মেরেছ?"

বললে, "হ্যাঁ। কি জিদ কি ছেলের। এই বয়সেই এই—বড় হ'লে ত আর রক্ষে থাকবে না।"

বললাম, "তাই বলে এই রকম ক'রে মারে। দেখত গালের উপর আঙুল ছুটো লাল হ'য়ে ফুলে উঠেছে।"

ব্যাপারটা সহজ নিষ্পত্তি হ'ল না। এককথায় ছু'কথায় বেশ একটু কটু রকমের ঝগড়া হ'য়ে গেল; এবং শেষ পর্যন্ত তুষার, ছেলেকে আর জন্মে স্পর্শ করবে না, এই বলে একটা শপথ ক'রে হন হন ক'রে আমার সামনে থেকে চলে গেল।

সন্ধ্যেবেলা এক মুস্কিল হলো। সমস্ত বিকেলটা গন্নু আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। তাকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। বিকেল বেলায় ছেলের স্ফূর্তি যেন আর ধরে না। নদীর ধারে গিয়ে "এটা কেন?" "ওটা কেন?" পঞ্চাশটা আধ আধ ভাষায় "কেন" দিয়ে আমাকে বিব্রত ক'রে তুললে।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আমার সেদিন সেরেস্তায় বিশেষ জরুরী কাজ ছিল। মহল থেকে নায়েবের সঙ্গে জনকতক প্রজা এসেছে তাদের একটা বিবাদের সালিশ করবার জন্য।

এখন গন্নুকে নিয়ে কি করা যায়। সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে গিয়ে গন্নুর মার

যেরকম রুক্ষ মূর্তি, যেরকম মেজাজ দেখলাম তাতে গন্নুকে একলা মার কাছে রেখে যেতে আমার মন একেবারেই সায় দিচ্ছিল না। যদিও লক্ষ্য করেছিলাম, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গন্নুও কেমন যেন বিষণ্ণ হ'য়ে মুষড়ে পড়ছিল। বুঝেছিলাম, আর তার ভাল লাগছে না, সে এখন মার কাছেই যেতে চায়।

সন্ধ্যা ফিরে যখন অন্ধকার হলো গন্নুকে কোলে ক'রে বাড়ীর ভিতরে উপরে গেলাম। আদর ক'রে গন্নুকে জিজ্ঞাসা করলাম "মার কাছে যাবে?"

গন্নু কাঁদ কাঁদ সুরে বললে, "হুঁ।"

উপরে আমার শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তুষার অন্ধকার ঘরে চুপ ক'রে শুয়ে আছে। আলোটা কমিয়ে রেখে দিয়েছে ঘরের বাইরে বারান্দায়।

বললাম, "এই নাও, গন্নু রইল। আমি বাইরে সেরেস্তায় যাচ্ছি, কাজ আছে।"

এই ব'লে গন্নুকে কোল থেকে নামিয়ে দিলাম! তুষার কোনও কথা কইলে না চুপ ক'রে শুয়ে রইল। গন্নু অতি সন্তর্পণে এক পা, দু'পা ক'রে মার খাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

বললাম, "কথা কইচ না কেন? নাও গন্নুকে।"

আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মাথা একটু তুলে গন্নুর দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল। "এখন কেন? এখন আমার কাছে কেন এসেছ পাজী ছেলে! মরনা কেন? মরলে তুমিও বাঁচ আমিও বাঁচি।"

ধমক খেয়ে গন্নু আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠল।

শরীর জলে গেল। গন্নুকে আদর ক'রে কোলে তুলে নিলাম। বললাম, "চল —আমার সঙ্গে চল। আমি কালই তোমাকে একটা ছোট্ট ঘোড়া কিনে দেব।"

এই ব'লে গন্নুকে কোলে তুলে নিয়ে হন হন ক'রে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনতে পেলাম তুষার সশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

একবার ভাবলাম গন্নুকে আমার মার কাছে রেখে যাই, কিন্তু মন তাতে মোটেই সায় দিল না। প্রথমতঃ, মা গন্নুকে কোনদিনই খুব বেশীক্ষণ রাখেন না বা রাখতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ ছেলেকে ভুলিয়ে, নানান রকম গল্প ক'রে খেলা দিয়ে, অন্যমনস্ক করার শক্তি মার একেবারেই ছিল না। মার কাছে গেলে গন্নুর যে কি দশা হবে—বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। গন্নু অল্পক্ষণের মধ্যে মার কাছে যাবার জন্য কান্নাকাটি সুরু করবে এবং মা হয় চাকরকে দিয়ে ছেলেকে তার মার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, নৈলে বৌমাকে ডেকে পাঠিয়ে হয় ত একটু বিরক্তিপূর্ণ

সুরেই ছেলেকে নিয়ে যেতে বলবেন।—সে ক্ষেত্রে গনুর অবস্থাটা যে একেবারেই সুখের হবে না, এটা সহজেই বুঝতে পারলাম।

গনু আমার কোলের উপর দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে আমার পিঠের উপর মুখ গুঁজে চুপ ক'রে ছিল এবং মার কাছ থেকে বকুনি খেয়ে গনুর মনের যা অবস্থা তাতে কোনও চাকর বা ঝি'র সাধ্য ছিল না এই সন্ধ্যাবেলা গনুকে ভুলিয়ে রাখে! কাজেই সবদিক ভেবে ঠিক করলাম গনুকে সন্ধ্যেবেলাটা আমার কাছে রেখে ভুলিয়ে, খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তারপর জমিদারীর কাজে যাব। হয় ত একটু রাত হবে—তা হোক।

কিন্তু তাতে আবার মনটা আর একদিক দিয়ে বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠল। প্রজাতে প্রজাতে বিবাদ, স্বয়ং জমিদারের কাছে সালিশি করতে এসেছে—ব্যাপারটা নিয়ে বোধ হয় বেশ একটু সময় লাগবে; এবং আজ রাত্রেই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করার দরকার, কেননা এই বিবাদ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সদরে মোকদ্দমা রুজু হ'য়ে গেছে এবং কালই তার দিন। কালই যদি উভয় পক্ষের আপোষনামা দরখাস্ত কোর্টে দাখিল করা না হয়, তাহ'লে হাকিম আপোষের জন্য আর দিন দেবেন না ব'লেছেন—মোকদ্দমা চলবে। এই মোকদ্দমা যদি চ'লে এবং কোর্ট থেকে যদি এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহ'লে আমাদের দিক দিয়ে বিশেষ ক্ষতিকর হ'য়ে দাঁড়াবে, কেননা এই বিবাদের মূলে নাকি মুকুন্দ এবং তার ম্যানেজার নবীন মুন্সীর কারসাজি আছে। নবীন মুন্সীরই বিশেষ এই বিবাদের এতদিন মীমাংসা হয়নি, কেননা এই সব মাতব্বর প্রজাদের মধ্যে এই ধরণের কলহের মধ্য দিয়ে ছ' আনির বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। তাই আমাদের নায়েব একবার শেষ চেষ্টা করবে জন্য উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসেছেন, যদি আমার দ্বারা কিছু হয়।

কাজেই ব্যাপারটায় বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে; এবং তাহ'লে আমাকে অনেক রাত পর্য্যন্ত সেরেস্তায় বসে কাজ করতে হবে। কিন্তু রাত্রে বাড়ীশুদ্ধ সব ঘুমিয়ে পড়বে, আমি বাইরে সেরেস্তায়, একই বাড়ীতে তুষার ও দাদা দু'জনে—কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। মনকে সায়েস্তা করার চেষ্টা করলাম কিন্তু মন কিছুতেই যেন সুস্থ হ'তে চায় না। আজকাল প্রায় সব সময়ই তুষারকে বড্ড বেশী চোখে চোখে রেখে মন যেন আমাকে পেয়ে বসেছে। হঠাৎ একটা মীমাংসা হ'ল—দাদাকেও আজ সঙ্গে নেওয়া যাবে। দাদা যে জমিদারীর

কাজ একেবারেই দেখবেন না—তারই বা মানে কি? ঠিক করলাম—এবার থেকে দাদাকে জোর ক'রে জমিদারীর কাজে টেনে নেব। ভাবলাম—কাজের মধ্যে দাদার মনকে খোরাক দেওয়া সবদিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়।

গনুকে নিয়ে ঘাটের পাড়ে এসে বসলাম। কি রংয়ের ঘোড়া কাল গনুকে কিনে দেব, ঘোড়ার পিঠে চড়ে গনুবাবু কি রকম নদীর ধারে গট গট ক'রে বেড়াবে—এই সব নানারকম গল্পে গল্পে গনুকে বেশ প্রফুল্ল ও সতেজ ক'রে তুললাম। আধ-আধ ভাষায় নানারকম কথা সুরু ক'রে দিল সে আমার সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি, দাদা বাইরের দিক থেকে বাড়ীর দিকেই চলেছেন।

ডাকলাম, "দাদা!" বললাম, "শোন। জান ত 'দাপাড়া' থেকে প্রজারা এসেছে; তাদের একটা বড় রকমের সালিশি করতে হবে; আমাদের দু'জনেরই থাকা দরকার। চল, একটু পরে সেরেস্তায় গিয়ে বসব।"

দাদা বললেন, "আমি ও-সব পারব না।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন? পারবে না কেন? জমিদারীর কাজকর্ম তুমি যে একেবারেই দেখবে না—তার মানে কি?"

কথার সুর বোধ হয় রুক্ষ হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু দাদা বেশ শান্ত সুরে উত্তর দিলেন, "আমার ওসব পোষায় না—।"

বললাম, "তোমার এ-কথার মানে কি? জীবনে যা খুসী তাই করা যায় না। জমিদারীর কাজকর্ম দেখা খালি আমার একলার কর্তব্য নয় তোমারও কর্তব্য।"

দাদা কোনও কথা বললেন না। বসেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। দাদার আজকাল স্বভাবে ঐ রকম একটা ধরণ এসেছে। কথা প্রায় বলেনই না এবং কোনও একটা কথার অবতারণা করলে, সেখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। লোকের সঙ্গ থেকে একটু দূরে দূরে থাকতে পারলেই যেন বাঁচেন।

অনেকটা যেন প্রথম জীবনের ধরণ। মাঝের জীবনে কি কথাই না বলতেন—কথা না বলতে পারলে যেন হাঁপিয়ে উঠতেন।

বললাম, "উঠলে কেন বস।"

বললেন, "না যাই। আমার শরীরটা ভাল নেই।"

এই ব'লে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না ক'রে ঘাট থেকে চলে এলেন।

আমি চুপ ক'রে খানিকক্ষণ বসে রইলাম। গনু আমার কোলে, সেও কিন্তু চুপ করেই বসে রইল। একটি কথাও কইলে না—নড়লও না।

আদর ক'রে ডাকলাম, "গনু!"

উত্তর এল "উঁ ?"

শুধালাম, "ঘুম পাচ্ছে ?"

একটু কাতরভাবে বলল, "হুঁ।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "খাবে না—খিদে পায়নি ?"

একটু কাতরভাবেই জবাব দিলে "মার কাথে দাবো।"

গন্নুকে এখন খাইয়ে ঘুম পাড়ান দরকার। একটা চাকরকে ডাকব ডাকব ভাবছি, এমন সময় দেখি একটা চাকর বাড়ীর ভিতর থেকে ঘাটের দিকে আসছে। চাকরটা এসে বললে "খোকাবাবুর খাবার দেওয়া হয়েছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তোর বৌমা কোথায় ?"

চাকরটা বলল, "খোকাবাবুর খাবার নিয়ে বসে আছেন।"

গন্নুকে কোলে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে গেলাম। দেখলাম তুষার নীচের বারান্দায় গন্নুর খাবার নিয়ে বসে আছে। গন্নুকে নামিয়ে দিলাম। গন্নু 'মা— মা' ব'লে ছুটে মার কাছে এগিয়ে গেল। তুষারও বেশ সস্নেহে গন্নুকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিতে লাগল। গন্নুর মুখে হাজার কথা ফুটে উঠল।

আমি তুষারকে লক্ষ্য ক'রে বললাম, "আমি সেরেস্তায় যাচ্ছি, বিশেষ কাজ আছে। আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখ। আসতে হয় ত রাত হবে।"

মুখ না তুলেই তুষার শান্তভাবে বললে, "আচ্ছা।"

কথার মধ্যে কোনও রাগ বা বিরক্তি একেবারেই ছিল না। বুঝলাম রাগটা আর নাই।

একটা আসন টেনে নিয়ে একটু বসে পড়লাম। একটু চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে চোখে একটু চাপা-হাসি মাখিয়ে শান্তভাবে বললে, "বসলে যে ?"

বললাম, "একটু বসি—। গন্নুর খাওয়াটা শেষ হোক। রাত ত হবেই।"

মুখ নীচু ক'রেই গন্নুকে খাইয়ে দিতে দিতে বললে, "ভয় নেই, তোমার ছেলেকে সত্যিই আমি খুন করব না।"

"তা করবে না জানি।" এই বলে একটু চুপ ক'রে বসে রইলাম। একটু পরে বললাম, "দাদার কি রকম অন্যায় দেখ।"

চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ? কি হয়েছে ?"

বললাম, "জটিল জমিদারীর কাজ রয়েছে আজ সেরেস্তায়। দু'জনে মিলে করলে কাজটা অনেকটা সহজ হ'ত। এত ক'রে বললাম আমাকে একটু সাহায্য করতে, কিছুতেই রাজী হলেন না।"

ইদানীং সব সময়েই লক্ষ্য করেছি দাদার নিন্দা তুষারের কেমন সয় না। প্রথম প্রথম তা নিয়ে প্রতিবাদ করেছে এবং দু'একদিন একটু ঝগড়াও করেছে; কিন্তু আজকাল আর ঝগড়া করে না বটে, আমার কথার সমর্থনও করে না। আমারও স্বভাবে কেমন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তুষারের সঙ্গে দাদার কথা উঠলেই, দাদার প্রতি কেমন যেন একটা নিন্দা বা বিদ্রূপের ইঙ্গিত না দিয়ে কথা কইতেই পারতাম না।

তুষার বললে, "বোধ হয় ওঁর শরীরটা আজ ভাল নেই।"

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ক'রে জানলে?"

তুষার বললে, "বেড়িয়ে এসে শুয়ে পড়েছেন। সন্ধ্যাবেলা ত কখনও ও রকম শুয়ে পড়েন না।"

বললাম, "তুমি জিজ্ঞাসা করনি কিছু?"

শান্তভাবে তুষার বলল, "না। আর ওঁকে নিয়ে তোমার বিশেষ কি লাভ হ'ত। উনি ত জমিদারীর কাজকর্ম বোঝেনও না কিছু।"

একটু তীব্রস্বরে বললাম, "কিন্তু বুঝিনা ব'লে চিরকাল থাকলে ত চলবে না। একটু শেখবার চেষ্টা করাও ত দরকার।"

তুষার চুপ ক'রে গেল, কোনও কথা কইলে না। একটু পরে আবার বললাম, "কি জানি, মানুষ যে কি রকম ক'রে এরকম নিষ্কর্ম, অলস-জীবন কাটাতে পারে, আমি ত ভেবেই পাই না।"

তুষার মুখ নীচু করেই রইল। ঠোঁটে একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠল। চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললে, "এক কাজ করনা—আমাকে একটু একটু জমিদারীর কাজ শেখাওনা। নিয়ে চলনা আমাকে আজ রাত্রে সেরেস্তায়।"

হেসে বললাম, "তা বেশ ত। চলনা।"

বললে, "তাহ'লে আমিও বাঁচি তোমারও কাজ সহজ হয়—না?" এই বলে একটু হেসে আমার দিকে চাইলে। কথাটার মধ্যে কি খোঁচা ছিল? বোধ হয় না।

সেরেস্তায় গিয়ে কাজে বসতে বসতে প্রায় ৯টা বাজল। খানিকক্ষণ প্রজাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতেই দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল। মনের আমার কি অধঃপতনই হয়েছিল। দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা কেমন ছাৎ ক'রে কেঁপে উঠল! মনে হ'ল হয় ত বাড়ীর সবাই যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। নিঝুম বাড়ী—তুষার—দাদা—

মনকে প্রশ্রয় দেবনা ব'লে জোর ক'রে কাজে মন দিলাম। হয় ত বা খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে যাই, আবার কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনটা কেমন এক একবার দুলে উঠে। এক একবার ইচ্ছে হ'ল, যাই বাড়ীর ভিতরের অবস্থাটা কি একবার দেখে আসি। কিন্তু মনের এ দুর্বলতা যে নিতান্ত অমার্জনীয়।—ঠিক ক'রে ফেললাম, কাজ শেষ না ক'রে কখনই যাব না।

রাত তখন ১১টা বেজে গেছে, বাড়ীর ভিতর থেকে একটা চাকর এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন আপনার খাবার দেওয়া হবে কি?"

বললাম, "না।"

রাত্রে খেয়ে উঠে কোনও কাজ করা ছেলেবেলা থেকেই আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। ভাবতেও পারতাম না। চাকরের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'সবাই খেয়েছেন?"

বললে, "বৌমা এখনও খাননি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "বড়বাবু?"

বললে, "তিনি অনেকক্ষণ খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। খালি বৌমা এখনও নীচে আছেন, আপনার খাবার দেবেন কিনা জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়ে দিলেন।"

বললাম, "তাকে খেয়ে শুতে বল, আমার এখনও দেরী আছে।"

চাকরটা চলে গেল। আলী মিঞা, নায়েব সবাই অবশ্য আমাকে ভিতরে গিয়ে খেয়ে আসবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আমি বলেছিলাম—"না।"

চাকরটা চলে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি—মন ক্রমেই অস্থির হ'য়ে উঠছে। খালি অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছি, কাজে যেন মন দিতেই পারছি না। ছিঃ ছিঃ, ভাবতেও এখন ঘৃণা হয়, শেষ পর্যন্ত আমার দুর্বল মনেরই জয় হ'ল।

তখন রাত ১১৷৷টা হবে, হঠাৎ বললাম, "আপনারা বসুন, আমি একটু বাড়ীর ভিতর থেকে আসছি।"

লজ্জা করব না, সমস্তই খুলে লিখব।—বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলাম নিতান্ত চোরের মতন—পা টিপে টিপে। বাড়ীর ভিতরের উঠান পার হবার সময়, অন্ধকারে যতটা সম্ভব গা-ঢাকা দিয়ে চললাম—যেন উপর থেকে আমার ভিতরে আসাটা কারো চোখে না পড়ে।

দোতলায় উঠে গিয়ে দেখি আমার ঘর থেকে একটা আলোকরশ্মি বারান্দায় এসে পড়েছে। দাদার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম দরজা খোলা কিন্তু ঘরের ভিতর অন্ধকার। বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না; আমার ঘরে গিয়ে

গয় বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে এবং মেঝের শুয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে আছে সরলা ঝি।

তুষার ঘরে নাই।—শরীরের মধ্যে দ্রুত তড়িৎ খেলে গেল। একবার এক মুহূর্তের তরে ভাবলাম, সরলাকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে শুধাই তুষার কোথায়? কিন্তু পরমুহূর্তেই বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম—নিশ্চয়ই দাদার ঘরে। এগিয়ে যাব?

বারান্দায় এসে দাঁড়াবার বোধ হয় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখতে পেলাম তুষার দ্রুতপদে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে বললে, "তোমার কাজ হ'য়ে গেছে?—চল খাবে চল। রাত কম হয় নি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি ছাদে কি রছিলে?"

বললে, "এমনি একটু খোলা হাওয়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম! মাথার মধ্যে যেন সন্ধ্যে থেকেই কি রকম করছিল।"

দাদা কোথায়? ছাদে নাই ত? কি জানি। দাদার ঘরে গিয়ে একবার দেখলে হয় না? কিন্তু দাদার ঘরের দিকে এগুতেও কেমন যেন লজ্জা হ'ল।

তুষার আবার বলল, "চল খাবে চল। আমি নীচেই তোমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছি।"

আমি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম "দাদার শরীর খারাপ হয়েছিল—অসুখ কিছু বাড়েনি ত?"

তুষার বললে, "না।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ঘুমুচ্ছেন বুঝি?"

তুষার বললে, "বোধ হয়।—তুমি খাবে চল। শুধু শুধু রাত করছ কেন? খাবার সব ঠাণ্ডা, হিম হ'য়ে গেল এতক্ষণ।"

বললাম, "এখনও ত আমার কাজ শেষ হয়নি।"

তাড়াতাড়ি বললে, "তবে না হয় খেয়ে গিয়ে কাজ কর।"

কেমন যেন একটা সন্দেহ প্রাণের মধ্যে ওলোট-পালোট করছিল। কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিলাম না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি এত রাত্রে ছাদে একলা ছিলে? একজন ঝি নিয়ে যাওনি?"

বললে, "না। ঝি নেওয়ার আবার কি দরকার।"

বললাম, "তোমার ত একলা ছাদে যেতে চিরকাল ভয় করত।"

বললে, "সে সব ছেলে বয়সে, এখন আর করে না। খেতে চল।"

এই ব'লে একতালার নামবার সিঁড়ির দিকে চলতে লাগল।

ডাকলাম, "শোন।"

তুষার এগিয়ে এল। বললে, "কি? আবার ডাকছ কেন?"

বললাম, "এতক্ষণ কাজ ক'রে আমার মাথাটা কেমন করছে। চলনা একটু ছাদে বেড়িয়ে আসি।"

বললে, "এখন আর আমি যেতে পারছি না খেয়ে-দেয়ে যাব'খন। এখন বড্ড খিদে পেয়েছে। চল খেতে যাই। তুমি খাবে তারপর ত আমি খাব!"

তখন বোধ হয় আমার মাথা একেবারেই ঠিক ছিল না। বললাম, "তুমি যাও, নীচে গিয়ে খাবার ঠিক কর—আমি মিনিট দু'তিন একটু খোলা হাওয়ায় ছাদে ঘুরে আসি।"

এই ব'লে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না ক'রে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠতে লাগলাম। যদিও পিছন ফিরে দেখিনি তবুও কেমন মনে হতে লাগল—তুষার স্তম্ভিতের মত বারান্দায়ই দাঁড়িয়ে রইল।

ছাদে গিয়ে দেখি, অন্ধকারে দাদা ছাদে পায়চারী করছেন।

*　　　*　　　*

দিন সাতেক মনের মধ্যে দিন-রাত আগুন জলেছিল। কিন্তু সময়ে সবই সয়—ক্রমে মনের আগুনে ছাই পড়ল!

সেদিন রাত্রে তুষারের সঙ্গে বিরোধের কাহিনী বিস্তারিত লিখবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। রাত্রে কেঁদে কেঁদে সে অনেক কথা আমাকে শুনিয়ে দিয়েছিল। আমার কুৎসিত নীচ মনের প্রতি তীব্র ইঙ্গিত ক'রে সে বলেছিল যে, আমারই মনের এই ঘৃণ্য অধঃপতনের দরুণ তারও মনের অধোগতি সুরু হয়েছে। নইলে যে মিথ্যাকে সে চিরকাল বিষের মত ঘৃণা করে, আজকাল বাধ্য হ'য়ে তাকে দু'-একটা মিথ্যাকথা বলতে হয়—সেটা আমারই মনের গ্লানির প্রতিধ্বনি। "ছিঃ ছিঃ," কাঁদতে কাঁদতে তুষার আমাকে বলেছিল, "তোমার সঙ্গে ঘর করতে করতে শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াব জানি না। আমার কোনও দোষ নেই, মাথাটার মধ্যে কেমন করছে ভেবে একটু খোলা ছাদে বেড়াতে গিয়ে দেখি দাদা ছাদে পায়চারী করছেন। আমি জানতামও না যে দাদা ছাদে ছিলেন। দাদাকে ছাদে দেখেই আমি নেমে এলাম। এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে কি কাণ্ডই না হ'ল। আমি না হয় জঘন্য মেয়ে মানুষ, যে দাদা দেবতার মতন লোক তাকে শুদ্ধ অবিশ্বাস কর, এত তোমার অধঃপতন হয়েছে। স্বামীর

এরকম মনোভাব হ'লে স্ত্রীর আত্মহত্যা করা উচিত। আমারও তা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই দেখছি" ইত্যাদি।

ভাবি, ভগবান আমাকে কোনও দিনই অবহেলা করেননি। অতি তুচ্ছ আমি, কিন্তু কত লীলাই না করেন আমার বুকের উপরে। বিশ্বসৃষ্টির লীলা-ভূমিতে তার যে কি প্রয়োজন ছিল আজও জানিনা। কোনও দিনই বুঝতে পারবনা বোধ হয়।

দিন পনেরো পরে আর একটা ব্যাপারও বলতে হয়। ইতিমধ্যে অবশ্য বারে বারে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি—তুষারের কথা অবিশ্বাস করার মতন কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ত আমার নাই। তবে কেন এ মিথ্যা প্রাণের আলোড়ন। কিন্তু মন বুঝেও বুঝতে চায় না।

যেদিনের কথা বলছি, সেদিন একটা মোকদ্দমার জন্য আমাকে সদরে যেতে হয়েছিল। মোকদ্দমাটা একটা জমির দখল নিয়ে—ফৌজদারী। একপক্ষে মুকুন্দদেরই একজন মাতব্বর প্রজা এবং অপর পক্ষে আমাদের একজন গরীব প্রজা—আমাদের বিশেষ আশ্রিত। অপর পক্ষে মুকুন্দ এবং তার দক্ষিণ হস্ত নবীন মুন্সী বিশেষ তদ্বির করছিল এবং আমাদের দিকেও আলী মিঞা বিশেষ উঠে-পড়ে লেগেছিলেন যাতে এ মোকদ্দমাটা আমরা না হারি। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে মুকুন্দদের জমিদারী ভাগ-বাঁটরা হ'য়ে পৃথক হ'য়ে গেছে এবং যদিও দুই-পরিবারের মধ্যে এখন আর বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না, তবুও বিরোধের অবসান একেবারেই হয়নি। সাক্ষাৎভাবে না হ'লেও পরোক্ষ-ভাবে প্রজাদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে, নানারকম দেওয়ানী, ফৌজদারী মোকদ্দমার সৃষ্টি করে মুকুন্দ, বিশেষ ক'রে নবীন মুন্সী, আমাদের বিব্রত ক'রে তুলেছিল।

যেদিনের কথা বলছি, তার দু'চার দিন আগেই আলী মিঞা আমাকে বিশেষ ক'রে বলেছিলেন যে, মোকদ্দমার এই শুনানীর দিনটাতে আমার সদরে গিয়ে কোর্টে উপস্থিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, কেননা যদিও বিস্তর টাকাকড়ি খরচ ক'রে অপর পক্ষের বেশীর ভাগ সাক্ষীই ভাঙান হয়েছে, তবুও তাদের উপর ঠিক বিশ্বাস করা চলে না। কিন্তু আমি যদি মোকদ্দমার শুনানীর সময় কোর্টে বসে থাকি, তবে আমার মুখের দিকে চেয়ে সাক্ষীরা কখনই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে ভরসা করবে না।

শুনানীর আগের দিন শেষ রাত্রে গরুর গাড়ী ক'রে সদরে রওনা হ'লাম।

দাদাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য আলী মিঞাকে দিয়ে দাদাকে বলিয়েছিলাম, কিন্তু দাদা সে কথায় কানও দেননি। আমি অবশ্য দাদাকে একটা কথাও বলিনি।

বন্দোবস্ত হয়েছিল. মোকদ্দমার পর খুলনায় আমারই উকিল হরিশ সেনের বাড়ীতে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ক'রে আমি রওনা হ'ব, এবং আমার বাড়ী ফিরে এসে পৌছতে প্রায় ভোর হ'য়ে যাবে।

তুষারকে একরাত্রি একলা বাড়ীতে রেখে যেতে মন যে একেবারেই অস্থির হয়নি—তা মোটেই নয়। কিন্তু মনের সঙ্গে একটা গোঁজামিল রকমের বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছিলাম। ভেবে ভেবে ঠিক করলাম—না, এ সন্দেহকে আর প্রশ্রয় দেব না। মন থেকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলব। নিজেরি গৌরবের প্রভাব উজ্জ্বল ক'রে তুলব নিজের জীবনের পথ। যদি কেউ আমার চোখের আড়ালে আশে-পাশে সরে যায়, হোঁচট খেয়ে পড়ে, তারাই মরবে—আমার কি?—আমি কেন মিথ্যে আশে-পাশে, আড়ালে-আঁধারে উঁকি-ঝুঁকি মেরে মরি!

খুলনা থেকে ফিরে যখন বাড়ী এসে পৌছলাম, তখন রাত দশটা বেজে গেছে। বেলা চারটা আন্দাজ কোর্টে শোনা গেল মোকদ্দমা মুলতবী হয়েছে, হাকিমের অন্য কাজ আছে, আজ আর মোকদ্দমা নেবেন না। আমি তখুনি গরুর গাড়ী ক'রে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম। হরিশ অবশ্য বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেছিল রাত্রে তার ওখানে খেয়ে যাবার জন্যে—কিন্তু আমি কিছুতেই শুনিনি।

কিন্তু হায়রে! যে গৌরবের দোহাই দিয়ে মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিয়েছিলাম, সে গৌরব ত চব্বিশ ঘণ্টাও রইল না। গরুর গাড়ী মাধবপুরে ঢোকার একটু পরেই, নদীর ধারে বাজারে আসবার আগেই, আমি পথে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। একটা সোজা গ্রাম্য গলিপথ ধরে, গাড়ী এসে পৌছবার অনেক আগেই বাড়ী এসে হাজির হ'লাম। বাড়ীর অন্দরের দরজার কাছে এসে দেখলাম অন্দরের দরজা খোলাই রয়েছে—বুঝলাম চাকরদের খাওয়া-দাওয়া তখনও শেষ হয়নি। আবার সেই চোরের মতন পা টিপে টিপে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম। সোজা উপরে গিয়ে দেখি, সেই দৃশ্য, দাদার ঘরের দরজা খোলা—ঘর অন্ধকার। মনে মনে দাদার সঙ্গে একটা কথা কইবার ছুতো ঠিক ক'রে নিলাম। ঢুকে পড়লাম দাদার ঘরে। দাদা কিন্তু ঘরে ছিলেন না। বিছানা খালি। দ্বিতীয় মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে পা টিপে টিপে সোজা চলে গেলাম ছাদের উপরে।

গিয়ে দেখি দাদা ছাদে পায়চারী করছেন একলা। তুষার ত নাই। বললাম "তুমি এত রাত্রে ছাদে বেড়াচ্ছ?" বললেন, "ঘরটা বেজায় গরম।"

নীচে নেমে এলাম। আমার ঘরের সামনে এসে দেখি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিলাম। কোনও সাড়া নাই। দু'-তিনবার জোরে ধাক্কা দিতে দরজা খুলে গেল। দেখলাম—সরলা-ঝি অসংযত কাপড় সংযত করতে করতে ঘোমটা দিয়ে মেঝেয় পাতা বিছানা গুটিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিছানার দিকে চেয়ে দেখি তুষার ও গনু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কাছে গিয়ে আদর ক'রে তুষারের ঘুম ভাঙ্গালাম। মনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যেন একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে গেল।

* * *

২৫শে আষাঢ়—দিনটা চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে আমার জীবনে। ২৫শে আষাঢ় ভোরবেলা রাত পোহানর সঙ্গে সঙ্গে বসুন্ধরা আবার যেন হঠাৎ এক নতুন রূপে, নতুন রসে সঞ্জীবিত হ'য়ে ভেসে উঠল আমার নয়নে নয়নে।

বাইরের জগৎটাকে—যেন এত দিন একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলাম একটা কলুষ জীবনের পঙ্কিল আবর্তে।

* * *

মনের বোঝাপড়ায় একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে গেল—সদর থেকে ফিরে এসে, এই রকমের একটা মনোভাব নিয়ে, রাত্রে যখন তুষারকে আদর ক'রে কাছে টেনে নিয়েছিলাম, তখন ত একবারও ভাবিনি যে, মনের এ শান্তি নিতান্ত ক্ষণিকের। রাত পোহানর সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রাণে বিষের ক্রিয়া নতুন ক'রে সুরু হবে।

সকাল বেলা উঠে মুখ-হাত ধুয়ে বৈঠকখানা বাড়ীতে এসে যখন আলী মিঞার সঙ্গে দেখা হ'ল তখনও ত মনটা নিতান্ত হালকাই ছিল। হেসে আলী মিঞাকে বললাম, "হাকিম মোকদ্দমা নিলেন না। তারিখ হ'য়ে গেল। কিন্তু আমার সদরে যাওয়াটা একেবারে বৃথা হয়নি। অপর পক্ষে সাক্ষীরা সবাই হাজির ছিল। তারা নিজেরাই এসে সব আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেল। নবীন মুন্সীও হাজির ছিল। সে নাকি সাক্ষীদের আমার কাছে আসতে বারণও করেছিল কিন্তু তারা সে কথায় কানও দেয় নি। আমার ত মনে হয় না এ-সব সাক্ষী আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবে। আমি তাদের জানিয়ে এসেছি এর পরের তারিখেও আমি কোর্টে থাকব। তারা বুঝেছে আমি নিজে এ মোকদ্দমার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি।"

আলী মিঞা বললেন, "আমি বিশেষ চেষ্টায় রইলাম। সহজে তাদের আমাদের বিরুদ্ধে যেতে দেব না। আমি বিশেষ উৎসুক হ'য়ে ছিলাম; কাল রাত্রেই খবরটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতাম। কিন্তু আপনি তাড়াতাড়ি

বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন।" জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কাল রাত্রে বাড়ী যাননি?" আলী মিঞা বললেন, "না। এখানেই ছিলাম, আপনি কখন আসেন—। আপনি ত রাত ১১টার পরেই এসেছেন।"

বললাম, "হ্যাঁ। আপনি তখন জেগে ছিলেন বুঝি?"

বললেন, "হ্যাঁ। তবে শুয়ে পড়েছিলাম। গরুর গাড়ীর শব্দ শুনে বারান্দায় এসে দেখি আপনি ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছেন।"

হেসে বললাম, "ভুল দেখেছেন। গরুর গাড়ী পৌঁছিবার অনেক আগেই আমি বাড়ী এসেছি। বাজারের আসবার আগেই গরুর গাড়ী থেকে নেমে কুমোর-পাড়ার মধ্য দিয়ে হেঁটে এলাম।

আলী মিঞা বললেন, "জানি বাবু। তবে বেশী রাতে গরুর গাড়ীর শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যায় কিনা। আপনি বাড়ী আসবার আগেই আমি গরুর গাড়ীর শব্দ শুনেছিলাম। তখনই বুঝেছিলাম আপনি আসছেন। নৈলে এত রাত্রে সদরের দিক থেকে গরুর গাড়ীতে আর কে আসবে।"

"গরুর গাড়ীর শব্দ বেশী রাত্রে অনেক দূর থেকে শোনা যায়।" আলী মিঞার উপর কেমন যেন হঠাৎ রাগ হ'ল।

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললাম, "তা বাড়ী-ঘর-দোর ছেড়ে আপনি রাত্রে এখানে ছিলেনই বা কেন? এ আপনার অত্যন্ত অন্যায়। বাড়ীর লোকজনদের প্রতিও ত আপনার একটা কর্তব্য আছে।"

এই ব'লে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না ক'রে সেখান থেকে চলে গেলাম।

আবার সুরু হ'ল। সমস্ত দিন মনের মধ্যে থেকে থেকে কেমন যেন ওলোট-পালোট হ'তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ভেবে ভেবে ঠিক করলাম এ বিষ সমূলে নির্মূল করতে হবে। আমার অন্তরের দিক দিয়ে যখন কিছুতেই সম্ভব হবে না, বাইরের দিক দিয়েই এর একটা বিহিত করা দরকার। বাইরের দিক দিয়েই অবস্থার এমন একটা পরিবর্তন করতে হবে যে, আমার প্রাণের এই বিষ আর কোনও রকম খোরাকই না পায়। করতেই যে হবে, নৈলে একটা জর্জরিত প্রাণ নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি একটা নিশ্চিত মৃত্যুর পানে। না, এ কখনও হ'তে দেওয়া হবে না—কখনই না।

এই রকম একটা মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণের মধ্যে কেমন যেন একটা জোর, একটা অনুপ্রেরণা অনুভব করতে লাগলাম। বর্তমান জীবনটাকে একেবারে ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে একটা নতুন রকমের জীবন তৈরি করার জন্য প্রাণ

যেন আকুল হ'য়ে উঠল। সমস্ত দিন পরেই রাত্রে যখন শুতে গেলাম, তখন প্রাণে অশান্তি বিশেষ আর কিছুই ছিল না, ছিল প্রাণভরা একটা উত্তম। বর্তমান জীবনটাকে ভেঙ্গে ফেললেই ত হয়, সে ত আমারই হাতে—তবে আর অশান্তি কিসের,—ক'দিনই বা চলবে।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'ল চিন্তা—এখন কি করা যায়। কিছু একটা করার উত্তম তখনও ষোল-আনা র'য়েছে কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে কি করা দরকার ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একবার ভাবলাম—যাই তুষারকে নিয়ে বেশ কিছুদিন কলকাতায় কিম্বা দূর বিদেশে কোথাও কাটিয়ে আসি ; বছরখানেক হ'লেই ভাল হয়, নিতান্ত ছয় মাসের কম ত নয়ই। কেননা দু'-এক মাসের জন্য বিদেশে গিয়ে কোনও লাভ নেই, তার প্রমাণ ইতিমধ্যে অন্ততঃ তিন-চারবার পেয়েছি।

কিন্তু ভেবে দেখলাম, তাতে চারিদিক দিয়ে বাধা অনেক! আলী মিঞাকে কথায় কথায় কথাটা বলাতে তিনি ত একেবারে চমকে উঠলেন। বললেন যে, ছোট তরফের কারসাজীতে জমিদারীর এমন অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আমি দীর্ঘকালের জন্য বিদেশে গেলে আলীর মিঞার পক্ষে একলা ছোট তরফের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা একেবারেই সম্ভব হবে না। মাকে অবশ্য কথাটা বলিনি। বললে, মার যে রকম শরীরের অবস্থা, তাতে যে তিনি কথাটা শুনলে একেবারেই খুসী হবেন না, বুঝতে আমার একটুও দেরী হ'ল না। তাহ'লে কি করা যায়? সব চেয়ে ভাল হয় যদি দাদা এখন দীর্ঘকালের জন্য বাইরে চলে যান। গেলেই ত পারেন। কোনও বাধা ত নেই, বাড়ীতে বসে বসে করছেনই বা কি?

হঠাৎ ভাবলাম দাদার সঙ্গে একবার কথা বললে হয় না? বেশ স্পষ্ট ক'রে তাঁকে সব খুলে বললে দোষটা কি? কিন্তু এ কথায় মন যেন কেমন পেছিয়ে গেল, প্রবৃত্তি হ'ল না। মুকুন্দর সঙ্গেও ত একদিন এই রকম ধরণের কথা কইতে গিয়েছিলাম।

দিনকতক দিন-রাত ভেবে ভেবেও কোন কিছুই ঠিক হ'ল না। তখন থেকে কেমন যেন একটা হতাশায় প্রাণটা ভেঙ্গে পড়তে লাগল। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, একটা কিছু যে করা দরকার।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম—তুষারের সঙ্গে আগে বেশ স্পষ্টভাবে পরিষ্কার একটা কথাবার্তা বলি। কোনও রকম রাগ বা বিরোধের সৃষ্টি না ক'রে বেশ স্পষ্টভাবে পরিষ্কার একটা কথাবার্তা বলি। কোনও রকম রাগ বা বিরোধের সৃষ্টি না

ক'রে বেশ শান্ত, সহজ ভাবে একটা বোঝাপড়া ক'রে ফেলা যাক। তারপর প্রয়োজন হয়, দাদার সঙ্গে কথা বলব এবং স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে বিদেশে গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ করব। যদি না শোনেন? আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে।—

একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে, তুষারের সঙ্গে কথাটা তুললাম—বেশ ভয়ে ভয়ে। বারে বারে মনকে বুঝিয়ে ঠিক করেছিলাম, তুষার হাজার রাগলেও, আমি কখনও রাগব না—ব্যাপারটাকে কিছুতেই একটা কুৎসিত কলহে পরিণত হ'তে দেব না। শেষ পর্যন্ত একটা বোঝাপড়া ক'রে নেবই।

বেশ শান্তভাবে একটু ভণিতা ক'রে বললাম, "দেখ! ভাসুরের সঙ্গে কথা বলায় আমি কোনও দোষ দেখি না। কিন্তু হাজার হ'লেও আমরা সমাজে বাস করি, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের সমাজ। তুমি যে দাদার সঙ্গে কথা বল—আমার মনে হয় এটা কেউ ভাল চোখে দেখেন না। যাও—"

তুষার শুয়েছিল; হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বিছানার উপর বসে বললে, "সে কি কথা? আমি আবার কবে দাদার সঙ্গে কথা বললাম?"

বললাম, "কেন? তুমি ত কতদিন দাদার সঙ্গে কথা কয়েছ।"

একটু উত্তেজিত-স্বরে বললে, "কবে আবার? বেশ কথা বানাতে শিখেছ ত?"

বললাম, "কেন?—তুমি একদিন রাত্রে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে দাদার শোবার ঘরে ধাক্কা দিয়ে কেঁদে কেঁদে দাদার সঙ্গে কথা বলনি? মনে ক'রে দেখ।"

তুষার কোনও কথা কইলে না, গুম হ'য়ে বসে রইল। একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মনে পড়ল?"

বেশ জোরের সঙ্গে কিন্তু না চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ও—সেই কথা। আজও মনে ক'রে রেখেছ দেখছি। সেদিন তুমি আমার নামে যে রকম অপবাদ দিয়েছিলে—সে কথাটা ভুলে গেছ বুঝি? অত বড় মিথ্যা কথা শুনলে, বিশেষতঃ স্বামীর মুখে, কোনও মেয়ের মাথার ঠিক থাকে? মেয়েদের মন তুমি কি বোঝ? ও রকম কথা শুনলে মেয়েরা পাগল হ'য়ে গিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে—জান? তাই আমি দাদার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কবে আমি তাঁর কাছে গিয়ে তোমার নামে মিথ্যা কথা

লাগিয়েছি। তাও আমি ঘোমটা টেনে মাথা নিচু ক'রে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বাড়াবাড়ি কিছুই করিনি। সেই কথা তুমি মনে ক'রে রেখে দিয়ে আজ আমাকে খোঁটা দিচ্ছ—?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "আমি খোঁটা তোমাকে মোটেই দিচ্ছি না কথাটা হচ্ছে—"

বাধা দিয়ে বললে, "দেখ, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ক'র না। তুমি যে কি ভাবে কি কথা বলছ আমি সব বুঝি। যতই বোকা হই তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।"

বললাম, "চিনে থাক ত ভালই, তাহ'লেই বুঝতে পারছ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়।"

তাড়াতাড়ি বললে, "কিন্তু আমি পারব না। তোমার মুখে এরকম কথা শুনলে আমার মাথা খারাপ হ'য়ে যায়—আমি স্থির থাকতে পারি না। তার চাইতে আমার এখন তোমার কাছে না থাকাই ভাল।

এই ব'লে হন্ হন্ ক'রে ঘরের দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি পিছু ডাকলাম, "শোন! যেও না,—যেও না বলছি, শোন—"

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাতও ক'রল না।

সব মাটি হ'ল। কথা তুলতে না তুলতেই সব কথা ভেস্তে গেল। ভাবলাম—না, তুষারের সঙ্গে কথা বলে কিছু লাভ নাই, তার চাইতে দাদার সঙ্গেই একটা পরিষ্কার কথা কইতে হবে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জীবনের ঘটনা-স্রোতে মোড় ফিরল। আপনা থেকেই ফিরল। আমার হাজার আঁকু-পাঁকুতে কিছুই হয়নি। ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি।

সেবার চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনটা ছিল শনিবার, তিথিটা ছিল অমাবস্যা। মার মতে, একটি মহাদিন। বহু বৎসরে একবারও এরকম দিন হয় কিনা সন্দেহ। মা ব'লে বসলেন, তিনি রাত্রে ওপারে ঠাকুরঝিতলায় পূজা দিতে যাবেন।

ওপারের তালপুকুরের ঠাকুরঝিতলা আমাদের ও-অঞ্চলে বিশেষ বিখ্যাত। তালপুকুর গ্রামখানি বেগবতী নদীর ওপারে—আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় মাইল খানেক দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে হয়। তালপুকুর গ্রামের এক প্রান্তে একটি বহু পুরানো আমলের প্রকাণ্ড বটগাছ আছে—তারই তলদেশের নাম ঠাকুরঝিতলা। গাছের গোড়াটি বহুকাল পূর্বে কে যে বাঁধিয়ে দিয়েছিল জানি না। কিন্তু এখন বাঁধান ইট সিমেন্টের ধ্বসে যাওয়া ফাটলে নানা রকম আগাছায় স্থানটি মোটেই

নিরাপদ নয়। বোধ হয় কোন একটি গ্রাম্য বধূর বড়লোক ঠাকুরঝি এই বটগাছ তলায় বহুদিন আগে একদিন অমাবস্যার রাত্রে কোনও কিছু মানত ক'রে ঘটা ক'রে কালীপূজা দিয়েছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁর মনস্কামনাও পূর্ণ হয়েছিল। তাই আজও প্রতি অমাবস্যার রাত্রে এই ঠাকুরঝিতলায় কালীপূজা হয়। শুধু তালপুকুর গ্রামেই নয়, আশে-পাশের অনেক গ্রামের-লোক এখানে অমাবস্যার রাতে কোনও কিছু কামনা ক'রে পূজো দিতে আসে, এবং পূজান্তে কিছু মন্ত্রপূত চাল একটি হাঁড়িতে রেখে গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে যায়। প্রবাদ এই, পূজারীর কামনা পূর্ণ হ'লেই চাল সমেত হাঁড়িটা গাছ থেকে খসে পড়ে যায়—এ নাকি একেবারে অব্যর্থ।

এই ঠাকুরঝিতলায় ছেলে বেলায় একবার মাত্র গিয়েছিলাম, এবং স্পষ্ট মনে আছে, স্তব্ধ দুপুরবেলায় ও-স্থানটিতে গিয়ে কি রকম যেন গা ছম ছম ক'রে উঠেছিল—এমনই একটা ভয়াবহ স্তব্ধতায় ভরা!

বেশ মনে আছে, প্রখর রৌদ্রের মধ্যাহ্নেও ঠাকুরঝিতলায় কোনও দিক দিয়ে এতটুকু রৌদ্র প্রবেশ করেনি—এত ছায়া-সুনিবিড় এই গ্রামছাড়া বটগাছটার ডালপালা। এবং এই ছায়ান্ধকার বটগাছের গোড়ায় একটি জীর্ণ ঘটের উপরে গাছের গুঁড়িতে সিন্দুর অঙ্কিত মূর্তির দিকে চেয়ে আমি ছেলেবেলায় কেমন যেন কেঁপে উঠেছিলাম—আজও ভুলিনি।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকালবেলা মা যখন ঠাকুরঝিতলায় পূজো দিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি যদিও একটু অমত করেছিলাম, দাদা কিন্তু ষোল-আনা মত দিলেন। আমার অমতের কারণটা অবশ্য ছিল মার শরীরের দিক দিয়ে। কেননা মা মুখে যাই বলুন, আমার কেমন একটা বিশ্বাস হয়েছিল যে, মার শরীর ভিতরে ভিতরে বিশেষ খারাপ, এবং অত রাত্রিতে দু'মাইল পাল্কীতে আসা-যাওয়া মার শরীরে সইবে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। যাই হোক, মার একান্ত জিদে শেষ পর্যন্ত যাওয়াই ঠিক হ'ল।

মা দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "প্রসুন আমাদের ঠাকুরঝিতলায় নিয়ে যাবে—কেমন?"

দাদা বেশ উৎসাহভরেই বললেন, "বেশ ত!"

আমি বললাম, "দাদা একলা কেন, দাদার সঙ্গে একজন বরকন্দাজ দেব। পাল্কীর সঙ্গে ত দাদা বরাবর ছুটতে পারবেন না। বরকন্দাজ পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে যাবে।"

কিন্তু সন্ধ্যার একটু আগে, মা যখন যাওয়ার জন্ত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করছেন, হঠাৎ দাদা ব'লে বসলেন তিনি যেতে পারবেন না।

বললেন—তাঁর অ্যানক মাথা ধরেছে, দু'মাইল হেঁটে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

কথাটা শুনে মার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—মার মুখখানা একেবারে মলিন হ'য়ে গেছে।

বললাম, "মা! এখন কি হবে?"

মা বললেন, "থাক, যাওয়ার দরকার নাই।"

আমি বললাম, "একজন কর্মচারীকে সঙ্গে দেব? দাসমশাই?"

মা বললেন, "না।"

মনে হ'ল, মার প্রাণে একটা অভিমান হয়েছে। উপযুক্ত দুই ছেলে মার ডাইনে বাঁয়ে, অথচ বাড়ী থেকে মাইলখানেক দূরে একটা পুজো দিতে যাবেন, এক ছেলেও সঙ্গে যেতে রাজী নয়।

একটু ভেবে বললাম, "চলো আমি তোমাকে নিয়ে যাব।"

মা বললেন, "থাক, পুজো পাঠিয়ে দিলেই হ'বে।"

বললাম, "কেন? চল না, আমি নিয়ে যাব তোমাকে।"

মাকে নিয়ে যখন রওনা হ'লাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। তুষারকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা অনেকবার মনে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের পাকীখানা ছিল নিতান্ত ছোট, কোন রকমে একজন যেতে পারে, এবং হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা আর একখানা পাল্কী যোগাড় করাও সম্ভব ছিল না। তা'ছাড়া তুষার সকালবেলা যাওয়ার কথা নিজেই আমাকে বলাতে সে কথা আমি তখন একেবারে অসম্ভব ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। এখন, আমি নিজে যাচ্ছি ব'লে সে কথা তার কাছে তুলতে কেমন যেন বাধল।

যাই হোক তুষার ও দাদাকে একলা বাড়ীতে রেখে যেতে মন আমার যেন কিছুতেই এগুচ্ছিল না। জোর ক'রে মনকে চাবুক মারতে মারতে মাকে নিয়ে নদীর ঘাটে, নদী পাড়ি দেওয়ার জন্য, আমাদের বজরায় গিয়ে যখন উঠলাম, তখন দেখি পাল্কী বেহারাদের দু'জন তখনও এসে হাজির হয়নি। বরকন্দাজকে পাঠিয়ে দিলাম দৌড়ে তাদের বাড়ী থেকে তাদের ডেকে আনবার জন্য। কোনও কিছুর জন্য দেরী করা তখন আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। যখন বেরিয়ে পড়েছি, কোনও রকমে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাড়ী ফিরে যেতে পারলে আমি যেন বেঁচে

যাই। কি ভেবে জানিনা মা আমাকে হঠাৎ বজরার মধ্যে ডাকলেন। বললেন, "সুশন! থাক এত রাত্রে তোর আর অতদূরে কষ্ট ক'রে যাওয়ার দরকার নেই। তার চাইতে তুই বাড়ী যা। বরং দাস মশাইকে পাঠিয়ে দে।"

মা কি আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন ?

বললাম, "কেন মা ? কষ্ট আর কি ? এই ত সামান্য পথ।"

মা বললেন, "না থাক, যে রকম ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি।"

বললাম, "তাতে আর কি। আলো নিয়ে ত চাকররাই সঙ্গে রয়েছে।"

মা একটু চুপ ক'রে রইলেন। পরে বললেন, "না তুই ফিরেই যা সুশন। প্রসূনটা ত কিছুতেই এল না।"

মার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি দাদাকেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, না মা ?"

মা শান্ত ভাবে বললেন, "হ্যাঁ"।

বললাম, "দাদার বদলে না হয় আমি যাচ্ছি। আমার কল্যাণেই পুজো দাও।"

মা একটু হেসে বললেন, "তোদের দু'জনার কল্যাণেই পুজো দেব। তবে তবে সেদিন শিরোমণি মশাইকে তোর দাদার কুষ্ঠি দেখিয়েছিলাম। তোর দাদার এখন ঘোর শনির দশা চলেছে।"

গম্ভীর হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "এত ক'রে বললাম কিছুতেই এল না। কথায় বলে শনিতে মানুষের সুবুদ্ধি লোপ হয়।"

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, "তা তুমি দাদাকে এসব কথা বলনি ?"

মা বললেন, "বলিনি আবার! সময় খারাপ হ'লে ভাল কথাও মন্দ শোনে।"

বুঝলাম, দাদার না আসার দরুণ মা যে শুধু মর্মাহত হয়েছেন তা নয়, দাদার অদৃষ্টের কথা ভেবে বিশেষ বিচলিত হয়েছেন। বুঝলাম দাদার মাথা ধরার কথা মা বিশ্বাস করেননি। হঠাৎ যেন প্রাণের মধ্যে কেঁপে উঠল। তবে কি মাও—?

একটু চুপ ক'রে অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবছি এমন সময় মা আবার বললেন, "সুশন, তুই ফিরে যা। দাসমশাইকে পাঠিয়ে দে।"

আমি আর দ্বিতীয় কথায় অপেক্ষা না ক'রে একটি ছোট্ট 'আচ্ছা' ব'লে বজরা থেকে নেমে চেঁচিয়ে ব'লে এলাম "মা! শুধু দাসমশাই না, আমি আর এক-জন বরকন্দাজও পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বাড়ী ফিরে এসে বৈঠকখানা বাড়ীতে সেরেস্তায়, দাসমশাইকে তৎক্ষণাৎ

একজন বরকন্দাজ নিয়ে বজরায় যাওয়ার জন্য হুকুম দিয়ে তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বাড়ীর মধ্যে এগুতে লাগলাম। পুকুরের উত্তর পারের ঘাটের ধার দিয়ে যখন যাচ্ছি দেখলাম অন্ধকারে সাদা সাদা কি যেন ঘাটের পাড়ে বসে আছে, কাছে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি সরলা-ঝি বসে গন্নুকে কোলের উপরে শুইয়ে আস্তে আস্তে পা নাচিয়ে গন্নুকে চেপে চেপে ঘুম পাড়াচ্ছে। গন্নুও চুপ ক'রে চোখ বুজে শুয়ে আছে। বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিল। আমাকে দেখে সরলা তাড়াতাড়ি শরীরের বসন সংযত ক'রে মাথার উপর ঘোমটা টেনে দিলে। জিজ্ঞাসা করলাম, "গন্নুকে নিয়ে এখানে কেন ?"

চুপ ক'রে রইল, কোনও জবাব দিলে না। মনের অবস্থা তখন নিশ্চয়ই ঠিক সহজ ছিল না। একটু ধমকের সুরে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "গন্নুকে ঘাটে বসে ঘুম পাড়াচ্ছ কেন ?" আমার ধমক খেয়ে সরলা-ঝি অতি মৃদু-সুরে বললে, "বৌমা বললেন।"

তীক্ষ্নসুরে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার বৌমা কোথায় ?"

চাপাগলায় উত্তর দিলে, "উপরে।"

দ্বিতীয় কথা না ব'লে তড়িৎপদে তেমনি নিঃশব্দে উপরে চলে গেলাম। ঠিক সেই পুরাতন দৃশ্য নয়। দাদার ঘরে অবশ্য আলো ছিল না। তবে দাদার ঘরের দরজা ঠিক খোলাও না। ভিতর থেকে একেবারে চেপে বন্ধ করা না থাকলেও দরজার পাল্লা দুটি ভেজান ছিল মাত্র। দু' ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক ছিল পাল্লা দুটির মধ্যে। ঠিক দরজার বাইরে বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বালান ছিল। আমি মুহূর্তমাত্র একটু বিবেচনা ক'রে কোনও কথা না ব'লে দরজা ঠেলে সটান ভিতরে গিয়ে হাজির হ'লাম।

অন্ধকারে যতদূর বোঝা গেল, তাতে দাদা বিছানায় চুপ ক'রে শুয়ে আছেন এবং আমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যেন তুষার খাট থেকে নিমিষের মধ্যে নেমে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে একখানা হাত-পাখা দিয়ে দাদাকে হাওয়া করতে লাগলো। মাথার ঘোমটা আমাকে দেখে যেন দিল একটু টেনে।

খানিকক্ষণ সব চুপ চাপ। কারও মুখে কোনও কথা নাই। তুষার নিঃশব্দে দাদাকে পাখার হাওয়া ক'রে যেতে লাগল। আমি স্তম্ভিতের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার উপর বসে পড়লাম।

বোধ হয় মিনিট-পাঁচেক পরে তুষার আমার ঘরে এল।

বললে, "বাবা! এতক্ষণে একটু ঘুমুলেন। একটু আগে ত মাথার যন্ত্রণায় একেবারে চীৎকার করছিলেন। উঃ, হাওয়া করতে করতে আমার হাতে ব্যথা হ'য়ে গেছে।"

আমি চুপ ক'রেই রইলাম, কোনও কথা কইনি। বিছানার উপর এলিয়ে বসে পড়ে একটু পরে আবার বললে, "তুমি শেষ পর্যন্ত গেলে না বুঝি? ভালই করেছ। যে অন্ধকার রাত্রি। ভাবতে আমার ত মোটে ভাল লাগছিল না।"

ব্যাপারটাতে আমার মনের যে ঠিক কি অবস্থা হয়েছিল, বিস্তারিত লিখা কিছু লাভ নাই। তবে ভাবতে আজও লজ্জা হয়। মনের নিদারুণ অস্থিরতায় তুষারের সঙ্গে সেদিন রাত্রের কলহটা যেন বড্ড বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বাড়ীর কারও কাছে কিছুই যেন গোপন ছিল না।

সকালবেলা ঘাটের পাড়ে গিয়ে মুখ ধুতে ধুতে ঠিক ক'রে ফেললাম যে, দাদার সঙ্গে একটা স্পষ্ট কথা ব'লে দাদাকে দেশ থেকে বেশ কিছুদিনের জন্য দূরে পাঠিয়ে দেব। শুনবেন না? শুনতেই হবে।

কিন্তু সমস্ত দিন দাদার সঙ্গে কোনও কথা হ'ল না। দু'তিনবার নিরিবিলি দাদাকে ডেকে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সুবিধা হয়নি। দাদা যেন সমস্ত দিন আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন।

সন্ধ্যাবেলা ঘাটের পাড়ে বসে একটা চাকরকে দিয়ে দাদাকে ডেকে পাঠাব ভাবছি, এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে বুড়ী শৈল-ঝি আমাকে এসে বললে—মা আমাকে ডাকছেন।

শৈল-ঝির সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে মার একতলার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই মা ঘরের ভিতর থেকে ডাকলেন, "কে সুশন! এস, বোস।" আমি ভিতরে গিয়ে মার খাটের উপর বসলাম। চেয়ে দেখলাম খাটের আর এক কোণে দাদা চুপ ক'রে বসে আছেন।

মা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "সুশন! শোন। তোমার দাদা কিছুদিনের জন্য বিদেশ যাবে। আমি বলছিলাম, আমাকে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন কাশীতে থাকবার জন্য। ও তাতে রাজী নয়। ও নানা দেশ বেড়িয়ে বেড়াবে—নানা তীর্থ। একলা যেতে রাজী।"

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, "বেশ সেই ভাল, আমি যেতে চাই না। এবং নানা দেশ ঘুরে বেড়াবার মত শরীরের সামর্থ্যও আমার নাই। যাই হোক, তোমার দাদা যখন যেতে চায়, তুমি সব বন্দোবস্ত কর সুশন। মাসে তুমি

ওকে একশত টাকা ক'রে পাঠাবে, অ ও যেখানেই থাকুক। তুমি কালকেই বন্দোবস্ত কর—দু'তিন দিনের মধ্যেই তোমার দাদা যাতে বেরিয়ে যেতে পারে।"

মা চুপ করলেন। কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ চাপ। একটু পরে আমি বললাম, "বেশ ত আমি কালই টাকার বন্দোবস্ত ক'রে দেব।"

মা আবার বললেন, "৩রা বৈশাখ ভাল দিন, আমি আজ দিন দেখিয়েছি।"

আবার সব চুপ চাপ। একটু পরে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "বেশ, তবে কথা ঠিক থাকে যেন।"

মা শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "হ্যাঁ, কথা ঠিকই থাকবে।"

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে ঘাটের পাড়ে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম। অনেকদিন মার মুখে এত শান্ত অথচ জোরের কথা শুনিনি। আমার চোখে জল ভরে এল কেন? হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই ছেলেবেলার একটা দিন। দাদার ফেলের খবর নিয়ে হেড্‌মাষ্টার মশাই আমাদের বাড়ীতে এলে, বাবার হাতে দাদার লাঞ্ছনার কথা কল্পনা ক'রে অস্থির হ'য়ে আমি ছুটে মার কাছে গিয়েছিলাম। মা শান্ত সুরে বলেছিলেন, "আচ্ছা, প্রসূনকে আমার কাছে ডেকে দে।"

বহুদিন পরে আজ যেন আবার সেই সুর মার গলায় শুনতে পেলাম।

৩রা বৈশাখ দাদা বাড়ী ছেড়ে রওনা হয়ে গেলেন—দূর বিদেশে।

*   *   *

দাদা চলে যাওয়াতে আমি অবশ্য হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। কিন্তু তুষারের মনোভাব ঠিক কি হয়েছিল, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি। ভিতরে যাই হ'য়ে থাক বাইরে কিন্তু কোন অভিব্যক্তি ছিল না। কেবল মুখে কথা দিনকয়েক খুবই কমে গেল। নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে কারুর সঙ্গেই তুষার বিশেষ কোনও কথাবার্তা বলত না; তবে যা কিছু কথা সে বলত, তার মধ্যে কোন ঝাঁজ বা রাগও ছিল না কিম্বা দুঃখে গলে যাওয়ার ধরণও কোনও দিন টের পাইনি। দাদা চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন আমার সঙ্গেও তুষারের কথাবার্তা একরকম বন্ধই ছিল—নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু'একটা কথা ছাড়া। এবং কিছুদিন কোনও রকম বিরোধ কলহের সৃষ্টি একেবারেই হয়নি।

তুষারের সঙ্গে আমার ব্যবহারটা আবার বেশ সহজ হ'য়ে উঠল জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। তার একটা বিশেষ কারণও ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ার দিকে

হঠাৎ একদিন গন্নুর জ্বর হয়। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ম্যালেরিয়া মনে ক'রে বিশেষ কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইনি। অপেক্ষা করছিলাম জ্বর ছাড়লেই কুইনিন খেতে দেব। কিন্তু পাঁচ-ছয়দিন কেটে গেল, জ্বর যখন একেবারেই ছাড়ল না, বরং শরীরের উত্তাপ ক্রমেই যেন বেশীর দিকে যেতে লাগলো, তখন তুষারই একদিন আমাকে বললে, "ছেলেকে একজন ভাল ডাক্তার ডাকিয়ে দেখাও ছেলের অবস্থা আমার ত ভাল মনে হচ্ছে না।" কথা শুনে আমি বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলাম এবং সেই দিনই সদর থেকে একজন ভাল ডাক্তার আনিয়ে গন্নুকে দেখাই।

দিন দশ-বার কেটে গেল জ্বর কিছুতেই ছাড়ল না। ক্রমে বোঝা গেল অসুখটা ম্যালেরিয়া নয়, টাইফয়েড্। সদর থেকে একজন ডাক্তারকে দিন হিসাবে ঠিক ক'রে একেবারে আমাদের বাড়ীতে এনে রেখেছিলাম এবং তা'ছাড়া তিন-চারদিন অন্তর জেলার বড় ডাক্তারসাহেব এসে গন্নুকে দেখে যেতে লাগলেন।

কিন্তু অসুখ ক্রমেই বেশীর দিকে যেতে লাগলো—কমলো না; এবং সতেরো দিনের দিন গন্নুর মুখের কথা যখন একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল, তখন আমি আকুল হ'য়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "হ্যাঁ ডাক্তারবাবু! ওকি জন্মের মত বোবা হ'য়ে গেল নাকি?" ডাক্তার যে উত্তরে আমাকে বিশেষ ভরসা দিয়াছিলেন ব'লে ত আমার মনে নাই, বরং টাইফয়েডে অনেক সময় সেরে উঠলেও এক একটা অঙ্গহানি হয়—এই রকমধরণের কি একটা কথা আমাকে বলেছিলেন।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো। উঃ কী মানসিক দুশ্চিন্তাতেই না কয়েকটা দিন কেটে ছিল সে সময়টা। গন্নুর সে সময়ের চেহারাটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে—রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা, রুগ্ন-শরীর যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু কখনও কখনও একটু মেলে কাতর ভাবে এদিক ওদিক চাইছে, আবার যেন বুজে যাচ্ছে। মাথার চুলগুলি কাঁচি দিয়ে ছোট ছোট ক'রে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে, যেমন রোগের অপ্রতিহত প্রভাবকে কোন দিকেই এতটুকুও বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি। বেশ মনে আছে, গন্নুর মুখের কথা বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার পর থেকে দিনের পর দিন কি রকম আকুল হ'য়ে আমি গন্নুর মুখের দিকে চেয়ে রোগ-শয্যায় বসে থাকতাম—একটি কথা, একটি ছোট কথা যদি গন্নুর মুখ থেকে শোনা যায়।

২০শে আষাঢ় গন্নুর জ্বর ছেড়েছিল, এবং তারই পাঁচ-সাত দিন আগে যে

দিন ছোট একটি "না" কথা বহুদিন পরে হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—সে দিনের সেই অপরিসীম আনন্দের কথা আমি ত আজও ভুলিনি।

মনে আছে ডাক্তাররা বলেছিলেন, "এ রোগে চিকিৎসার বিশেষ কিছুই নাই কেবল শুশ্রূষা।" সেই সময় রোগীর পরিচর্যায় তুষারের অক্লান্ত অমানুষিক উদ্যম, শুশ্রূষায় অদ্ভুত পারিপাট্য শুধু আমাকে না, বাড়ী শুদ্ধ সকলকে, এমন কি ডাক্তারদের পর্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। জ্বর ছাড়লে, আমাদের বাড়ীতে যে ডাক্তারটি ছিল, বিদেয় হ'য়ে যাবার সময় তুষারের কাছে বলে গেল, "এ রোগীকে বাঁচিয়ে তুলেছেন আপনি। আপনি নৈলে আমাদের মত পঞ্চাশ হাজার ডাক্তার গুলে খাইয়ে দিলেও এ রোগীকে বাঁচান যেত না। এ রকম পরিপাটী শুশ্রূষা আমি ত আজ পর্যন্ত দেখিনি।"

সত্য সত্যই অদ্ভুত! প্রায় দুই মাস ত অসুখ ছিল, তার মধ্যে তুষার রোজ দু'ঘণ্টা করেও ঘুমিয়েছে কিনা সন্দেহ। গন্নুর পাশে বসে সেবা করতে করতে কখনও কখনও, নেহাৎ অসম্ভব হ'লে একটু কাত হ'য়ে মিনিট দশ-পনেরো ঘুমিয়ে নিত মাত্র—তাও আমি পাশে থাকলে।

যাই হোক, এই সব নানা কারণে, তুষারের প্রতি আমার মনোভাব শুধু যে সহজ হ'য়ে উঠল তা নয়, ধীরে ধীরে বেশ সরস হ'য়ে উঠল। দাদা নাই,—সে সব দিনের কথা একটা দুঃস্বপ্নের মত প্রাণ থেকে গেল কেটে। ভাবলাম, ভগবান যা করেন ভালর জন্যই—গন্নুর অসুখটা হয়েছিল, তাই ত তুষারের প্রতি মনোভাবে আবার যেন সুরু হ'ল জোয়ার।

এমন সময় আমার জীবনে এল—২৫শে আষাঢ়। ২৫শে আষাঢ় ভোর হ'তে না হ'তে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দোতালার দক্ষিণ দিককার ঘরটায় আমি শুতাম। দক্ষিণ দিককার জানালা দুটি খোলাই ছিল, চেয়ে দেখি বাইরে আকাশ ছেয়ে ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, এবং তারই মধ্য দিয়ে একটা ভোরের আভাসে শুধু যে বাড়ীর আশ-পাশের গাছপালাগুলিই সজাগ হ'য়ে উঠেছে তা নয়, দূরে বেগবতী নদীর ওপারের ছবিটাও যেন একটা আধ-অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে ধরা দিতে চায়, আমার নয়নে-নয়নে। যদিও আমাদের শোবার খাটখানা জানালা দুটো থেকে বেশ খানিকটা দূরেই ছিল—ঘরে অপর প্রান্তে—তবুও বৃষ্টির জলের উড়ে আসা কণাগুলি মাঝে মাঝে আমার অঙ্গে তার পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিল; তাই কি হঠাৎ এত ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল আজ?

গন্নুর দিকে চেয়ে দেখলাম। গন্নু ও তুষার দুজনেই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। গন্নুকে

ঠাণ্ডা লাগছে মনে ক'রে, উঠে গিয়ে জানালা তুটো বন্ধ ক'রে দিলাম। আবার এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম কিছুতেই আর এল না। খানিকক্ষণ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রে উঠে পড়লাম। বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দেখলাম—বৃষ্টিটা একটু ধরেছে, কিন্তু ভোরের আকাশে মেঘ থম্ থম্ করছে, এখুনিই যেন আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামবে। আদি উষার অপরূপ বর্ষাশ্রী, আমার সদ্য-জাগরণের তন্দ্রালস নয়ন তুটোকে যেন পেয়ে বসল। বর্ষাস্নাত গাছপালা ঝোপঝাড়ের দিকে চেয়ে মনটা যেন হু-হু ক'রে উঠল—কি যেন একটা হারিয়ে যাওয়া অতীতের স্মৃতির মধ্যে। চুপ ক'রে খানিকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাড়ী শুদ্ধ সবাই তখন ঘুমুচ্ছে ঝি-চাকররাও কেউ তখন ওঠে নি। আমি বাইরে পুকুর ঘাটের পাড়ে যাব ব'লে নীচে নেমে গিয়ে অন্দর থেকে সদরে যাওয়ার দরজাটা খুলতেই কেমন যেন চমকে উঠলাম।

দরজার বাইরে দরজার কোণে, পাঁচিল ঠেস দিয়ে কোনও রকমে একটু আশ্রয় ক'রে নিয়ে মাথা নীচু ক'রে কে ও দাঁড়িয়ে? অঙ্গের শুভ্র বসন বেশীর ভাগই বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, চমকে শুধালাম—"কে?"

একবার চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চাইলে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু হ'য়ে গেল।

অস্ফুট-স্বরে কাণে এল—"শান্তদা!"

* * *

সাবিত্রীর বিবাহিত জীবনের কাহিনী, কতকটা মার কাছ থেকে এবং পরে কতকটা সাবিত্রীর নিজের মুখে শুনে যা বুঝেছিলাম সেইটে বলি।

মনের খবর বলতে পারি না, কিন্তু বাইরের দিক দিয়ে বিবাহের বছর-পাঁচেক সাবিত্রীর বোধ হয় ভালই কেটেছিল। প্রৌঢ়-স্বামী, বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই সাবিত্রীর মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললেন। সাবিত্রীর মুখের একটু হাসি, একটু প্রসন্নতা পাওয়ার জন্য তিনি যেন প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজী—এই রকম ধরণের একটা মনোভাব নিয়ে তিনি প্রায় দিনরাত সাবিত্রীর আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতেন, নিজের জমি-জমা তেজারতি কারবার প্রভৃতি দেখা-শুনার ভার বেশীর ভাগই চাপিয়ে দিয়েছিলেন নিজের বড় ছেলের উপরে। আজ পল্লীগ্রামে যতদূর সম্ভব, দেখতে দেখতে সাবিত্রীর ঘর নানারকম রঙ্গিন সাড়ী এবং সৌখীন জিনিষে ভরে উঠল; এবং যতদূর বোঝা গেল, স্বামীর এই পরিপূর্ণ দাক্ষিণ্যে,

সাবিত্রী কোনও দিনই এতটুকু বাধা দেয়নি, যদিও সমস্তটাই সাবিত্রীর দিক দিয়ে ছিল সম্পূর্ণ অযাচিত। শান্ত গভীর মুখে সাবিত্রী বিবাহিত জীবনের সংসার-যাত্রায় ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল, আর মনের সুদূর গহনতলের কোনও আবেগ বা অনুভূতির কোনও পরিচয় তার বাইরের ব্যবহারে কিম্বা তার মুখভঙ্গীতে কোনওদিনই এতটুকু প্রকাশ পায়নি।

দেখতে দেখতে বিবাহিত জীবনের পাঁচটি বৎসর কেটে গেল। এমন সময় সাবিত্রীর স্বামী কি একটা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হলেন এবং এই ব্যাধিই হ'ল তাঁর কাল। তিনি অবশ্য বেঁচে ছিলেন আরও প্রায় তিন-চার বৎসর; কিন্তু এর মধ্যে কোনও দিন তাঁর পক্ষে রোগমুক্ত হ'য়ে সহজ, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। এই সময়টা সাবিত্রী স্বামীর শুশ্রূষার মধ্যে যেন প্রাণের একটা অবলম্বন পেয়েছিল এবং তাই বোধ হয়, কি শরীরের দিক দিয়ে, কি মনের দিক দিয়ে, রুগ্ন স্বামীর সেবায় সাবিত্রী একটুকুও কার্পণ্য করেনি। শুনলাম, স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ-ছ' দিন আগে একদিন গভীর নিশীথে দুরন্ত ব্যাধির দারুণ নিস্পেষণে কাতর স্বামী শুশ্রূষারত সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন যেন আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে নাকি বলেছিলেন, "সাবিত্রী! আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। তোমাকে বিবাহ ক'রে আমি চিরদিন তোমার কাছে অপরাধী। আমি মানুষ নই দৈত্য। তোমাকে বিয়ে করার সময় কি একবারও বুঝেছিলাম যে, তুমি সাধারণ নও—রাজকন্যা! তোমাকে জোর ক'রে হরণ করেছি, বন্দী করেছি।"

আরও শুনলাম, এই ধরণের আরও কত কি প্রলাপ বকতে বকতে তিনি রুগ্ন শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন—সাবিত্রীর পক্ষে তাঁকে জোর ক'রে শুইয়ে রাখা কঠিন হলো। নিজেই শয্যা পার্শ্বস্থ লোহার সিন্দুক খুলে নগদ তিন হাজার টাকার নোট সাবিত্রীর হাতে দিয়ে টাকাটা সাবিত্রীর বাক্সে লুকিয়ে রাখতে কাতরভাবে অনুরোধ করেছিলেন, এবং টাকাটা সাবিত্রী নিজের ক্যাশবাক্সে না তোলা পর্যন্ত তিনি কিছুতেই সুস্থ হ'তে পারেননি সেদিন রাত্রে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরই পরিজনের হাতে সাবিত্রীর দুর্দশার সীমা থাকবে না এই রকম একটা আতঙ্কে রুগ্ন-শয্যায় শেষের কয়েকটা দিন তিনি কেবলই থেকে থেকে শিউরে উঠতেন।

তাঁর মৃত্যু হ'ল উপরোক্ত ঘটনার পাঁচ-দিন পরেই। তাঁর মৃত্যুর পর কিছুদিনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ীতে সাবিত্রীর জীবনযাত্রায় দুর্দশার সীমা রইল না। সাবিত্রীর শ্বশুরবাড়ীতে পরিজন খুব বেশী ছিল না। তার স্বামীর আগের পক্ষের

দুইটী ছেলে ছিল মাত্র। বড়টির বয়স বছর চব্বিশ-পঁচিশ, বিবাহিত এবং বছর তিনেকের একটী পুত্র ছাড়া তখনও পর্যন্ত তার অন্য কোনও সন্তান হয়নি। ছোটটার বয়স হ'বে বছর কুড়ি-একুশ। তখনও অবিবাহিত। এ ছাড়া সাবিত্রীর শ্বশুরবাড়ীতে তার এক বিধবা ননদ ছিল—বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, সাবিত্রীর স্বামীর নাকি আপন খুড়তুতো বোন।

স্বামীর মৃত্যুর পরে সাবিত্রীর জীবনে প্রথম অশান্তি সুরু হ'ল—সেই তিন হাজার টাকা নিয়ে। বাড়ীর সকলেরই মনে কেমন একটা বিশ্বাস ছিল যে, সাবিত্রীর স্বামীর লোহার সিন্দুক টাকায় ভরা। টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে কারও মনে সঠিক ধারণা না থাকলেও সিন্দুকের টাকাটা যে অন্ততঃ হাজার দশের কম নয়, এই রকম একটা কাণাঘুষো বহুদিন ধরে প্রবাদের মতন শুধু সাবিত্রীর শ্বশুর-বাড়ীতেই নয়,—গ্রামের পাঁচজনার মুখেও চ'লে এসেছে। তাই যখন স্বামীর মৃত্যুর পরে গ্রামের দু'-চারজন মাতব্বরকে ডেকে এনে পাঁচজনার সামনে লোহার সিন্দুক খোলা হ'ল, সকলেই বিস্মিত হ'য়ে দেখলে যে, কতকগুলি বন্ধকী গহনা ছাড়া নগদ টাকা কিছু নাই বলিলেই হয়। পাঁচজনার অনুরোধে সাবিত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিল, চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল সকলের চেয়ে একটু দূরে একপাশে। তার সমস্ত শরীর কেমন যেন কেঁপে কেঁপে শিউরে উঠতে লাগলো, যখন শুধু বাড়ীর লোকেই নয় গ্রামের দু'-চারজনও পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে একদৃষ্টে চাইলেন তারই পানে।

সাবিত্রীর স্বামীর বড় ছেলেটি ছিল একটু বদ্‌রাগী। সে তার বাপের জমি-জমা তেজারতি কারবার বোঝে ষোল আনার উপর আঠারো আনা এবং কোনও দিক দিয়ে যদি আধলা পয়সাও কোনও ফাঁকে অযথা বেরিয়ে যায় তাহ'লে তার শরীরের সমস্ত রক্ত দ্রুত স্পন্দনে মাথায় গিয়ে ওঠে, এবং তখন তার ক্রোধকে দমন করা শুধু তার পক্ষেই নয়, কারও সম্ভব হয় না। সে রোষকষায়িত নেত্রে সাবিত্রীর দিকে চেয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, "টাকা সব চুরি হয়েছে, চুরি হয়েছে। আমি চুপ ক'রে থাকব না, পুলিশে খবর দেব। এর কিনারা না ক'রে আমি জল গ্রহণ করব না।"

সাবিত্রীর স্বামীর খুড়তুতো বিধবা ভগ্নিটিও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে কোনও কালেই সাবিত্রীকে দেখতে পারেনি। বোধ হয় জীবিতাবস্থায় দাদার সাবিত্রীর প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্বই ছিল এর কারণ। তিনি ঝঙ্কার না তুললেও বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন—"সে ত বোঝাই যাচ্ছে। চোর যে

কে—সে তুইও বুঝতে পারছিস আমিও বুঝতে পারছি। সকলেরই ত চোখ আছে।"

এই ব'লে তিনিও ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে সাবিত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন।

সাবিত্রীর স্বামীর পয়সা ছিল—গ্রামে প্রতিপত্তিও ছিল। গ্রামের ছোট বড় প্রায় সবাই ছোট বড় নানান ব্যাপারে সাবিত্রীর স্বামীর কাছে নানান বন্ধনে ছিল বাঁধা। স্বামীর সমস্ত কারবার এখন তার বড় ছেলের হাতে, তাই দু'চারজন প্রতিবেশী যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বড় ছেলেকে তুষ্ট ক'রে কথা বলাই সমিচীন বিবেচনা করলেন। গ্রাম সম্পর্কে এক খুড়ো মশাই বললেন,—"বাবাজী, কেউই বোকা নয়। সবাই সব বুঝতে পারছে। চন্দ্রদা'র টাকা-কড়িগুলো ত আর ডানা হ'য়ে উড়ে যায়নি! এ নিজের ঘরের বিষ বাবাজী তোমায় নিজেকেই নির্মূল করতে হবে।"

বড় ছেলেটা আবার চীৎকার ক'রে উঠল—"নির্মূল নয়, সমূলে নির্মূল করব—তবে আমার নাম। চোরাই টাকা কিক'রে হজম করেন" আমিও দেখব।"

সাবিত্রী তখন অধোবদনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—নির্বাক নিস্পন্দ। ঘর শুদ্ধ সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে—সমস্ত চোখগুলো তীরের মতন গিয়ে বিঁধছে তার সারা প্রাণে-প্রাণে। ইচ্ছে হ'তে লাগলো—ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু দৃষ্টিবাণের বিষে তার শরীর ও মন এত অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল যে, তার আর দেহখানি এতটুকু সরিয়ে নেওয়ার শক্তি পর্যন্ত লোপ হ'য়ে গেল। নিজের প্রাণের জ্বালায় চেখ গেল ভরে'।

সাবিত্রীর স্বামীর ছোট ছেলেটা ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তার মাথায় কোঁকড়া চুল বাহারি রকমের ছোট বড় ক'রে ছাঁটা—দিব্য পরিপাটী ক'রে আঁচড়ান। সে সব সব সময়েই বেশ ফিটফাট থাকে, সব সময় সিগারেট, খায় গান গায়। একবার গ্রামের সখের থিয়েটারের দলে নায়িকার ভূমিকা অভিনয় ক'রে গ্রামে বেশ যশও অর্জন করেছিল। সাবিত্রীর দুর্দশায় তার মুখের দিকে চেয়ে তার প্রাণে কি কোনও ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছিল? সে দাদার দিকে চেয়ে বললে—"দাদা! চুরি চুরি ত করছ। কিন্তু চুরিটা হ'ল কি ক'রে। বাবার মৃত্যুর পরে ত সিন্দুকের চাবী এই একমাস তোমার কাছেই আছে। এ ঘরেও ত প্রায় সব সময়ই লোক থাকে।"

বড় ছেলে চীৎকার ক'রে উঠল—"তুই চুপ কর। গাধা কোথাকার।"

বিধবা পিসী বললেন—"হাজার হ'লেও ছেলেমানুষ ত, অত ঘোর প্যাঁচ বোঝে না। চুরিটা ত দাদার মৃত্যুর পরে হয়নি, আগেই হয়েছে। দাদা ত রোগের জ্বালায় বেহুঁস হ'য়ে থাকতেন—চাবিও ত থাকত তাঁরই কাছে। ব্যাপারটা তখনই ঘটেছে।"

ছোট ছেলেও ছাড়বার পাত্র নয়। যখন প্রতিবাদ তুলেছে তখন সে তর্ক করতে পিছপাও হওয়াকে বোধ হয় কাপুরুষতা মনে করে।

সে আবার বললে—"সিন্দুক খোলার যে একটা কায়দা আছে। সে দাদা ও বাবা ছাড়া আর কেউ জানে না।"

বড় ছেলে চীৎকার ক'রে উঠল—"তবে কি তুই বলতে চাস, আমি চুরি করেছি।"

*

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। বোধ হয় ছোট ছেলের প্রতিবাদের মধ্যে সাবিত্রীর প্রতি একটা সহানুভূতি কোথাও লুকানো ছিল। সেইটুকুতেই সাবিত্রীর প্রাণে এল বল, অবশ শরীর আবার সবল হ'ল। হঠাৎ সে দ্রুতপদে গিয়ে নিজের ক্যাশবাক্স খুলে একতাড়া নোট সকলের মাঝে মেঝেয় ছড়িয়ে ফেলে দিল। তারপর আঁচল হ'তে নিজের চাবীর গুচ্ছ খুলে নিয়ে বড় ছেলের দিকে সেটা ছুঁড়ে দিয়ে হন্ হন্ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চাবীর গুচ্ছ ঝনাৎ ক'রে পড়ল বড় ছেলের পায়ের কাছে—মেঝের উপরে।

এই হ'ল সুরু। দিনের পর দিন যত কাটতে লাগলো ততই সংসারে গঞ্জনা উৎপীড়নের বোঝা সাবিত্রীর বুকের উপর উঠতে লাগলো জমে। প্রথম প্রথম সাবিত্রীর মনে হ'ত—প্রাণখানা ফেটে ভেঙ্গে চৌচীর হ'য়ে যাবে, এত ভার ত সওয়া যায় না। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুকের সমস্ত বোঝা কেমন যেন আপনা থেকেই সহজ হ'য়ে উঠল সাবিত্রীর প্রাণের উপরে—যেন তার আর কোন মূল্য নাই। আঘাতে আঘাতে ধীরে ধীরে সাবিত্রীর প্রাণখানা হ'তে লাগলো কঠিন হ'তে কঠিনতর, এবং বছরখানেক যেতে না যেতে জমাট বেঁধে মধ্যে গড়ে উঠল একখণ্ড নীরেট পাষাণ—তাকে নড়ান ত দূরের কথা, স্পষ্টভাবে আঘাত দিয়ে তার উপর রেখাপাত করার শক্তি পর্যন্ত সাবিত্রীর শ্বশুর-সংসারে কারোরই রইল না। ফলে, এর পরে নিষ্ফল আক্রোশে বিপন্ন বিক্রমে মাঝে মাঝে যখনই তারা সাবিত্রীকে আক্রমণ করেছে, নিজেদেরই ক্ষতবিক্ষত প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে

হয়েছে তাদের অথচ আত্মরক্ষার জন্য স্পষ্টভাবে সাবিত্রীকে একটি আঙুল পর্যন্ত কোনও দিন তাদের বিরুদ্ধে তুলতে হয়নি।

একটি ছোট্ট উদাহরণ দি।

ক্রমে সাবিত্রীর শ্বশুরবাড়ীর সংসারে একটা নিয়ম গড়ে উঠেছিল—সকাল বেলা আমিষ ও নিরামিষ দুই হেঁসেলের একটি রান্নার ভার নিত সাবিত্রী এবং অপরটির ভার নিত সাবিত্রীর বিধবা ননদ। রাত্রে অবশ্য নিরামিষ হেঁসেলে রান্নার বালাই ছিল না এবং রাত্রে রান্না-বান্না করতেন সাবিত্রীর স্বামীর বড় পুত্রবধু। সাবিত্রীর রান্নার নানান রকম ত্রুটি বার ক'রে সেই বিষয় আলোচনা ক'রে, রান্নাবান্নার দিক দিয়ে সাবিত্রীর অপদার্থতা সকলের মধ্যে প্রত্যহ বারে বারে প্রমাণ ক'রেও বাড়ীর বড় ছেলে বা তার স্ত্রী কিম্বা তাদের বিধবা পিসী কারুরই যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না। কিন্তু তবুও সাবিত্রী এমনই একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতার সঙ্গে নীরবে ঘরের কাজকর্ম সমাধান করত যে, তার নিজের সম্বন্ধে কোনও চর্চা বা আলোচনা কোন দিক দিয়ে তার কানে প্রবেশ ক'রে তার মনটাকে একটুকু স্পর্শ করেছে, এমন কোন লক্ষণ তার ভাব-ভঙ্গীতে বা ইঙ্গিতে একদিনের তরে এতটুকুও প্রকাশ পায়নি। সাংসারিক জীবনে সে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছিল এবং বাড়ীর ছোট ছেলে ছাড়া বাড়ীর অপর সকলের সঙ্গেই ধীরে ধীরে সাধারণ বাক্যালাপও তার গেল একেবারে বন্ধ হ'য়ে। এমন সময় একদিন এক কাণ্ড ঘটল।

সেদিন রাত্রে রান্না করেছিল সাবিত্রী, কেননা বাড়ীর বড় পুত্রবধুর কোন বিশেষ কারণে সেদিন রান্না করার সুবিধা হয়নি। রাত্রে খেয়েদেয়ে শোবার ঘণ্টা তিন-চার পরে শেষ-রাত্রে বাড়ীতে হুলুস্থুল কাণ্ড সুরু হ'ল। প্রায় একই সঙ্গে বাড়ীর বড় ছেলে, তাঁর স্ত্রী এবং তাদের পুত্রটির একটু উৎকট রকমের ভেদবমি আরম্ভ হয় এবং পরের দিন সকাল বেলা বড় ছেলে এবং তার স্ত্রী একটু সুস্থ হ'য়ে উঠলেও পুত্রটির অবস্থা ক্রমেই হ'য়ে উঠতে লাগলো সঙ্গীন। অনেক কষ্টে পাশের গ্রাম থেকে একজন বড় কবিরাজ আনিয়ে তার ঔষধ খাইয়ে রোগের সঙ্গে অনেক টানাটানি ক'রে প্রায় দু'দিন পরে সেবার ছেলেটি সুস্থ ক'রে তোলা হয়।

সুস্থ হ'লেই পরের দিন বড় ছেলে সকলের মধ্যে বেশ জোরের সঙ্গে জাহির করলেন যে, তাদের বিষ খাওয়ান হয়েছিল ; এবং এ কথার অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ তিনি নিজের ভাইয়ের একই খাদ্য খাওয়া সত্ত্বেও কোন অসুখ না করায় যুক্তিটি শুধ বাড়ীর লোকদের কাছে নয়: পাড়ার পাঁচজনার কাছেও বলতে এতটুকু দ্বিধা

করেননি। বাড়ীর ছোট ছেলে কথাটার অবশ্য একটা প্রতিবাদ তোলবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আর সকলেই কথাটাকে চারিদিক থেকে পর্যালোচনা ক'রে সমর্থন করা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ই দেখেননি।

কথাটা শুনে সাবিত্রী চুপ ক'রেই ছিল—কোনও প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু কথাটা শোনার পর থেকে সাবিত্রীর রান্না ঘরে ঢোকা একেবারে দিল বন্ধ ক'রে। শুধু তাই নয়, সংসারের সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিলে অনেক দূরে—যেন, বাটনা-বাটা কুটনো-কোটা প্রভৃতি ছোট ছোট সংসারের কোনও কাজে তার ছায়াটুকু পর্যন্ত স্পর্শ না করে।

ফলে দুই-চারদিনের মধ্যেই তুমুল অশান্তি সুরু হ'ল সাবিত্রীর শ্বশুরবাড়ীর সংসারে। বিধবা পিসীর কোমরে হঠাৎ বাতের আবির্ভাবের দরুণ তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়লেন এবং অতি কষ্টে কোনও রকমে একবেলা বিধবা হেঁসেলের রান্না করা ছাড়া তাঁর দ্বারা সংসারের আর কোনও কাজই সম্ভব হ'য়ে উঠল না। বড় ছেলের বৌ বিশেষ গঞ্জনার সঙ্গে স্বামীকে জানিয়ে দিলেন যে, দু'বেলাই এত বড় সংসারের হেঁসেল ঠেলা তার পক্ষে অসম্ভব এবং যদি তার স্বামী এর কোনও বিহিত না করেন তাঁর পক্ষে সপুত্র বাপের বাড়ীর গিয়ে বাস করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকবে না।

ফলে, বাড়ীর বড়ছেলে একদিন বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে সাবিত্রীকে জানিয়ে দিল যে, বসে বসে, কোনও কাজ না ক'রে, অন্ন ধ্বংস করা এ সংসারে তার একেবারেই চলবে না এবং সংসারের কাজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে পারলে তবে এ সংসারে সাবিত্রীর এক মুঠা ক'রে ভাত জুটবে—নচেৎ নয়। এই ধরণের কথার সম্পর্কে সাবিত্রীর মৃত পিতামাতার দারিদ্র্য ও নীচতার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে দুই একটি কটূক্তি বর্ষণ করতেও বড ছেলে পিছপাও হয়নি।

ফলে, সাবিত্রী সংসারের কাজের দিকে একপাও অগ্রসর ত হ'লই না অধিকন্তু শ্বশুরবাড়ীর অন্ন একেবারে ত্যাগ করলে। সুরু ক'রে দিলে উপবাসের পালা। প্রথমটা সবাই মনে করেছিল সাবিত্রীর এ দম্ভ ক্ষণস্থায়ী, ক্ষুধার তাড়নায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ধূলিসাৎ হবে। কিন্তু একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন গেল, সাবিত্রী যখন কিছুতেই মুখে অন্ন তুললে না, তখন সংসারে সত্য সত্যই একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল।

সুরু হ'ল বড় ছেলের রাগারাগি, সাবিত্রীর উদ্দেশ্যে কটূক্তি ও তিরস্কার, বড়

পুত্রবধূ এবং বিধবা পিসীর গঞ্জনার ঝঙ্কার। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হ'ল না। উপবাসে সাবিত্রী নীরবে কাটিয়ে দিতে লাগলো দিনের পর দিন, অটল, অচল ও দৃঢ়তায়। এমন কি সংসারের ছোট ছেলের অনেক সাধ্যসাধনাও ব্যর্থ হ'ল।

ক্রমে চাঞ্চল্যের ঢেউ সংসার ছাড়িয়ে পাড়া এবং পাড়া ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। নানান কথা উঠল এবং নানান আলোচনা সুরু হ'ল গ্রামে। সাবিত্রীর সপক্ষে কথা কহিবার লোকও দু-এক জন যে গ্রামে জুটল না এমন নয়। আট-দশ দিন কেটে যাওয়ার পরও সাবিত্রী যখন উপবাসীই রইল, তখন গ্রামের দু-চারজন প্রবীণ মাতব্বর পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন যে, ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশে খবর দেওয়া দরকার—নইলে কি চুপ ক'রে থাকার দরুণ শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপার নিয়ে গ্রামশুদ্ধ সবাই পুলিশের হাতে মারা পড়বে।

কথাটা বাড়ীর বড় ছেলের কানে ওঠা মাত্র ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। পুলিশকে সে বড় ডরায়। পুলিশ মানেই, তার মতে, হাঙ্গামা অপমান, অত্যাচার এবং সব চেয়ে বড় কথা—টাকা। সে তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতরে গিয়ে স্ত্রী এবং বিধবা পিসীর সঙ্গে পরামর্শ সুরু করলে। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে অনেক সাধ্যসাধনা করার পর তের দিনের সাবিত্রীর উপবাস ব্রত ভঙ্গ হ'ল। বড় ছেলে নাকি সাবিত্রীর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক রকম শপথ করতে এতটুকু দ্বিধা করেনি।

এর পরে কিছুদিন সাবিত্রীর জীবন কাটল মন্দ নয়। কয়েক মাস শ্বশুর-বাড়ীর সংসারের সবাই সাবিত্রীকে বেশ ভয় ক'রে চলতে লাগল। সামনা-সামনি সাবিত্রীকে কোনও রকম গঞ্জনার ইঙ্গিত পর্যন্ত কেউ দিতে সাহস করেনি। কিন্তু সাবিত্রীর উপবাস ঘটিত ব্যাপারটায় সাবিত্রীর নিকট পরাজয়ের অপমানে সকলেরই অন্তর সাবিত্রীর প্রতি বিষের গ্লানিতে ছিল ভরা। তাই মুখে সাবিত্রীকে কেউ আর কিছু না বললেও আসলে বাড়ীর ছোট ছেলে ছাড়া সাবিত্রী ছিল সকলেরই চক্ষু-শূল। উপবাস ব্রত ভঙ্গ করার কয়েক মাসের মধ্যেই সাবিত্রীর শ্বশুরবাড়ীর সংসারে তার আড়ালে আড়ালে তারই ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ক্রমেই নিবিড় হ'য়ে উঠতে লাগল।

এবার সাবিত্রীকে আক্রমণ করা হ'ল সাক্ষাৎ ভাবে নয়—পরোক্ষ ভাবে।

বাড়ীর ছোট ছেলেটা ছিল প্রায় সাবিত্রীরই সমবয়সী। বাড়ীর আর কারুর সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক না থাকার দরুণই বোধ হয় এই ছোট ছেলেটার সঙ্গে একটা স্নেহের মধুর সম্পর্ক সংসারের একাধারে ক্রমেই ধীরে ধীরে নিবিড় হ'য়ে

উঠতে লাগল সাবিত্রীর প্রাণে। ক্রমেই এই ছোট ছেলেটা সংসারের আর সকলের চাইতে সাবিত্রীরই বেশী অনুগত হ'য়ে উঠল; এবং প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাবিত্রীর ঘরে বসে তার কাছে নানান রকম গল্প ব'লে গান শুনিয়ে সাবিত্রীকে খুসী করতে তার যে এতটুকুও ক্লান্তি ছিল না, এটা লক্ষ্য করা বাড়ীর লোকের পক্ষে মোটেই কঠিন হ'ল না।

পিতার মৃত্যুর পর দেখতে দেখতে বছর পাঁচ-সাত কেটে গেল, তবুও এই ছোট ছেলেটির কেন যে বিবাহ হয়নি, তার সঠিক কারণ অবশ্য আমি জানি না। তবে সাবিত্রীর মুখেই বোধ হয় শুনেছিলাম যে, সে নিজেও বিবাহ করতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিল না এবং তার বড় ভাই কিম্বা পিসী কেউই তাকে বিবাহ করবার জন্য কোনও দিনই পেড়াপিড়ি করেন নি। সম্বন্ধ অবশ্য আসত মাঝে মাঝে, কথাবার্তাও চলত কিছুদিন, আবার সব চুপ চাপ হ'য়ে থেমে যেত। মেয়ে পচ্ছন্দ হ'লেও, বাড়ীর বড় ছেলের মতে, দেনা-পাওনার দিক দিয়ে পচ্ছন্দসই সম্বন্ধ একটাও নাকি আসেনি। সাবিত্রীর অবশ্য প্রাণে প্রাণে একটা ইচ্ছা হয়েছিল যে, এই ছোট ছেলেটীর বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারী ক'রে তারই সংসারের মধ্যে নিজের বাকী জীবনটার একটু আশ্রয় খুঁজে নেয়, এবং ছোট ছেলেটিকে সাবিত্রী সে কথা নাকি বলেছিলও দু'একবার, কিন্তু কোনও কথা নিয়েই বেশী পেড়াপেড়ি করা ছিল একেবারে সাবিত্রীর স্বভাববিরুদ্ধ। ছোট ছেলে ছাড়া বাড়ীর আর কারও কাছে উপযাচক হ'য়ে একথা বলতে যাওয়া সাবিত্রীর পক্ষে ছিল একেবারেই অসম্ভব।

যাই হোক, বাড়ীর ছোট ছেলের সঙ্গে সাবিত্রীর ঘনিষ্ঠতার প্রতি কুৎসিত দৃষ্টিতে কে যে প্রথম চেয়েছিল—জানি না। তবে এটা নিশ্চয় যে দু'জনার সম্পর্কের প্রতি একটা ইঙ্গিত ক'রে একটা চাপা কাণাঘুষোর প্রথম দূষিত হাওয়া বইতে সুরু হয়েছিল সাবিত্রীর সংসারের মধ্যেই এবং ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল আশে-পাশে, পাড়ায়। বাড়ীর লোক সাবিত্রীকে কিছু না বললেও কথাটা সাবিত্রীর কানে এসে পৌঁছতে দেরী হ'ল না। এরকম ধরণের আক্রমণের জন্য সাবিত্রী পাষাণ প্রাণও প্রস্তুত ছিল না, কেমন যেন কেঁপে উঠল; এবার ত উপরে নয়, আঘাত দেওয়া হয়েছে পাষাণের তলদেশে, ভিতরে। কথাটা শোনার পর প্রথমটা সাবিত্রীর মনে হয়েছিল যে, বাড়ীর ছোট ছেলের সঙ্গেও সে কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ ক'রে দেবে। "কি আর বেশী তাতে এসে যায়।" বাকী জীবনটা সে আর বাড়ীর বা পাড়ার কারুর সঙ্গেই একটি কথাও কইবে না।

কিন্তু যতই না মনে মনে ঠিক করুক না কেন, প্রাণখানা কিছুতেই শান্ত হ'তে

চায় না। একটা রুদ্ধ বহ্নি প্রাণের গভীর তলদেশ থেকে জ্বলে উঠতে লাগলো— সাবিত্রী কিছুতেই যেন তাকে থামাতে পারে না। দূর থেকে সংসারের নানান কাজের মধ্যে বিধবা ননদ বা বড় পুত্রবধূর কণ্ঠস্বরটুকু পর্যন্ত সাবিত্রীর পক্ষে অসহনীয় হ'য়ে উঠল এবং একই সংসারে তাদের সঙ্গে অস্তিত্বের চিন্তাও যেন বুকের আগুনে ঢালতে লাগলো, ঘৃতাহুতি!

কোন দিক দিয়ে কি ভাবে সাবিত্রীর মনটা কোথা দিয়ে কোথায় দাঁড়াল, বলা কঠিন। তবে শেষ পর্যন্ত সাবিত্রী বাড়ীর ছোট ছেলের সঙ্গে কথা ত বন্ধ করলেই না বরং তার সঙ্গে মেশামেশির ঘনিষ্ঠতা আরও স্পষ্ট ক'রে সজাগ ক'রে বড় ক'রে তুলল সকলের চোখের সামনে। সবাই দেখলে, কারণে অকারণে সকলেরই মধ্য থেকে সাবিত্রী তাকে ডেকে নিয়ে যায় নিজের ঘরে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটিয়ে দিতে এতটুকুও দ্বিধা করে না।

ফলে, সাবিত্রী বিধবা হওয়ার বছর দশেক যেতে না কোন সে গহনতলদেশ হ'তে প্রচণ্ড ধাক্কায় এমনই গরল উৎসারিত হ'য়ে উঠল সাবিত্রী জীবনে, যে শুধু সে তার প্রাণখানা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিল তা নয়, সেই বিষের তাড়নায় সাবিত্রী শ্বশুরবাড়ী হ'তে পাগলের মত ছুটে পালিয়ে গেল, যেদিকে দু'চোখ যায়!

কথাটা আর একটু স্পষ্ট ক'রে বলি। যে কুৎসা গ্রামে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, তার কথা বাড়ীর ছোট ছেলেটিরও অবিদিত ছিল না এবং এত কথাকথি হওয়া সত্ত্বেও সাবিত্রী যখন আরও ঘনিষ্ঠভাবে বিনা সঙ্কোচে তাকে বেশী রকম আপনার ক'রে নিতে চাইল, তখন সে প্রথমটা সত্য সত্যই একটু অবাক হয়েছিল। সাবিত্রীকে ঠিক ভাবে বোঝার বুদ্ধি বা শিক্ষা তার কিছুই ছিল না। এবং তাই সাবিত্রীর তার প্রতি এই ব্যবহার তার কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'তে লাগলো এবং ক্রমে সাবিত্রীর এই অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যে, সে সাবিত্রীর সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতার অপূর্ব পুলকের সম্ভাবনায় নিজের প্রাণে নিজেই শিউরে উঠতে লাগলো, একটা উন্মত্ত কল্পনার আবেগে।

প্রথম প্রথম সাবিত্রী কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু ক্রমে সাবিত্রীর প্রাণেও একটু খটকা লাগতে সুরু হ'ল। কথা কইতে কইতে হঠাৎ সাবিত্রীর মুখের দিকে কেমন যেন একরকম তাকিয়ে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে চুপ ক'রে যায়, সাবিত্রীর ঠিক ভাল লাগে না। তাদের দু'জনকে নিয়ে যে কুৎসা গ্রামে রটেছিল, কোনও দিন কোনও কথায় তার আভাস বা ইঙ্গিত পর্যন্ত সাবিত্রী বাড়ীর ছোট ছেলেকে দেয়নি, কিন্তু হঠাৎ একদিন সে যখন সেই সব কথা তুলে হাসতে হাসতে সাবিত্রীকে সব

গল্প করতে লাগলো, তখন সাবিত্রীর প্রাণখানা কেমন যেন একটা শিরশিরানিতে গেল ভ'রে, এবং পরে কথা শেষে যখন সুর ক'রে গান ধরলে,—

"তোমায় নিয়ে কলঙ্ক মোর
ভেবে মনে পুলক জাগে
সবাই মোরে ছিঃ ছিঃ করে
তাও মনে ভাল লাগে।"

তখন সাবিত্রী একটা মর্মান্তিক ঘৃণায় ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

এর পরে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবিত্রীর বুঝতে কিছুই বাকী রইল না। বাড়ীর ছোট ছেলেকে ডেকে কথা বলা ত দূরের কথা, তাকে একেবারে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়ে উঠল। কিন্তু তখন এই সব বিভিন্নমুখী ঘাত-প্রতিঘাতে সাবিত্রীর মনের অবস্থা সব দিক হ'য়ে উঠেছিল, নিদারুণ। বাড়ীর ছোট ছেলেকে সাবিত্রী শ্বশুরবাড়ীর অন্য লোকদের মধ্যে শুধু যে পছন্দ করত তা নয়, এই নিরালা বান্ধবহীন পুরীতে একটা গভীর-স্নেহে তারই উপর নির্ভর করেছিল—ঠিক নিজের ছোট-ভাইয়ের মত। তাই তার মনের এই ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে, একটা মর্মন্তুদ বেদনার গ্লানিতে সাবিত্রীর পক্ষে জীবন হ'য়ে উঠল একেবারে অসহনীয়। তার উপর তাকে জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সাবিত্রীকে যখন স্পষ্টই তার সঙ্গে লড়াই সুরু করতে হ'ল, তখন বাড়ীর বিধবা পিসি বা বড় পুত্রবধূর বাঁকা বিষ চাহনির সম্মুখে লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে সাবিত্রী প্রায় পাগলের মত হ'য়ে উঠল।

সে দিনটা ছিল ২৩শে আষাঢ়। সন্ধ্যা থেকে টিপ টিপ টিপ সমানে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাড়ীর ছোট ছেলের সঙ্গে সাবিত্রীর ইতিমধ্যে অনেকবার অনেক সংঘর্ষ হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু সে তখন হ'য়ে উঠেছিল একেবারে 'মরিয়া'। লজ্জা সম্ভ্রমের বাঁধন ইতিমধ্যেই সে সম্পূর্ণ ছিন্ন করেছে। একটা পাশবিক তাড়নায় পৈশাচিক উত্তেজনায় সাবিত্রীকে স্পষ্টই আক্রমণ করতে তার আর এতটুকুও দ্বিধা ছিল না। সাবিত্রীর জীবনের এতবড় অত্যাচারে ও নির্যাতনে সাবিত্রীর শ্বশুর-বাড়ীর অন্য অন্য পরিজন একটুও বাধা দেওয়া ত দূরের কথা বরং যেন ক্ষুধিত লম্পটকে সাবিত্রীর দিকে লেলিয়ে দিয়ে একটা অমানুষিক উল্লাসে মশগুল হ'য়ে উঠেছিল। সাবিত্রীর শ্বশুরবাড়ীর সংসারটা যেন হ'য়ে উঠেছিল একটা প্রেতলোক।

২৪শে আষাঢ়—রাত্রি তখন এগারটা বেজে গেছে। বাইরে গাছ পালার মধ্যে, গভীর অন্ধকারে, বৃষ্টির সঙ্গে মেশান একটা সনসনে বাদুলে হাওয়ায়,

নিস্তব্ধ-পল্লী-ভূমিতে ভূত-প্রেত-পিশাচের একটা তাণ্ডবলীলা সুরু হয়েছিল। সাবিত্রী নিজের ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বিছানায় শুয়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে বোধ হয় অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের জীবনের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল এমন সময় টুক টুক ক'রে তার ঘরের দরজার বাইরে থেকে কে যেন মৃদু করাঘাত করলে। সাবিত্রী চমকে উঠল। কিন্তু কোনও সাড়া দিল না। করাঘাত ক্রমেই স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'য়ে শেষ পর্যন্ত জোর জোর ধাক্কায় পরিণত হ'ল। সাবিত্রী বিছানা ছেড়ে উঠতে বাধ্য হ'ল।

নিস্তব্ধ পুরী। বোধ হয় সকলেই যে যার বিছানায় শুয়ে পড়েছে। পাছে দরজার ধাক্কার শব্দে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে তাদের দৃষ্টির সামনে সমস্ত জিনিসটা একটা অশোভন কুৎসিত ব্যাপারে পরিণত হয়, কই লজ্জায় সাবিত্রী গিয়ে দরজা খুলে ফেলল। হাসতে হাসতে বাড়ীর ছোট ছেলে সাবিত্রীর ঘরে প্রবেশ ক'রে এক গাল হেসে বললে, "জানি শেষ পর্যন্ত দরজা খুলবে।"

এই ব'লে ঘরের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে সাবিত্রীর বিছানার উপর সটান শুয়ে পড়ল।

সাবিত্রী দরজার নিকটেই দাঁড়িয়ে রইল।—গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"কি চাই তোমার? বেরিয়ে যাও এখুনই এঘর থেকে।"

ছোট ছেলেটি বিছানায় শুয়ে হাসতে হাসতে কি যে সব কতকগুলি কথা ব'লে যেতে লাগলো, তার এক বর্ণও সাবিত্রীর কানে গেল না। সাবিত্রী চক্ষে তখন অন্ধকার দেখছে, কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, এমন সময় বাইরে বারান্দায় 'ঠুক' ক'রে একটা শব্দ হ'ল। বারান্দায় আলো ছিল না, সাবিত্রীর ঘরে একটা আলো কমানো ছিল, তারই একটা ম্লান-রশ্মি বারান্দার উপরে একটু-খানি রেখাপাত ক'রেছিল মাত্র। সেই অস্পষ্ট আলোকে সাবিত্রী চমকে চেয়ে দেখলে বিধবা ননদটি মাটির জলের ঘড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর কানে এল বাড়ীর বড় পুত্রবধূর কণ্ঠস্বর "থাক থাক পিসীমা, তোমার কোমরে বাত, তুমি নিচু হয়োনা। আমি জল গড়িয়ে দিচ্ছি।"

পিসী বললেন, "পোড়া তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যায়, তাই ত অন্ধকারে বারান্দায় এসে হাতড়ে হাতড়ে মরছি। কাল থেকে এক ঘটি খাবার জল আমার ঘরে রেখে দিস বউমা।"

কয়েক সেকেণ্ড সব চুপচাপ। হঠাৎ সাবিত্রী চেয়ে দেখলে পিসী এবং বড়

পুত্রবধূ তারই ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। দরজার কাছাকাছি এসে পিসী সাবিত্রীকে শুধাল—"ওমা! বড় বউ! তুমি এখনও ঘুমোওনি? এত রাত—"

এই বলতে বলতে সটান ঘরের ভিতরে চলে এলেন দু'জনেই। এসেই খাটের উপর বাড়ীর ছোট ছেলেকে শুয়ে থাকতে দেখে একেবারেই যেন অবাক হ'য়ে চমকে উঠলেন। মুখের কথা বন্ধ হ'য়ে গেল।

"চল চল বউ! আমরা যাই এখান থেকে।"

এই ব'লে পিসী আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে বউএর হাত ধরে হিড় হিড় ক'রে ঘর থেকে টেনে নিয়ে হন্ হন্ ক''রে বেরিয়ে চলে গেলেন।

মিনিট খানেক সব চুপচাপ, নিস্তব্ধ! বাইরে গভীর অন্ধকারে গাছ পালার মধ্যে বৃষ্টি ও ঝড়ের একটা প্রকাণ্ড মাতামাতি চলেছে।

বাড়ীর ছোট ছেলেই প্রথমে কথা কইলে। "ঢংটা দেখলে, এসে জানিয়ে দিয়ে গেল ওরা সবই জানে। বয়েই গেল। নিন্দে যা করার তা করতে রেহাই দিয়েছেন কিনা এতদিন। কাকে আর তোমার লজ্জা? কিসের আর লজ্জা? শোন বলি—"

এই ব'লে সে বিছানা থেকে উঠে সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ সাবিত্রীর মাথায় কি খেয়াল হ'ল, সাবিত্রী নিজেই বোধ হয় তা জানেনা মুহূর্ত দ্বিধা না ক'রে সে হন হন ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাড়ীর সদর দরজা খুলে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে একেবারে বাইরে বেড়িয়ে পড়ল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সাবিত্রী গিয়ে ধাক্কা দিল শরণ মাঝির ঘরের দরজায়। শরণ মাঝির ঘর গ্রামের এক প্রান্তে নদীর ধারে। শরণ মাঝির ঘর সাবিত্রী আগে থেকেই চিনত—এসেছেও আগে দু'-একবার। শরণ মাঝির স্ত্রী সাবিত্রীকে 'মা' ব'লে ডাকত এবং যথার্থই ছিল তার বিশেষ অনুগত। বছর আট-দশ আগে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে শরণ মাঝির বউ যখন ঘরে ঘরে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছিল, তখন সাবিত্রী নিজের গহনার বাক্স খুলে হাতের এক জোড়া বালা শরণ মাঝির বউ-এর হাতে তুলে দেয়, এবং সেই থেকে শরণের স্ত্রীর প্রাণ অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধায় একেবারে বাঁধা পড়েছিল সাবিত্রীর পায়ের তলায়।

এত রাত্রে আলু-থালু সিক্ত-বসনে সাবিত্রীকে দেখে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অবাক হ'য়ে গেল। তবুও "এস, এস মা এস" ব'লে বৃদ্ধ শরণ বিশেষ আদর যত্নে তৎক্ষণাৎ সাবিত্রীকে তুলে নিলে নিজের ঘরে। ঘরে গিয়ে সাবিত্রী বললে—"শরণ! নৌকায় চল। এখুনি আমি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।"

শরণ মনে মনে প্রমাদ গণল। এই ঝড় বৃষ্টিতে এত রাত্রে নৌকা নিয়ে নদীতে

চালান শুধু যে বিশেষ অসুবিধার ব্যাপার তা নয়, তাতে বিপদেরও বিশেষ আশঙ্কা। কিন্তু সে কথা তখন সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়ে তাকে বলবার মত ভরসা শরণের একেবারেই হ'লনা।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত শরণের স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে বাকী রাতটুকু শরণের বাড়ীতে কাটিয়ে ভোর হ'তে সাবিত্রী শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম ছেড়ে রওনা হ'ল—বোধ হয় জন্মের মত। যাত্রার পূর্বে শরণ সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মা! যাবে কোন দিকে, কোন গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছে?" সাবিত্রী সেকথার কোনও উত্তর দেয়নি। শরণ যখন ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ল, সাবিত্রী তখন সেই ছোট নৌকাখানার ছৈ এর মধ্যে শুয়ে পড়েছে—ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল—তার বোজা চোখ দুটোর ফাঁক দিয়ে। ক্রমে অবশ তনু এলিয়ে পড়ল অঘোর ঘুমে।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন সূর্যদেব আকাশে অনেক উপরে উঠে গেছেন—ঝড়-বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নাই। ক্লান্ত আঁখি দুটি মেলে শুয়ে শুয়েই সাবিত্রী কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল। চারিদিকে নদীর জলে সূর্যের আলো ঝিক মিক ক'রে জলছে। ছপ্ ছপ্ ছপ্ ক'রে বৈঠা বেয়ে নৌকা নিয়ে চলেছে শরণ। হঠাৎ সাবিত্রী ক্লান্ত সুরে সুধাল—"শরণ। চলেছ কোথায়?"

শরণ উত্তর দিল, "তোমারই বাপের বাড়ীর গ্রামে—মাধবপুরের দিকে।"

সাবিত্রী কোনও কথা কইলে না। আবার চোখ বুজে চুপ করেই শুয়ে রইল। আবার বোজা চোখ দুটোর পাতার মধ্য দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এল—ফোঁটা ফোঁটা জল।

## বারো

সাবিত্রী আমাদের বাড়ী আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যে বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল, সাবিত্রী আমাদের বাড়ীতে তার জীবনযাত্রাটুকু যতদূর সম্ভব আমার চোখের অন্তরালে একেবারে লুকিয়েই রাখতে চায়—নিজের অস্তিত্বটুকুর কোনও আভাস

পর্যন্ত আমাকে দিতে সে নারাজ। সাবিত্রী আসার পর শেষ কিছুদিন সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হওয়া ত দূরের কথা, চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি বললেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কখনও হঠাৎ আচমকা, বাড়ীর উঠানে কিম্বা বারান্দায়, সিঁড়িতে কিম্বা কোনও বাতায়নে, সাবিত্রীর দেখা পেতাম, আমার পদশব্দের ইঙ্গিতেই সে নিজেকে আড়ালে সরিয়ে নিত, মুহূর্তের বাক্যালাপের সুযোগ পর্যন্ত মাসখানেক, মাস-দেড়েকের মধ্যে আমার একদিনও ঘটেছে ব'লে একেবারেই মনে পড়ে না।

প্রথম কিছুদিন ব্যাপারটা সহজ ভাবেই নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, নিজের দুরদৃষ্টের একটা করুণ-ছবি নিয়ে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে সাবিত্রীর পক্ষে প্রথম প্রথম একটা লজ্জা থাকা ত মোটেই অস্বাভাবিক নয়—ক্রমে সবই যাবে কেটে। আমিও আমার ব্যবহারে, ধরণ-ধারণে সাবিত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য কোনরূপ ব্যাকুলতা বা আগ্রহ একেবারেই প্রকাশ করিনি; এবং কেন জানি না, সাবিত্রীর আসার পর কয়েকটা দিন নিজের প্রাণে-প্রাণে কেমনই একটা জোর একটা গর্ব অনুভব করেছিলাম যে, সাবিত্রীই আমার কাছে এগিয়ে আসবে প্রথমত আমি সাবিত্রীর দিকে এক পা-ও এগুব না। কিন্তু যখন দিনের পর দিন চলে গিয়ে—মাসাধিক কাল গত হওয়ার পরও সাবিত্রীর দিক দিয়ে কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না, তখন আমি যেন প্রাণে-প্রাণে একটু অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম।

সে দিন বর্ষা রাতের শেষে মেঘলা উষায় সাবিত্রীর পানে চেয়েই কেমন যেন চমকে উঠেছিলাম। সাবিত্রীর প্রতি অঙ্গের কানায় কানায় তখনও লাবণ্যের ভরা জোয়ার—কোনও দিকে এতটুকুও ভাঁটার টান লাগেনি। অস্ফুট সুরে "শান্তদা" ব'লে শুধু একবার মাত্র আমার মুখের পানে চোখ দুটী তুলেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ তড়িৎ খেলে গেল। সেই দুটী চোখ কত-কাল দেখিনি—এখন যেন ভাবের পরিপূর্ণতায় আরও সুগভীর, প্রশান্ত, স্থির!

সেই দিনই সকাল বেলায় ক্রমে মেঘ কেটে রোদ উঠেছিল—আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি আমাদের পুকুরের পূবের পাড়ের বাঁধা ঘাটের উপর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলাম সেইদিন সকাল বেলা, তাও মনে আছে। কত কি এলো-মেলো চিন্তার মধ্য দিয়ে সহসা বুঝতে পারলাম যে, আমার প্রাণের মধ্যে একটা এলোমেলো হাওয়া বইতে সুরু হয়েছে। হঠাৎ এক সঙ্গে আমার মনের সমস্ত বাতায়নগুলি যেন গিয়েছে খুলে—অনেক দিন যা' ছিল একেবারে বন্ধ করা।

চারিদিকে থেকে নানান স্মৃতিতে আকাশের মত আলো এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো আমার মনের প্রত্যেক কোণে কোণে—সেইদিন সকাল বেলায়।

তারপর কয়েকটা দিন কেটেছিল কেমন একটা আবেশের মধ্য দিয়ে—যেন একটা বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া অনুভূতির সন্ধান পেয়েছে মন, ক্রমেই যেন ভরপুর হ'য়ে উঠছে তারই কল্পনায়। অতীত,—সেই আমার সুমধুর অতীত দিনগুলির নানান স্মৃতি, থেকে থেকে শিউরে শিউরে উঠতে লাগলো আমার প্রাণের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে। আমাদের পুকুরের বাঁধাঘাট, তার আশ-পাশের গাছপালা, ঘাস, মাঠ, দূরে বেগবতী নদীর এপার ওপার সবই যেন হঠাৎ সজাগ হ'য়ে বারে বারে চাইতে লাগলো আবার আমারই মুখের পানে—নিতান্ত আকুল চাহনিতে!

ক্রমে একটা ইচ্ছা প্রাণের মধ্যে গড়ে উঠে মনটাকে থেকে থেকে নাড়া দিতে লাগল—সাবিত্রীর সঙ্গে দুটো কথা কই। একবার নিরিবিলি তাকে ডেকে শুধাই—সে আছে কেমন। একবার দুদণ্ড তার সঙ্গে বসে গল্প করি, আলোচনা করি তার সঙ্গে, আমাদের সেই ছেলেবেলার দিনগুলি নিয়ে। জীবনের কয়েকটা মুহূর্তে তার সঙ্গে বসে সেই সব সেই দিনের স্মৃতি আদান প্রদানের জীবনটাকে একটা মধুর রসে সঞ্জীবিত ক'রে তুলি। আসবে, সেদিন নিশ্চয়ই আসবে—আপনা থেকেই আসবে—সেই আনন্দেই ভরপুর হ'য়ে রইলাম কিছুদিন।

দিনের পর দিন কেটে গিয়ে প্রায় একমাস গত হ'ল কিন্তু সেই দিনটি আসার কোন লক্ষণই যখন দেখা গেল না, তখন ইচ্ছাটি ক্রমেই প্রবল হ'তে প্রবলতর হ'য়ে আমার সমস্ত প্রাণ-মন একেবারে দখল ক'রে বসল। কতদিন সন্ধ্যার পর নিরিবিলি আমাদের পুকুর পাড়ের উত্তরের বাঁধাঘাটের উপর চুপচাপ একলা বসে বসে কল্পনা করেছি—সাবিত্রী এখন যদি একবার কিছুক্ষণের জন্য একলাটি এইখানে এসে বসে আমার পাশে; কল্পনাতেও আনন্দ পেয়েছি—স্পষ্ট মনে আছে। ক্রমে ক্রমে সাবিত্রী আসার মাসখানেক পরে প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা খানিকক্ষণ একলা চুপ ক'রে ঘাটে বসে থাকতাম—হয় ত বা সাবিত্রী আসিবে ঘাটে। তখন সময়ে অসময়ে সকল কাজে, সকল কথায়, প্রাণের গভীরতম তলদেশ হ'তে মাঝে মাঝে ঢেউ খেলিয়ে তুলে উঠতো একটিমাত্র কথা—সাবিত্রী! আবার এসেছে আমার ঘরে—আছে আমারই আশে-পাশে।

এসব যদি প্রেমের লক্ষণ হয়, তবে সাবিত্রী আসার আন্দাজ মাসখানেক পরে সাবিত্রীর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে উঠেছিলাম—একথা বললে নেহাৎ মিথ্যাকথা বলা হবে না বোধ হয়। দীর্ঘকালের আঘাতে আঘাতে আমার প্রাণখানা হ'য়ে

উঠেছিল একখণ্ড লৌহ, পাষাণ! ক্রমেই মনে হ'তে লাগল—সন্ধান পেয়েছি এবার পরশমণির, স্পর্শেই প্রাণ হ'য়ে উঠবে স্বর্ণময়। এযে বিধিরই বিধান—তাই ত কোনও দ্বিধা করিনি। মনকে বুঝিয়েছিলাম পরশমণির স্পর্শে মধ্যেই ত আমার পরিমাণ। নৈলে কি নিজেরি প্রাণের ভারে অতলে যাবো তলিয়ে? কখনই না। এ ত' সেই সাবিত্রী, সেই আমার ছেলেবেলার সাবিত্রী, দু'টো কথা কইব মাত্র, তাতেও বাধা? কেন? কিসের জন্যে? তার এই অন্তরালটি আমি যেন কিছুতেই সইতে পাচ্ছিলাম না।

মনের যখন আমার এই অবস্থা, তখন একদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই শপথ ক'রে উঠেছিলাম যে, রাত্রে আমার শয্যা গ্রহণের পূর্বে যেমন ক'রে পারি সাবিত্রীর সঙ্গে দুটো কথা কইবই। সমস্ত দিনটা বারে বারে বাড়ীর মধ্যে নানান ছুতোয় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম—একটু নিরিবিলি সাবিত্রীর দেখা পাওয়ার জন্য! বাড়ীর অন্য লোকের সাক্ষাতে সাবিত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে কথা বলায় হয় ত কোনও দোষ ছিল না, কিন্তু আমার মনের দিক দিয়ে তখন তা ছিল অসম্ভব। এক প্রথম থেকে সাবিত্রীকে ডেকে কথা কইতাম, তাহ'লে সবই সহজ হ'য়ে দাঁড়াত। কিন্তু প্রায় মাস-দেড়েক আন্দাজ সাবিত্রীকে একটি কথাও বলিনি, ভাবে-ভঙ্গিতে সকলের কাছে এইটেই বুঝিয়েছি যে, সাবিত্রীর সঙ্গে কোনও কথা বলার প্রয়োজন আমার জীবনে একেবারেই নাই, তখন হঠাৎ সাবিত্রীকে ডেকে অন্য লোকের সামনে কথা বলি কি ক'রে—ভয়ানক বাধল। তাই সমস্ত দিন খুঁজে বেড়াতে লাগলাম একটু নিরিবিলি অবসর—সাবিত্রীর সঙ্গে দুটো কথ কইবার জন্য।

সমস্ত দিনে কোনও সুযোগ হ'ল না। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি, তুষার কাপড় কাচতে চলেছে—সামনেই তার সঙ্গে দেখা। একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললে—"ওকি! তুমি হঠাৎ এ সময়ে ভেতরে?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "একটা জরুরী কাগজ আমার সার্টের পকেটে রয়েছে—শোবার ঘর থেকে কেমন যেন থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই ব'লে কেমন যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তুষার বললে, "তা দাঁড়িয়ে রইলাম যে?"

"না—যাই" এই ব'লে ধীরে পদক্ষেপে ওপরে যাওবার সিঁড়ির দিকে এগুতে লাগলাম। উপরে উঠতে উঠতে দু'-একবার সিঁড়ি দিয়ে লুকিয়ে ফিরে চেয়ে দেখলাম—তুষার কাপড় কাচতে গেল কিনা।

লুকিয়ে কেন চেয়ে দেখেছিলাম তার কৈফিয়ৎ অতি সোজা। তুষারের সঙ্গে সাবিত্রীর মনের যে একেবারেই মিল হয়নি—এ খবরটা ইতিমধ্যেই তুষারের সঙ্গে কথাবার্তায় আমি টের পেয়েছিলাম, এবং যতদূর বুঝতে পেরেছিলাম, এ দিক দিয়ে দোষটা তুষারকে দেওয়া চলে না। সাবিত্রী আসার পর তুষার প্রাণভরা সহজ সহানুভূতি নিয়ে হে'সে বারে বারে সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল এবং বারে বারে সাবিত্রীর প্রাণের রুদ্ধ দুয়ারে ঘা খেয়ে ফিরে এসেছে—এ খবর জানতে আমার বাকী ছিল না। সাবিত্রীর মনের দরজা তুষারের জন্য একদিনের তরেও এতটুকুও খোলেনি। ফলে, ইতিমধ্যেই তুষারও নিজেকে সাবিত্রীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছিল। ইদানীং সাবিত্রীর কথা তুষারের কাছে যখনই তুলেছি কেমন যেন বিরক্তিভরে তুষার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—সাবিত্রীকে নিয়ে কোনও রকম আলোচনা করতে পর্যন্ত রাজী হয়নি।

তাই, যদি বা সাবিত্রীর সঙ্গে উপরে উঠতে উঠতে সিঁড়িতে আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় এবং তার সঙ্গে যদি দু'টা কথাই কই, তুষার সেটা নাইবা জানলে। তুষারকে জানা'ত মন আপনা থেকেই কেমন সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছিল।

চেয়ে দেখলাম—তুষার দাঁড়ায়নি, কাপড় কাচতেই চলে গেল। আসবার সময় নীচের ঘরগুলো লক্ষ্য ক'র'ত করতে এসেছিলাম—সাবিত্রীকে কোথাও দেখিনি। তাই কম্পিত পদে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম—হয় ত বা সাবিত্রীকে দোতলায় পাব—একা।

দোতলায় একেবারে উত্তরের ঘরটায় মা শুতেন এবং সাবিত্রী আসার পর সাবিত্রীও শুত মারই ঘরে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে, মোড় ফিরে সিঁড়ির রেলিংয়ের ধার দিয়ে আবার একটুখানি উত্তর মুখো গেলে মার শোবার ঘরের দরজাটা পাওয়া যায়। দোতলায় উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেমনই মনে হ'ল সাবিত্রী যদি দোতলায় কোনও ঘরে থাকে ত মার শোবার ঘরেই আছে। ঘুরে, মার শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরে চেয়ে দেখলাম—সাবিত্রী ঘরেই রয়েছে একা। দরজার দিকে পিছন ফিরে খাটের উপর বসে মাথা নীচু ক'রে বালিশে ধোপার বাড়ীর ওয়াড় পরাচ্ছে। আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ একটু কেঁপে উঠল।

কি কথা ব'লে কথা সুরু করি কিছুই ত ভেবে যাইনি। হঠাৎ দেখি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। ঘরের ঠিক মধ্যে না গিয়ে একটু শব্দ ক'রে দরজার চৌকাটের উপর উঠে দাঁড়ালাম, আশা করেছিলাম সাবিত্রী আমার পায়ের শব্দ শুনে চোখ

ফিরিয়ে চাইবে আমার পানে, হয় ত সেই সুরু করবে কথা। কিন্তু আমার পায়ের শব্দ শোনা সত্ত্বেও, সাবিত্রী কথা বলা ত দূরের কথা, যখন দরজার দিকে একবার ফিরেও চাইল না, তখন সত্যই আমি নিজেকে কেমন একটু অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম।

আর ত চুপ ক'রে থাকা চলে না। একটা কথা বলা দরকার। হঠাৎ ডাকলাম—"সাবিত্রী"! "সাবি" ব'লে ডাকতে কেমন লজ্জা হ'ল। মুখ ফিরিয়ে আমার মুখের উপর চোখ তুলেই আবার মাথা নীচু ক'রে রইল। কোনও কথা কইলে না। আমি ত তখনও দরজার চৌকাটের উপরেই দাঁড়িয়ে আছি। কোনও কথা খুঁজে না পেয়েই বোধ হয় তাড়াতাড়ি বলেছিলাম—"সাবিত্রী তুমি ভাল আছ ?"

ছিঃ ছিঃ—ভাবতে এখনও লজ্জায় মাথা কাটা যায়! আমারই বাড়ীতে আসার প্রায় দুমাস পরে নেহাত একটা অপ্রাসঙ্গিক মামুলি প্রশ্ন—আমারই মুখে!

মুখ না ফিরিয়েই মাথা দুলিয়ে আস্তে আস্তে বল্লে, "হ্যাঁ"।

হঠাৎ যেন আমার মনে অনুপ্রেরণা এল। বেশ স্পষ্ট গলায় শুধালাম "সাবিত্রী! তুমি আমার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা বলনা কেন ?"

কোনও কথা কইলে না। মাথাটি যেন আরও একটু নীচু হ'য়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার ব'লে যেতে লাগলাম—"আমি রোজই ভাবি তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে একটু কথাবার্তা কইব—কিন্তু কোনও দিনই হ'য়ে ওঠে না। কত কথা যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে ?"

তবুও কোনও কথা নাই। তেমনি বসে রইল নীরব, নিশ্চল। শুধু হাত দুটি কাজ করে যেতে লাগল বালিশের সঙ্গে ওয়াড়ের।

আমি এক-পা এক-পা ক'রে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকলাম। ঢুকে গিয়ে বসলাম খাটের আর এক প্রান্তে—অতি সন্তর্পণে আবার বলতে লাগলাম—"তোমার আমার সঙ্গে এ রকম কথাবার্তা বন্ধ থাকার ত কোন প্রয়োজন নাই, আর সেটা স্বাভাবিকও নয়। তাই বলছিলাম—"

হঠাৎ চোখ তুলে সোজা চাইল আমার মুখের দিকে। শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "বৌঠান কোথায় ?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "কাপড় কাচতে গেছে। কাপড় কেচে ফিরে আসতে তার এখনও দেরী। জান ত—"

আমার গলার সুরে ঠিক কি ভাব ফুটে উঠেছিল জানি না। তবে আমার

প্রাণের আশঙ্কার দিক দিয়ে বোধ হয় সাবিত্রীর প্রাণটাও বিচার করেছিলাম। তাই বোধ হয় বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, "সে দিক দিয়ে খানিকক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার—ভয় নেই।"

কিন্তু সাবিত্রীর প্রাণে ভয়ের যে কি কারণ থাকতে পারে সেটা একবারও ভেবে দেখিনি। সেই দিক দিয়ে বোধ হয় দারুণ ভুল ক'রে বসলাম। তখন আর একটা বালিশের ওয়াড় পরান বাকী। হস্তের ক্ষিপ্রগতিতে তাড়াতাড়ি সেই বালিশের ওয়াড় পরিয়েই হঠাৎ সাবিত্রী উঠে দাঁড়াল। সহজ গলায় আমাকে বললে, "আমার নীচে কাজ আছে——যাই।"

এই ব'লে আমার কথার অপেক্ষা না ক'রেই শান্ত পদক্ষেপে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। আমি কেমন যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম।

হঠাৎ কানে এল সাবিত্রীর কণ্ঠস্বর। সিঁড়ীর ঠিক উপরে দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলছে, "বৌঠান! শান্তদাকে খুঁজছ? এই যে মার শোবার ঘরে বসে আছেন।"

মার শোবার ঘর থেকে সিঁড়ির এক অংশ দেখা যায়। চেয়ে দেখলাম সাবিত্রী নীচে নেমে গেল। তুষার উঠছে উপরে। তুষারের কাপড় কাচা হয়নি —গায়ে শাড়ীর উপরে একখানা গামছা জড়ান। উপরে উঠে এসেই সটান মার শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তখনও মার শোবার ঘরের খাটের উপরে বসে আছি।

গম্ভীর মুখে তুষার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে বসে আছ?"

কিই বা বলি? বললাম, "এমনি! শুধু শুধু।"

"কখন ত তোমাকে শুধু শুধু মার শোবার ঘরে এসে বসে থাকতে দেখিনি।"

গলার সুরে একটু শ্লেষ মেশান ছিল। মনে মনে একটু রাগ হ'ল। একটু জোরের সঙ্গে বললাম, "এই সাবিত্রীর সঙ্গে দু'-একটা কথা কইছিলাম। তা হয়েছে কি?"

বললে, "না, হবে আবার কি! তবে ও রকম ঢাক্ ঢাক্—গুড়্ গুড়্— লুকোচুরি করাই বা কেন?"

এই ব'লে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না ক'রে সেখান থেকে চলে গেল। আমিও একটুখানি বসে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। দেখলাম—তুষার শোবার ঘরে গিয়ে খাট থেকে বোধ হয় কি একটা বার করলে, কেননা হাত-বাক্স খোলার শব্দ এল

আমার কানে; তারপর সিঁড়ি দিয়ে গম্ভীর ভাবে নেমে চলে গেল,—আমার সঙ্গে আর একটা কথাও কইলে না।

বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনটা ক্রমেই গ্লানিতে ভরে উঠতে লাগল। গ্লানিটা তুষারকে নিয়ে একেবারেই নয়, সম্পূর্ণ সাবিত্রীকে নিয়ে। সাবিত্রী আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করলে কেন? দুটো কথা কইতে এলাম, এতদিনের এত আগ্রহ নিয়ে, সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে ত চলে গেলই, অধিকন্তু তুষারকে বেশ জানিয়ে দিয়ে গেল যে, আমি সাবিত্রীর সঙ্গে কথা কইতে মার ঘরে এসে ঢুকেছিলাম।

কিন্তু ফলে, সাবিত্রীর কাছে 'ঘা' খাওয়ার দরুণ সাবিত্রীর প্রতি আমার মনোভাবের কোনও পরিবর্তন ত হ'লই না বরং দুটো কথা কয়ে সাবিত্রীর মনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের একান্ত আগ্রহটি আমার মনে আরও যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠল। সইতে পারছিলাম না, কিছুতেই সইতে পারছিলাম না যে, সেই সাবিত্রী চিরদিনই আমার অচেনা, পর হয়ে থাকবে।

দেখতে দেখতে বোধ হয় আরও একমাস কাটল—সাবিত্রীর সঙ্গে দুটো কথা কওয়ার সুযোগ কিছুতেই ঘটল না। ক্রমে লক্ষ্য করলাম সাবিত্রীর দিক দিয়ে বাধা ত ছিলই, তুষারের দিক দিয়েও সাক্ষাৎ ভাবে না হ'লেও পরোক্ষ ভাবে একটুও বাধা ছিল না এমন নয়। সেদিনকার সে ব্যাপারটির পর অবশ্য তুষারের সঙ্গে আমার সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও আলোচনা হয়নি। কিন্তু তবুও লক্ষ্য করেছিলাম, সাবিত্রীর সঙ্গে আমার কোনও দিক দিয়ে কোনও রকম সম্পর্কের এতটুকু আভাস পর্যন্ত যেন তুষার সইতে রাজী নয়—এমনই একটা অভিব্যক্তি ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠতে লাগলো তুষারের ধরণ-ধারণে, তার সমস্ত ব্যবহারে।

আমাকে ও সাবিত্রীকে নিয়ে তুষারের মনোভাব কেন যে এমন হয়েছিল জানি না। আমার ও সাবিত্রীর অতীত জীবনের সেই মধুর সম্পর্কটার বিষয় তুষার ত কিছুই জানত না। কিছুই বলিনি কোনও দিন। তবে? সাবিত্রীর সঙ্গে যে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল, এ খবরটি অবশ্য তুষারের অজানা ছিল না। তাই কি আমার ও সাবিত্রীর স্বাভাবিক মেলামেশাতেও তুষারের ছিল আপত্তি! কি জানি হয় ত হবে। কিম্বা হয় ত সবই একটা নীচ সন্দিগ্ধ মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি! জানি না।

তুষারের এই মনোভাবটুকু সাবিত্রীও যে লক্ষ্য করেছিল—সে বিষয়ে আমার

কোন সন্দেহ ছিল না। তাই কি সাবিত্রী নিজেকে অমন ক'রে গুটিয়ে রেখেছিল আমার চোখের অন্তরালে? কিন্তু তাও কেমন বিশ্বাস হয়নি। আমার সঙ্গে মেলা-মেশার আগ্রহ যদি সাবিত্রীর প্রাণে যথার্থই হয় তুষারের বাধা সাবিত্রী এক মুহূর্তের তরেও মানবে না—এ বিশ্বাস আমার সাবিত্রীর উপর ছিল। তবে?

একদিনের একটা ব্যাপার বলি। মার শোবার ঘরে সাবিত্রীর সঙ্গে কথা হবার প্রায় একমাস পরের কথা। আমাদের গ্রামের স্কুলের কার্যনির্বাহক সভায় আমি ছিলাম স্থায়ী সভাপতি। দিনটা মনে আছে, একদিন মঙ্গলবার আমাদের গ্রামের স্কুলের বিশেষ কোন জরুরী কাজের জন্য আমাকে সদরে যেতে হয়েছিল—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে। বন্দোবস্ত ছিল সদরের কাজকর্ম সেরে রাত্রে হরিশের ওখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে গরুর গাড়ীতে আমি মাধবপুর ফিরে আসব। বন্দোবস্ত অনুসারে আমি যখন গ্রামে ফিরে এলাম তখন সবে ভোর হয়েছে—আকাশে-বাতাসে ভোরের আভাসে গাছে গাছে পাখীগুলি সবে কিচির-মিচির সুরু ক'রে দিয়েছে! আমার গাড়ী একেবারে আমাদের বাড়ীর অন্দরের দরজায় এসে দাঁড়াল এবং আমি গাড়ী থেকে নেমে দেখলাম—অন্দরের যাওয়ার দরজাটা খোলাই র'য়েছে। বুঝলাম চাকর-বাকররা কেউ কেউ ইতিমধ্যেই উঠে পড়েছে। যদিও গরুর গাড়ীতে দিব্যি ঘুমুতে ঘুমুতে এসেছি, তবুও বিছানায় শুয়ে আরও খানিকটা ঘুমিয়ে নেব এই ভেবে গাড়ী থেকে নেমে সটান অন্দরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম সাবিত্রী আমাদের একতালার বারান্দায় সিঁড়ির উপরে চুপ ক'রে একা বসে আছে। দেখে একটু বিস্মিতও হয়েছিলাম যে সাবিত্রী আমাকে দেখেও বসেই রইল—উঠে ঘরের ভিতর চলে গেল না। সাবিত্রীর বসার ভঙ্গিটা দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার অতীতের একটি ছোট্ট স্মৃতি—এমনি ক'রেই ত সাবিত্রী বসেছিল আর একদিন ভোর বেলায়, যেদিন গ্রাম্যপথে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে তার হাতখানি আমার হাতে দিয়েছিল ধরা। মনটা সহসা সরস পুলকে শিউরে উঠতে লাগল। আজও কি সাবিত্রী আমার সঙ্গে দুটো কথা কইবে না?

সাবিত্রীর কাছাকাছি এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে গেলাম। সাবিত্রী কিন্তু নীরবে নতমুখে বসেই রইল, উঠে চলে গেল না। সমস্ত বাড়ী ঘুমন্ত, তুষার নিশ্চয়ই উপরে অঘোরে ঘুমুচ্ছে তখনও। সাবিত্রীর কাছে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে একবার চাইতেই দেখতে পেলাম ভোরের আকাশে খানকয়েক

পাতলা পাতলা সাদা সাদা মেঘ আকাশের গায়ে ইতস্ততঃ অলস ভাবে ভেসে র'য়েছে—সেদিন ভোরেও দেখেছিলাম।

উঃ, সে আজ কতকাল আগের কথা!

কোনও দ্বিধা না ক'রে সিঁড়িতে সাবিত্রীর পাশে বসে পড়লাম। সাবিত্রী তবুও ত উঠে গেল না। আমার মন তখন সমস্ত জগৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ঐ দূর আকাশের গায়ে পাতলা পাতলা মেঘগুলোর উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে—যেন এক স্বপ্নলোকের অপরূপ মায়ায়। তুষার! ছোট অতি ছোট সে, কোন তলায় সে তলিয়ে গেছে—খুঁজে পাওয়াই ভার!

ডাকলাম, "সাবিত্রী"।

সাবিত্রী একবার চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চাইলে, কোন জবাব দিল না।

বললাম, "তুমি কি আমার সঙ্গে আর একটি কথাও কইবে না জীবনে?"

তবুও সে চুপ ক'রেই রইল।

বললাম, "সে সব দিনের কথা কি একেবারেই মনে নাই—সবইকি ভুলে গেছ?"

আমার বুক ছাপিয়ে তখন কথার বন্যা আসছে—কথার অভাব আমার মোটেই হচ্ছিল না।

এইবার সাবিত্রী কথা কহিল—বেশ পরিষ্কার গলায় উত্তর দিল, "কিছুই ভুলিনি।"

বললাম, "মনে আছে এমনি এক ভোর বেলায়—" মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "আছে"। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, "তবে?"

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইল। বললাম, "তবে আজ আমাকে এমন ক'রে 'পর' করে রেখেছ কেন? ছুটো কথা—"

হঠাৎ প্রশ্ন করল, "ছোড়দার খবর কি?"

ছোড়দা—মুকুন্দ? কথাটা শোনা মাত্র হঠাৎ শরীর ও মন কেমন যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল।

বললাম, "কেন, তুমি শোননি কিছু?"

জিজ্ঞাসা করলে, "কি?"

বললাম, "তার সঙ্গে আমাদের এখন মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ।"

আশা করেছিলাম কথাটা শুনে বিস্মিত হ'য়ে বিস্তারিত আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু কিছুই বললে না। চুপ ক'রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি কিছুই জাননা ?"

কথার উত্তর না দিয়ে বললে, "সে এখন কলিকাতায় ১৪নং সাপর কুণ্ডু লেনে আছে—না ? বড়দাও তার ওখানেই আছেন।"

বললাম, "হ্যাঁ—সবই ত জান দেখছি।"

বললে "কাল সরলা-ঝি আমাকে দিয়ে একখানা পোষ্টকার্ড লেখালে তার দেশে। তখন দেখলাম তার হাতে বড়দার নামে একখানা চিঠি, ছোড়দার ঠিকানায়। পোষ্টকার্ডখানা লেখা হলে চিঠি দু'খানা ডাকে দিতে নিয়ে গেল।"

হঠাৎ শরীর চম্‌কে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "বড়দার নামে চিঠি ? কে লিখেছে ?"

বললে, "বৌঠান লিখেছেন। তাঁরই হাতের লেখা। শুনেছিলাম বটে তোমাদের সঙ্গে ছোড়দার কি সব গোলমাল হয়েছে। কিন্তু চিঠি দেখে ভাবলাম বড়দা যখন সেখানেই আছেন, তখন তেমন বিশেষ কিছু নয় বোধ হয়।"

কথাটা শুনে বোধ হয় কিছুক্ষণ আমি একটু শুম্ভিতের মত বসেছিলাম।

হঠাৎ সাবিত্রী বললে, "আমি যাই, বোধ হয় সইমা এতক্ষণে উঠেছেন।"

এই ব'লে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না ক'রে উঠে চলে গেল। আকাশে ভেসে যেতে যেতে সহসা প্রচণ্ড ধাক্কায় কে যেন আমায় ফেলে দিলে—ভূতলের পঙ্কিল ধুলায়।

সমস্তদিন মনের অবস্থা আমার যে ঠিক কি রকম হয়েছিল, লিখে বোঝান কঠিন। সাত রংয়ের রামধনু উঠেছিল আমার মনের আকাশে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝিরঝিরে পচা বৃষ্টিতে অস্থির হ'য়ে থেকে থেকে পাগল হ'য়ে উঠেছিল আমার মন। সাবিত্রী কথা কয়েছে—এতদিন পরে সহজ, সরলভাবে আমার সঙ্গে কথা কয়েছে—সমস্ত দিন থেকে থেকে সেই আনন্দে মন উঠছিল নেচে নেচে, অথচ সামান্য একটু নড়তে গেলেই মন ব্যথা পায় তীক্ষ্ণ কণ্টকের আঘাতে, আহত হ'য়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় এলিয়ে পড়ে—মনের নাচন আরম্ভেই যায় থেমে।

তুষার দাদাকে চিঠি লিখেছে—হঠাৎ কি লিখল, কেন লিখল,—কিছুতেই মন কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পাচ্ছিল না। হয়ত বরাবরই চুপি চুপি লিখে এসেছে, কে জানে ?

সমস্ত দিন গেল। অপরাহ্নে খাটের উপর বসে অন্যমনস্ক হ'য়ে চুপ ক'রে চেয়েছিলাম একটু দূরে মাঠের 'পরে ম্লান রৌদ্রটুকুর পানে। হঠাৎ মনে প্রশ্ন উঠল —আজ ভোরে সাবিত্রী যে এতটুকুও মিছে কথা বলেনি তা আমি জানতাম।

কিন্তু মনে হ'ল, হয়ত সবই সে জানে, মার কাছ থেকে সবই শুনেছে, কেননা সাবিত্রী আসার পর তার মধ্যে মা যেন একটা প্রাণের অবলম্বন পেয়েছিলেন। নিজের প্রাণ-মন একেবারে উজাড় ক'রে সাবিত্রীর হাতে নিজের সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন—এ ত আমি অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। তাই কি সাবিত্রী, সব জেনে-শুনে আমাকে আঘাত করার জন্যই জানিয়ে দিয়ে গেল—তুষার দাদাকে চিঠি লিখেছে? হয়ত সেই জন্যই কথা কয়েছিল, নইলে কথা কইত না আমার সঙ্গে। একমুহূর্তে মনের আকাশের রামধনু কোথায় মিলিয়ে গিয়ে ঘন কাল মেঘে মনটা একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল।

রাত্রে যখন শুতে গেলাম, মনটা একেবারেই সহজ ছিল না। তুষার শুতে আসতে দেরী করছিল—আমার ক্রমে সেটা অসহ্য হ'য়ে উঠতে লাগল।

তুষার শুতে এল, এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কথায় আবার সুরু হ'ল সেই পচা মামুলী দ্বন্দ্ব, যার বিষয় বিস্তারিত লেখার প্রবৃত্তি আমার আর একেবারেই নাই। তবে এবার তুষারের কলহের ধরণে একটা নতুনত্ব লক্ষ্য করেছিলাম,—সেই বিষয় একটু বলি।

তুষারের দাদার কাছে চিঠি লেখার খবরটি যে আমি সাবিত্রীর কাছ থেকে পেয়েছিলাম, আভাসে পর্যন্ত তুষারকে সে কথা জানাতে দিই নাই। তুষারকে বলেছিলাম যে, আমি সেইদিনই সকাল বেলায় গ্রামের ডাকঘরে ডাকমাষ্টারের সঙ্গে কোনও একটা পরামর্শের জন্য গিয়ে তুষারের হাতের লেখা চিঠি ডাকমাষ্টারের টেবিলে দেখতে পাই। তুষার প্রথম কথাটা একেবারে অস্বীকার করার চেষ্টা করাতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, প্রয়োজনে হয়ত সে চিঠি দেখানও আমার পক্ষে মোটেই অসাধ্য নয়। কেননা, সে চিঠি আমি ডাকমাষ্টারের কাছে থেকে ফেরৎ নিয়ে এসে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি।

কথাটা শোনামাত্রই হঠাৎ তুষার আমাকে আক্রমণ করলে—সহজ ভাবে সমুখ দিয়ে নয়, একেবারে অতর্কিতে পিছন দিয়ে। সাবিত্রী ও আমাকে নিয়ে একটা নিদারুণ কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রে স্পষ্টই আমাকে জানিয়ে দিলে যে, দাদাকে সে চিঠি লিখেছে, তার খুসী, এবং ভবিষ্যতে যদি ইচ্ছে হয় ত আরও হাজারখানা চিঠি সে দাদাকে লিখবে এবং তার বিষয় কোনও কৈফিয়ৎ সে আমাকে দেবে না। কথায় কথায় আরও জানিয়ে দিল যে, জীবনের সমস্ত কর্মে সে যা ইচ্ছা তাই করবে, কাউকে মানবেনা, তা সে সংসারই হোক বা স্বামীই হ'ন। শেষ পর্যন্ত এ কথাও আমাকে শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি যে, আমার মত জঘন্য চরিত্র পুরুষের তার কোন

কাজের জন্ত তার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া অমার্জনীয় স্পর্দ্ধার ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। এক কথায় তুষারের কথাবার্তার মধ্যে আমার চক্ষে, কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজেকে বাঁচবার চেষ্টা এতটুকুও ছিল না। আমার বিরুদ্ধে সহজ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে তার মন যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত—সেইটেই সে স্পষ্ট আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল সেইদিন রাত্রে।

তুষার পূর্বে আমার সঙ্গে অনেক কলহ করেছে; অসংযত ভাষায়, কুৎসিত ঝঙ্কারে আমাকে গালাগালি দিতেও সে এতটুকু দ্বিধা করেনি। কিন্তু ঠিক এ ভাবে আমাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে অপমান করতে সে এর আগে কখনও সাহস করেনি। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ স্পষ্ট মনে আছে, আমার মাথায় কেমন যেন একটা অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম এবং সশব্দে শোবার ঘরের দরজা খুলে একেবারে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

বারান্দায় এসে কেমন ইচ্ছে করতে লাগল—একটু ফাঁকায় যাই, খানিকক্ষণ চুপ ক'রে গিয়ে দাঁড়াই অনন্ত আকাশের নীচে। মাথার উপরে বারান্দার ছাদ—সেও যেন অসহ্য বোধ হ'তে লাগল।

সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে গেলাম তিনতলার ছাদে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মার শোবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখলাম—মার শোবার ঘরের দরজা তখনও খোলা রয়েছে, ভিতর হ'তে বন্ধ হয়নি।

ছাদে গিয়ে দাঁড়াতেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম চতুর্থী কি পঞ্চমীর চাঁদ একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমারই মুখের পানে একরাশ লাবণ্যভরা চোখে। চারিদিকে যতদূর চোখ গেল, ছড়িয়ে রয়েছে একটা ম্লান রূপের অর্দ্ধনিমীলিত মাধুরী,—স্বপ্নাবেশে তন্দ্রাভিভূত! দূরে দূরে চেয়ে দেখলাম সবই যেন একটা অপরূপ মায়ার রহস্যজালে কুয়াসাচ্ছন্ন, নীরব, নীথর, নিস্পন্দ। আমার শরীর-মন কেমন যেন এক সঙ্গে শিউরে উঠল! অভিভূতের মত খানিকটা এগিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালাম ছাদের এক প্রান্তে।

চমকে উঠলাম। হঠাৎ মনে হ'ল পিছনে যেন কার চরণের ধ্বনি। চমকে ফিরে চেয়ে দেখি দেহখানি শুভ্র বসনে আবৃত রমণী-মূর্তি—ধীর পদক্ষেপে ছাদের আর এক প্রান্ত দিয়ে চলে যাচ্ছে সিঁড়ি-ঘরের দিকে। সাবিত্রী না? নিশ্চয়ই সাবিত্রী।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি। ডাকলাম, "সাবিত্রী!"

সাড়া দিল না! মুহূর্তে সিঁড়ি-ঘরের দরজা পেরিয়ে মিশিয়ে গেল অন্ধকারে।

আবার ডাকলাম, "সাবিত্রী !"

হায়রে ! সাবিত্রীও আমাকে স্পষ্ট অবহেলা ক'রেই চলে গেল। ডাকলাম —সাড়াও দিলে না।

একটা বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন বুকের মধ্যেই গুমরে গুমরে আছাড় খেয়ে মরতে লাগলো। চোখ ফেরাতে পারলাম না। একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম সিঁড়ি-ঘরের দরজার পানে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই—একি ?

সাবিত্রী আবার এল ফিরে ? সাবিত্রীই ত ?

দরজার চৌকাট পেরিয়ে এসে দাঁড়াল মুক্ত আকাশের নীচে—ছাদের উপরে।

পরিষ্কার গলায় আমাকে ডেকে শুধাল, "শান্তদা ! আমাকে ডাকছিলে ?"

আমার বুকের নিঃশ্বাস সহসা যেন মুক্তি পেয়ে ছড়িয়ে গেল আকাশে বাতাসে।

বললাম, "হ্যাঁ।"

কয়েক পা এগিয়ে গেলাম সাবিত্রীর দিকে—সিঁড়ির ঘরের দরজার কাছাকাছি। সিঁড়ি-ঘরের দরজার দিকে চোখ পড়তেই সেখানে চেয়ে দেখি—আর একটি রমণী-মূর্তি, দরজার চৌকাট ধরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তুষার ছাড়া আর কেই বা হবে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমাদের দিকে—চোখ দুটি অন্ধকারে জ্বলছে, যেন দুটো উজ্জ্বল মণি।

ব্যাপার খানিকটা আন্দাজে বুঝলাম। সাবিত্রী আমার সঙ্গে ছাদে এ সময় কথা কইবে না ঠিক করেছিল, তাই বোধ হয় আমার কথার সাড়া না দিয়ে যাচ্ছিল নীচে নেমে। সিঁড়ি-ঘরে ঢুকেই সামনে তুষারকে দেখতে পেয়ে, ফিরে এসেছে। মনে হ'ল, এখন সাবিত্রী আমার সঙ্গে বেশ সহজ ভাবে কথাবার্তা কইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কেন ? সাবিত্রীর মনও কি তুষারকে দেখে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল ? কিম্বা—কি জানি।

সাবিত্রীর মনের খবর যাই হোক, আমার মন তখন ষোল আনা বিদ্রোহের ফণা তুলেছে—ভয়-ডরের কোনও ঠাঁই-ই তখন ছিলনা। তুষারকে দেখে সাবিত্রীর সঙ্গে কথা কইবার অনুপ্রেরণা যেন আরও গেল বেড়ে।

বললাম, "সাবিত্রী ! এস না খানিকটা গল্প করা যাক।"

সাবিত্রীও সহজভাবেই বললে, "বেশ ত।"

এই ব'লে সাবিত্রী ছাদের যে দিকটায় ছিল, সেই দিকটায় এগিয়ে চলল আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখি ছাদের সেই দিকটায় একটা মাদুর পাতা রয়েছে।

বললাম, "এখানটায় একটা মাদুর পাতা রয়েছে? তুমি এইখানটায় বসে ছিলে বুঝি?"

বললে, "শুয়েছিলাম।"

আমি মাদুরের উপর বসলাম। সাবিত্রী পাশেই মেজেয় বসে পড়ল। ছাদের যে দিকটায় আমরা বসলাম যেখান থেকে সিঁড়ি-ঘরের দরজাটা সোজা দেখা যাচ্ছে। চেয়ে দেখলাম তুষার তখনও ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, "তুমি মাদুরে বসনা। মেজেয় বসলে কেন?"

বললে, "তা হোক।"

আমাদের কথাবার্তা বেশ পরিষ্কার সহজ গলায়ই হচ্ছিল—একেবারে চাপা গলায় নয়।

একটুখানি দু'জনে চুপ ক'রে থাকার পর সাবিত্রীই কথা কইলে।

বললে, "সইমার শরীর কিন্তু দিন দিন বড্ড খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন কি হয়েছে?"

বললে, "রোজ শেষ-রাত্রের দিকে ঘুমের মধ্যেই কেমন যেন একটা কাতরোক্তি করেন—একটা গোঙানি রকমের শব্দ। তখন উঠে খানিকক্ষণ বুকে হাত বুলিয়ে দিতে হয়। অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কমে। তখন নাক দিয়ে নিঃশ্বাসও পড়ে খুব জোরে জোরে।"

বললাম, "সে কি? তাহ'লে ত কালই ডাক্তার আনাবার ব্যবস্থা করা দরকার।"

বললে, "হ্যাঁ। ডাক্তার আনতে দেরী করা বোধ হয় ঠিক হবে না। সকাল বেলা রোজই খানিকক্ষণ উঠতে পারেন না। কাহিল বোধ করেন—মাথা ঘোরে।"

বললাম, "কৈ, এতদিন ত এসব কিছুই শুনিনি।"

সাবিত্রী চুপ ক'রে রইল, কোনও কথা কইল না। আমিও বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে চুপ ক'রেই বসেছিলাম, হঠাৎ সাবিত্রী শুধাল, "আমাদের বাড়ীটা এখন কি অবস্থায় আছে?"

সাবিত্রীদের বাড়ী? অনেক দিন সে দিকটায় যাইনি বটে। তবে যতদূর জানতাম সেটা এখন জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো-বাড়ীতে পর্যবসিত হ'য়ে হিংস্র সর্পের আবাস-ভূমি হ'য়েছে। কিছুদিন আগেও দুটো বড় বড় গোখরো সাপ সাবিত্রী-দের বাড়ীর সদরের কাছে মারা হয়েছিল খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু কথাগুলি ঠিক এভাবে সাবিত্রীকে বলতে কেমন যেন বাধল।

বললাম, "সেই ভাবেই আছে। তবে এতদিন আগাছায় ভরে গিয়েছে নিশ্চয়ই।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সাবিত্রী বললে, "বাড়ীটা দেখতে ইচ্ছা করে, আবার কেমন ভয়ও করে।"

"কেন—কিসের ভয় ?"

সাবিত্রী বললে, "সেই ছেড়ে গিয়েছিলাম—আর ত সেখানে যাইনি।"

একটা নিঃশ্বাস যেন বুকের মধ্যে নিল চেপে।

হঠাৎ বললাম, "সাবিত্রী! বাড়ীটা পরিষ্কার করিয়ে ঠিকঠাক করাব? দু'চারদিন গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে সেখানে ?"

সাবিত্রী চুপ ক'রে রইল, কোনও কথা কইলে না।

আবার বললাম, "কিন্তু মাকে ছেড়ে ত তোমার সেখানে গিয়ে একদিনও থাকা চলে না।—নইলে বুড়ো বয়সে মার যে কি হ'ত।"

কথাগুলি ব'লেই দরজার দিকে চাইলাম। দেখলাম, তুষার তখনও ঠিক সেই ভাবেই সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, "এক কাজ করি বাড়ীটাকে লোকজন লাগিয়ে পরিষ্কার করিয়ে ঠিকঠাক করাই, কেমন ? তারপর তুমি একদিন গিয়ে দেখে এস।"

মাথা নীচু ক'রে আস্তে আস্তে বললে, "ভালই ত হয়।"

আবার চুপ ক'রে রইল। আমি যেন থেকে থেকে অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছিলাম। এমন মধুর জ্যোৎস্না রাত্রে সেই আমাদের ছাদে বসে আছি,—আমি ও সাবিত্রী। কত কথা বুক ছাপিয়ে উঠছে, ইচ্ছে করছে কিছু কিছু সাবিত্রীকে বলি! কিন্তু সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরে তুষার। কিছু বলতে গেলে আপনা থেকেই প্রাণ সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছে। প্রাণভরা ইচ্ছা সত্ত্বেও একবার "সাবি" বলে ডাকা—কৈ সেটুকুও ত হ'য়ে উঠল না। প্রাণভরা আগুন নিয়ে নীচে থেকে ছাদে এসে দাঁড়িয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে দু'-একটা কথা কইতেই আগুন নিভে গিয়ে প্রাণ হ'ল শান্ত। প্রাণের শক্তির উত্তেজনাও যেন ধীরে কমে গেল।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ চাপ থাকার পর দরজার দিকে চেয়ে দেখি—তুষার নাই। বেশ ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম—তুষার চলেই গিয়েছে। দেখলাম সাবিত্রীও আমার চোখ অনুসরণ ক'রে একবার চাইল দরজার দিকে। প্রাণ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হঠাৎ কি ভরসা হ'ল জানিনা।

ডাকলাম "সাবি!"

সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী উঠে দাড়াল।

বললে, "রাত হ'য়ে গেছে—শুতে যাই।"

এই ব'লে আমার দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না ক'রে ধীর পদক্ষেপে ছাদ থেকে গেল চলে। আমি স্তম্ভিতের মত বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন কেঁপে উঠল। ছিঃ ছিঃ, তুষার চলে যাওয়াতেই আমার "সাবি" ব'লে ডাকার ভরসা হয়েছিল—সে দুর্বলতাটুকু নিশ্চয়ই সাবিত্রীর চক্ষু এড়ায়নি। তাই কি অমন ক'রে গেল চলে? লজ্জায় সমস্ত শরীর-মন কেমন যেন কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে গেল। কেন জানিনা, সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম—পা টিপে টিপে চোরের মত। চেয়ে দেখলাম—মার শোবার ঘরের দরজা ভিতর হ'তে বন্ধ হ'য়ে গেছে।

আমার শোবার ঘরের সামনে গিয়ে দেখি, সে দরজাও বন্ধ। ঠেলে দেখলাম ভিতর হ'তে খিল দেওয়া। ধাক্কা-ধাক্কি ক'রে দরজা খোলবার প্রবৃত্তি হ'ল না। একটু চুপ ক'রে বারান্দায় দাড়িয়ে রইলাম। শরীর অবসন্ন হ'য়ে ভেঙ্গে আসছে।

হঠাৎ মাথায় কি খেয়াল হ'ল জানিনা। দাদার শোবার ঘরে গিয়ে খাটের উপর উলটানো বিছানার মধ্য হ'তে একটা বালিশ বার ক'রে নিলাম। তারপর সেই বালিশটা নিয়ে তিনতলার ছাদে গিয়ে পাতা মাদুরটার উপর শুয়ে পড়লাম। একটা ক্লান্ত মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে আমার মোটেই দেরী হয়নি।

* * *

সকাল বেলা যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন রোদ উঠেছে—একরাশ লাল টকটকে সূর্যের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে আমার মুখে, সারা অঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল প্রাণখানা বুকের মধ্যে একেবারে হালকা হ'য়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হ'ল সাবিত্রী রয়েছে আমাদের বাড়ীতে, কথা কয়েছে আমার সঙ্গে।

উঠে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চেয়ে দেখলাম—মার শোবার ঘরের দরজা খোলা। বুঝলাম মা এত ভোরে কখনই ওঠেননি, সাবিত্রীই উঠে নীচে নেমে গিয়েছে। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম নিজের শোবার ঘরের সামনে।

গিয়ে দেখি শোবার ঘরের দরজা খোলা—তুষার খাটের উপর শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে; আর গম্বু শোবার ঘরের দরজায় চৌকাটের উপর বসে দরজার একটা

পাল্লায় ঠেস দিয়ে অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

গন্নুর মুখখানার দিকে চেয়ে আমার বড় কষ্ট হ'ল। গন্নুর তখনও রুগ্ন, শীর্ণ চেহারা, মাথায় ছোট ছোট চুল। তখনও গন্নু দুর্বল, বেশী হাঁটতে পারে না। অনবরত খিদের তাড়নায় খাই খাই ক'রে তাই ডাক্তারদের মতানুসারে দু-ঘণ্টা অন্তর অন্তর তাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়। ভোর হ'তে না হ'তে গন্নুর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং শিয়রে 'হরলিক' তৈরী করবার সমস্ত বন্দোবস্ত থাকে, তখুনিই তৈরী ক'রে গন্নুকে খেতে দেওয়া হয়। গন্নুর মুখখানার দিকে চেয়ে বুঝলাম—এত বেলা হয়েছে বেচারী আজও এখনও পর্যন্ত কিছু খেতে পায়নি। বোধ হয় তুষারকে ডেকেছিল, ধমক খেয়ে এসে দরজায় চুপটী ক'রে বসে আছে আকুল-আগ্রহে চেয়ে আছে বাইরের পানে।

আমাকে দেখতে পেয়েই গন্নুর চোখ ছল ছল ক'রে নীচের ঠোঁটটী কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। অসুখের পর থেকে গন্নুর কথা ঠিক সহজ ছিল না, কথা বলতে কথা বেধে যেত। আমার দিকে আকুল ভাবে তাকিয়ে কাঁদ কাঁদ গলায় বললে, "বাবা! আমি ক-ক কখুন খাব। আমার ক্ষি-ক্ষিদে পেঁয়েছে।"

আমি আদর ক'রে গন্নুকে কোলে তুলে নিলাম।

কেন জানিনা বললাম, "ক্ষিদে পেয়েছে? তা-চল নীচে। পিসীমা রয়েছে, দুধ বার্লি ক'রে এখুনিই তোমাকে খাইয়ে দেবে।"

এই ব'লে গন্নুকে কোলে ক'রে সিঁড়ি দিয়ে সটান একতলায় নেমে এলাম।

নীচে এসে দেখি সাবিত্রী একতলার বারান্দা হ'তে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নেমে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ডাকলাম, "সাবিত্রী।"

একটু থমকে দাড়িয়ে, মুখখানা বেঁকিয়ে একবার মাত্র চোখ তুলে চাইল আমার প্রতি। তারপর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কোনও কথা কইলে না।

সাবিত্রীর কাছাকাছি একটু এগিয়ে বললাম, "গন্নুকে নাও না সাবিত্রী! বেচারী সকাল থেকে কিছু খায়নি। ওকে চট্ ক'রে একটু দুধ-বার্লি ক'রে খাইয়ে দাও।"

এই ব'লে গন্নুকে নামিয়ে দিয়ে বললাম, "যাও পিসিমার কাছে।"

গন্নু দুর্বল পায়ে গুটী গুটী সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ঈষৎ একটুক্ষণ সাবিত্রী ঠিক পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠানে গেল নেমে। যেতে যেতে আস্তে কি যে একটা ব'লে

গেল ঠিক বোঝা গেল না। শুধু "সরলা-ঝি" এই ছুটি কথা আমার কানে গেল। যাওয়ার সময় গন্নুর দিকে একবার ফিরেও চেয়ে গেল না।

গন্নু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে নিতান্ত কাতরভাবে চাইল আমার মুখের পানে। আমিও অপ্রস্তুত হ'য়ে স্তম্ভিতের মত দাড়িয়ে রইলাম, গন্নুর মুখের দিকে চাইতেও যেন কেমন লজ্জা হ'ল।

গন্নুর প্রতি সাবিত্রীর দুর্ব্যবহারটা আমাকে বিশেষ পীড়া দিয়েছিল এবং সাবিত্রীর প্রতি একটা নিদারুণ অভিমানে ঠিক করেছিলাম যে, একটু সুযোগ পেলেই, একটা নির্লিপ্ত উদাসীন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমার প্রাণের অভিমানের খবরটা পৌঁছে দেব তার প্রাণে। প্রথম প্রথম দু'-একটা দিন আমি সুযোগ খুঁজে বেড়াতে কার্পণ্য করিনি কিন্তু দিনের পর দিন যখন কেটে যেতে লাগলো, নিরিবিলি দেখা হওয়ার সুযোগ যখন আরও দিন পনেরোর মধ্যে এলই না, তখন প্রাণের অভিমান প্রাণ থেকে ধীরে ধীরে কর্পূরের মত গেল উড়ে। শূন্য প্রাণ হু-হু করতে লাগল, আবার দুটো কথার মধ্য দিয়ে সাবিত্রীর প্রাণের একটু খানি খবরের তরে।

দিন পনেরো পরের ব্যাপারটা বলি।

গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে মনে হ'ল—কে যেন আমায় ডাকছে। চমকে কান খাড়া ক'রে শুনলাম—ডাকছেই ত বটে। দরজার বাইরে সাবিত্রীর গলা মৃদু অথচ চঞ্চল—"শান্ত দা! শান্ত দা!"

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে ফেললাম। সাবিত্রী ঈষৎ ব্যস্তভাবে বললে, "শিগগীর একবার আমাদের ঘরে এস। সইমা যেন কেমন করছেন।"

তৎক্ষণাৎ মার ঘরে গিয়ে দেখি মা বিছানায় চোখ বুজে বেহুঁসের মত শুয়ে আছেন, কেমন যেন হাঁপাচ্ছেন, যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসছে। মা ব'লে ডেকে মার কপালে হাত দিতেই দেখি—গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সাবিত্রীর দিকে চেয়ে বললাম, "উঃ! খুব জ্বর হয়েছে যে।"

সাবিত্রী বললে, "রাত্রে শুতে এসেই দেখি জ্বর হয়েছে, তখুনিই বললাম শান্তদাকে একবার ডেকে আনি। কিন্তু বারণ করলেন। ব'লেন আজ থাক কাল সকালে যা হয় হবে। কিন্তু রাত দুপুরের পর থেকেই এই রকম করছেন। ডাকছি—কোনও সাড়া নাই।

থার্মোমিটারে উত্তাপ দেখলাম—জ্বর ১০৩-এর বেশী। এত রাত্রে আর কি

করা যাবে। মাথায় ঠাণ্ডাজলের পটি দিতে বারে বারে ভিজিয়ে হাওয়া ক'রে কোনও রকমে বাকি রাতটুকু কাটালাম। বিছানার পাশে বসেই আমার ও সাবিত্রীর রাত পোহাল।

ভোর হ'তে না হ'তেই সদরে ডাক্তার আনতে লোক পাঠিয়ে দিলাম। জ্বরের উত্তাপ ক্রমেই যেন একটু কমে আসছে মনে হ'ল। বেলা ৭টা আন্দাজ একবার চোখ মেলে চাইলেন কিন্তু চোখের চাহনিটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। কেমন যেন একটা অর্থহীন দৃষ্টি! একবার শুধু আমার দিকে চেয়ে আচ্ছন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রসূন কৈ, প্রসূন?"

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদাকে আসতে টেলিগ্রাম করব মা?"

কিন্তু সে কথার কোনও উত্তর না দিয়েই আবার চোখ বুজে এলিয়ে পড়লেন। দাদা সেই সময়টা এসে কিছুদিন কলকাতার মুকুন্দর ওখানে ছিলেন। আমি সেইদিনই সকাল বেলা দাদাকে আসতে জরুরী তার করলাম।

ডাক্তার এলেন। ভাল ক'রে মাকে পরীক্ষা ক'রে মুখখানা যেন কেমন একটু বিকৃত করলেন। নিজের মনেই যেন বললেন, "হার্টের অবস্থা বড় খারাপ—"

সাত-আট দিন কেটে গেল। জ্বর কিন্তু কিছুতেই বিরাম হ'ল না। দাদা টেলিগ্রাম পেয়েই চলে এসেছিলেন—মার রুগ্ন-শয্যার পাশে বসে বসে আকুল ভাবে মাকে ডেকে ডেকেও মার সহজ চেতনা ফিরিয়ে আনতে পারেননি। ডাকতে ডাকতে একবার চোখ মেলে হয়ত চাইতেন, কিন্তু সে একেবারে অর্থহীন দৃষ্টি!

কয়েকদিন পরে একদিন বিকেল বেলা বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। আমি মার শোবার ঘরে মার শয্যার পার্শ্বে বিষণ্ণ মুখে বসে আছি, একদৃষ্টে চেয়ে আছি একটা খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে—মার অন্তিম-শ্বাস উপস্থিত! তুষার মাটীতে বসে মার কোলের কাছে বিছানায় মাথাটী এলিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে আকুল ভাবে কাঁদছে। দাদা মার পায়ের কাছে বিছানার উপরেই বসেছিলেন। সাবিত্রী একদৃষ্টে মার মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে মার শিয়রের কাছে—চোখে অবশ্য এক ফোঁটা জল ছিল না। ঝম্-ঝম্-ঝম্ সমানে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—পল্লীগ্রামের গাছ-পালার মধ্যে বাদল সন্ধ্যা। বৃষ্টিটা একটু বন্ধ হয়েছে কিন্তু আকাশে মেঘ থম্ থম্ ক'রছে—এখুনই আবার মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়বে। যদু কবিরাজ বাইরে বারান্দায় বসেছিলেন, ভিতরে এসে

নাড়ি দেখে আমার দিকে চেয়ে ইসারা করলেন। মাকে খাঁট সমেত বাইরে নিয়ে এসে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনন্ত আকাশের নীচে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। তুষার মার বুকের কাছে মুখ লুকিয়ে আকুল হ'য়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। দাদাও আকুল হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে মাথাটি নীচু ক'রে হুইয়ে রাখলেন—মার চরণ দুটীর তলায়।

হঠাৎ মার দুটী হাত কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, যেন একটু উঁচু দিকে উঠতে চায়। আমি ও সাবিত্রী দুজনেই লক্ষ্য করেছিলাম। দুজনে দুটী হাত ধরে ফেললাম। বুঝলাম হাত দুটী আরও উঁচুতে উঠতে চায়—কেঁপে কেঁপে কি যেন খুঁজে বেড়চ্ছে। হাত দুটী আমার ও সাবিত্রীর মাথার উপরে তুলে দিতেই ধীরে এলিয়ে শান্ত হ'ল। অনন্ত আকাশের নীচে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় মার অন্তিম-আশীর্বাদ মাথায় তুলে নিলাম—আমি ও সাবিত্রী।

দিন ফুরালো—ব্যাকুল বাদল-সাঁঝে। আমার মা, স্বর্গীয় রতনসা'র স্ত্রী শ্রীমতী দয়াবতীর দিন ফুরালো।

*                    *                    *

শ্মশান থেকে যখন আমরা ফিরে এলাম, তখন ভোর হ'তে আর বেশী দেরী নাই। বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছিল। আকাশে পাতলা পাতলা মেঘগুলি সরে গিয়ে একপাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ রাত্রে-ওঠা একখানি আধফালি-চাঁদ জগতের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে একটা ম্লান রূপের আভা!

শ্মশান থেকে ফিরে দাদা বাড়ীর ভিতর গেলেন না, সোজা চলে গেলেন বৈঠকখানা বাড়ীর দোতালায়—বোধ হয় বাকী রাতটুকু সেইখানেই নিরিবিলি কাটিয়ে দিতে চান। আমি ধীর পদক্ষেপে গিয়ে ঢুকলাম—বাড়ীর ভিতরে।

উঠান থেকেই দেখলাম—সাবিত্রী আমাদের একতালার বারান্দায় সিঁড়ির পাশেই আঁচল বিছিয়ে মাটিতে শুয়ে আছে। শেষ রাত্রের ম্লান চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। কোনও কথা না ব'লে বারান্দার একটা স্তম্ভে ঠেসান দিয়ে বসে পড়লাম সাবিত্রীর কাছাকাছি বারান্দায় মেঝের উপরে।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ চাপ—সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত। সাবিত্রী মড়ার মত পড়ে আছে—যেন কোন চেতনাই নাই। শেষ রাত্রের একটা শিরশিরে হাওয়া হঠাৎ বয়ে গেল আমাদের দু'জনার উপর দিয়ে।

সহসা সাবিত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আকুলভাবে চোখ তুলে চাইল—আমার পানে।

কাতর স্বরে বললে, "আমার কি হবে?" সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "আমি ত এখনও বেঁচে আছি সাবিত্রী।"

সাবিত্রীর অসাড় হাতখানা আমার হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। সরিয়ে নিল না। বললাম, "তুমি কি আমার পর? তুমি ত সেই সাবি!"

স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলাম। হাতখানা হাতের মধ্যেই র'য়ে গেল। অনেক দূর,—দূর ছেলেবেলার কথার মধ্য দিয়ে মার কথা ঢেউ খেলিয়ে বুকের মধ্যে উঠতে লাগল দুলে দুলে। অশ্রুধারার বন্যায় আমার চোখ দুটো গেল ভেসে।

## চৌদ্দ

মার মৃত্যু দিনের শেষ রাত্রে সাবিত্রীর হাতখানি আমার হাতে অনায়াসে দিয়েছিল ধরা। ভেবেছিলাম সাবিত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয়টা সহজ হ'ল মারই অন্তিম-শয্যায় মহা-আশীর্বাদের পুণ্য-মন্ত্রে। সহজ অবশ্য হয়েছিল, যে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কেননা তার পর থেকে সাবিত্রী প্রয়োজন হ'লেই আমার সঙ্গে সহজ মেলামেশায় আর এতটুকুও দ্বিধা করেনি কোনও দিন। কিন্তু তবুও আমার কেমন মনে হ'তে লাগল—সাবিত্রীর সঙ্গে আমার মনের পরিচয়টা কিন্তু সরল হ'ল না। সাবিত্রীর নিভৃত অন্তরের গোপন দুয়ারটা যেন গোপনেই রুদ্ধ হ'য়ে রইল আমার চক্ষের অন্তরালে।

মার শ্রাদ্ধ-শান্তি-শেষ হবার আরও মাস দুই পরের কথা। আমি একদিন সন্ধ্যার পরে আমাদের পুকুর পাড়ের ঘাটের উপর চুপ ক'রে বসেছিলাম—একলা মনটা ভাল ছিল না, কেননা সেই দিনই সকাল বেলা দাদার সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার একটু কথাবার্তা হয়েছিল, এবং দাদা আমাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি এখন কিছুদিন দেশেই থাকবেন—বিদেশে যাবেন না। ইতিমধ্যে অবশ্য তুষার এবং দাদার পরস্পর ব্যবহারের মধ্যে অশোভন কিছুই

আমি লক্ষ্য করিনি। কিন্তু তবুও দাদা যে দেশে থাকাই ঠিক [illegible]—কেমন যেন আমার ভাল লাগছিল না। তুষারকে নিয়ে আমি অবশ্য বেশ কিছুদিন বিদেশে কাটিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু সেদিক দিয়ে এখন প্রকাণ্ড বাধা—সাবিত্রী। সাবিত্রীকে দেশের বাড়ীতে একলা রেখে তুষারকে নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেও আমার ভাল লাগত না এবং বাইরের দিক দিয়েও তা ছিল অসম্ভব। এই সব নানান এলোমেলো চিন্তায় বিভিন্নমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের একটা অবসন্ন মন নিয়ে ঘাটের উপরে চুপ চাপ বসেছিলাম সন্ধ্যার পরে।

হঠাৎ দেখি সাবিত্রী আসছে ঘাটের দিকে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, আকাশে চাঁদ ছিল না। চলার ভঙ্গিতে একটু দূর থেকেই চিনতে পেরেছিলাম—সাবিত্রী কাছাকাছি আসতেই ডাকলাম, "সাবি! এস, বোস।"

সাবিত্রী এসে বিনা দ্বিধায় বসল বাঁধান ঘাটের উপরে—আমার কাছ থেকে একটু দূরে।

বললাম, "অত দূরে বসলে কেন? এইখানটায় বসনা।"

আমার কাছাকাছি একটা স্থান নির্দেশ ক'রে দেখিয়ে দিলাম।

বললে, "থাক—বেশ বসেছি।"

একটুক্ষণ দু'জনেই চুপ চাপ। আমি মনে মনে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছিলাম, ভাবছিলাম—তুষার এখন কোথায়, করছেইবা কি? হঠাৎ এখন ঘাটে এসে পড়বে না ত?

মনকে ইতিমধ্যে অনেকবার চাবুক মেরে সায়েস্তা করবার চেষ্টা করেছি। বারে বারে ভেবেছি—সাবিত্রীর সঙ্গে সহজ মেলামেশাতে তুষারকে আমি ভয় করব না, কখনই না, কেনই বা ভয় করব? কিন্তু দুর্বল মন কিছুতেই সায়েস্তা হ'তে চায় না। সাবিত্রীর সঙ্গ পাওয়ার জন্যও আকুল হ'য়ে ওঠে, আবার সাবিত্রীর কাছাকাছি হ'লেই কেমন যেন ভয় পায়। অনেক ভেবে দেখেছি আমার মনের সে সময়ের এই দুর্বলতাকে কোনও দিক দিয়েই ত ক্ষমা করা চলে না। সেদিন রাত্রে দাদার কাছে চিঠি লেখা ব্যাপারটা নিয়ে তুষারের সঙ্গে কলহের পর থেকে, আমার ও তুষারের সম্পর্কটা কোন দিনই আর ঠিক সহজ হয়নি। আমার মনের দিক দিয়ে ত নয়ই, তুষারের দিক দিয়েও নয়। অতীতে তুষারের সঙ্গে কলহের পরে মিলনে, সাময়িক হ'লেও, সব সময়ই একটা পরিপূর্ণতা ছিল—অন্ততঃ তুষারের দিক দিয়ে। মনের গহন তলের খবর ঠিক বলতে পারিনা, কিন্তু বাইরের ব্যবহারে মিলনের মধ্যে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিতে সে কোনও দিনই কার্পণ্য করেনি। কিন্তু এবার সেদিন রাত্রে কলহের পর থেকে, ষোল আনা নিজেকে বিলিয়ে দিতে তুষারের মন যেন আর রাজী নয়—এমনই একটা ধরণ তুষারের ব্যবহারে ফুটে উঠতে লাগলো আমার প্রতি সর্বক্ষণ। তার ফলে, আমার সঙ্কুচিত মন ধীরে ধীরে আরও সঙ্কুচিত হ'য়ে শেষে একেবারে বিরূপ হ'য়ে উঠল তুষারের প্রতি। কিন্তু তবুও তুষারকে ষোল আনা

অবজ্ঞা করার শক্তি তখনও যে আমার কেন হয়নি—ভেবে পাই না।

তুষারের মনের এই ভাবান্তরের বিষয় আমি পরে অনেক চিন্তা ক'রে দেখেছি—কিন্তু কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাইনি। মন বিরূপ হওয়ার কারণ ত আমার দিক দিয়েই যথেষ্ট ছিল, তুষারের দিক দিয়ে ত নয়। সাবিত্রীর প্রতি আমার মনোভাবের কোনও প্রকাশ বা কোনও ইঙ্গিত পর্যন্ত বাইরের দিক দিয়ে ত কিছু ছিল না। তবে? তবুও তুষারের চক্ষে, তুষারের ধরণ-ধারণে যেন একটা চাপা বিদ্রোহের বহ্নি থেকে থেকে জ্বলে উঠত—আমি লক্ষ্য করেছিলাম, যার প্রথম অভিব্যক্তি টের পেয়েছিলাম দাদার চিঠি নিয়ে কলহের দিন রাত্রে। যেন এক মুহূর্তে প্রয়োজন হ'লে জীবনটাকে সে ভেঙ্গে গুড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিতে পারে বিনা দ্বিধায়, এতটুকু ইতস্ততঃ না ক'রে। তার অন্তরের এই শক্তির প্রতি সে যেন সব সময়ই ছিল বিশেষ সজাগ—এবং কোনও কিছুর মধ্যেই নিজেকে ষোল আনা বিলিয়ে দিতে যে যেন আর রাজী নয়. পাছে তার অন্তরের এই শক্তিটুকু হারায়—দিন দিন এই কথাটাই প্রকাশ পেতে লাগল তার জীবনের সমস্ত ব্যবহারে, সমস্ত কর্মে। তুষারের মন আমাদের বাড়ীতে ক্রমেই সব চেয়ে বিরূপ হ'য়ে উঠেছিল সাবিত্রীর প্রতি। যেন এ বাড়ীতে সাবিত্রীর ছায়া পর্যন্ত তুষার সইতে রাজী নয়—এমনই একটা নিদারুণ মনোভাবের সঙ্গে সে সব সময়েই সাবিত্রীর কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখত, যত দূরে সম্ভব—কিন্তু এই পর্যন্ত। সাবিত্রীর কাছেও তুষারের মনের খবরটা লুকানো ছিল না এবং তুষারের মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়ার পরে সাবিত্রী নিজের ছায়া দিয়েও তুষারকে কোনদিন স্পর্শ ক'রেছে ব'লে ত জানি না এবং মনেও হয় না।

সময় সময় মনে হয়েছে—মার মৃত্যুর পরে সাবিত্রী যদি আমাদের বাড়ীতে না থেকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকত, তা'হলে হয়ত তুষারের মনের শয়তান একটা রুদ্র প্রলয়-মূর্তি নিয়ে সজাগ হ'য়ে উঠত না। সাবিত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে, মার মৃত্যুর পরে আমি অবশ্য অনেক সময়েই ভেবেছি। কিন্তু আমার মনের সঙ্গে মিলিয়ে সব দিক্ দিয়ে সাবিত্রীর বিষয়ে কোনও রকম সন্তোষজনক ব্যবস্থা ভেবে ঠিক করতে পারিনি। আমাদের বাড়ী থেকে সরিয়ে সাবিত্রীকে অন্য কোথাও রাখার কথা যেন ভাবতেই চাইত না আমার মন এবং আমার মনের মতন সুবন্দোবস্তে রাখার স্থানও ত ছিলনা কোথায়। তুষার সাবিত্রীর নাম পর্যন্ত ইদানিং আমার কাছে মুখে আনত না কখনও, তাই তার সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা করিনি। তবে সময় সময় ইচ্ছে করত সাবিত্রীর সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু নিরিবিলি আলোচনা করি। কিন্তু সাবিত্রী, মার মৃত্যুর দিন শেষ রাত্তে 'আমার কি হবে' বলার পর আর কোনও দিন আমার সঙ্গে তার নিজের বিষয়ে কোনও কথা তোলেনি। সে স্বইচ্ছায় কিছু না বললে আমার দিক দিয়ে তার ভবিষ্যতের কথাটা প্রথম তুলতে আমার নিজের মনেই বাধা পেতাম। ভয় হ'ত পাছে সাবিত্রী আমাকে ভুল বোঝে, ও মনে করে আমি তাকে আমাদের

বাড়ী থেকে সরিয়ে দিতে চাই।

যাই হোক, মার শ্রাদ্ধশান্তির মাস দুই পরে সেদিন সন্ধ্যাবেলা মোটেই শীত ছিল না। বিকেল থেকে একটা বসন্তের উদাস হাওয়া বইছিল। সন্ধ্যায় অন্ধকারে সাবিত্রী যখন এসে ঘাটে বসল, তখন বসন্তের হাওয়ায় আমার ক্লান্ত মনে একটা অবসাদ এসেছে। দু'-একটা কথার পর আমি যখন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলাম, তখন সাবিত্রীই কথা কইলে!

শুধাল, "ভাবছ কি শান্তদা?"

বললাম, "না, বিশেষ কিছু নয়।"

বললে, "ভয় পেওনা; আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকব না।"

একটু লজ্জা হ'ল। তাড়াতাড়ি বললাম, "ভয়টা আবার কিসের?"

বললে, "ভূতের নয়,—মানুষেরই।"

বললাম, "ইস—কি ভাব আমাকে?"

একটু চুপ ক'রে রইল। পরে বললে, "শোন তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

বললাম, "কি কথা? বল।"

বললে, "আমার বিষয়ে কি ভেবেছ কখনও?"

বললাম, "তোমার বিষয়ে?"

তাড়াতাড়ি বললে, "তা ভাবনি জানি। কেননা, আমার বিষয়ে ভাববার তোমার ফুরসুৎ নেই। কিন্তু আমি ত আর এখানে থাকতে পারবনা।"

কথাটা শুনেই মনে হ'ল সাবিত্রীর সঙ্গে তুষারের নিশ্চই কোনও কিছু গোলমাল হয়েছে; নইলে সাবিত্রী এতদিন পরে আমার কাছে হঠাৎ একথা তুলবে কেন?

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, কিছু হয়েছে?"

বললে, "না। কিন্তু আমি তোমাদের বাড়ীতে এ রকম ভাবে আর কতদিন থাকব?"

বললাম, "হঠাৎ তোমার মুখে এ কথা কেন সাবিত্রী?"

বললে, "হঠাৎ নয়, আমি প্রায়ই এ কথা ভাবি। চিরদিন ত আর তোমাদের বাড়ীতে থাকা চলবে না।"

সাবিত্রী যে একথা নিয়ে ভেবেছে, এই প্রথম শুনলাম। এতদিন ত তার কোনও আভাসও পাইনি।

বললাম, "কেন চলবে না সাবিত্রী?"

বললে, "কি যে বল।" ব'লে চুপ ক'রে বসে রইল।

আমি বললাম, "আমাদের বাড়ীটাকে পরের বাড়ী ভাব ব'লেই তোমার মনে আজ এই প্রশ্ন উঠেছে সাবিত্রী।"

হঠাৎ একটু চাপা রকমের খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। হাসিটা যে বিদ্রূপের, না সুখের, না দুঃখের, ঠিক বোঝা গেল না।

বললে, "তোমাদের বাড়ীটা বুঝি আমার আপনার বাড়ী ?"

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "হ্যাঁ। কারুর চাইতে এ বাড়ীতে তোমার অধিকার কম নয় সাবিত্রী। অন্ততঃ যতদিন আমি বেঁচে আছি।"

একটু চুপ ক'রে রইল।

আমি আবার বললাম, "সাবিত্রী! আমি এ বিষয় অনেক ভেবে দেখেছি। এই বাড়ীকেই আপনার ক'রে নিয়ে তোমায় থাকতে হবে।"

বললে, "তা হ'তে পারে না।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন ?"

বললে, "এ বাড়ীতে থাকার আমার ইচ্ছে নেই।"

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন সাবিত্রী ?"

অস্ফুটস্বরে বললে, "কেন ?" ঈষৎ একটু চুপ ক'রে থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে নিয়ে বললে, "কোনও কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দিতে পারব না শান্তদা।"

একটু অভিমান হ'ল। বললাম, "বেশ, কোথায় থাকতে চাও বল ?"

একটু উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিল, "আমি জানি না। যেখানে হোক আমার একটু থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দাও। আমি এ বাড়ীতে থাকতে পারব না।"

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সাবিত্রীর কাছাকাছি বসে পড়লাম। খপ ক'রে সাবিত্রীর হাতখানা ধরে হাতের মধ্যে নিয়ে শুধালাম, "সাবিত্রী! সব আমাকে খুলে বল। কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে? বল কি হয়েছে—বল লক্ষীটি।"

হাতখানা আমার হাতের মধ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে একটু যেন ভারী গলায় বললে, "না—কিছুই হয়নি। তবে এ বাড়ীতে আমার আর থাকা চলে না শান্তদা! বরং একটা কাজ কর, আমাদের বাড়ীটা পরিষ্কার করিয়ে একটি মেয়েলোক রেখে দাও—আমার কাছে থাকবে। আমি সেইখানে গিয়ে থাকি।"

বললাম, "কিন্তু ওখানে গিয়ে থাকলে আমার সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না সাবিত্রী—সেটা ভেবে দেখছ কি ? আমি একলা গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করলে গ্রামের লোক কখনই সইবে না—"

"জানি! জানি! কিন্তু নাই বা হ'ল দেখা।"

অভিমান একটু একটু ক'রে প্রাণের ভিতর পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল। হাতখানি ধরেছিলাম তাও নিল সরিয়ে; আমাকে অনায়াসে কেটে 'পর' ক'রে দূরে চলে যেতে চায়।

সাবিত্রীর কথায় একটা উপযুক্ত উত্তর মনের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন সময়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম গন্টুবাবু ঝিয়ের হাত ধরে বাড়ীর ভিতরের দিকে

যাচ্ছে। ভয়-ডর আমার প্রাণে কিছুই নেই এইটে সাবিত্রীর কাছে প্রমাণ করার জন্যই হোক, কিম্বা কেন জানিনা হঠাৎ গনুকে ডাকলাম। গনু আমার গলা পেয়েই "বাবা—" ব'লে ছুটে আমার কাছে এল এবং আমার কাছে এসেই পাশে সাবিত্রীকে দেখে একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে গেল।

গনুর প্রতি সাবিত্রীর ব্যাপারটা কেমন যেন মোটেই সহজ ছিল না—সব সময়েই আমাকে একটু পীড়া দিত। গনুকে সবাই আদর করত, বাড়ীর লোকজন, আমলা-কর্মচারী থেকে আরম্ভ ক'রে গ্রামের সবাই গনুকে দেখলেই আদর করতে কখনও কার্পণ্য করেছে ব'লে জানি না, কিন্তু সাবিত্রী যেন গনুর দিকে ফিরেও চাইত না। গনুকে আদর করা ত দূরের কথা, কখনও গনুকে ডেকে দুটো কথা অবধি কইতে শুনিনি। তাই গনুও সাবিত্রীকে দেখলে চুপ ক'রে শুম হ'য়ে যেত এবং ইদানিং সাবিত্রী যেদিকে আছে গনু সেদিক কখনও ভুলেও মাড়াত না। গনুর প্রতি সাবিত্রীর এই বীতরাগের কারণটা কি—এই নিয়ে অনেক সময় ভেবেছি। অনেক সময় মনে হয়েছে যে, গনুর প্রতি মনোভাবটা হয়ত সাবিত্রীর তুষারের প্রতি মনোভাবেরই একটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু হাজার হ'লেও গনুতো ছেলেমানুষ। তার প্রতি মনোভাবে সাবিত্রীর এই উদারতার অভাবটা আমি কেমন যেন সইতে পারছিলাম না।

যাই হোক, গনু কাছে আসতেই তাকে আদর ক'রে কোলে তুলে নিয়ে দু'গালে দুটো চুমো খেলাম। চেয়ে দেখলাম একটু পরে সরলা-ঝি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, আছে, বুঝলাম—গনুর প্রতীক্ষায়।

আদর ক'রে গনুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে—গনুবাবু?"

গনু বললে, "ভা-ভা ভাত দিয়েছে। মা খে-খে-খেতে ডাকছে যে।"

"ও—ভাত খেতে যাচ্ছ? আচ্ছা যাও।"

এই ব'লে গনুকে কোল থেকে নামিয়ে দিলাম। গনু ছুটে সরলা-ঝির কাছে গিয়ে তার হাত ধরে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

সাবিত্রীর দিকে চেয়ে দেখলাম, সাবিত্রী চুপ ক'রে মাথা নীচু ক'রে বসে আছে, মুখখানি ঈষৎ একটু ফিরিয়ে দিয়েছে অন্য দিকে—চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছিলাম না। সাবিত্রীর প্রতি প্রাণের মধ্যে যে অভিমান হয়েছিল গনুর সঙ্গে কথাবার্তার পরেও সেটা কতখানি প্রাণের মধ্যে ছিল জানিনা। তবুও অভিমান সুরেই বললাম, "তুমি তাহ'লে আমাকে জীবন থেকে সরিয়ে দূরে চলে যেতেই চাইছ—কেমন?"

কোনও উত্তর দিল না। ঠিক সেই ভাবে নিশ্চল মূর্তির মত ঈষৎ একটু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েই বসে রইল। একটু চুপ ক'রে থেকে অভিমানের সুরেই আবার বললাম, "বেশ তাই যাও তাহ'লে। আমি সেই বন্দোবস্তই ক'রে দেব.

তবুও কোনও উত্তর নাই। ঠিক সেই ভাবেই বসে রইল। দু'জনেই

চুপচাপ। একটু পরে আমিই ডাকলাম, "সাবিত্রী! সাবি! কথা কইচ না কেন ?"

একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে শুধালাম, "কি হ'ল ?"

হঠাৎ সাবিত্রী উঠে দাঁড়াল। সোজা আমার দিকে চাইল। একটু উত্তেজিত সুরে কম্পিত গলায় বললে, "সেই ভাল, আমি চলেই যাব। কিসের জন্য তোমার সুখের সংসারে একটা উৎপাতের মত থাকব শুনি। আমি চলে গেলে সবাই বাঁচে, তুমিও বাঁচ।"

এই কথা ব'লে ঘাট ছেড়ে হন হন ক'রে চলে গেল। আমি স্তম্ভিতের মত খানিকক্ষণ চুপচাপ ঘাটের উপর বসে রইলাম।

আরও পাঁচ-ছয়দিন পরের একটা ব্যাপার বলি। ইতিমধ্যে সাবিত্রীর বিষয় মনে মনে নানান দিক দিয়ে আলোচনা করেছি। সে আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে চাইছে, চিরদিনের মত আমাকে পর ক'রে দিতেও তার দ্বিধা নাই—ভাবতে অবশ্য মনে একটু ব্যথা পেতাম। অথচ তার শেষের কথাগুলির মধ্যে ত বেশ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম যে, মুখে সে আমাকে যাই বলুক না কেন, অন্তরে অন্তরে সে আমার উপর নির্ভর করতে শিখেছে, আমার উপর অভিমান করতে তার আর এতটুকুও দ্বিধা নাই। অভিমান ক'রেই ত বলেছিল যে, সে চলে গেলে আমিও বাঁচি। সে চলে গেলে আমি যে মোটেই বাঁচি না—এই সহজ সত্যটুকু তার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে বোঝা ত মোটেই কঠিন ছিল না। তবুও সে অভিমান ক'রে বসেছিল, সে চলে যেতে চায়। কেন ?

আমার সুখের সংসারে সে উৎপাতের মত থাকবে না—কথাটা নিয়ে অনেকবার ভেবেছি। আমার সংসার যে সুখের নয়, তাও ত সে বিলক্ষণ জানত। তবে ? কি আমার সংসারে তার সত্যকারের ঠাঁই যেখানে হওয়া উচিত ছিল, সেখানে ছিল না ব'লেই কি তার প্রাণে গড়ে উঠেছিল এই তীব্র অভিমান। তাই আমার সংসারে তার অস্তিত্বটুকুই কি তার আর অভিমানী মনের দিক দিয়ে হয়ে উঠেছিল—একটা উৎপাত ?

যাই হোক, আরও পাঁচ-ছয়দিন পরে একদিন সন্ধ্যের পরেই বাইরে থেকে বাড়ীর উঠানে যেমন ঢুকেছি, তুষারের গলার ঝঙ্কার কানে গেল, তুষার দোতলার উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সরলা-ঝিকে বকছে। সরলা নীচের উঠানে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছিল আমার কানে গেল।

সরলা বলছে, "তা কি করব বল না। পিসীমা পাঠালেন, বলব কি যাব না ?"

তুষার বেশ চেঁচিয়ে তীব্র ঝঙ্কারের সঙ্গে বললে, "এ বাড়ীতে তোমার মনিব আমি—আর কেউ নয়। খবদার বলছি আমার বিনা হুকুমে তুমি এ বাড়ী ছেড়ে এক পাও বেরুবে না। আর কেউ কিছু বললে স্পষ্ট ব'লে দেবে—মার হুকুম নেই।"

সরলা ঝি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ উঠানের মাঝখানে আমাকে দেখে

থমকে চুপ ক'রে সরে গেল। তুষার বোধ হয় অন্ধকারে আমাকে ঠিক লক্ষ্য করেনি। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "কথা কানে গেল ? ফের যদি তুমি কোনও দিন অন্য কারো ফরমাস খাটতে যাও, তোমাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেব ব'লে রাখছি।"

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরী হ'ল না। তুষারের মুখে এ রকম ধরণের উত্তেজিত কথা আমি ইদানিং আর একেবারেই সইতে পারতাম না—তা সে যেখানে যে অবস্থায়ই বলুক না কেন। বিশেষতঃ তার মুখে সাবিত্রীর এই স্পষ্ট অপমানে শরীর কেমন জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল সাবিত্রীকে সসম্মানে এ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে এর বিহিত এখনই করা দরকার। পায়ের জুতার একটু অতিরিক্ত শব্দ ক'রে দোতলার বারান্দায় সোজা তুষারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

গম্ভীর গলায় শুধালাম, "ব্যাপার কি ?"

একটু যেন তাচ্ছিল্যভরে বললে, "কি আবার ?"

আবার শুধালাম, "তুমি সরলাকে বকছিলে কেন ?"

জোরের সঙ্গে বললে, "বকছিলাম, অন্যায় ক'রেছে বলে। সমস্ত সন্ধ্যে ছেলেটা ওর জন্য কাঁদছে, কোথায় চলে গিয়েছিল পাত্তা নেই।"

আমিও একটু জোরের সঙ্গে বললাম, "তা ওর দোষটা কি ? সাবিত্রী ওকে কোথায় যেন পাঠিয়েছিল কি কাজে।"

সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কারের সঙ্গে উত্তর দিল, "দোষ-গুণ যারই হোক, ও কিসের জন্য আমার বিনা হুকুমে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে ?"

বললাম, "গিয়েছিল সাবিত্রীর হুকুমে তার উপর তোমার কথা বলার কিছু নেই।"

আধ মিনিট আন্দাজ আমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর গম্ভীর গলায় শুধাল, "তোমার কথার মানেটা কি ?"

সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু চেঁচিয়ে জোরের সঙ্গে বললাম, "মানে অতি সোজা। আমি সকলকে জানিয়ে দিতে চাই, বাড়ীর লোকজন সকলকেই, এমন কি তোমাকে শুদ্ধ যে, এ বাড়ীতে সাবিত্রীর হুকুমের জোর কারও হুকুমের চাইতে কম নয়। এইটে যেন সবাই মনে রাখে—।"

"ও!—বড্ড দরদ যে দেখতে পাচ্ছি।"

একটা চাপা বহ্নির স্ফুলিঙ্গের মত কথা কয়টি তুষারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। আমি সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে সিঁড়ি দিয়ে সশব্দে নীচে নেমে গেলাম। যাওয়ার সময় মার শোবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখেছিলাম সাবিত্রী মার শোবার ঘরের মধ্যেই চুপ ক'রে বসে আছে, আমার কথাগুলো সাবিত্রীর কানে গেছে বুঝতে পেরে প্রাণের মধ্যে একটু যেন তৃপ্তি অনুভব করলাম।

বাড়ীথেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে ঘাটের পারে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম—অনেকক্ষণ। নানান চিন্তায় মনটাকে পেয়ে বসল। বুঝতে মোটেই

দেরী হ'ল না—আবার সুরু হ'ল লড়াই—চলবে কতদিন কে জানে?

কিন্তু লড়াই! মন যে আমার বড় ক্লান্ত। লড়াইয়ের নামে কেমন যেন কাতর হ'য়ে উঠে। মন বিদ্রোহী হ'লে কি হয়, আর যেন কোনও দ্বন্দ্বের মধ্যে যাওয়ার উৎসাহ নেই তার।

কিন্তু উপায়ই বা কি? এক একবার মনে হ'ল,—যাক দরকার নাই আর কোনও বিরোধের মধ্যে গিয়ে। সাবিত্রীকে তার নিজের বাড়ীতেই সুবন্দোবস্তে রাখার ব্যবস্থা করি। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা-শুনা ক'রে আসব। গ্রামের লোক কথাকথি করবে—বয়েই গেল।

কিন্তু তাতেও মন সায় দেয় না। তুষারের কাছে এত বড় পরাজয়, মন স্বীকার করতে একেবারেই নারাজ; এবং বিশেষ ক'রে সাবিত্রী চলে গেলে শূন্য পুরীতে তুষার—দাদা—আর কেউ নাই। ভাবতে মন কেমন শিউরে উঠে!

যাই হোক, ভেবে ভেবে কিছুই হ'ল না। চাকরটা এসে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "খাবার দেবে কি?"

বললাম, "দিতে বল।"

নীচের বারান্দায় খাবার দিয়েছিল, চাকরটা দাঁড়িয়ে আছে, আর কেউ সেখানে ছিল না। সন্ধ্যাবেলা কলহের পর তুষার আমার খাবার সময় আসবে না জানতাম। তবুও চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোর বৌমা কোথায়?"

বললে, "মা শুয়ে পড়েছেন। আজ আর কিছু খাবেন না বলছেন।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "বড়বাবু খেয়ে নিয়েছেন বুঝি?"

বললে, "হ্যাঁ।"

গম্ভীরভাবে খেয়ে উঠলাম।

তুষার শুয়ে পড়েছে, এখুনিই শুতে যেতে কেমন প্রবৃত্তি হ'ল না। মনটা তখনও নানান চিন্তায় ভরা। একবার ভাবলাম—যাই আরও খানিকক্ষণ ঘাটের উপর চুপ ক'রে বসে থাকিগে। কিন্তু কেন জানি না ঘাটের দিকে না গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। শোবার ঘরের দিকে না গিয়ে সোজা চলে গেলাম ছাদের উপরে।

সেদিন কি তিথি ছিল মনে নাই। অস্পষ্ট আলোকে একটু দূর চেয়ে দেখলাম—সাবিত্রী ছাদের উপর একটা মাদুর পেতে শুয়ে আছে। এইটেই কি আশা করেছিলাম?—তাই কি এলাম ছাদে?

সাবিত্রীর কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। সাবিত্রীও উঠে বসল। তার প্রতি মনোভাবে তখন আমার অভিমান একটুও ছিল না, তবুও একটু অভিমানের সুরেই কথা সুরু ক'রলাম।

কেন? সেদিন সাবিত্রী আমায় 'পর' ক'রে দিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল, আর আজ আমি তারই হ'য়ে তুষারের সঙ্গে ঝগড়া করেছি—সাবিত্রীও তা জানে। তাই যেন সাবিত্রীর উপর আজ আমার অভিমান দেখাবার অধিকার হয়েছে,—সময় হয়েছে।

সে চলে গেলে আমিও বাঁচি—এ কথা বলার উপযুক্ত প্রতিশোধ আমি যেন আজ নিয়েছি। আজ যেন সে মরমে মরে আছে আমারই প্রতি কৃতজ্ঞতায়, নিজেরই মনের অনুশোচনার লজ্জায়।

বললাম, "সাবি! তুমি তাহ'লে আমাকে জীবন থেকে কেটে দিয়ে চলে যাওয়াই ঠিক ক'রেছ?"

শুধাল, "আজ হঠাৎ একথা আবার কেন?"

বললাম, "না আমি জানতে চাই। যদি যাও তাহ'লে তার ব্যবস্থা করতে হবে ত?"

বললে, "ও।"

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "তা তুমি কি বল? আমার চলে যাওয়াটাই ত সব দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয়, নয় কি?"

বললাম, "আমার বলাব কিছুই নাই। তোমার মন যদি এখানে না থাকতে চায়—কেন থাকবে?"

সঙ্গে সঙ্গে বললে—"আর যদি থাকতে চায়?" সোজা চাইল আমার মুখের দিকে।

বললাম, "তাহ'লে কেউ তোমাকে এখান থেকে নাড়াতে পারবে না। এমন কি আমিও না।"

শুধাল, "তুমিও নও—কেন?"

কথাটার উত্তর না দিয়ে একটু ঘুরিয়ে বললাম, "তোমার এ বাড়ীতে থাকা না থাকা সম্পূর্ণ তোমার নিজের উপর নির্ভর করে। তুমি যেতে চাইলে জোর ক'রে আমি তোমায় ধরে রাখব না—এটা ঠিক। আর তুমি থাকতে চাইলে তোমার ঠাঁই এ বাড়ীতে থাকা; যাতে সসম্মানে থাকতে পার, আমি তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব।"

একটু যেন তিক্ত সুরে বললে, "অর্থাৎ জোর ক'রে তাড়িয়ে দেবে না এটাও ঠিক। তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ!"

কথাটা শুনে এবার সত্যি একটু অভিমান হ'ল। কিছুতেই কি সাবিত্রী আমার মনের কথাটা বুঝবে না।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে সাবিত্রীই কথা কইলে। একটু কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে ভারী গলায় বললে, "সেই ভাল, আমি চলেই যাব। সেই ব্যবস্থাই ক'রে দিও।"

বললাম, "বেশ তাই হবে।"

একটু অভিমান দেখিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম, "আচ্ছা—কাল থেকেই তোমার বাড়ী-ঘর ঠিক করবার জন্য আমি লোকজন লাগাব। এখন রাত হ'য়ে গেছে শুতে যাই।"

এই ব'লে ধীর পদক্ষেপে ছাদ থেকে নেমে গেলাম। যাওয়ার সময় সিঁড়ি-ঘরের দরজার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলাম—সাবিত্রী মাদুরের উপর আবার শুয়ে পড়েছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে।

নিজের শোবার ঘরের সামনে এসে দেখি, ঘরের দরজা খোলা, ঘরের ভিতর একটা হ্যারিকেন কমান রয়েছে এবং তুষার গন্তুর পাশে বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। দাদার ঘরের দিকে চেয়ে দেখলাম, দাদার ঘরেরও দরজা ভিতর হতে বন্ধ। মনে হ'ল দাদাও ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম! ঘরের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়তে কেমন যেন ভাল লাগছিল না—মনটা পেছিয়ে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ বারান্দায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম! হঠাৎ মনে হ'ল—তাই ত সাবিত্রী ত এখনও শুতে এল না। ছাদেই কি শুয়ে থাকবে সমস্ত রাত? মনে হ'ল—আহা! বেচারী! জীবনে কোথাও একটু ঠাঁই পাচ্ছে না। একটা অভিশপ্ত জীবন দিয়ে বিতাড়িত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দরজায় দরজায়।

মনে হ'ল—যাই আর একবার ছাদে যাই। ভাল ক'রে একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসি যে, সে নিজের বাড়ীতে থাকলেও আত্মসম্মানে সুবন্দোবস্তেই থাকবে —তার কোনও অসুবিধা হবে না, কোনও কষ্ট হবে না। তার চলে যাওয়াটা কথায়-বার্তায় একটু সহজ ক'রে দিয়ে আসি।

আবার চললাম ছাদের উপর, পা টিপে টিপে—পাছে কারও ঘুম ভেঙ্গে যায়। ছাদে সিঁড়ি-ঘরের দরজার কাছে যেতেই একটা যেন চাপা-কান্নার শব্দ কানে এল। চেয়ে দেখলাম সাবিত্রী ঠিক সেইখানে মাদুরে ঠিক সেই ভাবে দরজার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছে। কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম সমস্ত দেহখানি একটু কেঁপে কেঁপে উঠছে একটা বুকভাঙ্গা কান্নায়।

বসে পড়লাম সাবিত্রীর পাশেই মাদুরে। তার গায়ের উপর হাতখানি রেখে ডাকলাম, "সাবি!"

কোনও উত্তর দিল না। আবার ডাকলাম, "সাবি! কাঁদছ কেন?"

তবুও কোনও উত্তর দিল না। সমানে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

গায়ের উপর হাতখানি রেখে চুপ ক'রে বসে রইলাম। হঠাৎ মনে হ'ল সাবিত্রীর এরকম কান্না বহুকাল দেখিনি। মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার একটা কথা—মুকুন্দদের বাড়ীতে যাত্রা শোনার দিন, মুকুন্দদের ঘরে সাবির সেই আকুল কান্না। এই সেই সাবি! প্রাণভরা দরদ দিয়ে বললাম, "সাবি! অমন ক'রে কেঁদ না। হয়েছে কি?"

হঠাৎ কথা কইলে। কান্নায় জড়ানো কথাগুলি "আমি জানি—আমি জানি আমি চলে গেলে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তাই তুমি আমাকে এত তাড়িয়ে দিতে চাইছ। আমি সেই অভিশপ্ত পুরীতে একলা গিয়ে থাকব না—কখনই না—যতই তুমি আমাকে তাড়িয়ে দাও—সইব, সইব, সইব—দেব না তোমাকে নিশ্চিন্ত হ'তে। আমার আবার মান-অপমান—আমার আবার লজ্জা।"

এই কথা বলতে বলতে উঠে, বসন সংযত ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ছাদ থেকে চলে গেল।

হায়রে! সত্যই কি আমি তাড়িয়ে দিতে চাই?

যতদূর মনে পড়ে দাদার সঙ্গে কথা হ'ল বোধ হয় আরও পনের-কুড়ি দিন পরে। দাদাই কথাটা তুললেন একদিন সকাল বেলা আমাদের বৈঠকখানা বাড়ীর দোতলার বারান্দায়। দাদা বৈঠকখানা বাড়ীর দোতলায় একটা চেয়ারে চুপ ক'রে বসেছিলেন—যেন আমারই প্রতীক্ষায়। আমি বারান্দা দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম—আমাকে ডাকলেন।

ইদানিং দাদার সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুব কমই হ'ত। দাদা আপন মনেই থাকতেন এবং আমিও বড় একটা দাদার সঙ্গে কোনও বিষয় কথাবার্তা বলতাম না। ধীরে ধীরে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর যেন গড়ে উঠেছিল আমার ও দাদার অন্তরের মাঝখানে।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাকছ আমাকে?"

দাদা বললেন, "হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে দু'একটা কথা আছে।"

এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালাম—দাদা কি বলবেন তারই প্রতীক্ষায়। কোনও কথা বলিনি।

দাদা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "সুশন! একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব?"

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দাদা বললেন, "সাবিত্রীর বিষয় কি ব্যবস্থা করেছ?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তার মানে? কিসের ব্যবস্থা?"

বললেন, "তার থাকার। তাকে কোথায় কি ভাবে রেখে দেবে ঠিক করেছ?"

বললাম, "কেন আমাদের বাড়ীতেই ত আছে?"

বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু চিরদিন ত আর এখানে থাকতে পারে না।"

বললাম, "কেন?"

বললেন, "সে কি ক'রে হয়। ওর যেখানে হোক থাকার একটা ভাল বন্দোবস্ত তোমার ক'রে দেওয়া উচিত।"

বললাম, "আচ্ছা প্রয়োজন হ'লে সে যা হয় আমি করব। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার এখনি কোনও দরকার দেখি না।"

এই ব'লে কথাটা কেটে দিয়ে চলে যাব ভাবছি কিন্তু দাদা ছাড়লেন না।

আবার বললেন, "আমার ত মনে হয়, এখুনিই যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা উচিত। মা বেঁচে থাকতে কথা ছিল স্বতন্ত্র।"

দাদার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা কইতে গেলেই আমার কেমন যেন রাগ হ'ত—কিছুদিন ধরেই এটা আমি লক্ষ্য করেছি। কেমন যেন একটা নাছোড়বান্দা ধরণ—আমার অসহ্য হ'য়ে উঠত।

বোধ হয় একটু বিরক্তিপূর্ণ স্বরেই বললাম—

"কিন্তু এ নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বল দেখি?"

সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন—

"কেন? আমার কি সংসারে কোন-কিছুতেই কোনও কথা বলার অধিকার নেই?"

একটু আশ্চর্য হ'লাম। জোরের সঙ্গে কোনও কথা বলা দাদার একেবারেই স্বভাব নয়—কোনও দিন ত লক্ষ্য করিনি। বিশেষতঃ আমার মুখের উপর ত নয়ই। দাদার এ পরিবর্তনের অর্থটা কি? হলোই বা কবে?

আমিও বেশ জোরের সঙ্গে বললাম, "কিন্তু সাবিত্রীর বিষয়ে তোমার কোন কথা বলার আমি ত কোনও প্রয়োজন দেখি না।"

সঙ্গে সঙ্গে দাদা উত্তর দিলেন, "কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় যে, সাবিত্রী আর এ বাড়ীতে থাকে, এইটে মনে রেখে যা-হয় ব্যবস্থা কোর।"

এই বলে দাদা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বললাম, "কিন্তু সাবিত্রী এখন এ বাড়ীতেই থাকবে—যতদিন না সে অন্য কোথাও যেতে চায় স্ব-ইচ্ছায।"

বললেন, "তার মানে কি? তোমার যা খুসী তাই তুমি করবে? কারও মনের দিকে তুমি চাইবে না?"

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চেয়ে শুধালাম, "কার মনের কথা তুমি অত ভাবছ? তোমার নিজের কি?"

বললেন, "হ্যাঁ আমার নিজের।"

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বললাম, "সাবিত্রীর এ বাড়ীতে থাকাতে তোমার মনের দিক দিয়ে আপত্তির কারণটা কি শুনি?"

বললেন, "দশ জনার চক্ষে শোভন হচ্ছে না।"

কথাটা শুনে শরীর জ্বলে গেল। বললাম "ও। অশোভন হচ্ছে? কবে থেকে তোমার শোভন-অশোভন সম্বন্ধে এত বিবেচনা বুদ্ধি হ'ল? যাক্ সে কথা। শোন—সাবিত্রী এ বাড়ীতে থাকবে মার অন্তিম আশীর্বাদের জোরে। সাবিত্রীকে এ বাড়ী থেকে নড়ানর শক্তি তোমার ত নেই-ই, আমারও নেই—যত দিন না সে স্ব-ইচ্ছায় এ বাড়ী থেকে চলে যায়; এবং যেতে চাইলেও আমি বাধাই দেব—জেনে রাখতে পার।"

এই বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না ক'রে সটান চলে গেলাম সেখান থেকে।

* * *

কথাটা নিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে আলোচনা হ'ল—আরও সাত-আটদিন পরে।

আমি ভেবেছিলাম—কথাটা সাবিত্রীকে বলব না। এ কথা শুনলে সাবিত্রীর মনের দিক দিয়ে সুফল ফলবে না—হয় ত একেবারে বিগড়ে যাবে। বিশেষতঃ ইদানিং আমার প্রতি সাবিত্রীর ব্যবহারে সব সময়ই কেমন যেন একটা রুক্ষতা প্রকাশ পেত—যেন আমার প্রাণে আঘাত দিয়েই তার তৃপ্তি,

তার আনন্দ। আমার কথা কিছুই যেন সে সহজভাবে নিত না, নিতে চাইত না।

বেদনা পেয়েছি। সাবিত্রীর এই রুক্ষ ব্যবহারে, বেদনা পেয়েছি—অস্বীকার করব না। কিন্তু তবুও তার উপর কখনও রাগ করিনি। চোখের সামনে কেবলই ভেসে উঠত তার সেই অসহায় শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা—তার সেই আকুল কান্না, সেদিন রাত্রে ছাদের উপর যা দেখেছিলাম। আমার প্রতি তার এই রুক্ষতা হয় ত বা আমারই উপর তার একান্ত নির্ভরতাটার অভিব্যক্তি। সত্যিই ত তার প্রাণের নির্ভরতার ঠাঁই তার ত কোথাও নাই জগতে। অভাগিনী সে, জীবনের নিষ্ঠুর কশাঘাতে পাগল হ'য়ে আক্রমণ করে আমাকেই—আর তার কেই বা আছে।

যাই হোক্ দাদার সঙ্গে কথাবার্তার বিষয় সাবিত্রীর নিকট বলতে নিজের মনেই একটা বাধা পেলাম! সাত-আটদিন বলিনিও কিছু। কিন্তু কথাটা নিয়ে ভেবেছি। দাদা হঠাৎ সাবিত্রীর বিষয় কেন যে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছেন —ভেবে কোনও কিনারা পাইনি। দাদার কথাবার্তার পিছনে তুষারের অনুপ্রেরণা ছিল কি? তারই অনুপ্রেরণায় কি দাদার কথার মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম অতখানি 'জোর' যা এর পূর্বে আর কখনও দেখিনি। তুষার সাবিত্রীকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না জানি। কিন্তু তাকে বাড়ী থেকে একেবারে তাড়াবার হঠাৎ তুষারের এত আগ্রহের কারণটাই বা কি? তবে কি?—ভাবতে শরীর শিউরে উঠল।

তুষারের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কোনও কথাবার্তা হয়নি এবং অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে সম্ভবও ছিল না। সাবিত্রীর নামও সে আমার সামনে মুখে আনত না এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু'-একটা কথা ছাড়া আমার সঙ্গে তার কথাবার্তা একরকম বন্ধই হ'য়ে গিয়েছিল। সে যেন সব সময়ই ফণা তুলে একেবারে তৈরী হ'য়েই আছে, দংশন করলেই হয়, এবং এতটুকু কারণ ঘটলেই সে দংশন করতে দ্বিধা করবে না—এই রকম একটা ধরণ নিয়ে তুষার আমাদের বাড়ীতে ঘুরে বেড়াত এবং সবই করত—বাড়ীর যত প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম—একটা নীরব নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায়। জীবনের পথে তাকে পাশ কাটিয়ে চললে সে তেড়ে এসে কামড়াবে না—বড় জোর এইটুকু অনুগ্রহ যেন সে আমাদের বাড়ীর লোকদের করতে রাজী ছিল, কিন্তু এর বেশী নয়। সাবিত্রী ত বটেই, আমিও সেই সময়টা তুষারের পাশ কাটিয়েই চলতাম— —যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতাম জীবনের যত বিরোধ।

কথাটা প্রথম তুলেছিল সাবিত্রী, আমি তুলিনি। দাদার সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার সাত-আটদিন পরে একদিন সকাল বেলায় পুকুরের ঘাটে মুখ ধুয়ে ধাপে ধাপে উঠে আসছি, এমন সময় দেখি সাবিত্রী ঘাটের উপরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—যেন আমারই প্রতীক্ষায়। সাবিত্রীর কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই আমার মুখের দিকে সোজা চেয়ে শুধাল, "শান্তদা! বড়দা তোমাকে কি বলেছেন..."

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বিষয় সাবি?"

বললে, "আমার বিষয়।"

অবাক হ'য়ে গেলাম। সে কথা সাবিত্রী জানলে কি ক'রে? কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বললাম, "তোমার বিষয়? কি আবার বলবেন?"

বললে, "লুকিও না। বল, সব খুলে বল আমাকে। চল ঐ থানটায় ছায়ায় বসি।"

পরিষ্কার সকাল বেলা, চারিদিকে রোদ ঝক্‌ঝক্ করছে। সাবিত্রী একটু এগিয়ে গিয়ে বসল লেবুগাছটার তলায়, বাঁধান-ঘাটের উপর। আমিও একবার চারিদিকে চেয়ে নিয়ে বসলাম—খানিকটা ছায়ায় খানিকটা রোদে।

শুধাল, "কি বলেছেন দাদা?"

বললাম, "দাদা যে তোমার বিষয় আমাকে কিছু বলেছেন জানলে কি ক'রে?"

বললে, "আমি জানি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ক'রে জানলে?"

বললে, "সে কথা দরকার হয় ত পরে বলব। আগে বল—কি বলেছেন?"

বললাম, "কি আর বলবেন—এমন বিশেষ কিছু নয়।"

বললে, "যা বলেছেন সব খুলে বল আমাকে—লুকিও না।"

একটা নির্লিপ্ত সুরে উত্তর দিলাম, "এই বলছিলেন, তোমার থাকার বিষয়। একটা ভাল বন্দোবস্ত করা উচিত—এই সব।"

আবার শুধাল, "আর কি—আর কি বললেন?"

ক্রমেই যেন একটু একটু উত্তেজিত হ'য়ে উঠছিল।

বললাম, "ঐ সব কথা। আবার কি বলবেন।"

বললে, "কেন বলেননি—এক্ষুণি এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। এ বাড়ীতে ওর থাকার জায়গা হবে না?"

বললাম, "না। ও রকম ধরণের কথা কিছু বলেননি।"

একটা 'হু' ব'লে চুপ ক'রে নীচু দিকে চেয়ে রইল।

আমি সত্যসত্যই মনে মনে আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছিলাম। এসব কথা সাবিত্রী পেলে কোথায়?

শুধালাম, "কে বললে তোমাকে এসব?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আবার শুধাল, "তা তুমি দাদাকে কি বললে?"

বললাম, "আমি? বললাম, সাবিত্রী এ বাড়ীতেই থাকবে। এ বাড়ীতেই তার ঠাঁই পাকা। এ বাড়ীতে তার থাকার অধিকার কারোর চেয়ে কম নয়।"

একটা জোরে "উঃ" ব'লে ঠোঁট দুটি চেপে চুপ ক'রে পুকুরের জলের দিকে চেয়ে রইল।

এর মানে কি? সাবিত্রী দাদার সঙ্গে আমার কথাবার্তার খবর জানলেই বা কোত্থেকে?

আবার শুধালাম, "সাবিত্রী। এসব কথা কে বলেছে তোমাকে?"

ঠিক সেইভাবে চুপ ক'রে রইল। আবার শুধালাম, "বল আমাকে কোথায় শুনলে?"

বেশ একটু জোরের সঙ্গে বললে, "বলব না।"

এমন সময় চেয়ে দেখি একটু দূরে দাদা বাড়ীর ভিতর হ'তে বৈঠকখানা বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন। যেতে যেতে একবার চেয়ে দেখে গেলেন আমাদের পানে।

তাড়াতাড়ি বললাম, "সাবিত্রী! সাবি! কি হ'ল? কি আসে যায় অন্যে কে কি বললে না বললে তাতে? আমি বেঁচে থাকতে কারও সাধ্য নাই—এ বাড়ী থেকে তোমাকে এতটুকু নড়ায়।"

বসেছিল, উঠে দাঁড়াল।

উত্তেজিত স্বরে বললে, "দোহাই তোমার! আমার প্রতি দরদ একটু কম দেখিও। তাহ'লে আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচ। তোমার ঐ দরদ দেখলে, আমার শরীর জ্বলে যায়—সইতে পারি না। চাই না তোমার করুণা, চাই না তোমার দয়া।"

বলতে বলতে উত্তেজিত ভাবে ঘাটের পাড় হ'তে চলে গেল।

দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল সেইদিনই সকাল বেলা বৈঠকখানা বাড়ীতে। তিনি যেন আমারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন—আমারই চলে যাওয়ার পথে।

ডাকলেন, "সুশন!"

দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?"

বললেন, "সাবিত্রীর বিষয়—"

জোরের সঙ্গে বললাম, "সাবিত্রীর বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে কোনও কথা কইতে রাজী নই।"

ব'লে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না ক'রে হনহন ক'রে চলে গেলাম।

এল ২৩শে চৈত্র। তারিখও মনে আছে। বারও ভুলিনি। ইতিমধ্যে আমার সাবিত্রীর সঙ্গে আরও দু'তিনবার কথাবার্তা হ'য়েছে কিন্তু সব সময়ই সেই একই ধরণ। যা কিছু ঘটে, সকলের জন্যই সে দোষী করে আমাকে। যেন তার জীবনের সত্যিকারের শত্রুর দেখা পেয়েছে সে এতদিন পরে—আমারই মধ্যে। তাই তার সমস্ত লড়াই আমারই সঙ্গে। কিন্তু তবুও যতদিন যাচ্ছিল, সাবিত্রীর প্রতি শুধু আমার ভালবাসা নয়, একটা কেমন নির্ভরতাও ক্রমেই বেড়ে উঠছিল দিন দিন; যেন আমাদের বাড়ীতে আমার যথার্থ প্রাণের ঠাঁই যদি কোথাও থাকে ত সে আছে সাবিত্রীর প্রাণের উপরে, আর কোথাও নাই। তার রুক্ষ ব্যবহারে বারে বারে বেদনা পেয়েছি, তবুও কিন্তু তার এক মুহূর্তের তরেও বিশ্বাস হারাইনি। প্রধানতঃ সেই জন্যই বোধ হয়, সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাবিত্রীকে জোর ক'রে আমাদের বাড়ীতে রাখবার একটা অনুপ্রেরণা আমি সমস্ত প্রাণে প্রাণে অনুভব করছিলাম। সাবিত্রী অন্য কোথাও চলে গেলে, তার সঙ্গে আমার দেখা-শুনা সহজ হবে না—সেটাও আমার প্রাণের দিক দিয়ে একটা বিবেচনার বিষয় ছিল না যে এমন নয়। কিন্তু আমার জীবনের দিক দিয়ে সে সময়টা সাবিত্রীর আমাদের বাড়ীতে থাকার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল আমারই মনের একটা আশ্রয়ের জন্য, তা সে যতই রুক্ষ ব্যবহার করুক না কেন আমার সঙ্গে।

সাবিত্রী কি আমার মনের এই দিকটা বুঝতে পেরেছিল? বুঝেছিল কি যে, সেই আমাদের মাধবপুরের বাড়ীতে সে সময়টা সে ছাড়া আমার সত্যিকারের আপন আর কেউ ছিল না, তাই কি আমাদের বাড়ীতে থাকা নিয়ে তার প্রাণের মধ্যে একটা বিরাট দ্বন্দ্বের আভাস পেতাম প্রায়ই মাঝে মাঝে? তাই কি নিজের প্রাণের এই দ্বন্দের অস্থিরতায় আমাকেই সে আক্রমণ করছে বারে বারে আমাকেই মনে ক'রেছে তার অমর্যাদার বন্ধন? জানি না।

দু'-তিনদিন কলকাতায় থেকে ২৩শে চৈত্র বেলা ১১টা আন্দাজ বাড়ী ফিরে এলাম। আমাদের স্কুলের লাইব্রেরী এবং ছেলেদের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণের জন্য প্রায় দুই শত টাকার বই কিনিবার দরকার হয়েছিল। তাই দু'-তিনদিনের জন্য গিয়েছিলাম—কলকাতায়।

ফিরে এসে দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আলী মিঞার সঙ্গে বৈঠক খানা বাড়ীতে কথা বলতে বলতেই বিকেল হ'ল। এবার মহল পর্যবেক্ষণে মফঃস্বল বেরিয়ে ছিলেন আলী মিঞা—আমি বেরুইনি। আলী মিঞাও সেই দিনই সকাল বেলা ফিরে এসেছেন। চারিদিকে মহলে মহলে মুকুন্দদের সঙ্গে আমাদের

নানান বিষয় নিয়ে বিবাদ তখনও ষোল আনা চলেছে, সেই সব বিষয়ের বিস্তারিত কথাবার্তা আমাকে ব'লে আলী মিঞা যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভগতী চলে গেলেন, তখন বেলা ৫টা বেজে গেছে। আমি হাত-মুখ ধোবার জন্য পুকুরের বাঁধাঘাটে এসে দেখি—সাবিত্রী ঘাটের পাড়ে গম্ভীর মুখে চুপ ক'রে বসে আছে—যেন আমারই প্রতীক্ষায়। আমিও বসলাম।

শুধালাম, "কি খবর? অসময়ে এখানে চুপ ক'রে বসে আছ?"

বললে, "শান্তদা! আমি কালই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব, আর কিছুতেই থাকব না। তুমি যা-হয় ব্যবস্থা কালকের মধ্যেই কর।"

অবাক হ'লাম। আবার কি হ'ল?

শুধালাম, "কেন? কি হয়েছে?"

বললে, "কোন প্রশ্ন কোর না আমাকে। কালকের মধ্যেই কোনও বন্দোবস্ত ক'রে দেবে কিনা জানতে চাই।"

বললাম, "তুমি চাইলে নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু হঠাৎ এ রকম চলে যেতে চাইছ কেন—কারণটাও কি আমাকে বলে যাবে না সাবিত্রী?"

একটু চুপ ক'রে বসে রইল। আবার শুধালাম, "সাবিত্রী। বল সব আমাকে খুলে।"

তবুও চুপ ক'রেই রইল। ভ্রুকুঞ্চিত, ধীর-স্থির, গম্ভীর মূর্তি।

আবার বললাম, "বল। আমাকে কি সেটুকুও বিশ্বাস ক'রবে না?"

হঠাৎ বললে, "ওরা আমাকে অপমান করেছে।"

'ওরা' বলতে দাদা ও তুষারের কথাই সাবিত্রী বলতে চায়—বুঝতে আমার দেরী হয়নি। হঠাৎ মনটা জলে উঠল।

বললাম, "অপমান করেছে? কি বলেছে তোমাকে?"

সে চুপ ক'রে রইল।

আবার শুধালাম, "বল, সব খুলে বল, আমাকে সাবিত্রী।"

তবুও কথা নাই। মনে হ'ল তুষার অথবা দাদা কিম্বা হয় ত দু'জনেই অনুপস্থিতির সুযোগ পেয়ে সাবিত্রীকে কিছু কড়া কথা বলেছে নিশ্চয়।

শুধালাম, "তুষার তোমাকে কিছু বলেছে বুঝি?"

উত্তর দিল, "না।"

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহ'লে দাদা বলেছেন, কেমন?"

সঙ্গে সঙ্গে বললে, "না।"

"তাহ'লে? লুকিও না, বল সব।"

বসেছিল। উঠে দাঁড়াল।

বললে "আমি কিছুতেই আর এ বাড়ীতে থাকব না। কালই যাব। তোমার দয়া হয়, যা-হয় ব্যবস্থা কোরো। আর না হয় সেই পোড়ো বাড়ীতেই গিয়ে উঠব—তারপর অদৃষ্টে যা থাকে হবে। এই ব'লে আর কথার অপেক্ষা না ক'রে গম্ভীর পদক্ষেপে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

চুপ ক'রে খানিকক্ষণ ঘাটের উপর বসে রইলাম। বসে বসে ধিকি ধিকি বুকের জ্বালায় নানান রকম এলোমেলো চিন্তা যেন প্রাণের মধ্যে থেকে উড়ে উড়ে হাওয়ায় ভেসে যেতে লাগল। দূরে চেয়ে দেখলাম—আমাদেরই বাড়ীর সদরে নদীর ঘাটে বাঁধা রয়েছে একখানি বড় বিদেশী কোষ নৌকা। আমাদের বজরাখানি অতিরিক্ত জীর্ণ ও অপটু হওয়ার দরুণ বিদেশ থেকে এই নৌকাখানি ভাড়া ক'রে আনিয়ে আলী মিঞা মহল পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছিলেন এ বছর। হঠাৎ মনে হ'ল ঐ বড় নৌকাখানা নিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে দিন কতক নদীতে নদীতে বেড়ালে কি আনন্দই না পাওয়া যায় জীবনে। শুধু আনন্দ নয়—যেন বেঁচে যাই। এ বাড়ী থেকে পালাতে পারলে যেন আমিও বাঁচি, সাবিত্রীও বাঁচে।

সন্ধ্যা ফিরে রাত্রি হ'ল! বুকের মধ্যে আগুন নেভা ত দূরের কথা, ক্রমেই যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। সাবিত্রীকে এরা অপমান করেছে—নিশ্চয়ই কিছু কটু কথা বলেছে তাকে, তা সাবিত্রী আমার কাছে যতই গোপন করুক না কেন। এর বিহিত আমাকেই করতে হবে, নইলে যে আর উপায় নেই। নইলে আমি যে নিজের বুকের আগুনে জ্বলে জ্বলে নিজেই ছাই হ'য়ে যাব—কেউ আসবে না এক গণ্ডুষ জল ঢেলে আগুন নেভাতে।

তুষারের সঙ্গে যখন কথা সুরু হ'ল, তখন রাত্রি ৯টা হবে। শোবার ঘরে গিয়েই তুষারের সঙ্গে দেখা করলাম। খাটে গনু ঘুমিয়েছিল, তুষার তারই পাশে শুয়ে শুয়ে কি যেন একটা পড়ছিল। আমি ঢুকলাম ঘরে। তুষার একবার চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়েই আবার বইখানিতে মন নিবিষ্ট করল।

গম্ভীর গলায় বললাম, "তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মুখ না ফিরিয়েই স্থির গলায় বললে, "বল।"

"তুমি সাবিত্রীকে কি বলেছ?"

মুখ ফিরিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল আমার পানে। মুখে কিছু বললে না।

আবার শুধালাম, "তুমি সাবিত্রীকে কি বলেছ?"

"তার মানে?"

"মানে না বোঝার মতন ত কিছুই বলিনি।"

"তুমি বলতে চাও কি?"

"কিছুই না, আমি জানতে চাই। জানতে চাই, তুমি সাবিত্রীকে কি বলেছ?"

গম্ভীর মুখে চোখ ফিরিয়ে আবার বইয়ের মধ্যে মন নিবিষ্ট করলে। মুখে বললে, "কিছুই বলিনি।"

বললাম, "মিথ্যে কথা ব'ল না। বল তুমি সাবিত্রীকে কি বলেছ?"

হঠাৎ বইখানা বন্ধ ক'রে শিওরের বালিশের নীচে রেখে বিছানার উপর

উঠে বসল। আমার দিকে সোজা চেয়ে প্রশ্ন করল, "সাবিত্রী কি বলেছে তোমাকে, শুনি?"

বললাম, "তুমি তাকে অপমান করেছ।"

সঙ্গে সঙ্গে জোর গলায় বললে, "মিথ্যা কথা। ও যে এ রকম মিথ্যাবাদী তা' ত বুঝতে পারিনি।"

আমিও বেশ জোরের সঙ্গে বললাম "কেন, তুমি ওকে কিছু বলনি বলতে চাও?"

"একটা কথাও না। আমার বয়ে গেছে ওর মত মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে।"

সেই গলার স্বর। বুকটা আরও জ্ব'লে উঠল।

বললাম, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।"

আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে, আমার পাশ কাটিয়ে হন হন ক'রে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় ডাকলে, "সাবি ঠাকুরঝি!"

কোনও উত্তর নাই।

আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বললাম, "কেন—তাকে ডাকছ?"

হঠাৎ আমার কথা থামিয়ে দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—"তুমি চুপ কর।"

আবার ডাকলে "সাবি ঠাকুরঝি!"

"কি বলছ?"

হঠাৎ সাবিত্রীর গলা শুনতে পাওয়া গেল, বারান্দার অপর প্রান্তে মার শোবার ঘরের সামনে। অন্ধকারে সেই দিকটায় একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, সাবিত্রী চুপ ক'রে মার দরজার চৌকাটের উপর বসে আছে। তুষার বারান্দায় খানিকটা সেইদিকে এগিয়ে গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "আমি তোমাকে কী অপমান করেছি?"

সাবিত্রী চুপ ক'রেই রইল, কোনও কথা কইলে না।

তুষার আরও চেঁচিয়ে আবার শুধাল, "চুপ ক'রে রইলে যে। বল, বল সত্যি কথা, আমি তোমাকে অপমান করেছি?"

শান্ত গলায় অথচ বেশ জোরের সঙ্গে সাবিত্রী উত্তর দিলে, "হ্যাঁ।"

"উঃ—কি মিথ্যেবাদী। বল, কি অপমান করেছি। কি বলেছি তোমাকে আমি? বলতেই হবে তোমায়। একটা কথাও আমি বলেছি তোমার সঙ্গে? একটাও কথা?"

এই বলতে বলতে তুষার আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল সাবিত্রীর দিকে।

তাড়াতাড়ি সাবিত্রীকে বললাম, "সাবিত্রী। তুমি এখন নীচে যাও।"

তুষার চীৎকার ক'রে উঠল, "খবরদার, কখ্‌খনো না।"

সাবিত্রীকে উদ্দেশ ক'রে আবার বলল, "আমার কথার উত্তর না দিলে আমি এখান থেকে এক-পাও যেতে দেব না। বলনা, চুপ ক'রে রইলে কেন? আর ত কিছু জীবনে রাখনি, ঐ তোমার দাদার পায়ে হাত দিয়েই বল। বল, দেখি তোমার মত মেয়ে কতদূর যেতে পারে।" এই বলে সিঁড়ি দিয়ে নামবার পথটা আড়াল ক'রে দাঁড়াল।

নিজের মনেই যেন বলতে লাগলো—"না আর নয়। এ বাড়ীতে আর একদিনও নয়। হয় 'ও' বিদেয় হবে নয় ত আমি—আজই।"

সাবিত্রী তখন চুপ ক'রে পাথরের মূর্তির মত বসে আছে—একটি কথাও কইছে না, একটুও নড়ছে না।

কয়েক সেকেণ্ড সকলেই চুপচাপ।

হঠাৎ তুষারই কথা কইলে। আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললে, "কি একটি কথাও কইছেন না যে? তোমার মুখ রক্ষা করার জন্য না হয় মিথ্যে ক'রেই আমার নামে দুটো কথা বলতে বল। মিথ্যে কথা বলতে জানেন না বুঝি উনি? শেখেননি বুঝি কোনও কালে?"

সাবিত্রী স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিল, হঠাৎ যেন সচল হ'ল। উঠে দাঁড়াল। ধীরে এগিয়ে এল দু-পা। মাব ঘরের সামনের সিঁড়ির রেলিংটা একটা হাত দিয়ে জোর ক'রে চেপে ধরলে। তুষারকে উদ্দেশ ক'রে বললে—

"তুমি কি শুনতে চাও?"

শ্লেষাত্মক সুরে তুষার বললে—

"ও। এতক্ষণ কোনও কথা কানে যায়নি বুঝি? শোননি বুঝি এতক্ষণ আমার কোনও কথা?"

শান্ত গম্ভীর গলায় সাবিত্রী বললে—

"শুনেছি,—শুনেছি সবই। কিন্তু তোমার স্পর্দ্ধা দেখে আমি অবাক হই। এখনও বলি সাবধান।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে তুষার বললে—

"উঃ আবার শাসন! উত্তর দাও। আমার কথায় আমি কবে তোমাকে অপমান করেছি? কী বলেছি আমি তোমাকে?"

সাবিত্রী উত্তর দিল—

"কিছুই বলনি। কিন্তু অপমান ক'রেছ। শান্তদা চলে যাওয়ার পর থেকে প্রতি মুহূর্তে তুমি আমাকে অপমান করেছ। তুমি যে ব্যবহার আমার চোখের সামনে করেছ, কুকুর শেয়ালের সামনেও মানুষ সে ব্যবহার করতে লজ্জা পায়। তুমি আমাকে কুকুর শেয়ালেরও অধম মনে কর!"

"তার মানে?"

তুষারের গলার সুরে কেমন যেন একটা চমকে-উঠা ভাব লক্ষ্য করেছিলাম।

সেই স্থির ধীর কণ্ঠস্বরে সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী বললে—

"মানে অতি সহজ। গত দু'-তিনদিন শান্তদা ছিলেন না, রাত্রের কথা মনে ক'রে দেখ। তোমার কি এতটুকুও লজ্জা করেনি। চাকর-বাকরকে তুমি গ্রাহ্য কর না, তাদের মানুষ ব'লে মনে কর না, তারা তোমার নেমক খায় চুপ করে থাকে। কিন্তু তুমি আমাকে শুদ্ধ স্পষ্ট অগ্রাহ্য করবে কেন শুনি? এত তোমার কিসের স্পর্দ্ধা! আমার সঙ্গে লুকোচুরী করতে, আমি একটি কথাও কইতাম না। যতদিন আমার সামনে লুকোচুরী করেছিলে, আমি কিছুই বলিনি। আড়ালে-আঁধারে উঁকি ঝুঁকি মেরে তোমার কীর্তি দেখবার প্রবৃত্তিও আমার নেই। কিন্তু এবার শান্তদা চলে যাওয়ার পরে তুমি আমাকে স্পষ্ট অগ্রাহ্য করেছ—সে অপমান সইতে আমি রাজি নই।"

কথাগুলির শেষের দিকটায় সাবিত্রীর গলা যেন একটু কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

"উ: কি মিথ্যা কথা!" তুষারের গলা দিয়ে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কথা বেরিয়ে এল।

"মিথ্যে কথা! সাবিত্রী বললে, "ধন্য মেয়ে তুমি। জগতে সত্যই তোমার জোড়া নেই,—তুলনা নেই! মিথ্যে কথা। কে না জানে বাড়ীর? অতটুকু ছেলে গনু, সে শুদ্ধ জানে। কাল অর্দ্ধেক রাত্রে বেচারা 'মা' 'মা' ব'লে কাঁদতে কাঁদতে বারান্দায় উঠে এসেছিল—আমি গিয়ে শান্ত করি, কোনও খবর রাখ? মিথ্যে কথা, এত বড় সত্যকে তুমি মুখের জোরে মিথ্যে ক'রে দেবে?—তা হয় না বৌঠান।"

খানিকক্ষণ সব চুপ চাপ। আমি স্তব্ধ হ'য়ে সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি—নড়বার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল। আজ যেন সাবিত্রী জীবনের খেলার 'তাস' সকলের চোখের সামনে ছড়িয়ে দিল ফেলে, যেন সে জোচ্চরদের সঙ্গে জীবনে খেলতে আর রাজী নয়। হঠাৎ চমক ভাঙ্গল। তুষার হনহন ক'রে গিয়ে সশব্দে শোবার ঘরের দরজা ভিতর হ'তে দিল বন্ধ ক'রে।

সমস্ত শরীরে মাথায় একটা অসহনীয় অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম। ধীর পদক্ষেপ চলে গেলাম মুক্ত আকাশের নীচে, ছাদের উপরে। ছাদে একটা মাদুর পাতা ছিল, বোধ হয় সাবিত্রীর। সটান শুয়ে পড়লাম—মাদুরে!

শরীর ও মন দুই-ই তখন এত অবসন্ন, এত অসাড় যে, কোন-কিছু চিন্তা করার শক্তি পর্যন্ত আমার লোপ পেয়েছিল। চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম—অনেকক্ষণ, বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটু তন্দ্রার ঘোরে কেমন একটা জড়ান স্বপ্ন দেখলাম। সবটা ঠিক স্পষ্ট মনে নাই। যেন একটা বড় নদী দিয়ে নৌকায় যেতে যেতে গনু হঠাৎ নৌকা থেকে জলে পড়ে গেল। একবারমাত্র 'বাবা' ব'লে একটা তীব্র আর্তনাদ ক'রে গেল অতলে তলিয়ে। 'বাবা' কথাটা স্পষ্ট মুখ দিয়ে বেরুতেও পেল না। বেরুতে না বেরুতে ঢোকে ঢোকে জলের ঢেউ মুখ যেন দিল চেপে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ঘামে আমার সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। গন্নুর সেই চাপা আর্তনাদটা তখনও বুকের পরতে পরতে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটার প্রলয় নাচন চলছে—জোর ক'রে দুহাত দিয়ে বুক চেপেও তাকে থামাতে পারছিলাম না!

একি! হঠাৎ চমকে উঠলাম। আবার "সেই আর্তনাদ—গন্নুর গলার আর্তনাদই ত বটে। আমি ত ঘুমিয়ে নেই, জেগেই ত বসে আছি। 'বাবা' কথাটা মুখ দিয়ে বেরুত না বেরুতে কে যেন জোর ক'রে মুখ দিল চেপে। দূরে নদীর দিক থেকে চাপা আর্তনাদটা যেন ভেসে-ভেসে বারে বারে কানে এসে লাগতে লাগলো।

এ আমার কি হ'ল? ভাবলাম—উঠি, দেখি কি ব্যাপার। কিন্তু শরীর এত অসাড়, তাকে নড়ান সম্ভব হ'ল না। স্তব্ধ হ'য়ে অসংখ্য তারায় ভরা আকাশের দিকে খানিকক্ষণ রইলাম চেয়ে—স্তম্ভিত, বজ্রাহতের মত।

আবার—আবার সেই আর্তনাদ! এবার যেন আরও অস্পষ্ট! তাই ত!" হঠাৎ শিউরে উঠলাম। সমস্ত শরীরে দ্রুত তড়িৎস্পন্দনে দেহটা থর থর ক'রে উঠল কেঁপে। উঠে দাঁড়ালাম—ছুটে চললাম নীচে।

দোতালায় এসে ছুটে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দেখি দুয়ার খোলা—ঘর খালি! দাদার ঘরেও শূন্য-শয্যা পাতা পড়ে আছে—লোকজন কেউ নেই। মার ঘরে গিয়ে দেখি কৈ সাবিত্রীই বা কোথায়?

দোতলার বারান্দার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম—"সাবিত্রী!" কোনও উত্তর পেলাম না। সমস্ত বাড়ী স্তব্ধ, নিঝুম ঘুমে ঘুমন্ত।

একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। সব গেল কোথায়? হঠাৎ মনে পড়ে গেল—নদীর জলে গন্নুর তলিয়ে যাওয়া স্বপ্নের কথাটা। একেবারে চমকে উঠলাম। তবে কি তুষার গন্নুকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিতে গেল?

ছুটে সিঁড়ি বেয়ে চললাম নীচে। অন্দরের উঠানের দরজা খোলাই ছিল। অন্দর পেরিয়ে ছুটলাম বাইরে—নদীর পাড়ের দিকে।

গভীর অন্ধকার রাত্রি। অসংখ্য তারার অস্পষ্ট আলোয় চেনা পথ কোনও রকমে চিনে নিলাম। নদীর দিকে যেতে যেতে চীৎকার ক'রে ডাকলাম "গন্নু! গন্নু!" কোনও সাড়া পেলাম না।

আমাদের বাড়ীর বাইরের পূবের পাড়ের ঘাট ছাড়িয়ে নদীর দিকে একটু যেতেই কানে এল—

"যাচ্ছ কোথায়?"

চমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সাবিত্রীর গলা বলেই ত মনে হ'ল। চেয়ে দেখি পথের ধারে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ শ্রেণীর একটি গাছে গোড়ায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সাবিত্রী—অন্ধকারে চিনে নেওয়া কঠিন হ'ল না।

ছুটে সাবিত্রীর কাছে গেলাম।

শুধালাম, "সাবিত্রী! তুমি এখানে, এ সময়? এরা সব কোথায়?"

শান্ত গলায় সাবিত্রী উত্তর দিল, "কে ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে শুধালাম, "গনু—গনু ? আবার কে ?"

চুপ ক'রে দাড়িয়ে রইল, কোনও কথা কইলে না। অধৈর্য মনে রাগ হ'ল।

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললাম, "কথা কইছ না কেন ? কি যে তোমার চুপ ক'রে থাকা স্বভাব।"

সাবিত্রীর সঙ্গে এ রকম ধমকের সুরে কথা বোধ হয় জীবনে আর কখনও বলিনি। দাঁড়িয়েছিল, কোনও কথা না ব'লে ধীর পদক্ষেপে ফিরে চলল বাড়ীর দিকে।

মনে মনে রাগ ক্রমেই বোধ হয় বেড়ে যাচ্ছিল। জোর ক'রে ধরলাম সাবিত্রীর একখানা হাত। বেশ জোরের সঙ্গে শুধালাম, "শীঘ্র বল—গনু কোথায় ?"

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে চাইল আমার দিকে। চীৎকার ক'রে আবার শুধালাম, "বল, গনু কোথায় ? বল শীগগীর।"

না চেঁচিয়ে জোরের সঙ্গে বললে, 'বলব না, করবে কি ?"

ধরা হাতখানা আরও জোর ক'রে ধরে একটু ঝাঁকি দিয়ে বললাম, বলতেই হবে তোমাকে। আমি সব জানতে চাই।"

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "উঃ হাত ছাড় বড্ড লাগছে।"

"ছাড়ব না—বল আগে।" বলে সাবিত্রীর হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরলাম।

কম্পিত ভারী গলায় বললে, "হাত ছাড়—বলছি।"

হাতখানা ছেড়ে দিলাম।

বললাম, "বল সময় নষ্ট কোর না। গনু কোথায়।"

ঠিক সেই গলায় বললে, "গনুর মা, গনুর হাত ধরে হিড় হিড় ক'রে নদীর দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

"এঁ্যা—তাহ'লে যা ভেবেছিলাম তাই ঠিক!" গনুই কি 'বাবা' ব'লে চেঁচিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ—মুখ চেপে নিয়ে গেছে।"

গলায় তখনও ঠিক সেই সুর। পা-দু'টী আমার ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল, যেন দাঁড়িয়ে থাকা দায়।

চীৎকার ক'রে বললাম, "তুমি দেখেছিলে ? বাধা দাওনি ?"

জোরের সঙ্গে বললে, "না।"

"কেন ?"

"আমার খুসী !"

"আশ্চর্য মেয়ে তুমি !"

এই ব'লে আবার ছুটলাম নদীর দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে সাবিত্রী ডাকল, "যাচ্ছ কোথায় ? শোন, শোন বলছি"—

নদীর কিনারায় এসে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম—শান্ত ঘুমন্ত

নদী, দু' পাড়ই নিস্তব্ধ। আর একবার প্রাণপণে চীৎকার ক'রে ডাকলাম 'গনু!—গনু! গনু!'—কোনও দিক থেকে কোনও সাড়া এল না।

পা-দুটি তখনও কাঁপছে। কিছুতেই সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারছি না। হঠাৎ চোখের সামনে সব একেবারে গাঢ় অন্ধকার হয়ে গিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমায় নিয়ে প্রচণ্ড বেগে উঠল দুলে। নদীর কিনারায় ঘাসের উপর আচ্ছন্ন দেহটা নিয়ে এলিয়ে শুয়ে পড়লাম—বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

বেঁহুসের মত কতক্ষণ শুয়ে পড়েছিলাম, জানি না। হঠাৎ হুঁস হ'ল চেয়ে দেখি আমার দেহটা নদীর কিনারায় অর্দ্ধ-উত্থিত অবস্থায় এলিয়ে রয়েছে—মাথাখানি সযত্নে রক্ষিত—কার বুকে। মাথাখানি একটু ঘুরিয়ে চাইলাম। দেখলাম সাবিত্রীর সেই দুটি বড় বড় চোখ এক প্রাণ ভালবাসা নিয়ে চেয়ে আছে আমারই মুখের পানে, ভিজে আঁচল বুলিয়ে দিচ্ছে আমার মুখে-চোখে- কপালে!

আকুল-কণ্ঠে ডাকলাম, "সাবি!"

সস্নেহ উত্তরে শুধাল, "শান্তদা! কোনও কষ্ট হচ্ছে কি?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "না?"

বললে "তুমি ভেব না। মফঃস্বলের কোষ নৌকায় বড়দা একজন বরকন্দাজ ও নিজের চাকর দিয়ে গনু ও তার মাকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই কিছুক্ষণ তারা রওনা হ'য়ে গেল।"

ঠিক যেমন ছিলাম সেই ভাবেই চোখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম। সাবিত্রীর নিঃসঙ্কোচ সস্নেহ-পরশে সমস্ত শরীরে যেন ধীরে ধীরে নূতন জীবন সঞ্চারিত হ'তে লাগল।

"শান্তদা।" এমন মধুর কণ্ঠ বহুদিন সাবিত্রীর শুনিনি।

একটু পরে বললে, "চল, ঘরে যাই।"

'চল' ব'লে ধীরে ধীরে উঠলাম। দাঁড়িয়ে উঠে সাবিত্রীকে টেনে নিলাম আমার বুকের মধ্যে। অনায়াসে দিল ধরা—এতটুকুও বাধা দিল না।

তখন শেষ রাত্রের ম্লান একটুখানি চাঁদের আলো সবে নিজের পরশটুকু বুলিয়ে দিয়েছে জগতের গায়ে! সেই শেষরাত্রে সর্বাঙ্গে সেই আলোটুকু মেখে সেই নদীর কিনারায় কতক্ষণ দু'জনে অনন্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়েছিলাম মনে নাই। হঠাৎ সাবিত্রী কথা কইলে। "শান্তদা! মণি বৌঠানকে মনে পড়ে!"

দু'জনেই একসঙ্গে চেয়ে দেখলাম একটু দূরে ম্লান চাঁদের আলোয় মণি বৌঠানের চিতার উপরের ছোট শুভ্র শিব-মন্দিরটি সহসা কেমন যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

পরের দিন ভোরবেলা আমার বিছানা ছেড়ে উঠবার আগেই দাদা মাধবপুর ছেড়ে চলে গেলেন;—শুনেছিলাম কলকাতায়।

# তৃতীয় পর্ব

## এক

আমি বন্দী। খুনের অপরাধে অভিযুক্ত আমি বন্দী—জামিন পাইনি। খুলনার জজ-সাহেব জামিনে আমাকে অব্যাহতি দিতে অস্বীকৃত হন। হরিশ সেন আমার পক্ষ সমর্থন ক'রে হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়ে উপযুক্ত উকিল ব্যারিষ্টারের সাহায্যে আমার জামিনের চেষ্টা ক'রে এসেছে, কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। হাইকোর্টের বিচারপতিরাও আমাকে জামিনে খালাস দিতে নারাজ। আমি খুলনা জেলে বন্দী—কালই খুলনার দায়রা আদালতে সকলের সম্মুখে আমার বিচার স্বরু হবে!

উঃ—সেদিন সেই রাতটার কথা কখনও ভুলব! স্পষ্ট মনে আছে সমস্ত রাত খুলনা জেলে দোতলার একটা লম্বা ঘরে একটা বড় খোলা জানলার কাছে মোটা মোটা লোহার গরাদের একটা ধরে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। এক সেকেণ্ডের তরেও ঘুমইনি। ঘরে আরও পাঁচ-ছ জন লোক এক একটা কম্বল বিছিয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে শুয়েছিল। তাদের মধ্যে দুটো আস্তে আস্তে কথাবার্তা কইছিল অনেক রাত পর্যন্ত—সেদিকে আমার মোটেই কান ছিল না। কেবল মাঝে মাঝে একটা কালো বিরাট চেহারার লোকের বিকট নাসিকা গর্জনে আমি প্রায় উন্মাদের মত হ'য়ে উঠেছিলাম। কতবার ইচ্ছা হ'য়েছিল ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দি, কিন্তু কেমন প্রবৃত্তি হয়নি। আশ্চর্য! আমারই মতন কোনও না কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ছিল তারা। নিশ্চয় গুরুতর অপরাধ, নইলে জামিন পায়নি কেন? কিন্তু তাদের—কই ঘুমের ব্যাঘাত ত এতটুকু হচ্ছিল না। এরাও ত মানুষ! আমারই মতন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ!

আমি ঘুমইনি। বিচার স্বরু হওয়ার আগের দিন রাত্রে এক মুহূর্ত্তের তরেও ঘুমইনি। ঘুমান কি সম্ভব? আমি সুশান্ত—মাধবপুরের স্বনামধন্য জমিদার সেই 'সুশান্তদা'—খুনের অপরাধে অভিযুক্ত—খুলনা জেলে

সামান্য কয়েদী হ'য়ে একটা ছেঁড়া কম্বলের উপর মেঝের বসেছিলাম—আমি ঘুমুতে পারি? পরের দিন বেলা ১১টায় আমার বিচার সুরু হবে—আমার চোখে ঘুম? বিচারে কি হবে কে জানে? হয় ত ফাঁসি—না ভাবব না। কতবার শিউরে উঠে মনের লাগাম কষে দিয়েছিলাম টেনে সেদিন রাত্রে; ভাবব না, বিচারের ফলাফল।

সমস্ত রাত বসেছিলাম বাইরের দিকে চেয়ে, আকাশে চাঁদ ছিল। তিথিটা মনে নেই—পূর্ণিমা কি এদিক ওদিক কোন একটা তিথি। প্রায় সমস্ত রাতই আকাশে চাঁদ ছিল। এখন ভাবি, আমার অসীম সৌভাগ্য তাই চাঁদ ছিল আকাশে। নইলে ঘন অন্ধকারে আমি বোধ হয় দম বন্ধ হ'য়ে মরে যেতাম—সেদিন রাত্রে।

জানালা দিয়ে সেদিন রাত্রের দূরের ছবিটি লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলাম? সেই যে দূরে ভৈরবী নদীর ওপারের গোটা তিনেক লম্বা লম্বা তাল গাছ, তার তলায় নুয়ে-পড়া বনভূমির প্রান্ত-রেখা নদীর কিনারায় এসে দিয়েছে ধরা প্রস্ফুটিত চাঁদের আলোয়, একটা মায়া-রাজ্যের ঘুমন্ত ছবি সেই যে দূরে সমস্ত রাত ছিল ভেসে—আমি ত তাদের আমার প্রাণের অভিনন্দন জানাইনি সেদিন রাত্রে। তবুও ত তারা আমার বুকের রক্তের সঙ্গে রয়েছে মিশে—কিছুই ত হারায়নি।

কত কথা, কতদিনের কত তুচ্ছ হারিয়ে যাওয়া কথা, সেদিন রাত্রে মনের মধ্যে কতবার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে উঠে তৎক্ষণাৎ আবার অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল—কে তার খবর রাখে? কত কথা ভেসে ভেসে উঠছিল—সেই আমার প্রথম জীবনের, ছেলেবেলার দিনগুলি, বেগবতী নদীর ধার দিয়ে সেই স্কুলে যাওয়া-আসা, সেই স্কুলের সাথীরা, সেই বাজারের ননী ময়রা সেই বাবা-মা, পরে মন্টি বৌঠান, সেই সাবিত্রী, কত আশা কত আনন্দ, কত কত কি! একবার হঠাৎ মনে পরে গেল ছেলেবেলার সন্ধ্যাটি, যেদিন আমার বাবাকে খুনে বলার দরুণ হরিশকে নির্মমভাবে প্রহার করেছিলাম—আমি ও মুকুন্দ। সেই হরিশ, সে আমার একমাত্র বিপদের বন্ধু—এ বিপদে আমাকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণপাত করতে পর্যন্ত রাজী। আর মুকুন্দ! সেই বোধহয় এখন সর্বপ্রধান শত্রু। কেমন যেন হঠাৎ আশ্চর্য হ'য়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলাম খানিকক্ষণের জন্য।

হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম! সত্যই কি আমি খুনী? মিথ্যা কথা—মিথ্যা,

মিথ্যা, মিথ্যা। এত বড় মিথ্যা যারা আমার নামে রটিয়েছে—প্রাণ ভরে সেদিন রাত্রে তাদের অভিসম্পাত দিয়েছিলাম।

ব্যাপারটা সব খুলে বলি—

নদীর কিনারা হ'তে সেদিন শেষরাত্রে, সাবিত্রীর হাত ধ'রে যখন আবার ঘরে ফিরে গেলাম, তখন মনের মধ্যে একটা শান্তি একটা যেন অভূতপূর্ব তৃপ্তি অনুভব করেছিলাম। সাবিত্রীর প্রাণে আমার ঠাঁই হয়েছে—একটা নিরুদ্বেগ বিশ্রামে বিছানায় শুয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেদিন শেষরাত্রে। অন্য সব চিন্তা প্রাণ থেকে যেন অনেক দূরে গিয়েছিল সরে, ক্লান্ত মন তাদের নাগালই পায়নি।

পরের দিন সকাল বেলা ঘরে এসে ঘুম ভাঙাল সাবিত্রী। ঘুম ভেঙে সাবিত্রীর দিকে চেয়েই প্রাণখানা একটা সরস পুলকে উঠল ভ'রে। মধুর কণ্ঠে শুধালাম, "চায়ের জল কি চড়ান হ'য়েছে?"

বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু তুমি এখন উঠবে, না আরও ঘুমুবে?"

বললাম, "বাজল ক'টা?"

বললে "৯টা।"

উঠে পড়লাম। মুখ হাত ধুয়ে 'চা' খেতে খেতেই দু একটা চিন্তা মনের মধ্যে উকি ঝুকি মারতে লাগল। তুষারের দিকটা এখন কি করা যায়। অবশ্য এখন দু'-চার মাস থাকুক বাপের বাড়ীতে কিন্তু তারপরে? বাপের বাড়ীতে চিরদিন সে থাকবেও না এবং রাখাও সম্ভব হবেনা। তার সঙ্গে আর জীবনে এক সঙ্গে ঘর করব না—এ 'শপথ' আমি ইতিমধ্যেই মনে মনে করেছিলাম। কিন্তু তাকে কোথায় কি ভাবে রেখে দেওয়া যায়।

মনের তখনও আমার ক্লান্ত—বেশী ভাবতে রাজী নয়। মনে মনে ঠিক ক'রে নিলাম—সময় ত আছে, পরে ভেবে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। মন তাতেই যেন নিশ্চিন্ত হ'ল কিন্তু আশ্চর্য! • দাদা ও তুষারকে নিয়ে সাবিত্রী যে এতবড় একটা নির্মম-সত্য আমার চোখে ধরিয়ে দিয়েছে, কৈ তা নিয়ে ত কোন অশান্তি অনুভব করিনি সেদিন সকাল বেলা। মনের মধ্যে মোটের উপর একটি নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততাই অনুভব করেছিলাম। মন যেন এই নিষ্ঠুর সত্যের জন্য একদিন তৈরীই ছিল। যেন একটা প্রকাণ্ড সমস্যার নিষ্পত্তিও হয়ে গেল আমার জীবনে!

গহু! গহুর কথা মনে হতেই মনটা কেমন কাতর হ'য়ে উঠল। আহা! বেচারীকে জোর ক'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেছে।

সাবিত্রী শুধাল, "চা খেতে খেতে অত তন্ময় হ'য়ে ভাবছ কি ?"

কেন জানি না গন্নুর কথাটা ভেবে যে মনটা কাতর হয়েছিল, তাড়াতাড়ি সাবিত্রীর কাছে থেকে লুকিয়ে নিলাম। সে আমার কাছে ধরা দিয়েছে এখন আর আমার মনে কোন দুঃখই নেই, থাকাও যেন উচিত নয়, এই ভাবেই বললাম, "দাদা আজ সকালে কলকাতা রওনা হ'য়ে গেছেন—জান ?"

সাবিত্রী বললে, "জানি।"

বললাম, "কোন লজ্জায় আর আমার কাছে মুখ দেখাবেন ?"

আবার যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছিল।

সাবিত্রী বললে "যে যার নিজের ব্যবস্থা ত ক'রে নিল এখন আমার কি হয় ?"

একটু চমকে শুধালাম, "তোমার ?"

একটু হেসে সাবিত্রী বললে, হ্যাঁ আমার। সে দিকটাও মাঝে মাঝে একটু ভেবো—বুঝলে ?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "তোমার বিষয় আর ভাবনাটা কি ? তোমাকে আমি জীবনে ছাড়বো না।"

একটু হেসে সাবিত্রী বললে "তারপর ?"

বললাম, "তারপর আবার কি ? লোকে নিন্দে করবে ? করুকগে—কিছু এসে যায় না। গ্রাহ্যও করব না।"

হাসি মুখেই সাবিত্রী বললে, "ইস বড্ড মনের জোর দেখতে পাচ্ছি যে! যাক্ এখন আমার কাজ আছে, আমি যাই।"

এই ব'লে সে চলে গেল।

আলী মিঞার সঙ্গে ১১টা আন্দাজ দেখা হ'ল সেরেস্তায়, আলী মিঞার ছকাণ্ডেনে অবাক হ'লাম যে দাদা নাকি আগের দিন সন্ধ্যা বেলাই আলী মিঞাকে আজ ভোরে কলকাতায় রওনা হ'য়ে যাবার কথা বলেছিলেন। শুধু তাই নয় মাসে কলকাতায় তিনশো ক'রে টাকা তাঁর নামে পাঠানোর জন্য আলী মিঞাকে কড়া হুকুম দিয়েছেন, এবং আর নাকি ব'লে গেছেন যে, এখন তিনি কিছুদিন বিদেশেই থাকবেন—দেশে ফিরবেনই না। টাকাটা মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে নিশ্চয়ই যেন তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং তিনি যদি চিঠিতে কলকাতার কোন ঠিকানা না পাঠান ত টাকাটা যেন মুকুন্দর ঠিকানাতেই যায়।

কথাগুলি ব'লে আলী মিঞা বললেন, "কিন্তু বাবু! বড় বাবু বিদেশে থাকেন, থাকুন। তিনশো টাকা মাসে পাঠাতে আমাদের বিশেষ কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু ও-বাড়ীর ছোট বাবুর সঙ্গে বড় বাবুর একটা ঘনিষ্ঠতা মেলামেশা ভাল হচ্ছে না। ছোট বাবুর কুপরামর্শে বড় বাবু যদি শেষটা জমিদারীর ব্যাপারে ছোট বাবুর পক্ষ হ'য়ে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করেন ত অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক দাঁড়াবে না।"

কথাটা আমারও মনে হয়নি এমন নয়, কিন্তু তবুও আলী মিঞাকে বললাম "অতদূর মনে করবার এখনো কোনও কারণ হয়নি।"

আলী মিঞা কিন্তু আশ্বস্ত হ'লেন না। বললেন, "কি জানি বাবু বড় বাবু যে রকম দুর্বল চরিত্রের লোক। ছোট বাবু ও নবীন মুন্সী এতদিন অনেক চেষ্টা ক'রেও আমাদের কিছু ক'রে উঠতে পারেননি। কিন্তু বড় বাবুকে একবার হাত করতে পারলে—"

কথাটা থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আচ্ছা যদি প্রয়োজন হয় ত সে পরে ভেবে দেখা যাবে। এখন কিন্তু বড় বাবুর টাকাটা মাসে মাসে ঠিক পাঠিয়ে দেবেন। তাহলেই তিনি আর কোনও গণ্ডগোলের মধ্যে যাবেন না। ব'লে আমার বিশ্বাস। আরও একটা কাজ করবেন—"

কথাটা শেষ না ক'রেই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম। আলী মিঞাও প্রশ্নসূচক-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ মনে মনে ইতস্ততঃ ক'রে বললাম, "এ বাড়ীর বৌঠাকরুণও এখন কিছুদিন বাপের বাড়ীতে থাকবেন—তাঁর শরীরটা এখানে বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। তাঁকেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হবে। তাই তহবিলে সব সময়ই টাকা মজুত থাকে যেন।"

এ কথাটা আলী মিঞাকে এখুনি বলার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবুও বললাম। কেননা তুষারের হঠাৎ চলে যাওয়ায় একটা কৈফিয়ৎ আলী মিঞাকে দেয়ার যেন প্রয়োজন হচ্ছিল; এবং আমার মনের দিক দিয়ে সেদিকেরও একটা সুবন্দোবস্ত এই সঙ্গেই ক'রে ফেলে আমি যেন নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিলাম, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য।

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর যখন আমার শোবার ঘরে বিশ্রাম করতে গেলাম তখন একটা চিন্তায় মনটাকে পেয়ে বসল। দাদা ত সন্ধ্যা বেলায়ই আলী মিঞাকে কলকাতা যাওয়ার কথা বলছিলেন। তখনও ত

তুষারের সঙ্গে আমার কোনও কলহ হয় নাই তবে কি দাদার চলে যাওয়ার কোনও যোগ নেই? তুষার না গেলেও দাদা চলেই যেতেন কলকাতায়? কিন্তু সবই কি একটা ষড়যন্ত্রের ফল? কলহটা হয়েছিল ভালই, না হ'লেও তুষারকে দাদা কাল রাত্রেই পল্‌তায় পাঠিয়ে দিতেন। কিছুই ঠিক বুঝতে পারলাম না।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল আমার জীবনে। সেই আমাদের মাধবপুরের বাড়ীতে আর কেউ নেই—আমি ও সাবিত্রী। এই জীবনের শেষ-সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে ভাবি আর মনে হয় সেই সময় সাবিত্রীকে নিয়ে কয়েকটা দিন কি অপূর্ব শান্তির মধ্যে না কাটিয়েছিলাম। ছেলেবেলায় সাবিত্রীর সঙ্গে সেই প্রেমের দিনগুলির কথা মনে হ'লে এখন বেশ বুঝতে পারি যে, তারমধ্যে সত্য যতখানি ছিল, তার চাইতেও বোধহয় একটা মাদকতা ছিল অনেক বেশী। সেই সব দিনের সেই সব ছোট পুলকের শিহরণ মনকে থেকে থেকে পাগল ক'রে দিত একটা নেশার উত্তেজনায়। কিন্তু এবার সাবিত্রীকে পেয়েছিলাম স্পষ্ট ভাবে, সহজ ও সরল ভাবে। তার মধ্যে শুধু যে আনন্দ ছিল তা নয়, একটা আশ্রয় ছিল, বিশ্রাম ছিল। আমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তটি, প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপার কেমন ক'রে সরস ও মধুর ক'রে তুলতে হয়—এ মন্ত্রটি জগতের সমস্ত মেয়ের মধ্যে বিশেষ ক'রে যেন সাবিত্রীরই ছিল জানা। তাই সেই সময় জীবনের কয়েকটা দিন, নিজের ব'লে কিছুই রাখিনি, সমস্তই উজাড় ক'রে তুলে দিয়েছিলাম সাবিত্রীর হাতে একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়!

কিন্তু সইল না। এমনি অদৃষ্ট, এ শান্তিটুকুও আমার সইল না। আনন্দের জোয়ারে ধীরে ধীরে ভাঁটার টান লাগল আমারই অন্তরের মধ্যে। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি।—

মনের মধ্যে আশা ছিল যে, পল্‌তা থেকে আমার কাছে একটা চিঠি আসবে। তুষার আমার কাছে কোনও চিঠি লিখবে এ আশা আমি করিনি, চাইওনি আমি তুষারের চিঠি। কিন্তু ভেবেছিলাম, তুষারের মাতা আমার কাছে একখানা চিঠি লিখবেন। তুষারের ওরকম ভাবে চলে যাওয়ার দরুণ আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে তুষারকে ফিরিয়ে আনার জন্ত আমাকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ জানিয়ে, কিম্বা ঐ ধরণের একটা কিছু চিঠি যে আমি পাব এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। তুষারকে নিয়ে আমি অবশ্য আর কখনও সংসার করব না, কিন্তু তার মায়ের কাছ থেকে কোন রকম অনুরোধ এলে,

সেই সময় নিজের জোরের উপরে তুষারের বিষয় একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে দেব—এইটেই ছিল আমার মনের সঙ্কল্প।

এই দিক দিয়েই আমার মন আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। গন্তুকে যে ভাবে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সে কথা আমি ভুলিনি। তার চলে যাওয়ার সময়ে শেষ আর্তনাদটী—'বাবা' কথাটা—গন্তুর কথা মনে হ'লেই বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত। সমস্ত প্রাণ-মন অস্থির হত, গন্তুকে একবার দেখবার জন্ম। মনে মনে ইতিমধ্যেই ঠিক ক'রে নিয়েছিলাম যে, তুষারের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করার সময় গন্তুর সঙ্গে আমার দেখাশুনার কোনও দিক দিয়ে কোনও বাধা না হয়, সে ব্যবস্থাও আমি করব; এবং গন্তুকে প্রয়োজন হ'লে আমার কাছে এনে রেখে আমারই তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শেখাবার ভার নেব।

কিন্তু মাস-তিনেক কেটে গেল, পল্তার কোনও চিঠি আসা ত দূরের কথা, পল্তার যথন কোনও খবরই পাওয়া গেল না, তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা অস্থিরতা গড়ে উঠে ক্রমেই আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলতে লাগলো। তুষারের এবং বিশেষ ক'রে তার মার আমাকে এ রকম ভাবে অবজ্ঞা করার মধ্যে আমার প্রতি যে অপমান পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে উঠেছিল সেটাও আমার মনের দিক দিয়ে মোটেই ভাল লাগছিল না। বিশেষ ক'রে গন্তুর কোনও খবর না পাওয়ার দরুণ গন্তুর চিন্তাই সব চেয়ে বড় হ'য়ে আমার মনটাকে একেবারে জুড়ে বসল। কেবল ভাবতে লাগলাম—কিছু একটা ত করা দরকার।

গন্তুর খবরের জন্ম একটা লোক পল্তা পাঠাব? এ প্রস্তাবে মন সায় দিল না। মনে হ'ল এর মধ্যে একটা পরাজয় আছে। অন্ততঃ ওরা মনে করবে—আমিই পরাজিত হ'য়ে এগিয়ে গিয়েছি। এ চিন্তাও আমার মনের দিক দিয়ে সে সময় ছিল অসহ্য। কোনও রকম চিঠি আমি সেধে প্রথম লিখব না—এ শপথ আমি অনেক আগেই মনে মনে করে ছিলাম। তা'হলে কি করা যায়?

সাবিত্রীর সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে তখনও কোনও আলোচনা করিনি। কেন করিনি তার কৈফিয়ৎ অতি সোজা। তুষারের দিকটা নিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে কোনও কথা কইতেই আমার যেন কেমন একটা লজ্জা হ'ত। কিন্তু গন্তু গন্তুই ত আমার মনের দিক দিয়ে ছিল সবচেয়ে বিবেচনার বিষয়—তুষার ত নয়। কিন্তু তবুও সাবিত্রীর সঙ্গে আলোচনা করিনি। গন্তু যখন আমাদের

বাড়ীতে ছিল, তখন তার প্রতি সাবিত্রীর মনের ভাবটা ত আমি ভুলিনি।

যাই হোক্ যতদিন মন নিশ্চিত ছিল, যতদিন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল পল্তা থেকে খবর আসবে, ততদিন সাবিত্রীকে বলার কিছুই ছিল না। কিন্তু মাস-তিন সাড়ে তিনেক পরে মনের মধ্যে যখন একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হ'ল, গন্নু যখন ক্রমেই বড় হ'য়ে উঠতে লাগলো আমার অন্তরে, তখনই এল প্রাণের মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব।

তখনিই আমার মনে শান্তির পরিপূর্ণ জোয়ারে আবার সুরু হ'ল ভাঁটার টান।

যাই হোক্, সাবিত্রীকে কথাটা বললাম আমি আশ্বিন মাসের প্রথমেই।

কথাটা বলতেই হ'ল। কথাটা ক্রমেই এত বড় হ'য়ে উঠেছিল আমার প্রাণে যে, সাবিত্রীর কাছ থেকে কথাটা চেপে রাখা সম্ভব হয়নি—আমার মনের দিক দিয়েও নয়। বাইরের দিক দিয়েও নয়।

ভাদ্রর শেষাশেষি ঠিক ক'রে ফেললাম গন্নুকে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য পল্তায় লোক পাঠাব। বেশ জোরের সঙ্গে শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে একখানা চিঠি লিখে পাঠাব যে গন্নুর লেখা-পড়া করার বয়স হয়েছে, তাকে ওরকম ভাবে ওখানে রেখে দিতে আমি একেবারেই রাজী নই। তাই লোক পাঠাচ্ছি তাকে যেন নিশ্চয়ই এই লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আরও লিখব, তুষারের এখন ওখানে থাকা উচিত। তার মাসোহারা হিসাবে কিছু কিছু টাকাও আমি পাঠাতে রাজী আছি; এবং গন্নুও স্কুলের ছুটিতে বছরে দু-তিনবার গিয়ে তার মার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে—সে ব্যবস্থাও আমি করব।

যাই হোক্, কথাটা যখন মনের মধ্যে ঠিক ক'রে ফেললাম, তখন আমার আর 'তর' সইছিল না। গন্নুকে একবার দেখবার যেন আগ্রহটা অবশ্য আমার প্রাণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শুধু সেই জন্যই নয়, বর্তমান অবস্থাটাকে ভেঙ্গে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিলাম। এদিক দিয়ে একটুও দেরী করতে মোটেই ভাল লাগছিল না।

কালামশাই আমাদের অত্যন্ত পুরানো কর্মচারী, প্রভুভক্ত অথচ বেশ সরল জোয়ানো লোক। ঠিক ক'রে ফেললাম তাঁকে একজন চাকর সঙ্গে দিয়ে চিঠি

দিয়ে পলতায় পাঠাব ; এবং বিশেষ করে ব'লে দেব যেমন ক'রে হোক বুঝিয়ে বা জোরের সহিত গন্টুকে যেন তিনি নিশ্চয়ই আনেন।

ভিতরের অবস্থা অনেকটা বলতে হয়, তাই দাসমশাইকে কথাটা বলতে প্রথমটা একটু বাধল। কিন্তু উপায়ই বা কি? দাসমশাই পুরানো লোক, তাঁকে বিশ্বাস করতে আমার দ্বিধা ছিল না, তাই একদিন তাঁকে ডেকে চুপি চুপি কতকটা বললাম।

বললাম, "বৌঠাকুরাণীর সঙ্গে আমার যে রকম মনোমালিন্য হচ্ছিল তাই তাঁকে এখন কিছুদিন বাপের বাড়ীতে রাখা ছাড়া উপায় নাই কিন্তু গন্টুকে আমার কাছে নিয়ে আসা দরকার, তার লেখাপড়া—"ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাসমশাই আমার সমস্ত কথা শুনে সম্পূর্ণ আমার মতের সঙ্গের সায় দিয়ে বললেন, "এ অতি উত্তম কথা বাবু, খোকা বাবু আমাদের সা'-বংশের একমাত্র কুল-প্রদীপ। তিনি কেন মামার বাড়ীতে ওরকম ভাবে পড়ে থাকবেন। আপনি ভাববেন না, আমি যেমন করে হোক খোকা বাবুকে নিয়ে আসবই।"

সব ঠিকঠাক। এখন সাবিত্রীকে না জানিয়ে ত এ কাজ করা চলে না, তাই কথাটা তাকে বলা দরকার।

কথাটা বললাম একদিন সন্ধ্যার পরে। বললাম, "সাবি! তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরী পরামর্শ আছে।"

একটু হেসে সে বললে, "কি ব্যাপার?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "না, এমন কিছু বড় কথা নয়, তবে কথাটা জরুরী। এ গন্টুর বিষয় তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার।"

দেখলাম সাবিত্রীর মুখ গম্ভীর হ'ল। বললে, "তা আমার সঙ্গে আবার কি পরামর্শ?"

একটু রসিকতার চেষ্টা ক'রে বললাম, "তোমার পরামর্শ না পেয়ে আমার জীবনের আর কোনও কাজই চলে না—জান ত? কথাটা হচ্ছে গন্টুর লেখাপড়ার বিষয়ে। লেখাপড়ার বয়েস হয়েছে তার। অথচ ওরকমভাবে ওখানে ফেলে রেখে লেখাপড়া না শেখালে ত একটা গরু হ'য়ে উঠবে।"

বললে, "তোমার ছেলে, তুমি লেখাপড়া শেখাবে, তা আমাকে জিজ্ঞাসা করার কি আছে।"

একটা গম্ভীর নির্লিপ্ত কথার ধরণ। তাড়াতাড়ি বললাম, "কথাটা হচ্ছে আমি এ বিষয় একটু ভেবে দেখছি পলতায় কোনও স্কুল নেই আর সেখানে ঐ সংসর্গে থাকলে ওর লেখাপড়া হবেও না কিছু। তাই ভাবছিলাম ওকে

এখানে নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়ে একটা ভাল মাষ্টার রেখে লেখাপড়া শেখাই কি বল? ওর মা পল্‌তায় যেমন আছে তেমনি থাকুক।"

বললে, "কেন, মাই বা পল্‌তায় থাকবে কেন? ছেলেকে লেখা-শোনা করতে ত মার দরকার।"

বললাম, "তার মানে?"

বললে "মানে ত অতি সহজ?"

এই কথা ব'লে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না ক'রে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে গেল চলে।

একটু রাগ হ'ল। এত বড় আমার কথাটা বুঝলে না, বুঝতে চাইলে না। কি বলতে চায় সাবিত্রী? গনু লেখাপড়া না শিখে পল্‌তায় মূর্খ হ'য়ে পড়ে থাকুক—তাহ'লেই কি সাবিত্রী সুখী হবে? মনে মনে শপথ করলাম—তা কিছুতেই হ'তে দেব না, তাতে সাবিত্রী যতই রাগ করুক না কেন। ভাবলাম, যুক্তি বিবেচনা জিনিষটা ভগবান কি মেয়ে জাতকে একেবারেই দেননি?

সেইদিন রাত্রে দাসমশাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক ক'রে পরের দিন সকাল বেলায়ই দাসমশাইকে পল্‌তায় পাঠিয়ে দিলাম। পল্‌তায় নৌকায় যেতে তিন চার ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না, তাই সন্ধ্যার মধ্যেই গনুকে তিনি ফিরে আনবেন—এই আশায় মনটা সমস্ত দিন উৎফুল্ল হয়ে রইল।

গনু ফিরে আসবে—আমার মনের সেই দিনের আশার আনন্দ-টুকু সত্যই ছিল একেবারে খাঁটি। তার মধ্যে কোনও দ্বিধা ছিল না, কোনও উৎকণ্ঠা ছিল না। গনুর ওরকম ভাবে মাকে ছেড়ে এখানে এসে থাকার মধ্যে গনুর মনে কোনও রকম কষ্ট হ'তে পারে—এ চিন্তা আমার মনে একবারও আসেনি। আমার মনে কেমন একটা বিশ্বাস ছিল যে, গনু আসলে অন্তরে অন্তরে আমারই একান্ত অনুরক্ত এবং আমার কাছে থাকতে পেলেই সে সুখী হবে, শান্তি পাবে। আমাকে পেলে গনু মায়ের অভাবটা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে, সে বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ ছিল না।

সাবিত্রীর দিক দিয়েও গনুর আসায়, আমার মনে কোনও উৎকণ্ঠা ছিল না। অবশ্য গনুকে এখানে আনার ব্যাপারটা সাবিত্রীকে বলতে গিয়ে সাবিত্রীর যে মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে যদিও বিস্মিত হইনি, তবুও ব্যথা যে একেবারেই পাইনি এমন নয়। সাবিত্রীর মনোভাবটা নানান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক বিবেচনা ক'রে দেখেছি, কিন্তু

সাবিত্রীর এই মনোভাব আমি প্রাণে প্রাণে কিছুতেই সমর্থন করিনি, কেননা কোনও কিছুর জন্যই গন্নুকে বিসর্জন দেওয়ার অধিকার আমার কিম্বা সাবিত্রীর কারুরই নাই—এইটেই ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পাপ-পুণ্য ধর্ম-কর্ম যদি মানতে হয় ত, শিশু যারা, বালক যারা, যারা অসহায়, যারা দুর্বল, হাত ধরে এগিয়ে না নিয়ে গেলে যারা জীবনের পথে এক পা-ও এগুতে পারে না, প্রতি পদক্ষেপে যাদের বিপথে চলে গিয়ে ধ্বংসের পথে, মরণের পথে, ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনা—তারাই সকল অবস্থায় সকলের পূজনীয়। তাদের অবহেলা করার সৃষ্টিকর্তা ভগবান কাউকে দেননি—কোনও মানুষকেই না। তাই সাবিত্রীর মনোভাবটা আমি সমর্থন করিনি, যদিও তার প্রাণের উদারতার প্রতি, তার মনের সত্যিকারের মাহাত্ম্যর প্রতি আমার একটুও সন্দেহ হয়নি—একটা অগাধ বিশ্বাস ছিল, আস্থা ছিল। তাই ভেবেছিলাম, ছোট অসহায় বালক মাকে ছেড়ে যদি তার কাছে এসে আশ্রয় চায়, সাবিত্রীর মত মেয়ে কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে নেবে না। নিতে পারে না, তাকে সাদরে আশ্রয় দেবে, মুখে সে এখন আমাকে যাই বলুক না কেন। ভেবেছিলাম—সাবিত্রীর আমার প্রতি ভালবাসাটা একটা প্রচণ্ড বন্যার মত, সমস্ত নিয়ম, সমস্ত বাঁধন, প্রাণের শক্তির প্রাচুর্যে ভেঙে-চুরে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই তার উৎসাহ, তার আনন্দ। কিন্তু সত্যই যদি কোনও অসহায় শিশু সেই বন্যার মুখে পড়ে' আকুল হ'য়ে ওঠে কেঁদে, জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে হ'তে গঙ্গার মত বেরিয়ে আসবে স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি—শিশুটিকে আশ্রয় দেবে, কোলে তুলে নিবে তলিয়ে যেতে কখনই দেবে না।

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে সাবিত্রীর কাছে কথাটা আবার তুললাম। কাল রাত্রে সাবিত্রীর সঙ্গে কথাবার্তার পর সাবিত্রী চুপচাপ একটু গম্ভীর ভাবেই ছিল, আমার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথা বলেনি। তাই কথাটা আমি নিজেই আবার তুলছিলাম।

কোনও রকম ভূমিকা না ক'রেই হঠাৎ ব'লে ফেললাম, "সাবি! আমি গন্নুকে আনতে লোক পাঠিয়েছি।"

কোনও রকম ভাবের অভিব্যক্তি না ক'রেই বললে, "বেশ ত।"

বলতে লাগলাম,—"ভেবে দেখ, এ ছাড়া এখন আর উপায়ই বা কি?"

সে চুপ ক'রে রইল। কোনও কথা বললে না।

আবার বললাম, "চুপ ক'রে আছ যে?"

নির্লিপ্ত সুরেই সে বললে, "কি বলব?"

বললাম, "পূজার ছুটির ত আর বেশী দেরী নেই—ক'টা দিন মাত্র। একবার নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি ক'রে ছুটি হ'লেই আবার পল্তায় পাঠিয়ে দেব। তখন তোমাকে নিয়ে একবার পশ্চিম বেড়াতে যাবার ইচ্ছে আছে।"

কথা বেশী এগুল না। সব কথাই যেন দিল কেটে। ভাবলাম গন্নু একবার এসে পড়ে দিনকতক থাকতে থাকতেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। মনে মনে কল্পনাও ক'রে ফেললাম যে, এ বছরটা হবে না, আগামীবারে পূজার সময় দূর—দূর পশ্চিমে বেড়াতে বেরব আমি ও সাবিত্রী আর সঙ্গে থাকবে গন্নু।

সন্ধ্যার পূর্বেই দাসমহাশাই ফিরে এলেন। ফিরে এলেন একা—গন্নু আসেনি।

ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার দাসমশাই? গন্নু এলনা?"

দাসমশাই বললেন, "না, তাকে কিছুতেই পাঠালেন না।"

দাসমশাইয়ের-কথার মধ্যে একটা বিরক্তি ফুটে বেরুচ্ছিল।

বললাম, "পাঠালেন না কি রকম—তার মানে?"

দাসমশাই বললেন, "শুধু পাঠাতে রাজী হ'লেন না নয়, আমাকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়েননি।"

ক্রমে উত্তেজিত হ'য়ে উঠছিলাম। বললাম, "কে? কে কি বলেছে আপনাকে?

দাসমশাই চুপ করে রইলেন।

বললাম, "বলুন সমস্ত খুলে আমাকে—চুপ ক'রে থাকবেন না।"

ধীরে ধীরে দাসমশাই বলতে লাগলেন, "কথাগুলি শুনিয়েছেন বৌ-ঠাকরুণ—কিন্তু বড়বাবুর সামনে। বড় বাবু তাতে একটিও কথা বলেননি।"

চমকে উঠলাম! "বড় বাবু?"

দাসমশাই ব'লে যেতে লাগলেন, "হ্যাঁ বড় বাবু। তিনি এখন বেশীর ভাগ সময় কলকাতা থেকে এসে সেইখানেই থাকেন। আমাকে বললেন,—বৌঠাকরুণদের ত ওরকম ক'রে ভাসিয়ে দিলেও চলবে না, তাদেরও ত দেখা-শুনা করা দরকার।"

একটু চুপ ক'রে রইলাম। পরে যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত ক'রে শান্ত গলায় শুধালাম, "বৌঠাকরুণ কি বললেন?"

দাসমশাই চুপ ক'রে আছেন দেখে আবার বললাম, "বলুন সব, ইতস্ততঃ করবেন না।"

দাসমশাই বললেন, "সে অনেক কথা। বিস্তারিত আমার মনেও নাই আর বলতে আমার ভাল লাগছে না। এক কথায় বৌঠাকরুণের মতে এ পুরী পাপের পুরী—এখানে তিনি কিছুতেই ছেলে পাঠাবেন না যতদিন না—"

বললাম, "যতদিন না পাপ বিদেয় হ'য়ে এ পুরী আবার ধর্মের পুরী হয়, কেমন? আচ্ছা! আলী মিঞা কোথায়, তাকে ডেকে দিন আমার কাছে।"

দাসমশাই চলে গেলেন। আলী মিঞা এলেন।

বললাম, "আলী মিঞা! বড় বাবুর মাসোহারা আজ থেকে বন্ধ। আমার বিনা হুকুমে আর এক পয়সাও যেন না যায়।"

আলী মিঞা যেন কি-একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না ক'রে সেখান থেকে চলে গেলাম।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দেশ ছেড়ে রওনা হ'লাম—আমি ও সাবিত্রী। রওনা হ'লাম দূর পশ্চিমাভিমুখে।

বিশেষ কিছু বিবেচনা না ক'রে কেবল একটা মনের উত্তেজনাতেই পশ্চিমে রওনা হয়েছিলাম। রওনার মধ্যে প্রাণে একটা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম একটা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। মনকে বুঝিয়েছিলাম—এ অপমান আমি চুপ ক'রে কখনও সইব না, এর একটা বিহিত আমাকে নিশ্চয়ই করতে হবে, গনুকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে আসব আমার কাছে, তা সে-পথে যত বাধাই থাকুক না কেন। ভেবেছিলাম—এখন দিন কয়েক দূর দূর পশ্চিমে ঘুরে আসি; মনটাও একটু শান্ত হোক, তারপর এর বিষয় যা হয় একটা বিহিত করব। কি করা যায়—এই ভাবনা নিয়ে চুপ ক'রে সেই মাধবপুরের বাড়ীতে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে তখন অসম্ভব হয়েছিল, বিশেষতঃ সামনেই পূজা।

আরও একটা দিক দিয়ে সেই সময় মাধবপুর ছেড়ে যাওয়াটা বিশেষ বাঞ্ছনীয় হ'য়ে উঠেছিল। দাসমশাই ফিরে আসবার দু-এক দিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার মনের ঐ অবস্থায় ও-সময় মাধবপুরের বাড়ীতে চুপ ক'রে বসে থাকলে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে আমার ও সাবিত্রীর মধ্যে। দাসমশাই ফিরে আসবার পর সমস্ত ব্যাপারটা সাবিত্রীকে যখন বললাম, সাবিত্রী চুপ করেই রইল—আমার মনের সেই উত্তেজনার কোনও রকম সহানুভূতি বা সাড়া কিছুই পাওয়া গেল না তার কাছ থেকে। "পাপের পুরী" ব'লে তুষার তাকেও কি রকম অপমান করেছে সে কথাও সাবিত্রীকে শুনিয়ে দিতে ছাড়িনি, কিন্তু তবুও সেই একই ভাব। আমার

মনের এই দিকটার সঙ্গে যেন তার সম্পূর্ণ অসহযোগ, কোনও কথা যেন সে কইতে রাজী নয়। কথাগুলি সব শেষ ক'রে একটু চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত যখন বললাম, "কথাগুলো সব শুনলে ত ?"

তখন শুধু বললে, "তা টাকা বন্ধ করার তোমার কি অধিকার আছে ?"

"অধিকার ? আমার মনের জোরের অধিকার। আইন-কানুন হিসাবে ত কোনও কাজই হচ্ছে না।"

বললে, "কি জানি।—এসব কথা আমাকে ব'লে কোনও লাভ নেই। আমি এ সব বুঝি না।" এই ব'লে উঠে চলে গেল।

দু'-তিনদিন পরে যখন বিদেশ যাওয়ার কথাটা বললাম, তখন সাবিত্রীর মুখে যেন একটু হাসি ফুটল এবং যেদিন গরুর গাড়ী ক'রে সত্য সত্যই আমরা রওনা হ'লাম—সাবিত্রীর আনন্দ উৎসাহ যেন আর ধরে না। সাবিত্রীদের বাড়ীর পিছন দিককার সেই ঘন বেত-বনের পাশ দিয়ে সদর রাস্তা ধরে যখন আমাদের গাড়ীখানি হেলে দুখে খুলনা অভিমুখে যাচ্ছিল, তখন সাবিত্রী গাড়ীর ছইয়ের ভিতর হ'তে একটু মুখ বাড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই বেতবনের ঝোপের দিকে। সাবিত্রীর দিকে চেয়েই আমার মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার একটি কথা—সেই আমার দেশ ছেড়ে কলকাতায় কলেজে পড়তে যাওয়ার দিন, যেদিন সাবিত্রী এসে দাঁড়িয়েছিল ঐ বেতবনের মধ্যে একদৃষ্টে চেয়েছিল আমারই গরুর গাড়ীর পানে।

আমি বললাম, "মনে পড়ে ?"

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে, মাথা দুলিয়ে ঈষৎ একটু হেসে সাবিত্রী কেমন যেন এক রকম করুণ ভাবে চাইল।

মুখে বললে, 'হ্যাঁ।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে বললাম, "উঃ—কতকাল আগেকার কথা ! তখন কি জীবনই না ছিল।"

দাসমশাই প্রভৃতি পুরানো কর্মচারিদের হাতে দেশের বার্ষিক পূজার ভার দিয়ে আলী মিঞাকে যখন বলেছিলাম যে, আমি সাবিত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন তীর্থ পরিদর্শন করার জন্ত দূর বিদেশে রওনা হচ্ছি, তখন কোথায় কোথায় যাব, কোথায় কতদিন থাকব—এসব কথা আলী মিঞা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু আমি কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিই নাই।

বলেছিলাম, "আমার কিছুই ঠিক নাই, যা-হয় খবর পাবেন।"

মনে মনে ঠিক করেছিলাম—খবর আমি কিছুই দেব না, আমার সমস্ত

আবহাওয়ার সঙ্গে, আমার সমস্ত অতীতের সঙ্গে, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দিন কয়েক সাবিত্রীকে নিয়ে থাকতে চাই—নতুন আবহাওয়ার নতুন পারি-পার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে। যতদূর সম্ভব অতীতটাকে ভুলেই যেতে চাই—অন্ততঃ কিছুদিন।

এ কথাটা শুনলে সাবিত্রী অত্যন্ত খুসী হবে বুঝে গরুর গাড়ীতেই সাবিত্রীকে কথাটা বললাম। বললাম, "কারুকে কোনও চিঠি দেব না, বুঝলে? দেশের ও জমিদারীর কোন খবরও রাখব না, কারুকে জানতেও দেব না আমরা কোথায় কি অবস্থায় আছি। সমস্ত ভুলে গিয়ে নতুন আবহাওয়ার মধ্যে কেবলমাত্র তোমাকে নিয়ে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে থাকতে চাই—অন্ততঃ কিছুদিন। কি বল?"

একমুখ হাসি হেসে সাবিত্রী আমার দিকে চেয়ে বললে, "সত্যি? তুমি তা পারবে ত?"

বললাম, "নিশ্চয়ই। দেখে নিও।"

তাড়াতাড়ি সাবিত্রী বললে, "তাহলে, ত—।"

হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। যেন বলতে চেয়েছিল তাহ'লে ত তার সুখের সীমা পরিসীমা থাকবে না। এ জীবনে এর চাইতে সুখের অবস্থা সে যেন কল্পনাও করতে পারে না।

দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর প্রভৃতি উত্তর ভারতের সমস্ত নামজাদা ভাল ভাল স্থানগুলি মাসখানেক ধরে ঘুরে বেড়ালাম আমি ও সাবিত্রী এবং এলাহাবাদে এসে যেদিন বেলা ১১টার সময় নামলাম, সেদিন ২৭শে কার্তিক।

এলাহাবাদে দিন-দুই থেকে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে দু'জনে এক সঙ্গে স্নান ক'রে কাশী অভিমুখে রওনা হব—আমাদের এই সিদ্ধান্তই ছিল। এলাহাবাদে বেশী দিন থাকতে আমি মোটেই রাজী ছিলাম না, পাছে কোথাও সুলোচনা দিদি বা তাঁর স্বামী বিমলবাবুর সঙ্গে আমাদের দেখা হ'য়ে যায়, কেননা নানান কারণে বর্তমান জীবনে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার প্রবৃত্তি আমার একেবারেই ছিল না।

ইতিমধ্যে আমার মনের অবস্থা ঠিক কি ছিল বলা কঠিন। একটা আনন্দ একটা তৃপ্তি, নতুন নতুন দেশে সাবিত্রীর সঙ্গে নতুন নতুন অবস্থায় থাকার একটা উত্তেজনার অপূর্ব পুলক আমার মনের মধ্যে যে ছিলনা এমন নয়, কিন্তু প্রাণের গভীরতম তলদেশে একটা বেদনার অস্বস্তির আভাস আমি

পেলেই সেই বেদনায় টন্ টন্ ক'রে উঠত অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য।

যখনই মনটা দুলে উঠত, তখনই মনকে নানান রকম ক'রে বোঝাতাম। ভাবতাম—ব্যস্ত হ'য়ে লাভটা কি? বর্ত্তমানটাকে ষোল আনা উপভোগ যদি না ক'রতে পারি ত নিজেরই লোকসান; অতীত ত আছেই, তার মধ্যে ত ফিরে যেতেই হবে একদিন। অতীতকে ভেঙে-চুরে নতুন ভবিষ্যৎ তৈরী করার শক্তি যখন আমার মধ্যে প্রচুর আছে, তখন আর ভাবনাটা কিসের? অপেক্ষা করি দিন কতক। অপেক্ষা করার মধ্যে ত কোনও পরাজয় নেই, ক্ষতিও বিশেষ কিছু নেই; বরং লাভই। ভাবতাম—অদূর ভবিষ্যতে যে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে, তার পূর্বে মনটাকে ত একটা বিশ্রাম দেওয়া দরকার; তাতে মনের শক্তির প্রভাবই বাড়বে। এই সব নানান সান্ত্বনায় মনকে বুঝিয়ে, যতদূর সম্ভব সাবিত্রীর সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের আনন্দ-টুকুর উপভোগ ষোল আনা সার্থক ক'রে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমার এতটুকুও কার্পণ্য ছিল না। তাই বোধ হয়, আমার নিভৃত অন্তরের বেদনাটিকে আভাসে পর্যন্ত কোনও দিন সাবিত্রীকে বুঝতে দিই নাই, যতদিন তাকে নিয়ে বিদেশে বেড়িয়েছি।

যাই হোক্ এলাহাবাদে দিন দুইয়ের বেশী থাকবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দেরী হ'য়ে গেল, থাকতে হ'ল প্রায় দিন পনেরো।

উঠেছিলাম একটি ধর্মশালায়, এবং আসার পরের দিন, অর্থাৎ যেদিন রাত্রে ১১টার গাড়ীতে আমাদের রওনা হওয়ার কথা, সেইদিন বিকেলে সাবিত্রীর হঠাৎ জ্বর এল এবং দেখতে দেখতে সন্ধ্যার পরেই একেবারে বেঁহুস হ'য়ে পড়ল। দিন দুই কেটে গেল, জ্বর যখন কিছুতেই ছাড়ল না, অধিকন্তু নানান উপসর্গ যখন দেখা দিল, তখন একটা বাড়ী মাস খানেকের জন্য ভাড়া ক'রে সাবিত্রীকে সেখানে সরিয়ে নিয়ে রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

এদিকে আমার হাতে তখন টাকার জোর ছিল না—টাকা ফুরিয়ে এসেছে। বিদেশে নানান স্থান পরিদর্শনে মোটামুটি টাকার যে হিসেবটা করে-ছিলাম, খরচ সব দিকেই হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। দিন পাঁচেক কেটে যাওয়া সত্বেও সাবিত্রীর জ্বরের যখন কিছুই উপশম হ'ল না, চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় যখন জলের মত অর্থ ব্যয় হ'তে লাগলো, তখন সত্য সত্যই বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম—বান্ধবহীন এলাহাবাদ সহরে।

ইতিমধ্যে আলী মিঞাকে কোনও চিঠি লিখিনি, কারো কাছে আমাদের বিষয় কোনও খবরই দিই নাই। কিন্তু এলাহাবাদ আসার ছয় দিনের দিন আলী মিঞাকে টাকার জন্ত জরুরী 'তার' করতে বাধ্য হ'লাম—উত্তরের মাশুল ও আমার এলাহাবাদের ঠিকানাও এই সঙ্গে দিয়েছিলাম। আলী মিঞার উত্তর না আসা পর্যন্ত আমি বিশেষ দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম, ইহা বলাই বাহুল্য। নানান রকম ভয় হয়েছিল—হয় ত আলী মিঞা দেশেই নাই, অথবা মফঃস্বলের কোনও নিভৃত পল্লীতে জমিদারী সংক্রান্ত কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত আছে।

আলী মিঞার টেলিগ্রাফের উত্তর এল দিন-দুই পরে এবং উত্তর দেখে বিস্মিত হ'লাম। টাকা অবশ্য আলী মিঞা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেছেন—টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র দেশে ফিরে যেতে, নতুবা কি যেন সর্বনাশ হবে। আমি এখুনিই দেশে ফিরে না গেলে সর্বনাশ যে কেন হবে, অনেক ভেবেও তার কোনও সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পেলাম না।

হঠাৎ মনে প্রশ্ন উঠল—তবে কি গনুর খুব বেশী অসুখ? পল্‌তায় বিশেষ কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না, তাই কি বিপদের সম্ভাবনা? সাবিত্রীর অসুখ, তার সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা চলে না, অস্থির চিত্তে সেই দিনই আলী মিঞাকে আর একটা জরুরী তার পাঠালাম। —জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালাম—"গনুর কি অসুখ? বিস্তারিত খুলে লিখুন।"

দিন দুই পরে আলী মিঞার জবাব এল এবং যেদিন এল, তার আগের দিন বিকালে সাবিত্রীর জ্বরের উপশম হয়েছে; জবাব এল—গনুর অসুখ নয়, বিস্তারিত টেলিগ্রাফে লেখা অসম্ভব, টেলিগ্রাফ পাওয়ামাত্র যেন রওনা হই, একদিনও দেরী যেন না করি।

সেদিন যদিও জ্বর ছিল না, সাবিত্রী অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় বিছানায় ছিল শুয়ে, তাই তাকে কিছু বলা গেল না। একটা চিন্তিত মন নিয়ে নানান রকম ভেবে আলী মিঞার টেলিগ্রাফের অর্থ কিছুতেই আমার হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

যাই হোক, সাবিত্রীকে যখন তিন-চারিদিনের মধ্যে নড়ান সম্ভব নয়, তাই অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলাম, কিন্তু সাবিত্রীকে কথাটা বললাম পরের দিনই দ্বিপ্রহরে, তার রুগ্ন-শয্যার পাশে। সব শুনে সাবিত্রী শুধাল, "তা কি করবে এখন?"

বললাম, "কি আর করব? তুমি একটু সুস্থ হ'লেই চল তোমাকে নিয়ে দেশে রওনা হই। —কি যে ব্যাপার হয়েছে, কিছুই ত বুঝতে পারছি না।"

বললে, "তা আলী মিঞার ত একটা চিঠি আসবে?"

বললাম, "কি জানি, হয়ত ভাবছেন আমি রওনা হয়েছি—তাই কোনও চিঠি লিখছেন না।"

বললে, "তা আলী মিঞাকে একটা টেলিগ্রাফ করো না বিস্তারিত চিঠি দিতে।

বললাম, "কিন্তু টেলিগ্রাফ পেয়ে চিঠি লিখলে, সে চিঠি আসতে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়দিন কেটে যাবে। তাই ভাবছি—"

বললে, "তা বেশ ত চল না, কালই রওনা হই।" বলে যেন ক্লান্ত ভাবে চোখ বুজল। বুঝলাম, আলী মিঞার এক টেলিগ্রাফ পেয়েই বিশেষ কিছু না বুঝে তখনই দেশে রওনা হওয়া সাবিত্রীর ইচ্ছা নয়। বুঝলাম—সাবিত্রীর মতে, দেশে এমন কিছু হ'তে পারে না, যার মূল্য আমাদের এই বিদেশ ভ্রমণের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিটুকুর মূল্যর চেয়ে কোনও অংশে বেশী।

তাড়াতাড়ি বললাম, "না কাল কেন? পরশু পর্যন্ত রওনা হওয়া যাবে। গাড়ী রিজার্ভ ক'রে নেব মনে করছি, তাতে তোমার বিশেষ কোনও কষ্ট হবে না।"

কোনও উত্তর দিল না। চুপ ক'রেই শুয়ে রইল। আমার মন তখন সত্য সত্যই অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল দেশের খবরের জন্য। কি ঘটেছে বিস্তারিত না জানতে পারলে আমি যেন কিছুতেই সুস্থ হ'তে পারছিলাম না।

এতদিন দেশের কথা ভাবিনি—মনের সেদিককার জানালাটি যেন ছিল একেবারে বন্ধ। একটু যেন ফাঁক হ'ল, অমনি জোর হাওয়ায় জানালাটি সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে প্রাণ-মন অস্থির ক'রে তুলল সেই দিককার একটা আকুল বাতাস।

* * * *

দিন চার-পাঁচ পরে দেশে ফিরে এলাম একদিন সকালবেলা ১১টা আন্দাজ। গাঢ় নীল আকাশের তলায় চারিদিকে মাঠে মাঠে বনে বনে শরৎকালের তাজা সোনালী রোদটুকু, গরুর গাড়ীতে আসতে আসতে পথে বিশেষ ক'রে মধুর লেগেছিল আমার চোখে—স্পষ্টই মনে আছে।

সাবিত্রীকে বলেছিলাম, "সাবি! শরৎকালের সকাল বেলা জীবনটাকে যেন আবার নতুন ক'রে পাই—যেন নতুন ক'রে আবার সুরু হ'ল সবই আমার জীবনে।"

সাবিত্রী বললে, "এটা ত শরৎ নয়—এটা হেমন্ত।"

বললাম, "ঐ শরৎ,—রূপ একই।"

সাবিত্রী বললে, "আমার কিন্তু বড্ড বেশী পুরানো কথা মনে পড়ে শরৎকালের সকাল বেলা।"

বললাম, "তাও ঠিক কিন্তু মজা হচ্ছে পুরানো কথা মনে হ'য়ে মন অবসাদে ভরে উঠে না শরতের সকালে। বরং পুরানোর মধ্য দিয়েই একটা নতুন পথের আভাস পাই—যেন আনন্দ জীবনে ফুরিয়ে যায়নি, আরও ঢের বাকী আছে।"

সাবিত্রী বললে, "তা যদি হয় তবে শরতের সকালে পুরানো ঘরে ফিরে যাওয়াটা ভুল। সব পুরানো ছেড়ে বেরিয়ে পরতে হয় নতুনের পথে—নতুন আনন্দের সন্ধানে।"

কথাটা বলেই সাবিত্রী একটা সলজ্জ হাসিভরা চাহনিতে চকিতে একবার আমার দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। বুঝলাম, ও ধরণের কথার ও রকম জবাব আমার মুখের উপর দিয়ে, সে নিজেই যেন লজ্জায় অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল।

সহাস্য মুখে বললাম, "বারে সাবি! খাসা কথা কইতে শিখেছ ত?"

তাড়াতাড়ি বললে, "যাও।—তুমি লোককে বড় অপ্রস্তুত করতে পার।"

বললাম, "না—না, চমৎকার কথা বলেছ। কথাটা খুবই ঠিক। দেশে বেশীদিন থাকব না। দেশে গিয়ে দিন কয়েকের মধ্যেই সব দিকের একটা সুব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আবার তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব—নতুন পথে। এবার যাব দাক্ষিণাত্যের দিকে।

সাবিত্রী চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

একটু পরে বললাম, "দেশে একবার যাওয়াটা দরকার, সেটা ত বুঝতে পারছ?"

বললে, "কি জানি, আমার মন মোটেই ভাল লাগছে না। সেই দেশের বাড়ীতে ফিরে যেতে প্রাণ যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তাড়াতাড়ি শুধালাম, "কেন? কেন?"

বললে, "কেন জানি না।—আমার ভয়—" সে চুপ ক'রে গেল।

সাবিত্রীর পিঠে হাত রেখে বললাম, "বল—কিসের ভয় তোমার? চুপ ক'রে গেলে কেন?"

ক্লান্তভাবে বলতে লাগল, "কেমন মনে হয় ও-বাড়ীর আর মঙ্গল কিছুই নাই—সবই অমঙ্গল। সত্যিই পাপের পুরী। মনে হয়, যা আমার অদৃষ্ট ও-বাড়ীতে গেলে শেষ পর্যন্ত আবার কি হয় কে জানে।"

বললাম, "ও কথা বলছ কেন সাবি? কি আর হবে? তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না—সে ত তুমি জান।"

ক্লান্তভাবেই ব'লে যেতে লাগল, "ও-বাড়ীতে গেলেই আবার তোমার মনে পিছনের টান না লাগে। পিছনের টান লাগলে মঙ্গল হবে না, কিছুতেই হবে না, একথা আমার মন জোর ক'রে বলছে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, "সাবি! তুমি কি এখনও আমাকে চেননি? পিছনের টান বলতে তুমি কি বুঝছ? বিশ্বাস কর সাবি—একমাত্র গন্থু। জগতে আর সব থাকে থাকুক, যায় যাক্—কিছুমাত্র আসে যায় না—গন্থুর একটা সুব্যবস্থা ক'রে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

সাবিত্রী আবার বললে, "ব্যবস্থা করতে হয় করো—আমি তা বারণ করি না। কিন্তু দোহাই তোমার—জড়িও না। নিজেকে আর কারোর সঙ্গেই জড়িও না। নইলে নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারবে না—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মনে কোরনা একথা আমি খালি নিজের জন্তই বলছি। মোটেই তা নয়।"

বললাম, "কিন্তু ভেবে দেখো—"

কথাটা কেটে দিয়ে সাবিত্রী বললে, "এ নিয়ে তর্ক করো না। তোমাকে আমি যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার মন বারে বারে বলে—তোমার আমার ছু'জনার অতীতেই এত বিষ আছে যে, তার সঙ্গে কোনও দিক দিয়ে এতটুকু যোগ হ'লে আবার সব যাবে বিষিয়ে তাহ'লে কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

চুপ করে বসে রইলাম। গরুর গাড়ী ক্রমেই এগুতে লাগল—মাধবপুরের পানে, আমাদের সেই বাড়ীর দিকে। এতদিন সাবিত্রীকে নিয়ে ঘর করছি এ রকম সরলভাবে এ-সব কথা সাবিত্রী কখনও আমাকে বলেনি।

চুপ ক'রে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলাম। সাবিত্রীর প্রাণের গহন তলদেশ হতে যেন কথাগুলি বেরিয়েছিল—আমার প্রাণকে স্পর্শ করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমার প্রতি তার গভীর প্রেমের ঠাঁই তার প্রাণের

গভীরতম অনুভূতির মধ্যে; তাই সে যেন বুঝতে পেরেছিল কিসে আমার মঙ্গল, আর কোথায় আমার অমঙ্গল, অতি সহজে—কোনও যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার করার কোনও প্রয়োজনই হয়নি।

কিন্তু আমার মনে তর্ক উঠেছিল। গরুর গাড়ীতে যেতে যেতে চুপ ক'রে বসে সাবিত্রীর কথা নিয়ে নানান যুক্তিতে নানান তর্কে আমার মন উঠল ভরে। মনে হ'ল প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করার মধ্যেই ত পুরুষোচিত গর্ব, পলায়নের মধ্যে ত নয়। ভেবেছিলাম—সাবিত্রী সমস্ত অবস্থাটাকে যাচাই ক'রে দেখেছে, কেবল নিজের প্রাণের অনুভূতির কষ্টিপাথরে এবং যতই আমি মনে মনে সেই অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করি না কেন, আমার জীবনে তার কষ্টিপাথরই ত একমাত্র কষ্টিপাথর নয়। ক্রমে মাধবপুরের কাছাকাছি এসে ঘুরে যখন মাধবপুর বাজার দেখা গেল, তখন আমার মন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার অতীতে যে বিষ আছে, সে বিষয়ে আমার এতটুকুও সন্দেহ হয়নি। কিন্তু মনে মনে শপথ করেছিলাম—সে বিষ যদি আমি সমূলে নির্মূল করতে নাও পারি, গনুকে আমি সেই বিষের হাত থেকে উদ্ধার করবই, কিছুতেই তার মধ্যে তাকে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত হব না, তাতে আমার যতই অমঙ্গল হোক না কেন।

বাড়ী এসেই আলী মিঞার খবর নিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তখন ছিলেন না, স্নানাহারের জন্য ভগতী চলে গিয়েছিলেন। দাসমশাই প্রভৃতি দু'এক জন কর্মচারীকে ডেকে খবরাখবর নিয়ে কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। সবদিকই ত ঠিক আছে মনে হ'ল, তবে আলী মিঞা আমাকে ওরকম টেলিগ্রাফ পাঠালেন কেন?

আলী মিঞার সঙ্গে দেখা হ'ল বিকেল বেলা। দ্বিপ্রহরে নিদ্রার পরে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে যখন বৈঠকখানা বাড়ীতে গেলাম, তখন আলী মিঞার সঙ্গে দেখা হ'ল বৈঠকখানার দোতলায়। কুশলাদি প্রশ্নের পর আমার বসবার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আলী মিঞা বলতে লাগলেন, "বাবু! সর্বনাশ উপস্থিত, এখুনিই যা-হয় একটা বিহিত করা দরকার। আপনি ত বড়বাবুর মাসোহারা বন্ধ করবার হুকুম দিয়ে চলে গেলেন, তারপর আশ্বিন কার্তিক এই দুই মাসের টাকা আমি বড় বাবুকে পাঠাইনি। তিনি আমাকে ইতিমধ্যে চারখানা অত্যন্ত কড়া চিঠি লিখেছেন—আমি তার কোনও জবাব দিই নাই। আমি তাঁর কাছ থেকে শেষ চিঠি পেয়েছিলাম কার্তিক মাসের ৯ই। তার আগের চিঠিখানা পেয়েছিলাম কার্তিক মাসের ১লা এবং সে

চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, যদি কার্তিক মাসের ৩ই এর মধ্যে টাকা না পান ত তিনি জমিদারীর ম্যানেজারী থেকে আমার বরখাস্তনামা লিখে নবীন মুন্সীকে তাঁর অংশের ম্যানেজার নিযুক্ত ক'রে আদায় তহশীলের সমস্ত ক্ষমতা তাকে দিয়ে তার নামে আমমোক্তারনামা লিখে দেবেন। শেষের চিঠিখানায় আমাকে বরখাস্ত ক'রে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, নবীন মুন্সীকে আমমোক্তারনামা দেওয়াই তিনি ঠিক করেছেন, এবং এবার পৌষ কিস্তিতে নবীন মুন্সী তার তরফের তহশীল করবার জন্ত আমাদের মহলে বেরুবে—"

প্রশ্ন করলাম, "চিঠিগুলো সব আসছে কোথা থেকে?"

আলী মিঞা বললেন, "প্রথম দু'খানা চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে কিন্তু শেষ দু'খানা চিঠি পলতা থেকে লেখা, যদিও—"

প্রশ্ন করলাম, "যদিও?"

আলী মিঞা বললেন, "যদিও চিঠির উপরে কোনও ঠিকানা লেখা নাই, কিন্তু আমি পোষ্ট-অফিসের ছাপ পড়ে দেখেছি। দেখবেন, চিঠিগুলি আনবো?

তাড়াতাড়ি বললাম, "না।"

আলী মিঞা বললেন, "থাক সে সব চিঠি দেখে আপনার দরকার নাই। যা হোক বাবু! এখুনিই যা-হয় একটা ব্যবস্থা করুন! যদি নবীন মুন্সীকে আমমোক্তারনামা দিয়ে তিনি পৌষ কিস্তিতে মহলে পাঠান—তাহ'লে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে বাবু। মহলগুলো সব ছারখারে যাবে। স্বনামধন্ত 'রতনসা'র সোনার জমিদারীটা যাবে একেবারে উচ্ছন্নে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, "তা এতদিন হয় ত আমমোক্তারনামা লিখে দিয়েছেন তাকে। সে কি মহলে এখনও বেরোয়নি?"

বললেন, "না বাবু! এখনও কিছু হয়নি। আমার শেষ চিঠি পাবার দিন-দুই পরেই বড় বাবুর হাতের লেখা নবীন মুন্সীর নামে চিঠি পলতা থেকে এখানে আসে! আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, বড় বাবু পলতা থেকে আমমোক্তারনামা দেওয়ার জন্ত নবীন মুন্সীকে ডেকে পাঠাবেন। তাই আমি পোষ্ট অফিসে নজর রেখেছিলাম। পিয়ন ডাক নিয়ে আসার সময় রোজই পোষ্ট অফিসে গিয়ে পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে গল্প-গুজব করতাম। নবীন মুন্সীর নামে বড় বাবুর হাতের লেখা চিঠি দেখেই চিঠিখানা আমি চুরি ক'রে ফেলি। মাষ্টার টের পায়নি। পরে খুলে পড়ে দেখি যা ভেবেছিলাম তাই। তবে গুতকল্য কলকাতা থেকে বড় বাবুর চিঠি নবীন মুন্সীর নামে এসেছে। চিঠি-

খানা সরাতে চেষ্টা করছিলাম, পারিনি। তাতে তিনি নবীন মুন্সীকে পাকড়া যেতে হুকুম দিয়েছেন কিনা জানি না।"

বললাম, "নবীন মুন্সী এখন এইখানেই আছে?"

বল্লেন, "হ্যা—আমি তার উপর কড়া নজর রেখেছি এখনও সে রওনা হয়নি বাবু। আপনি এসে পড়েছেন আমি বেঁচেছি! কী যে করবো, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এ সব কথা ত বলাও যায় না কাউকে—সব কথাই অত্যন্ত গোপনে রেখেছি। এখন আপনি যা হয় করুন।"

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম।

পরে বললাম, "তা এর আমি কি করিতে পারি আলী মিঞা? তা যাক না নবীন মুন্সী মহলে। বড় তরফের কিস্তির তহশীল সেই করুক না এবার।"

তাড়াতাড়ি আলী মিঞা বলল "না না বাবু! না—কখনই না। তাহ'লে একেবারে সর্বনাশ হবে। নবীন মুন্সী কখনই আমাদের মঙ্গল দেখবে না। একবার যাওয়ার সুবিধা পেলে মহলে মহলে গিয়ে নিজেদের মধ্যে মামলা বাধিয়ে, নানাভাবে মহলগুলোকে একেবারে উচ্ছন্নে দিয়ে আসবে। বিশেষতঃ আপনার এমন সর্বনাশ ক'রে আসবে যে—"

একটু জোরের সঙ্গে বললাম,—"তা আমার সে কি করতে পারে?"

আলী মিঞা বললেন, "এখন কিছুই করতে পারে না, যদিও তার চেষ্টার অবধি নাই, জানেন ত সবই। কিন্তু একবার বড়বাবুর পক্ষ নিয়ে যদি সে আমাদের মহলে যেতে পায়, আপনার বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মাতব্বরদের নিয়ে এমন সব জটলা সৃষ্টি করবে যে, আমাদের আদায় তহশীলে ব্যাঘাত ঘটবেই—অধিকন্তু আপনাদের নামে একটা কুৎসার—"

আলী মিঞাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "থাক। জানি সব আলী মিঞা, বুঝি সবই। কিন্তু বর্তমানে উপায় কি আছে বলুন?"

বললেন, "বড় বাবুকে যেমন ক'রে হোক এ কাজ থেকে বিরত করতে হবে।"

বললাম, "কি ক'রে? টাকাকড়ি নিয়ে গিয়ে সেধে তার পায়ে ধরতে পারবো না আলী মিঞা। তার চাইতে জমিদারী উচ্ছন্নে যায় যাক।"

ক্রমেই আমি যেন উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আর একটা কথা—দাদা মার সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতলায় পূজা দিতে যেতে অস্বীকার করলে মা বলেছিলেন, "শনিতে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়।"

হায়রে! এ শনির দশা কি সব দিকে একেবারে সর্বনাশ না ক'রে কিছুতেই ছাড়বে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে আলী মিঞা বললেন, "টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে বড় বাবুকে আমি এইখানা চিঠি লিখব? আপনার অনুমতি পেলেই লিখতে পারি।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম। বর্ত্তমান অবস্থায় দায়ে পড়ে আবার দাদাকে টাকা পাঠাতে এবং তার উপর খোসামোদ ক'রে আলী মিঞাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে আমার সমস্ত শরীর ও মন অপমানের গ্লানিতে জ্বলে উঠছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, "মুকুন্দটা কোথায়? সে কি আর দেশে ফিরবে না কখনও?"

আলী মিঞা বললেন, "কলকাতাতেই আছেন বাবু। এইবার আসবেন এবং এবার এসে কিছুদিন দেশেই থাকবেন শুনেছি।"

একটু পরে আলী মিঞা বললেন, "বাবু। আপনি অনুমতি দিন, এ ছাড়া আপাততঃ আর কোনও উপায় নেই। নইলে সত্যই সব ছারখার হয়ে যাবে। অনুমতি দিন, আমি আজই পলতায় কিছু টাকা দিয়ে লোক পাঠাই।"

"যা-হয় করুন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।"

এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দরজার কাছে এসে দরজাটা খুলে ফেললাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আলী মিঞাকে ডেকে ব'লে গেলাম, "আলী মিঞা! বড় বাবুকে লিখে দেবেন তিনি যেন পত্রপাঠ পলতা ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকেন এবং তাহ'লেই টাকাকড়ি তাঁকে নিয়মিত পাঠান হবে। জোর ক'রে লিখে দেবেন যে, তাঁর পলতা থাকা আমার একেবারেই মত নয়।"

বাড়ীর মধ্যে গিয়ে সাবিত্রীকে ডেকে বললাম, "সাবিত্রী! স্বনামধন্য "রতনসা'র জমিদারী এবার ছারখার হ'তে বসেছে।"

সমস্তই সাবিত্রীকে বললাম। সাবিত্রী চুপ ক'রে শুনছিল, কোনও কথা কয়নি।

পরের দিন সন্ধ্যার পরে আমাদের পুকুরের উত্তর পাড়ের ঘাটের উপর বসেছিলাম, সাবিত্রীও ছিল আমার কাছে। একটু চুপ ক'রে থেকে সাবিত্রীই শুধালে, "শেষ পর্যন্ত কি হ'ল?"

শুধালাম, "কোন বিষয় সাবি ?"

জিজ্ঞাসা করলে, "বড়দাদাকে টাকা পাঠাবার বিষয় ?"

বললাম, "জানি না। আর কোনও খবর নিই নাই। ও-কথা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোর না সাবি। ও-কথার মধ্যে আমি একেবারেই থাকতে চাই না।"

সাবিত্রী যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় একটু কেশে আলী মিঞা ঘাটের কাছে এগিয়ে এলেন। সাবিত্রী আলী মিঞাকে দেখে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

আলী মিঞা বাঁধান ঘাটের উপর বসে বললেন, "বাবু! কিছুই ফল হ'ল না। পলতায় পাঠিয়েছিলাম ঘোষাল মশাইকে। তিনি পলতা থেকে ফিরে এসেছেন বড় বাবুর চিঠি নিয়ে। টাকা তিনি অবশ্য নিয়েছেন, কিন্তু লিখেছেন তিনি আমাদের অনুগ্রহের উপর হাত তোলা হ'য়ে কিছুতেই থাকবেন না। তিনি নবীন মুন্সীকে তাঁর অংশের ম্যানেজারী দেবেন।"

আলী মিঞার গলা শুনে একটু অবাক হ'লাম। আলী মিঞার গলা স্বভাবত গম্ভীর, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে যেন একটু অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর ব'লে মনে হ'ল।

শুধালাম, "আর কি লিখেছেন বড় বাবু ?"

বললেন, "অনেক কথা। সে সব শোনার আপনার কোনও প্রয়োজন নেই।"

আলী মিঞার কথার মধ্যে শুধু একটা অস্বাভাবিক রকমের গাম্ভীর্যই প্রকাশ পাচ্ছিল না, একটা অস্বাভাবিক রকমের জোরও ফুটে বেরুচ্ছিল। এই সহজ সরল একনিষ্ঠ মানুষটির জোরালো কথার মধ্যে যেন প্রাণের একটা অবলম্বন পেলাম বলে ব'লে মনে হ'ল।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ চাপ ব'সে থাকার পর আমি প্রশ্ন করলাম, "তা এখন কি করবেন ঠিক করেছেন ?"

আলী মিঞা বললেন, "কি জানি বাবু! আকাশ পাতাল ভাবছি, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কি এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না বাবু। আপনার পিতাঠাকুরের পায়ের তলায় ব'সে আমি জমিদারীর কাজ শিখেছি, তিনি হাতে ধরে শিখিয়েছেন আমাকে সব। আমি বেঁচে থাকতে সেই জমিদারী ছারখার হবে—এ আমার কিছুতেই সইবে না।"

কেন জানি না আলী মিঞার কথাগুলোয় আমার বুকের ভিতরটা কেমন দুলে উঠল, চোখে জল আসতে চায়।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ চাপ। হঠাৎ আলী মিঞা প্রশ্ন করলেন, "বাবু! এক কাজ করব? বড় বাবুর মাথা খারাপ হয়েছে। বড় বাবুকে জোর ক'রে পল্‌তা থেকে ধ'রে নিয়ে আসব মাধবপুরে? আমার হাতে লোক আছে। আমি তা পারি।"

বললাম, "তাতে কি লাভ হবে আলী মিঞা? তা কি সম্ভব? জোর ক'রে ত তাঁকে এখানে ধ'রে রাখা যাবে না।"

আলী মিঞা কোনও উত্তর দিলেন না চুপ ক'রেই বসে রইলেন।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কাতর ভাবে বললাম, "আলী মিঞা! আমি বড় ক্লান্ত—আমি আর পারি না। সবই ত বুঝতে পারছেন, যা করবার হয় আপনি করুন। রইল 'রতনসা'র জমিদারী রইলেন আপনি—আমাকে ছুটি দিন। কেবল একটা অনুরোধ—।"

চুপ করলাম। আলী মিঞা কোনও কথা না ব'লে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরে বললাম, "যেমন ক'রে পারেন গনুকে আমার কাছে এনে দিন। আর আমার কিছুই বলবার নেই।"

আলী মিঞা বসেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। আমার কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহে হাত রাখলেন আমার কাঁধের উপরে। শান্ত-গম্ভীর গলায় ধীরে ধীরে বললেন, "বাবু! আমি সবই বুঝতে পারছি। ভাববেন না, যেমন ক'রে পারি বর্তমান অবস্থার বিহিত আমি করবই। তাতে যদি আমার প্রাণ দিতে হয় সেও স্বীকার। তিন দিনের মধ্যে খোকাবাবুকে আমি আপনার কাছে ফিরিয়ে এনে দেব, এই কথা আমি আপনার কাছে শপথ ক'রে বলছি।"

চোখের জল কিছুতেই সামলান গেল না, ঘাট ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলাম।

* * *

পরের দিন সকাল থেকে মনটার মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম।—ঠিক যে কি রকম মনোভাব, বোঝান কঠিন। আলী মিঞাকে আমি বিলক্ষণ চিনতাম। তিনি যে চুপ ক'রে বসে থাকবেন না, কিছু একটা বিহিত করবার চেষ্টা করবেন—সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই ছিল না।—কিন্তু কি যে করবেন, অনেক ভেবেও কিছুই বুঝতে পারিনি। অথচ এমনই অদ্ভুত আমার মনোভাব সে সময় হয়েছিল যে, আলী মিঞাকে প্র

সব বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে বা এ সব ব্যাপার নিয়ে আলী মিঞার সঙ্গে আর কোন আলোচনা করতে মোটেই প্রবৃত্তি হয়নি। এমন কি দিন দুই বাড়ীর ভিতর হ'তে বৈঠকখানা বাড়ীতে গেলামই না একেবারে, পাছে আলী মিঞার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। আলী মিঞার সঙ্গে কথা হওয়ার পরের দিন সকালে চাকরটা এসে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, "বাবু! বার-বাড়ীতে যাবেন না একবার—আলী মিঞা ডাকছেন।" বলেছিলাম, "না" অথচ কি যে হবে একটা অনিশ্চয়তার উত্তেজনায় প্রাণটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনকে বুঝিয়ে-ছিলাম, বর্ত্তমান অবস্থা ত চলতে পারে না, কিছু একটা হওয়া দরকার। আলী মিঞা যখন ভার নিয়েছেন, কিছু একটা তিনি করবেনই। যা হয় করুন, আমি সে দিকে ফিরেও চাইব না—কি দরকার আমার। তবে, গনুকে একবার ফিরে পেলে চলে যাব দূর বিদেশে তাকে আর সাবিত্রীকে নিয়ে। রেখে যাব পিছনটা সম্পূর্ণ আলী মিঞার হাতে।

সাবিত্রীকেও এ সব কথা কিছুই বলিনি। কেমন যেন এ সব কথা নিয়ে করে সঙ্গে কোনও আলোচনা করতে আমার ভালই লাগছিল না। নিজের মনে বাড়ীর মধ্যেই চুপ চাপ শুয়ে ব'সে প্রায় দুটো দিন কাটিয়ে দিলাম—বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও যোগই যেন চাইছিল না আমার মন।

সাবিত্রী নিশ্চয়ই আমার এই অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু সেও কোনও কথা আমাকে শুধায়নি, নিজের মনেই চুপ চাপ ছিল। কেবল দ্বিতীয় দিন বিকেল বেলা আমি যখন আমার শোবার ঘরে বিছানার উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে একটা বই পড়বার চেষ্টা করছিলাম, সেই সময় সাবিত্রী ঘরে এল।

বললে, "যাও না একবার নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে এস না। বিকেল বেলা এ রকম চুপ চাপ ঘরের মধ্যে শুয়ে আছ কেন?"

উঠে বসলাম। বললাম, "ভাল লাগছে না—আলস্য আসছে।"

সাবিত্রী বসল খাটের উপরে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে; "কি হয়েছে তোমার সব খুলে বল আমাকে। লুকিও না।"

বললাম, "সত্যি সাবি, বিশ্বাস করো, ভেবে দেখতে গেলে কিছুই হয়নি, তবুও মনটা মোটেই ভাল লাগছে না। কারণ আমি নিজেই যা জানি না তা তোমায় কি বলব।"

সাবিত্রী বললে, "পরশু দিন সন্ধ্যাবেলা আলী মিঞার সঙ্গে তোমার কি কথা হলো, কিছুই ত বলনি আমাকে?"

বললাম, "বিশেষ কোনও কথাই হয়নি। বর্তমান অবস্থার বিহিত করবার ভার আমি সম্পূর্ণ আলী মিঞার হাতে তুলে দিয়েছি।"

শুধাল, "তিনি কি বিহিত করবেন?"

বললাম, "জানি না, জানতে চাইও না।"

"তার মানে কি?"—কথা কয়টী ব'লে সাবিত্রী নিজের মনে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর বললে, "যাও, খানিকটা নদীর ধারে বেড়িয়ে এস।"

কোন প্রতিবাদ না ক'রে উঠে দাঁড়ালাম। আলনা থেকে একটা চাদর গায়ে দিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম! নদীর ধারে গিয়ে নিজের মনে পায়চারী করলাম খানিকক্ষণ। দেখলাম আমাদেরই ঘাটে একখানা পান্সী নৌকা বাঁধা রয়েছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ ভাল লাগল না, ফিরে এলাম বাড়ীতে। বাড়ীর মধ্যে না গিয়ে পুকুরের উত্তর পাড়ের ঘাটের উপর বসে পড়লাম। হঠাৎ চেয়ে দেখি সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে আলী মিঞা আসছেন ঘাটের দিকে। বুঝলাম—আমারই সন্ধানে।

উঠে যাইনি, ঘাটের উপরেই বসে রইলাম। আলী মিঞা ঘাটে এসে বললেন, "বাবু আমি এখুনিই পলতায় রওনা হচ্ছি। ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। খোকাবাবুকে নিয়ে আসব। কাউকে বলুন খোকাবাবুর জন্ত একটা বিছানা নৌকায় দিতে।

শুধু শুধালাম, "কখন ফিরে আসবেন?"

বললেন, "কাল সকালের আগেই ফিরে আসা উচিত। পল্‌তায় যেতে আসতে ত বেশীক্ষণ লাগে না।"

চাকরটাকে ডাকলাম। একজনার মত চাদর, তোষক, বালিশ, মশারী গুছিয়ে বাইরে নিয়ে আসতে বললাম। চাকরটা ভিতরে চলে গেল।

আলী মিঞা বললেন, "বাবু! আর একটা কথা। দাস মশাইয়ের কাছে শুনলাম খোকাবাবুকে আনতে হ'লে হয় ত একটু জোর-জবরদস্তি করার প্রয়োজন হবে। তাই তিনজন জোয়ালো বিশ্বাসী লোক সঙ্গে নিচ্ছি। এরা আপনারই প্রজা।—তাই আপনার কাছ থেকে তাদের একটু ভরসা পাওয়া দরকার।"

এই কথা কয়টি ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট বার ক'রে আমার হাতে দিয়ে আবার বললেন, "এই টাকাটা

আপনি রাখুন। সেই লোক তিনটিকে আমি একবার এখানে ডাকি, তারা বার-বাড়ীতেই প্রস্তুত হ'য়ে বসে আছে। আপনি তাদের একটু ভরসা দিয়ে এই টাকাটা নিজের হাতে তাদের দিন। তাহ'লেই তাদের মনে আর কোন দ্বিধা থাকবে না।"

আলী মিঞার কথার ধরণে বুঝলাম তিনি এসব বিষয় আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে কিম্বা আমার অনুমতি নিতে আমার কাছে আসেননি। তাঁর মতে যা করা উচিত তার সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি নিজেই করেছেন এবং তাঁর বন্দোবস্ত আমাকে দিয়ে যেটুকু কাজ করাবার দরকার, সেইটুকুর জন্যে এসেছেন একবার মাধবপুরে আমাদের বাড়ীতে—পল্‌তা রওয়ানা হওয়ার আগে।

একবার ইচ্ছা হ'ল শুধাই যে দাদার বিষয় কি ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু কেমন প্রবৃত্তি হ'ল না। শুধু বললাম, "বেশ, ডাকুন তাদের।"

আলী মিঞা নিজেই বললেন, "আর বড় বাবুর সঙ্গেও একটা স্পষ্ট কথা ব'লে একটা বোঝাপড়া ক'রে আসব।—তাতে যদি কাল সকালের মধ্যে এসে পৌছতে না পারি ত ভাববেন না। এখন ডাকি তাদের।"

এই ব'লে চ'লে গেলেন। আলী মিঞা চ'লে যেতে না যেতেই সাবিত্রী এল ঘাটে।—এসেই একটু উত্তেজিত স্বরে আমাকে শুধাল, "বিছানা চেয়ে পাঠিয়েছ কেন? আলী মিঞা কি বলছিলেন?"

বললাম, "সব কথাই একটু পরে তোমাকে বলব। আলী মিঞা এখুনিই এখানে আবার আসবেন। তুমি এখন একটু ভিতরে যাও।"

সাবিত্রী একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল; একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার পানে। পরে বললে, "না। আমি এখনই সব শুনতে চাই। এসব কি ব্যাপার? সব খুলে বল আমাকে।"

এমন সময় একটু দূরে অস্পষ্ট অন্ধকারে আলী মিঞাকে দেখতে পেলাম সঙ্গে তিনজন লোক। সাবিত্রীও সেই দিকে চেয়ে দেখলে। তাড়াতাড়ি বললাম, "ঐ আলী মিঞা এসে পড়েছেন, তুমি এখন ভিতরে যাও—লক্ষীটি।"

সাবিত্রী কোনও কথা না ব'লে একটু দূরে সরে গিয়ে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাটের উপরেই বসল; ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে—সে এখন যাবে না, শুনবে সে সব কথা।

আলী মিঞা বার দুই কেশে এগিয়ে এলেন। লোক তিনটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। সাবিত্রীর দিকে চেয়ে আমাকে বললেন, "দুএকটা গোপনীয় কথা ছিল আপনার সঙ্গে।"

আমিও একবার সাবিত্রীর দিকে চাইলাম, কিন্তু সাবিত্রীর উঠে যাওয়ার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। মনে মনে একটু বিরক্ত হ'য়ে আলী মিঞাকে বললাম, "তা বলুন না।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে আলী মিঞা বললেন, "ডাকব ওদের এখানে ?"

বললাম, "ডাকুন।"

আলী মিঞা লোক তিনটিকে ডেকে আনলেন। লোক তিনটির চেহারা আমি সে সময় মোটেই ভাল ক'রে লক্ষ্য করিনি। লোক তিনটি নত হ'য়ে আমাকে প্রণাম জানালে।

আলী মিঞা তাদের উদ্দেশ ক'রে বললেন, "এই নাও নফর, বাবু তোমাদের আপাততঃ ৫০৲ টাকা বখশিষ দিচ্ছেন। এ বাবুরই কাজ। পরে আরও বখশিষ পাবে।"

আমি টাকা কয়টি নফরের হাতে তুলে দিলাম। নফর আর একবার লম্বা সেলাম ক'রে বলল, "হুজুরের যখন ইচ্ছে, আমরা জান দিয়ে হুজুরের কাজ উদ্ধার ক'রে দেব।"

আলী মিঞা একবার আমার দিকে চাইলেন—যেন এইবার আমার কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু আমার কোনও কথা বলার ইচ্ছা একেবারেই হ'ল না। একটু পরে আলী মিঞা বললেন, "আচ্ছা, আমরা তাহ'লে এখন রওনা হই বাবু। চল নফর, চল তোমরা। কই বিছানাটা ত এখনও আনল না। আচ্ছা নফর তোমরা এগোও নৌকার দিকে, আমি আসছি।"

এই ব'লে আলী মিঞা অন্দরের দিকে দু-পা এগুতেই বংশী বিছানা নিয়ে বেরিয়ে এল। বংশীকে সঙ্গে নিয়ে আলী মিঞা নদীর দিকে চ'লে গেলেন।

সাবিত্রী এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিল। আলী মিঞা চ'লে গেলে উঠে এল। আমার কাছে এসে সোজা আমার দিকে চেয়ে শুধাল, "এ সবের অর্থ কি ?"

বললাম, "জানি না। এখন আমি কিছু বলতে পারছি না। পরে সব বলব।"

সাবিত্রী খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে ধীর পদক্ষেপে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেল। সাবিত্রীর সে চাহনির মধ্যে রাগ না দুঃখ, অভিমান না ঘৃণা, কি যে প্রকাশ পেয়েছিল অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি।

* * * *

সমস্ত সন্ধ্যেটা মোটের উপর একটা অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছিলাম। সাবিত্রীও আমার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে একটু দূরেই রেখেছিল—বিশেষ

কোনও কথাবার্তা হয়নি তার সঙ্গে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম ভাল হয়নি, মাঝে মাঝে কি রকম আচম্‌কা ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল—স্পষ্ট মনে আছে।

ভোর হ'তে না হতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। তখন সমস্ত বাড়ী ঘুমন্ত। খানিকক্ষণ বারান্দায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কে একদৃষ্টে চেয়েছিলাম দূরের পানে—একটা অবসাদভরা প্রাণ নিয়ে। হঠাৎ টের পেলাম আমাদের অন্দরের উঠানের দরজায় কে যেন জোরে জোরে করাঘাত করছে।

চম্‌কে উঠলাম। মনে হ'ল হয়ত গন্নুকে নিয়ে আলী মিঞা ফিরে এসেছেন। দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। উঠান পেরিয়ে দরজাটা ফেললাম খুলে।

আলী মিঞাই বটে। উস্ক-খুস্ক চুল, চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল—যেন এক রকম অস্বাভাবিক চাহনি। কোলে গন্নু—আলী মিঞার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে আছে, একটা সাদা চাদর দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা।

হাত বাড়িয়ে গন্নুকে কোলে তুলে নিতে নিতে আলী মিঞাকে শুধালাম, "আপনার এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? সমস্ত রাত ঘুমুতে পারেননি বুঝি?"

আলী মিঞা কোনও জবাব দিলেন না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। গন্নু আমার কোলে আসতে আসতে একবার শুধু চোখ মেলে আমার পানে চেয়ে মাথা এলিয়ে রাখল আমার কাঁধের উপরে। গন্নুকে কোলে নিয়েই বুঝলাম গন্নুর গা পুড়ে যাচ্ছে। বললাম, "একি? গন্নুর গা এত গরম কেন?"

কাঁধে মাথা রেখে গন্নুই বললে, "আমার জ-জ্বর হয়েছে যে। কাল থেকে ভা—ভাত খাইনি।"

আলী মিঞাকে বললাম, "আপনি এখন বাড়ী যান, একটু ঘুমিয়ে নিন গিয়ে। বিকেলে কথাবার্তা হবে।"

আলী মিঞা বললেন, "বাবু। আপনার সঙ্গে আমার আর বোধ হয় দেখা হবে না।"

তাড়াতাড়ি শুধালাম, "কেন? কেন?"

আলী মিঞা একটু থেমে থেমে বললেন, "একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটেছে। বড় বাবু আর নাই। বিশ্বাস করুন, ঠিক এ উদ্দেশ্য আমার ছিল না। যাই হোক, আমি বোধ হয় কিছুতেই রক্ষা পাব না।"

বজ্রাহতের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরে আলী মিঞা বললেন, "বেশী কথা আমি বলতে পারছি না। একটা অনুরোধ রইল—ভগতীতে সব যেন না খেতে পেয়ে মারা না যায়।"

গ্রেপ্তার হ'লাম তার পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। আগের দিনই থানা থেকে ঝি-চাকরদের সব ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, বংশী চাকরটাকে আটকে রেখেছিল—ফিরে আসেনি।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আমার শোবার ঘরের খাটের উপর বসে আছি, গন্থ পাশে শুয়ে আছে—তার তখন প্রায় ১০৩ ডিগ্রী জ্বর। সে এক একবার আমার দিকে কাতর ভাবে চেয়ে, "বাবা! একটু জ—জল খাব" ব'লে আবার চোখ বুজে চুপ ক'রে এলিয়ে পড়ছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না।

হঠাৎ একটা চাকর ঝড়ের মতন ছুটে এসে হাউ মাউ ক'রে কতকগুলো কথা ব'লে গেল। বুঝলাম, পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করেছে, স্বয়ং ইন্‌স্পেক্টর বাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

চাকরটার চীৎকারে গন্থ চোখ মেলে চাইলে। কি বুঝেছিল জানি না, কাতর ভাবে আমার দিকে চেয়ে বললে, "তুমি যে-যেওনা বাবা।" চাকরটাকে বললাম, "ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে উপরে ডেকে নিয়ে এস।"

ইন্‌স্পেক্টর বাবু এল, সঙ্গে আরও দু'চারজন পুলিশের লোক। তারা ঘরের মধ্যে।

আমি শুধালাম, "কী চাই আপনাদের ?

ইন্‌স্পেক্টর বললেন, "আপনি কি সুশান্ত সাহা চৌধুরী ?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

বললেন, "আপনার দাদার খুনের অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি—মাপ করবেন।"

"আমাকে ?" ব'লে একটু আশ্চর্য হ'য়ে চাইলাম। পরে বললাম, "তা আমাকে কি করতে হবে ?"

"থানায় যেতে হবে।"

"কখন ?"

"এখুনিই।"

"এখুনিই ?"

"এখুনিই—পরে জামিন পান, ফিরে আসবেন।"

শুধালাম, "ছেলেটার বড্ড জ্বর দু'চার দিন পরে গেলে হয় না ?"

বললেন, "কি করব বলুন—আপনাকে রেখে যাওয়ার অধিকার আমাদের নাই। আপনার নামে পরওয়ানা আছে—চলুন।"

কাতরভাবে একবার গনুর দিকে চাইলাম।

সাবিত্রী—কোথায় ছিল জানি না, ধীর পদক্ষেপে এল ঘরে। বসল গিয়ে খাটে, গনুর পাশে, সস্নেহে হাত রাখল গনুর কপালে।

আমার দিকে চেয়ে বললে, "ভেব না—গনু আমার কাছে রইল।"

চললাম পুলিশের সঙ্গে। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই কানে এল গনুর কণ্ঠস্বর, "বাবাকে কো-কো-কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?"

## দুই

দায়রা আদালতে বিচার সুরু হ'ল বেলা এগারটা আন্দাজ। আদালত গৃহ এবং পার্শ্বস্থিত বারান্দা, যতদূর দেখা যায়, জনতায় ভরা—যেন দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসেছে আমার বিচার দেখবার জন্য। আমি কারও দিকে চাইনি চাইবার প্রবৃত্তিও হয়নি। স্তব্ধ হ'য়ে মাথা নীচু ক'রে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম, সঙ্গে ছিল আরও দু'জন—আলী মিঞা ও নফর। আরও দু'জন লোক আসামী শ্রেণীভুক্ত ছিল—মদন সেখ ও গোলাপ মণ্ডল। তার মধ্যে মদন সেখ সুরু থেকেই পলাতক, তাকে পুলিশে ধরতে পারেনি এবং গোলাপ মণ্ডলকে আমাদের মধ্য হ'তে আলাদা করে ভিন্ন স্থানে রাখা হয়েছিল, কেননা সরকার পক্ষ থেকে তাকে করা হয়েছিল রাজ-সাক্ষী অর্থাৎ approver.

সম্মুখে উচ্চমঞ্চে জজ সাহেবের বসবার আসন, এবং তাঁর সামনে কিঞ্চিৎ নীচুতে আমাদের দিকে পিছন ফিরে সারি সারি চেয়ারে বসেছিলেন উভয় পক্ষের উকিলরা—কেবল তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্ট থেকে আগত ব্যারিষ্টার। বিশেষ ক'রে এই মোকদ্দমায় আসামী পক্ষ সমর্থন করার জন্য হরিশ তাঁকে কলকাতা থেকে খুলনায় নিয়ে এসেছে—নাম শুনেছিলাম মিঃ নাগ। শুনেছিলাম তিনি নাকি কলকাতা হাইকোর্টের একজন নামজাদা কৌশুলী—ফৌজদারি মোকদ্দমায় তাঁর বহুদর্শিতা এবং

বিচক্ষণতার খ্যাতি নাকি ছিল দেশবিখ্যাত। আদালত গৃহে জজ সাহেব প্রবেশ করবার আগে হরিশ তাঁকে আমার কাছে একবার নিয়ে এসেছিল এবং দু'একটা কথার পর তিনি আমাকে বলেছিলেন, "বিচারের ফলাফল আমার হাতে নয়, তবে আমরা আপনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ভগবান নিতান্ত বিমুখ না হ'লে এ মোকদ্দমায় আপনার কিছুই হবে না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

লোকটির প্রবীণ সৌম্য চেহারার দিকে চেয়ে এবং তাঁর সঙ্গে দুএকটি কথা ব'লেই তাঁর উপর আমার কেমন যেন একটা বিশ্বাস হয়েছিল, সে কথা স্পষ্ট মনে আছে। তাঁর প্রশস্ত ললাটের নীচে বুদ্ধিদীপ্ত আঁখি দুটি, সমুন্নত নাসিকা, দেহের নাতিস্থূল সুদীর্ঘ গড়নের পারিপাট্য, কথা বলার ভঙ্গিমার বিশেষত্ব—সমস্ত মিলিয়ে এমনই একটা আত্মশক্তির আভাস পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে যে, মন তাঁর উপর নির্ভর ক'রে যেন নিশ্চিন্ত হয়। তাই তাঁর দু'-একটি কথায়ই মন অনায়সে আশ্বস্ত হয়েছিল, বিনা দ্বিধায়। একটা ভরসায় মন ভরপুর হয়ে উঠেছিল—হয় ত আমরা মুক্তিই পাব, কিছুই হবেনা মোকদ্দমায়।

হরিশকে ডেকে চুপি চুপি বলেছিলাম, "লোকটি ত চমৎকার। এঁর পারিশ্রমিক কত ঠিক হয়েছে?"

হরিশ বলেছিল, "অনেক সুপারিশ ধরে খুব সুবিধায়ই বন্দোবস্ত করেছি। ২৫০৲ টাকা ক'রে রোজ দিতে হবে এঁকে। মিঃ নাগ আজকাল রোজ ৫১০৲ টাকার কমে কিছুতেই কাজ নিতে চান না।"

শুধালাম, "সুপারিশ? কী সুপারিশ জোগাড় করলে?"

হরিশ বলল, "তোমার বন্ধু কাশীর ডাক্তার ললিতকে মনে পড়ে ত? তাঁর বোন, যাকে তুমি 'সুলোচনা দিদি' বল, তাঁরই আপন ননদ হচ্ছেন মিঃ নাগের স্ত্রী। তোমার সুলোচনা দিদি নিজে কলকাতায় এসে মিঃ নাগকে অনুরোধ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অবাক হ'লাম। সুলোচনা দিদি—এসব জানেন।

হরিশকে সুধালাম, "তুমি তাঁর সন্ধান পেলে কি ক'রে?"

হরিশ বলল, "আমি তাঁর সন্ধান করিনি, তিনিই আমাকে খুঁজে বার করেছেন। তোমার এ মোকদ্দমায় যখন কলকাতার জামিনের দরখস্ত করি, তখন সব কথাই সে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। সে সব অনেক কথা, বিস্তারিত পরে বলব। কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে তোমার এই সুলোচনা দিদি। তোমার আপন বোন থাকলেও তোমাকে এত বেশী ভালবাসত কিনা সন্দেহ।"

সেই সুলোচনা দিদি!—মনটা হঠাৎ কেমন যেন দুলে উঠল।

জজ সাহেব আদালত গৃহে ঢুকলেন, বসলেন উচ্চমঞ্চের উপরে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

উভয় পক্ষের উকীল ব্যারিষ্টারের সঙ্গে দু'একটি কথাবার্তার পর জজ সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে জজ সাহেবের পেস্কার আমাদের একে একে প্রশ্ন করতে লাগল। আমকে শুধাল যে, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ অর্থাৎ আমি, আলী মিঞা প্রভৃতি সকলে আমার ভাই প্রশান্ত সাহা চৌধুরীর খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আমি তাতে লিপ্ত না নির্দোষী?

আমি বলেছিলাম, "আমি নির্দোষী, বিচার চাই।" আমার পর আলী মিঞা, তারপর নফর, সকলকেই একে একে প্রশ্ন করা হ'ল, সবাই বলেছিল "নির্দোষী—বিচার চাই।" তবে যতদূর মনে পড়ে তাদের বিরুদ্ধে শুধু ষড়যন্ত্রেরই নয়, খুনের অভিযোগও ছিল।

জুরী বাছাই হ'ল। সাত জন জুরী জজ সাহেবের বাম পার্শ্বে উচ্চমঞ্চের একাধারে গিয়ে বসলেন। জজ সাহেবের নির্দেশ মত একজনকে তাঁরা ঠিক ক'রে নিলেন নিজেদের foreman. অর্থাৎ—অগ্রদূত। লোকটি বৃদ্ধ, মাথার প্রকাণ্ড টাকের চারি পার্শ্বে পাতলা পাতলা পাকা চুল, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, গৌরবর্ণ গায়ের রং এবং মুখের ভঙ্গীতে একটা সহৃদয়তা, একটা দাক্ষিণ্যের আভাস বেশ স্পষ্টই ফুটে বেরুচ্ছিল। শুনেছিলাম, লোকটি নাকি কোন এক গ্রাম্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অনেকবার জুরী হ'য়ে বিচারাসনে বসেছেন এবং সহজে নাকি আসামীকে দোষী বলার পক্ষপাতী তিনি নন। একবার হরিশ এসে চুপি চুপি আমাকে ব'লে গেল "জুরী বাছাই ভাল হয়েছে। তিনজন ত আমার বিশেষ চেনা এবং লোকও ভালো। ফোরম্যানটি ত নাম করা ভাল লোক।"

জুরীরা সব একসঙ্গে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ অনুসারে ন্যায্য বিচার ক'রে যথাযথ রায় দেওয়ার হলপ নিয়ে নিজ নিজ স্থান দখল ক'রে বসার পর আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জুরীদের শুনিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর বিপক্ষের বৃদ্ধ উকীল উঠে দাঁড়িয়ে সরকার পক্ষের মোকদ্দমার বিষয় জুরীদের বলতে সুরু করলেন। আইনের যে সব ধারায় আমরা অভিযুক্ত, সেই ধারাগুলি জুরীদের কাছে যথোচিত ব্যাখ্যা ক'রে সরকার পক্ষের মোকদ্দমার কাহিনীটি বিস্তারিত ক'রে জুরীদের দিলেন বুঝিয়ে। মোটামুটি তাঁর বক্তব্যটি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি। সরকারী উকীলের কথা অনুসারে—

আমি সুশান্ত, আমি অতিশয় পাষণ্ড ও দুশ্চরিত্র লোক। সতী-সাধ্বী

রূপবতী আমার স্ত্রী—তাঁর চরিত্রে অযথা সন্দেহ করা এবং তার উপর নির্মম অত্যাচার করা আমার চিরদিনের স্বভাব। আমার দাদা স্বর্গীয় প্রশান্তচন্দ্র সাহা চৌধুরী ছিলেন অতিশয় মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি চিরদিনই আমার অযথা অত্যাচারের হাত থেকে আমার স্ত্রীকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন এবং তাই আমি তাঁর উপরও হ'য়ে উঠেছিলাম বিরূপ। ক্রমে, আমি আমার দাদা ও আমার স্ত্রী—উভয়ের নির্মল মধুর সম্পর্কটিও অত্যন্ত কলুষিত সন্দেহের চক্ষে দেখতে সুরু করলাম। এই নিয়ে স্ত্রীকে নানানভাবে নির্যাতন করতে এতটুকুও দ্বিধা করিনি। শুধু তাই নয়, এতবড় দুর্বৃত্ত আমি যে, একটি কুল-ত্যাগিনী বিধবাকে বাড়ীতে নিয়ে এসে আশ্রয় দিয়ে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত স্পষ্ট অগ্রাহ্য ক'রে, সকলের সম্মুখে সেই বিধবাটির সঙ্গে একটা দূষিত, ঘৃণ্য সম্পর্কে জীবন যাপন করতে সুরু করেছিলাম—আমাদেরই সেই মাধবপুরের বাড়ীতে। —এতবড় অপমান, আমার এই অমানুষিক দুর্ব্যবহার সবই আমার সাধ্বী-স্ত্রী নীরবে সহ্য ক'রে সংসারের একপাশে কোনও রকমে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ক্রমে সেই বিধবাটির অত্যাচার তাঁর পক্ষে হয়ে উঠল অসহ্য। তখন আমার দাদা সমস্ত অবস্থা বুঝে, সেই বিধবাটির অত্যাচারের হাত থেকে আমার স্ত্রীকে একটু শান্তি দেবার জন্য, ব্যবস্থা ক'রে তাঁকে তার বাপের বাড়ী পল্তায় পাঠিয়ে দেন এবং নিজেও মনোকষ্টে ঘৃণায় দেশের বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বসবাস সুরু করেন। আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে অভিভাবক কেহ ছিল না। আমার স্ত্রীর মাতা রোগে শয্যাশায়ী ও পঙ্গু। তাই আমার দাদা আমার স্ত্রীর ও বালক পুত্রটির তত্ত্বাবধানের জন্য মাঝে মাঝে পল্তায় গিয়ে তাদের দেখাশুনা ক'রে আসতেন। আমার ছেলেটি নাকি ছিল আমার দাদার নয়নের মণি। নিজের সংসার ছিল না, পুত্র-কন্যা ছিল না, তাই আমার এই পুত্রটিকে প্রাণের সমস্ত ভালবাসা ও স্নেহ দিয়ে জীবনের একমাত্র সম্বল বলে আমার দাদা আঁকড়ে ধরেছিলেন—এবং সেজন্যও মাঝে মাঝে তার মুখখানা দেখবার জন্য তিনি ছুটে যেতেন পল্তায়।

সরকারী উকীল আর বললেন যে, যদিও আমি বিনা বাধায় মাধবপুরের বাড়ীতে সেই বিধবাটির সঙ্গে পরম সুখে বসবাস করছিলাম, কিন্তু তবুও এত নীচ, এত কলুষিত আমার মন যে, আমার দাদার মাঝে মাঝে পল্তায় গিয়ে আমার স্ত্রী-পুত্রের তত্ত্বাবধান করা পর্যন্ত আমার পক্ষে হ'ল অসহ্য—ক্রোধে আত্মহারা হলাম। জমিদারী, টাকাকড়ি সবই ছিল আমার হাতে, তাই দাদার মাসোহারা বন্ধ ক'রে তাঁকে হুকুম ক'রে পাঠালাম—তিনি যেন পল্তামুখো

আর না হন। আসামী আলী মিঞা ছিলেন আমার এবং দাদার উত্তরপক্ষের জমিদারীর ম্যানেজার কিন্তু বিশেষ ক'রে আমারই হাতের লোক, আমারই অনুগত। দাদা যখন নিরুপায় হ'য়ে টাকার জন্ত আলীমিঞাকে পত্রের পর পত্র দিয়েও আলী মিঞার কাছ থেকে টাকাকড়ি পেলেন না, তখন বাধ্য হ'য়ে ছ-আনির ম্যানেজার নবীন মুন্সীকে নিজ তরফের তহশীলের জন্ত আমমোক্তার-নামা দেওয়ার বন্দোবস্ত করছিলেন। তখন কোনও দিক দিয়ে দাদাকে সংযত করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলাম আমি ও আলীমিঞা এবং সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই আলী মিঞা তিনজন গুণ্ডা নিয়ে পলতায় রওনা হলেন একদিন সন্ধ্যার পরে। পলতায় আমার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত এগারটা হ'ল। পলতায় আমার শ্বশুরবাড়ীটি বিশেষ বড় নয়—নদীর খুব নিকটেই। তবে বাড়ীটা পাকা, তিনখানি ঘর ও সম্মুখে একটি লম্বা টানা বারন্দা, খোলা নয়, ঘর হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তার সম্মুখে একটি রোয়াক। দাদা মাঝে মাঝে যে সময় পলতায় যেতেন এই সামনের টানা বারান্দাটির একপাশে একখানা তক্তাপোষের উপর শুতেন এবং রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করা ছিল তাঁর নিত্য অভ্যাস।

সরকার পক্ষের কথানুযায়ী ঘটনার দিন রাত্রেও রাত এগারটা আন্দাজ দাদা সদর দরজা বন্ধ ক'রে বারান্দার বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন এবং আমার স্ত্রী একটা ঘরে জ্বরে রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে তার মার সঙ্গে একই বিছানায় একটু তন্দ্রার ঘোরে ছিল শুয়ে, এমন সময় সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। দাদা শুয়ে শুয়ে শুধালেন, "কে?" আলী মিঞা নিজের পরিচয় দিয়ে দাদাকে ডাকলেন। দাদা এত রাত্রে আলী মিঞার গলা শুনে বোধ হয় একটু আশ্চর্য হ'য়ে উঠে এসে সদর দরজা খুলে ফেলে বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়াতেই নফর তার মাথায় জোরে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিল। দাদা চীৎকার ক'রে সেইখানেই রক্তাক্ত শরীরে রোয়াকের উপর গেলেন পড়ে। আলী মিঞা প্রভৃতি লোকগুলি সময় নষ্ট না ক'রে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় অসুস্থ ছেলেটিকে মার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নৌকায় ফিরে এসে তৎক্ষণাৎ নৌকা দিল খুলে।

ঘটনার বিবরণ মোটামুটি এই কথাগুলি ব'লে বৃদ্ধ সরকারী উকীলটি পুলিশের অসাধারণ নিপুণ তদন্তের ফলে কেমন ক'রে এই মোকদ্দমাটির সত্য রহস্য প্রকাশ হয়েছে, কেমন ক'রে আসামীরা একে একে গ্রেপ্তার হ'ল ইত্যাদি

সবই সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হ'লে যদিও আমি কারও দিকে চাইনি, তবুও মনে হ'ল গুরু আদালত গৃহের হাজার দৃষ্টিবাণের বিদ্ধ বিঁধে আমার দেহ-মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে আসছে—কাঠগড়ায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা দায় হ'ল।

আলী মিঞা যখন আমাকে চুপি চুপি বললেন, "চমৎকার মিথ্যা মোকদ্দমা সাজিয়েছে ত এরা। বড় বাবু বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে রোয়াকে বসে কথাবার্তাই ত বলেছিলেন প্রায় এক ঘণ্টা তখন এ কথা নিয়ে তার সঙ্গে কোনও আলোচনা করিনি"—একটি কথা বলারও যেন শক্তি ছিল না আমার।

সাক্ষী ডাকা হ'ল। প্রথম সাক্ষী এল গোলাপ মণ্ডল। সত্য কথা বলার হলপ নিয়ে সরকারী উকীলের প্রশ্নের উত্তরে সে সরকার পক্ষের মোকদ্দমাটি ষোল আনা সমর্থন ক'রে গেল। ব'লে গেল যে, তার বাড়ী ভগতীর পাশের গ্রামে এবং সে চিরকালই আলী মিঞার বিশেষ আশ্রিত লোক। এ খুনের ষড়যন্ত্রে তাকে প্রথম ডেকে নেয় আলী মিঞা। আলী মিঞার সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং বিশেষ ক'রে, আমি জমিদার, আমার কথা অবহেলা করার সাধ্য না থাকায় দরুণ সে এই খুনের ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে বাধ্য হ'য়েছিল। খুন হওয়ার প্রায় দিন পনেরো আগে থেকে আমাদের বাড়ীতে একটু বেশী রাত্রে আমাদের পুকুরের পুবের পাড়ের বাঁধাঘাটের উপর এই খুনের বিষয় ষড়যন্ত্র হ'ত এবং আমিও এই ষড়যন্ত্রে সব সময়ই নাকি উপস্থিত থাকতাম। খুনের দিন পাঁচেক আগে একদিন রাত্রে কি ভাবে কি করা হবে না হবে এই বিষয়ে কথাবার্তা চলেছে এমন সময় পুকুরের পাড়ের রাস্তা ধরে একটি লোক আসছে দেখা গেল। লোকটিকে দেখেই আমরা চুপ ক'রে গেলাম এবং আলী মিঞা ডেকে শুধালেন, "কে?" লোকটি "আমি" ব'লে ঘাটের উপর এল।

প্রশ্ন হ'ল, "লোকটিকে চিনতে পেরেছিলে?"

উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ছ'আনার ম্যানেজার নবীন মুন্সী।"

প্রশ্ন হ'ল, "তারপর?"

উত্তরে গোলাপ মণ্ডল ব'লে যেতে লাগল যে অত রাত্রে নবীন মুন্সী আমাদের ঘাটে উপর বসে থাকতে দেখে একটু আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনারা রাত্রে ঘাটে বসে?" আলী মিঞা নাকি উত্তর দিয়েছিলেন, "একটা জমিদারী বিবাদের শালিসী করা হচ্ছে।" নবীন মুন্সী আর বিশেষ কিছু না ব'লে চলে গেল।

তারপর গোলাপ মণ্ডল নৌকা ক'রে পল্‌তায় রওনা ইত্যাদি সরকার পক্ষের গল্পটি পুনরাবৃত্তি ক'রে গেল। তার গল্প শেষ হ'লে সরকারী উকীল আবার প্রশ্ন করলেন—"এর জন্য কিছু টাকাকড়ি পেয়েছিলেন?"

উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবু নিজের হাতে আমাদের ৫০৲ ক'রে বকশীষ দিলেন।"

প্রশ্ন হ'ল "কোথায়?"

উত্তর দিল, "বাবুর বাড়ী পুকুরের উত্তর পাড়ের ঘাটে।"

প্রশ্ন, "কখন?"

উত্তর, "যেদিন পল্‌তায় রওনা হই, সেই দিনই সন্ধ্যার সময়।"

প্রশ্ন, "সেখানে তখন কে কে ছিল?"

উত্তর, "বাবু, আলীমিঞা, আমি, নফর, মদন ও আর একটি বিধবা স্ত্রীলোক।"

প্রশ্ন, "তাঁকে তুমি চেন?"

উত্তর, "আজ্ঞে বাবুর বাড়ীতে তাঁকে দেখেছি।"

প্রশ্ন, "তিনি কি করছিলেন?"

উত্তর, "তিনি ঘাটের 'পরে একটু দূরে বসেছিলেন।"

প্রশ্ন, "বাবু টাকা দেওয়ার সময় কিছু বলেছিলেন?"

উত্তর, "বললেন—আপাততঃ এই নাও, কাজ হাসিল হ'লে এর দশগুণ টাকা দেব।"

গোলাপ মণ্ডলের বক্তব্য শেষ হ'লে আমার পক্ষের ব্যারিষ্টার জেরা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়েই প্রথম প্রশ্ন করলেন—"তুমি জীবনে কখনও কাউকে খুন করেছ?"

উত্তর, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন, "দাঙ্গা-হাঙ্গামা জীবনে করেছ কখনও?"

উত্তর, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন, "তোমাদের দেশে খুনে বা দাঙ্গাবাজ ব'লে তোমার কি কোনও রকম সুনাম বা দুর্ণাম আছে?"

উত্তর, "আজ্ঞে না?"

প্রশ্ন, "আলী মিঞার অধীনে কোন জমি রাখ?"

উত্তর, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন, "আলী মিঞার কাছে কোন টাকাকড়ি ধার?"

প্রশ্ন, "তুমি হিন্দু, আলী মিঞা মুসলমান। আলী মিঞার সঙ্গে জীবনে কোনও দিন কোনও কাজে লিপ্ত হয়েছিলে?"

উত্তর, "একসঙ্গে গিয়েছিলাম পল্‌তায়।"

প্রশ্ন, "এর আগে কোনও দিন?"

উত্তর, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন. "খুনে বা দাঙ্গাবাজ ব'লে তোমার কোনও সুনাম নাই, আলী মিঞার সঙ্গে কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই, কখনও একসঙ্গে কোনও কাজও করে নাই, হঠাৎ আলী মিঞা এত বড় খুনের ষড়যন্ত্রে তোমাকে ডেকে নিলেন এর কোনও কারণ দেখাতে পার?"

উত্তর, "আলী মিঞাই জানেন।"

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে জেরা করা হ'ল। মোটের উপর জজ সাহেবকে এবং জুরীদের বোঝাবার চেষ্টা করা হ'ল যে, মোকদ্দমার যে কাহিনী সাক্ষী তাঁদের সামনে ব'লে গেল—সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা—একটি শেখান গল্প। ছ-আনীর জমিদার মুকুন্দ সাহার সঙ্গে জমিদার সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার ও আলী মিঞার গুরুতর বিবাদ থাকার দরুণ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে এবং তার ম্যানেজার নবীন মুন্সী এই মিথ্যা মোকদ্দমাটি সাজিয়েছে। এক কথায়, আমাদের পক্ষের ব্যারিষ্টার জেরার প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, খুনের ষড়যন্ত্রের গল্পটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং আমি,—সুশান্ত—কোনও ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত ছিলাম না; আলী মিঞা লোকজন নিয়ে পল্‌তায় গিয়েছিলেন ছেলেটাকে নিয়ে আসার জন্য, কেননা ছেলেটার লেখাপড়া শেখবার বয়স হয়েছে অথচ আমার অর্থাৎ সুশান্তর বিশেষ অনুরোধ ও চেষ্টা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী কিছুতেই তাকে আমার কাছে পাঠাতে রাজী হননি। তাই আলী মিঞা দু-তিনজন লোক নিয়ে পল্‌তায় গিয়েছিলেন, একটু ভয় দেখিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসার জন্য আর কোনও উদ্দেশ্যে নয়। ঘটনার দিন রাত্রে ছেলেটাকে নিয়ে আসার সময় বড় বাবু অর্থাৎ—আমার দাদা বাধা দেওয়ার মানসে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করতে এলে,—নফর নয়, সাক্ষী গোলাপ মণ্ডলই আত্মরক্ষা করার জন্য লাঠির আঘাতে দাদাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়—আলী মিঞা বা নফরের এ ব্যাপার কোনই হাত ছিল না বা তাদের কোনও রকম প্ররোচনায় বা সম্মতিক্রমে ঘটনা ঘটে নাই।

জেরা করতে করতে এক সময় হঠাৎ আমাদের ব্যারিষ্টার সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই যে ভদ্রলোকটি সরকারী উকিলবাবুর ঠিক পিছনে চেয়ারে বসে আছেন, ওঁকে চেন ?"

উত্তর দিল, "হাঁ।"

প্রশ্ন, "কে উনি ?"

উত্তর, "উনি ছ'-আনীর জমিদার মুকুন্দবাবু।"

প্রশ্ন, "উনি এ মোকদ্দমায় সরকার পক্ষের তদ্বির করেছেন—কেমন ?"

উত্তর, "তা জানি না।"

প্রশ্ন, "দেখতেই ত পাচ্ছ সরকার পক্ষের উকীলবাবুর পিছনে বসে আছেন, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করছেন—দেখতে পাচ্ছ ত ?"

উত্তর, "তা জানি না।"

প্রশ্ন, "কি জান না ?"

উত্তর, "উনি এ মোকদ্দমায় তদ্বির করেছেন কিনা জানি না।"

প্রশ্ন, "সে কথা ত আমি এখন জিজ্ঞাসা করছি না। আমার আপাততঃ প্রশ্ন হচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা—উনি সরকার পক্ষের উকীলবাবুর পিছনে বসে তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে চুপি চুপি পরামর্শ করছেন ?"

উত্তর, "জানি না।"

প্রশ্ন, "তুমি যা চোখের সামনে দেখছ তাও জান না ?"

উত্তর, "আজ্ঞে জানি না।"

যাইহোক নানান বিষয়ে নানান রকম প্রশ্ন করার পর আমাদের ব্যারিষ্টার তাঁর জেরার শেষের দিকে সাক্ষীকে শুধালেন—"যখন খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'লে তখন বুঝতে পেরেছিলে তুমি একটা অন্যায় কাজ করছ ?"

উত্তর, "কি করব বলুন, জমিদারের অনুরোধ এড়াই কি ক'রে।"

একটু ধমকের সুরে প্রশ্ন হ'ল, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি বুঝতে পেরেছিলে কিনা অন্যায় কাজ করছ ?"

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "খুনের শাস্তি ফাঁসী—এটাও জানতে ?"

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "সরকারী উকীলের প্রশ্নের উত্তরে এখানে যে গল্পটা বলেছ এসব কথা প্রথম তুমি কাকে বল ?"

উত্তর "মনে নাই।"

প্রশ্ন, "কতবার কত জায়গায় বলেছ সেটা তোমার মনে আছে ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "অনেকবার বলেছ, বারে বারে বলেছ—কেমন ?"

উত্তর, "মনে নাই।"

প্রশ্ন, "এখানে বলেছ, নিম্ন আদালতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলেছ—এর আগে আর এক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পুলিশ তোমাকে স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ করবার জন্য নিয়ে যায়, তাঁর কাছে বলেছ, কেমন ?"

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ"

প্রশ্ন, "তার আগে পুলিশের কাছেও বলেছ ?"

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "বরাবর সত্যকথা ব'লে এসেছ ?"

উত্তর, "আজ্ঞে সত্যকথা বলেছি।"

প্রশ্ন, "প্রথম পুলিশের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করেছিলে না নিজেকে বাঁচিয়ে অন্য গল্প বলেছিলে ?"

উত্তর, "আজ্ঞে বরাবর সত্যকথা বলেছি।"

প্রশ্ন, "প্রথম থেকেই নিজের দোষ স্বীকার করেছ, কেমন ?"

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "পুলিশ তোমাকে ভয় দেখিয়ে স্বীকার করিয়েছিল ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "পুলিশ তোমার উপর কোনও অত্যাচার করেছিল ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "মুকুন্দবাবু বা তাঁর কর্মচারী নবীন মুন্সী তোমাকে কোনও রকম ভয় দেখিয়েছিল বা তোমার উপর কোনও অত্যাচার করেছিল ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "পুলিশ তোমাকে কোনও প্রলোভন দেখিয়েছিল—সত্যকথা বললে তোমাকে ছেড়ে দেব বা ঐ রকম কিছু ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "মুকুন্দবাবু বা নবীন মুন্সী তোমাকে কোনও প্রলোভন দেখিয়েছিল ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "তবে কেন সব স্বীকার করেছিলে ?"

উত্তর, "সত্যকথা বলেছি।"

প্রশ্ন, "কেন? হঠাৎ সত্যকথা বলার এ প্রবৃত্তি তোমার হ'ল কেন? স্বইচ্ছায় ফাঁসী যাবার ইচ্ছে হয়েছিল কি?"

উত্তর নাই।

প্রশ্ন, "তুমি জানতে তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে তোমার ফাঁসী হ'তে পারর, তবুও তুমি কেন স্বীকার করেছিলে এর কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে পার?"

উত্তর নাই।

ধমকের সুরে প্রশ্ন, "উত্তর দাও। কোনও সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পার—কেন স্বীকার করেছিলে?"

অর্ধস্ফুটস্বরে উত্তর দিল, "না।"

প্রশ্ন, "আমি বলি পুলিশ মুকুন্দবাবু ও নবীন মুন্সীর সহযোগে এই সব কথা তোমাকে শিখিয়েছে, প্রলোভন দেখিয়েছে যে এসব কথা বললে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে—কেমন?"

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর, "না।"

গোলাপ মণ্ডলের জেরা শেষ হ'ল। মনে একটা আশা হ'ল যে হয়ত এর কথা জুরীরা বিশ্বাস করবে না। এ লোকটি যে মোটের উপরে একটা শেখান গল্প বলেছে—এটা যেন পরিষ্কার হ'য়ে গেল আমার পক্ষের ব্যারিষ্টারের জেরায়। আকুল নয়নে জুরীদের দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম, তাদের মধ্যেও নীচু গলায় চুপি চুপি আলোচনা চলেছে—নিশ্চয়ই সাক্ষীর কথা নিয়ে। হরিশের দিকে চাইলাম, দেখলাম হরিশ আমাদের ব্যারিষ্টারের সঙ্গে গোপনে গভীর পরামর্শে ব্যস্ত।

দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকা হ'ল—নবীন মুন্সী। আদালতে অর্থাৎ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাক্ষী দিয়েছিল, তাই সে যে কি কথা বলবে—আমি সবই জানতাম। জানতাম যে, সে প্রথম সাক্ষীর ষড়যন্ত্রের গল্পের পোষকতায় ঘাটের পাড়ে একদিন রাত্রে আমাদের দেখেছিল সেই কথাই হলপ নিয়ে বলতে এসেছে।

নবীন মুন্সীকে হলপ দেওয়া হল। সরকারী উকীলের প্রশ্নের উত্তরে সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যা যা বলেছিল সব কথাই ব'লে গেল। কেবল-মাত্র আমার কথায় ব'লে গেল—অন্ধকারে ঘাটের পাড়ে সে আমাকে ঠিক

চিনতে পারেনি, তাই হলপ নিয়ে বলতে পারে না আমি সেই ষড়যন্ত্রে ঠিক ছিলাম কিন।

সত্য সত্যই অবাক হ'লাম। কথাটা নতুন, এই দায়রা আদালতেই সে প্রথম বলল। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও সে স্পষ্ট ব'লে গিয়েছিল যে, সে আমাকে ঘাটের পরে দেখেছিল। নবীন মুন্সীর হঠাৎ আমার উপর এ করুণার যে কি কারণ কিছুই বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হ'য়ে নবীন মুন্সীর দিকে চেয়ে রইলাম।

সরকারী উকিল ধমক দিয়ে তার হলপের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে বারে বারে প্রশ্ন করাতেও কোন ফল হ'ল না। সে দায়রা আদালতে নিজের কথা ঠিকই রেখে গেল—এতটুকুও এদিক-ওদিক হ'ল না।

সরকারী উকীল জজ সাহেবকে তখন কি যেন একটা কথা বললেন—ঠিক শুনতে পাইনি। জজ সাহেব তখন নবীন মুন্সীকে প্রশ্ন করলেন—

"তুমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একথা বলেছিলে যে আসামী সুশান্ত সাহা সেদিন রাত্রে ঘাটের 'পরে ছিলেন?"

উত্তর, "আজ্ঞে না, ঠিক ওকথা বলিনি।"

প্রশ্ন, "সেই কথা তুমি বলেছিলে বলে লেখা রয়েছে?"

উত্তর, "তাহ'লে ভুল লেখা হয়েছে। আমি বলেছিলাম—হতে পারে সুশান্তবাবু সেদিন রাত্রে সেখানে ছিলেন।"

প্রশ্ন, "তুমি তাঁকে চিনতে পারনি?"

বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না।"

প্রশ্ন, "ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যা লেখা হয়েছে তা পড়ে, ঠিক লেখা হয়েছে ব'লে তুমি সই করেছিলে?"

উত্তর, "আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ইংরেজী ত আমি ভাল জানি না হুজুর। আমাকে মানে ক'রে যা বুঝিয়ে দিয়েছিল, আমি তাই ঠিক ব'লে সই করেছিলাম।"

জজ সাহেব আর কোনও প্রশ্ন করলেন না।

আমাদের ব্যারিষ্টার প্রায় এক ঘণ্টা নবীন মুন্সীকে জেরা করলেন। বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, তার সাক্ষী সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রথম সাক্ষীর কথায় পোষকতায় প্রমাণের দরকার, নতুবা আইন অনুসারে তার কথা বিশ্বাস করা চলে না—তাই নবীন মুন্সী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে প্রথম সাক্ষীর কথার পোষকতায় প্রমাণ দিতে এসেছে।

ব্যারিষ্টারের জেরার দিকে আমার তখন মন ছিল না। কেবল ভাবছিলাম—নবীন মুন্সী আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রে গেল কেন? হঠাৎ আমার উপর তার এ করুণার কারণটা কি? নবীন মুন্সী, সেই আমার চিরদিনের শত্রু নবীন মুন্সী, তারই আত্মীয় মনিব মুকুন্দ, সরকার পক্ষের মোকদ্দমার তদ্বির করছে, সশরীরে কোর্টে উপস্থিত—অনেক ভেবেও কিছুই বুঝতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত হরিশকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "হরিশ! নবীন মুন্সী আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রে গেল কেন বল ত?" হরিশ একটু হেসে চুপি চুপি আমাকে বললে, "বলেছে কি আর সাধে। দু'-হাজার টাকা খাওয়াতে হয়েছে। যাক, এইবার তোমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল বোধ হয়। প্রথম সাক্ষীর পোষকতায় তোমার সম্বন্ধে আর ত কোনও প্রমাণ নাই।"

শুধালাম, "তার মানে কি?"

হরিশ বললে, "আইন বলে approver অর্থাৎ যে নিজেই দোষী তার সাক্ষ্যর পোষকতায় ভাল প্রমাণ না থাকলে, কেবলমাত্র তার কথা উপর বিশ্বাস ক'রে কোনও আসামীকেই দোষী বলা চলে না। ওরকম লোকের কথা যে সত্য তারই বা বিশ্বাস কি?"

ব্যাপারটা বুঝলাম। মনে মনে নবীন মুন্সীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম কি না জানি না, তবে মুক্তির আশায় মনে মনে যে খানিকটা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় সাক্ষী ডাকা হ'ল—তুষারবালা। সমস্ত আদালতে একটা চাপা চাঞ্চল্যের ঢেউ যেন বয়ে গেল—বারে বারে এসে লাগতে লাগল আমার অন্তরের প্রত্যেক শিরায়-শিরায়।

জজ সাহেব ঘড়ির দিকে চাইলেন—দেখা গেল বেলা সাড়ে চারটা বেজে গেছে। জজ সাহেব সেদিনকার মতন বিচার বন্ধ ক'রে পরের দিন বেলা ১১টায় বিচার সুরু হবার হুকুম দিয়ে নিজের আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন।

তুষারবালার সাক্ষ্য সেদিন আর নেওয়া হ'ল না।

তুষারবালার সাক্ষী সুরু হ'ল বিচারের দ্বিতীয় দিন বেলা সাড়ে ১১টা আন্দাজ। আদালতে সমস্ত লোকের একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে, নত মস্তকে দাঁড়িয়ে হলপ নিয়ে সরকারী উকীলের প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে ধীরে সংযত গলায় একটির পর একটি ক'রে সমর্থন ক'রে গেল সরকার পক্ষের আগাগোড়া সমস্ত কাহিনীটি। ব'লে গেল যে আমার সমস্ত রকম অত্যাচার যতদিন

সম্ভব নীরবে সে সহ্য করেছিল, শ্বশুরকুলের মুখ চেয়ে, তার একমাত্র সন্তানের মুখ চেয়ে। কিন্তু সহ্যেরও ত একটা সীমা আছে। সাবিত্রীর সঙ্গে আমার একটা কুৎসিত সম্পর্কের ইঙ্গিত ক'রে ব'লে গেল যে শেষ পর্যন্ত বিধবাটির অত্যাচার সহ্য করা তার পক্ষ হ'ল অসম্ভব, তাই ত হ'ল কাল—তার সওয়াটাই বোধ হয় উচিত ছিল, নইলে ত এ অঘটন ঘটত না। মহাপ্রাণ দাদার সঙ্গে নিজের একটা নির্মল পবিত্র সম্পর্কের দোহাই দিয়ে ব'লে গেল এমনই তার দুরদৃষ্ট যে অসহায় অবস্থায় বাপের বাড়ী থাকার সময় দাদার মাঝে মাঝে পল্‌তায় তাদের দেখাশুনা করতে যাওয়াটাও আমার মনের দিক দিয়ে হ'ল অসহ্য, একটা কুৎসিত সন্দেহে দাদাকে হুকুম ক'রে পাঠালাম পলতা থেকে দূর হ'য়ে যাওয়ার জন্য। এমন কি এই সম্পর্কে দাদার কাছে লেখা আলী মিঞার চিঠি পর্যন্ত আদালতে দাখিল ক'রে প্রমাণ ক'রে গেল ; এবং দাদা তাতে রাজী না হওয়ার দরুণ ন্যায্য মাসোহারা পর্যন্ত বন্ধ ক'রে দিতেও আমি দ্বিধা করিনি। ফলে, দাদা নবীন মুন্সীকে তাঁর অংশের পৃথক ম্যানেজার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ইত্যাদি একে একে সরকার পক্ষের সব কথাই ব'লে গেল অত্যন্ত সহজ, সরল ভাবে, এতটুকুও ইতস্ততঃ না ক'রে।

ঘটনার দিন রাত্রের বিষয় কেবলমাত্র ব'লে গেল যে, রুগ্ন সন্তানকে পাশে নিয়ে একটু তন্দ্রার ঘোরে সে আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল শুয়ে, এমন সময় হঠাৎ দাদার আর্তনাদে তার ঘুম গেল ভেঙ্গে। কি হ'ল—কিছু বুঝবার আগেই ঘরের মধ্যে ঢুকে তার বুকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল কতকগুলি লোক, অন্ধকারে সে তাদের চিনতে পারেনি, তাই তার পক্ষে কারুকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়।

তুষারবালার সাক্ষী দেওয়ার ধরণে তার কথা বলার ভঙ্গীমায় শুরু আদালত গৃহের সমস্ত লোকই যে বিনা দ্বিধায় তার আগাগোড়া কথা বিশ্বাস করেছিল, সে কথা বুঝতে তখন আমার এতটুকুও দেরী হয়নি। লাল পেড়ে মিহি তাঁতের সাড়ী পরিধানে একখানি সিল্কের উড়ানি, কপালে উজ্জ্বল একটি সিঁদুরের টিপ, কারো দিক না চেয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে ছিল সে—সত্য সত্যই মনে হচ্ছিল একখানি নির্যাতিত লক্ষ্মী প্রতিমা, বিসর্জনের পূর্বে মুহূর্তে একবার এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের হাটে, দুঃখের কাহিনী উজাড় ক'রে দিয়ে যেতে চায়। আকুল নয়নে একবার জুরিদের দিকে চেয়ে দেখেছিলাম—স্তব্ধ হ'য়ে সবাই চেয়ে আছে তুষারের মুখের দিকে মুগ্ধ চাহনিতে, তার প্রত্যেক কথাগুলি যেন লিখে নিচ্ছে বুকের পরতে পরতে আগুনের অক্ষরে। হতাশ

চক্ষে চাইলাম আমারই ব্যারিষ্টারের পানে, দেখলাম চুপ ক'রে মাথা নীচু ক'রে তিনি বসে আছেন—কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

সরকার পক্ষের প্রশ্ন শেষ হ'ল, জেরা করতে উঠে দাঁড়ালেন আমাদের ব্যারিষ্টার, আদালত গৃহে একটা চাপা চাঞ্চল্যের সাড়া টের পেলাম।

উঠে দাঁড়িয়েই প্রথম প্রশ্ন করলেন, "কপালে আপনি ও কিসের টিপ পরেছেন ?"

হঠাৎ যেন তুষার কেমন একটু থতমত খেয়ে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল দাঁড়িয়ে। ব্যারিষ্টার আবার প্রশ্ন করলেন, "আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার কপালে ও কিসের টিপ ?"

এবার শান্ত গলায় উত্তর দিল, "সিঁদুরের ?"

প্রশ্ন, "সধবার চিহ্ন—না ?"

তুষার বললে, "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "সিঁদুর পরতে আপনি ভালবাসেন ?"

উত্তর, "সব মেয়েই ভালবাসে।"

প্রশ্ন, "আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছি—আপনি ভালবাসেন কি ?"

উত্তর, "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "মনে মনে কামনা করেন সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক ?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন, "উত্তর দেবেন কি আমার কথার ?"

উত্তর, "দেব।"

প্রশ্ন, "ঐ ত আপনার স্বামী যিনি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, কেমন ?"

তুষার মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও কথা কইলে না।

প্রশ্ন, "দয়া ক'রে একবার আপনার স্বামীর দিকে চেয়ে দেখবেন কি ?"

তবুও তুষার মাথা নীচু ক'রেই দাঁড়িয়ে রইল—চাইলে না। আমাদের ব্যারিষ্টার বিশেষ জিদ করাতে অপর পক্ষের উকীল প্রতিবাদ ক'রে বললেন যে, বর্তমান ক্ষেত্রে সাক্ষী কোনও আইন অনুসারেই আসামীর দিকে চেয়ে দেখতে বাধ্য নয়। এই নিয়ে উভয় পক্ষের কিছু বাগবিতণ্ডার পর জজ সাহেবের আদেশে তুষার একবার মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখতে বাধ্য হ'ল।

প্রশ্ন, "স্বামীকে দেখলেন ?"

উত্তর, "হ্যাঁ।

প্রশ্ন, "চিনতে পেয়েছেন ?"

উত্তর, "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "ক'মাস জেলে চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে—একেবারে ভেঙ্গে গেছে—না ?"

উত্তর, "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "ওর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ—আপনি জানেন ?"

উত্তর, "জানি না।"

প্রশ্ন, "আপনি কি আজ পর্যন্ত শোনেননি যে ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ?"

উত্তর, "শুনেছি।"

প্রশ্ন, "খুনের শাস্তি ফাঁসী—এটাও জানেন।"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন, "উত্তর দিন আমার কথার। জানেন নাকি যে খুন করলে ফাঁসী হয় ?"

উত্তর, "শুনেছি।"

প্রশ্ন, "এইবার একটা সোজা কথার উত্তর দিন। আপনি কি চান যে, আপনার স্বামীর ফাঁসী হোক।"

তুষার নীরব।

জোরের সঙ্গে প্রশ্ন, "উত্তর দিন আমার কথার।"

উত্তর, "কোনও স্ত্রী কি তাই চায় ?"

প্রশ্ন, "আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছি—আপনি কি তাই চান ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "চমৎকার। এইটেই ত স্বাভাবিক। এইবার বলুন ত এই খুনের মোকদ্দমায় স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসেছেন কেন ?"

তুষার নীরব।

বিদ্রূপাত্মক স্বরে প্রশ্ন, "সিঁথির সিঁন্দুর অক্ষয় করবার জন্য কি ?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন, "আপনাকে এই মোকদ্দমায় কি কেউ সাক্ষী দিতে বাধ্য করেছে ?"

উত্তর, "আদালতের সমন পেয়েছি।"

প্রশ্ন, "সমন পেয়ে আদালতে আসতে আপনি বাধ্য। কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে এত কথা বলতে কি কেউ আপনাকে বাধ্য করেছে?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন, "উত্তর দিন। কেউ আপনাকে বাধ্য করেছে—কেউ শিখিয়ে দিয়েছে এসব কথা?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ; দোষী সাব্যস্ত হ'লে ফাঁসী হ'তে পারে; আপনি কি চান স্বামীর বিরুদ্ধে যে সব কথা এখানে ব'লেছেন, আমরা সব বিশ্বাস করব, না করব না?"

উত্তর, "আপনাদের ইচ্ছা।"

প্রশ্ন, "আপনার ইচ্ছেটা কি, সেইটেই জানতে চাইছি।"

উত্তর, "আমার কোন ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই।"

প্রশ্ন, "ও। আপনার কথা বিশ্বাস ক'রে আপনার স্বামীকে আমরা শাস্তিই দিই বা আপনার কথা অবিশ্বাস ক'রে তাঁকে খালাসই দিই—সে বিষয়ে আপনার কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই, কেমন?"

তুষার নীরব।

বেশ ধমকের সুরে প্রশ্ন, "উত্তর দিন আমার কথার। আপনার তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না—কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই আপনার?"

একটু জোরের সঙ্গে উত্তর, "না।"

বুঝলাম তুষার এবার রেগেছে মনে মনে। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, তুষারের মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে।

তুষারের জেরা চলল। নানান ভাবে নানান কথা নিয়ে নানা রকম প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললেন আমাদের ব্যারিষ্টার। তুষারকে রাগিয়ে জেরার মধ্য দিয়ে মোটের উপর বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, তুষারবালা অতিশয় রাগী আত্মসুখী এবং কোপন স্বভাবের স্ত্রীলোক। স্বামীর প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা বা প্রেম তার কোনও কালেই ছিল না; এবং জীবনে স্বামীকে এতটুকু আদর-যত্নে তৃপ্ত করবার চেষ্টা পর্যন্ত সে করেনি কোনও দিন। চির জীবনটা স্বামীকে জ্বালিয়ে এসেছে নানান রকম অবুঝ অত্যাচারে, অযথা অশান্তির উৎপীড়নে। জেরা ক'রে বোঝাবার চেষ্টা হ'ল —এমন কি, আজকে এই দারুণ দুর্দিনেও সে স্বামীর শাস্তিই চায়, ফাঁসী হয়, তাতেও আপত্তি নেই, কেননা তাহ'লেই সে নাবালক সন্তানের পক্ষ থেকে

জমিদারীর একচ্ছত্র মালিক হ'য়ে অতিসুখে নিজের মনের মতন ক'রে জীবন কাটাতে পারবে। এবং সেই জন্যই স্বামীর শত্রু মুকুন্দর সঙ্গে সে যোগ দিয়েছে, তারই প্ররোচনায় এসেছে সরকার পক্ষের সাক্ষী হ'য়ে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে।

সাবিত্রীর কথা তুলেও তুষারকে অনেক জেরা হ'ল। বোঝাবার চেষ্টা করা হ'ল যে সাবিত্রীর জগতে কোনও আশ্রয় ছিল না ব'লেই আমাদের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কেননা, ছেলে বেলা থেকে সে ছিল আমার খেলার সাথী এবং আমরা এত বড় হ'য়ে উঠেছি ঠিক দুটী ভাই-বোনের মতন। সাবিত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটি ছিল একেবারে পবিত্র ভাই-বোনের সম্পর্ক। একথা ওকথার পর প্রশ্ন করা হ'ল, "এই সাবিত্রী মেয়েটির বাপের বাড়ী ত আপনার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে?"

উত্তর, "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "সাবিত্রীর মাকে আপনার স্বামী 'সইমা' ব'লে ডাকতেন—কেমন?"

উত্তর, "জানি না।"

প্রশ্ন, "শোনেনও নি, কোন দিন সে কথা?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "সাবিত্রী আপনার শাশুড়ী ঠাকুরণকে 'সইমা' ব'লে ডাকতেন—সেটা ত শুনেছেন?"

উত্তর, "হবে।"

প্রশ্ন, "শুনেছেন কিনা উত্তর দিন।"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "সাবিত্রী আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণকে কি ব'লে ডাকতেন?"

উত্তর, "জানি না।"

প্রশ্ন, "এক সঙ্গে বাস করলেন প্রায় এক বৎসর অথচ সাবিত্রী আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণকে কি ব'লে ডাকতেন কখনও শোনেননি?"

উত্তর, "লক্ষ্য করিনি।"

প্রশ্ন, "আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণের সঙ্গে সাবিত্রীর মার ছেলেবেলা থেকেই 'সই' পাতান ছিল এবং সেই সম্পর্কে আপনার স্বামী ও সাবিত্রী পরস্পরের মাকে ছেলে বেলা থেকেই 'সইমা' ব'লে ডেকে এসেছেন, এটা অস্বীকার করতে পারেন?"

উত্তর, "জানি না।"

প্রশ্ন, "সাবিত্রী আপনার স্বামীকে 'দাদা' বলে ডাকতেন—এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ?"

উত্তর, "শুনিনি।"

প্রশ্ন, "সে কি কথা ? একটি যুবতী স্ত্রীলোক বাড়ীতে এল, আপনার স্বামীর সঙ্গে তিনি কি সম্পর্কে মেলামেশা করেছেন, কি ব'লে ডাকছেন—এটাও লক্ষ্য করার কৌতূহল কখনও হয়নি আপনার ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "মেয়েটি কি সম্পর্কে আপনাদের বাড়ীতে হঠাৎ এসে আশ্রয় নিল—এটা জানবার কৌতূহল হয়েছিল কি ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "কৌতূহল আপনার বড়ই কম দেখতে পাচ্ছি। আপনার মনটা কি স্বামীর বিষয়ে একেবারে নিরাসক্ত ছিল ?"

উত্তর, "তার মানে ?"

প্রশ্ন, "মানে, স্বামীর প্রতি কোন ভালবাসা নেই, তিনি কি করেন না করেন কিছুই এসে যায় না, নির্লিপ্ত উদাসীন—এই ধরণের মনোভাব ?"

উত্তর, "কোনও স্ত্রীর তাই হয় নাকি ?"

প্রশ্ন, "আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

উত্তর, "আমিও ত স্ত্রী।"

প্রশ্ন, "শুনে সুখী হ'লাম। স্বামীর বিষয়ে আপনার মন তাহ'লে নিরাসক্ত বা উদাসীন ছিল না—কেমন ?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "তাহ'লে স্বামীর বিষয়ে আপনার মন একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল বলতে হবে; অর্থাৎ স্বামীকে কখনও সন্দেহের চক্ষে দেখেননি বা দেখার কোনও কারণও কখনও ঘটেনি ?"

উত্তর, "হবে।"

একটু হেসে প্রশ্ন, "এ ত আমার প্রশ্নের উত্তর হ'ল না শ্রীমতী তুষার-বালা। আমার সোজা প্রশ্ন হচ্ছে এই, মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্কে লক্ষ্য করার মতন কিছু ছিল না ব'লেই আপনার কোন কৌতূহলও হয়নি বা এই মেয়েটি আপনার স্বামীকে কি ব'লে ডাকছে লক্ষ্য করার প্রয়োজনও হয়নি—কেমন ?"

তুষার নীরব।

ধমকের সুরে প্রশ্ন, "উত্তর দিন আমার কথার।"

"হ্যাঁ, তাই—তাই কি?" বেশ জোরের সঙ্গে তুষার উত্তর দিল।

প্রশ্ন, "না কিছু নয়, সত্যটা জানবার চেষ্টা করছিলাম মাত্র। যাক ও কথা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনাদের সমাজে কি ভাসুরের সঙ্গে কথা বলা চলে?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "কেউ বলে না—না?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "আপনি বলতেন?"

উত্তর, "ওমা! সে কি কথা?"

প্রশ্ন, "আপনি ভাসুরের সঙ্গে কোনও দিনই কোনও কথা বলেন নি—কেমন?"

জোরের সঙ্গে উত্তর, "কখনো না।"

প্রশ্ন, "ভাসুরের সঙ্গে একলা একঘরে কখনও কেউ আপনাকে দেখেননি—কেমন?"

উত্তর, "মিথ্যা কথা।"

প্রশ্ন, "কোনটা মিথ্যা কথা শ্রীমতী তুষারবালা?"

উত্তর, "কেউ কখনও কোনও দিন ভাসুরের সঙ্গে আমাকে একলা এক ঘরে দেখেনি।"

প্রশ্ন, "আপনার স্বামী? কোনও দিন জীবনে কখনও এমন হয়েছে কি যে, আপনাকে ও আপনার ভাসুরকে একলা এক ঘরে দেখেছেন?"

জোরের সঙ্গে উত্তর, কখনো না।"

প্রশ্ন, "এই ধরুণ কিছুক্ষণ—"কয়েক মুহূর্তের জন্য?"

উত্তর, "অসম্ভব। ভাসুর কোনও ঘরে একলা আছেন জানলে বা দেখলে আমি সে ঘরে ঢুকতামই না কখনও।"

প্রশ্ন, "বলে গেছেন আপনার ভাসুরের সঙ্গে নির্মল পবিত্র সম্পর্ক আপনার স্বামী সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। কেন? তার কি কোন কারণ ছিল?"

উত্তর, "কোনও কারণ ছিল না।"

প্রশ্ন, "আপনার স্বামী বিকৃত মস্তিষ্কের লোক বা উন্মাদ—এই কথা কি আপনি বলতে চান?"

উত্তর, "তার মানে?"

প্রশ্ন, "মানে ত অতি সোজা। আপনার স্বামী পাগল নন—এ কথা ত আপনি স্বীকার করেন?"

উত্তর, "হ্যাঁ—তাতে কি?"

প্রশ্ন, "তিনি বিদ্বান—বি-এ পাশ এবং সবাই তাকে বুদ্ধিমান বলে। কেমন?"

উত্তর, "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "তাহ'লে আমাদের বুঝিয়ে বলতে পারেন যে, জীবনে কোনও দিন এক মুহূর্তের তরেও আপনার স্বামী আপনাকে আপনার ভাশুরের সঙ্গে কথা কইতে বা একলা একঘরে দেখেননি। আপনার স্বামী পাগল নন্—স্বাভাবিক মস্তিষ্কের লোক, অথচ কেন তিনিও শুধু শুধু আপনার ও আপনার ভাশুরের মধ্যে একটা কুৎসিত সম্পর্কের সন্দেহ করতেন?"

উত্তর, "তিনিই জানেন।"

প্রশ্ন, "আপনি কিছু জানেন কি?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলল। দাদার বিষয় আমাদের ব্যারিষ্টার মোটের উপর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন যে, আমি জীবনে তুষারের সঙ্গে দাদা সম্পর্কে কোনও দিনই সন্দেহের চোখে দেখিনি এবং ভিতরে ভিতরে কি ছিল ভগবানই জানেন, কিন্তু যা-ই থাকুক সন্দেহের চক্ষে দেখবার কোনও কারণ আমার জ্ঞানত ঘটেওনি কোনও দিন, এবং এদিক দিয়ে তুষারের কথাই ঠিক। সেই জন্যই তুষার আমার সঙ্গে কলহ ক'রে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকতে সুরু করলে, তখন দাদার সেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে বাস করার কথা শুনে আমি সত্য সত্যই বিস্মিত হ'য়েছিলাম। প্রথম প্রথম এ নিয়ে আমি কোনও কথাই বলিনি। কিন্তু ক্রমে তুষারের ওরকম জোর ক'রে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকার দরুণ এবং বিশেষ ক'রে দাদার মাঝে মাঝে গিয়ে পলতায় বাস করায় দরুণ তুষার ও দাদাকে নিয়ে একটা চাপা কুৎসিত কাণা-ঘুষো যখন আমাদের গ্রামে বেশ প্রবল হ'য়ে উঠল তখন তুষারেরই সুনামের জন্য দাদাকে পল্‌তা থেকে চলে যাওয়ার কথা ব'লে পাঠাতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম, যদিও আমার নিজের প্রাণে তুষার ও দাদাকে নিয়ে কোনও রকম কুৎসিত সন্দেহের ঠাঁই কোনও দিনই ছিল না আজও নাই।

অবাক হ'লাম। আমার দাদা ও তুষারের সম্পর্কে কোনও সন্দেহ ছিল

না—আসল সত্য অবস্থাটাকে এমন ক'রে চেপে কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য গল্প দিয়ে এ রকম ভাবে জেরা করার উদ্দেশ্য প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। সত্য অবস্থাটা ত আমাদের ব্যারিষ্টারের কিছুই অজানা ছিল না, কেননা হরিশকে ত আমি মুক্তকণ্ঠে সবই বলেছিলাম—কিছুই লুকাইনি এবং হরিশ নিশ্চয়ই সমস্ত অবস্থা আমাদের ব্যারিষ্টারকে বুঝিয়ে বলেছে। তবে?

জেরা চলতে লাগল। ক্রমে বুঝলাম।

প্রশ্ন, "আপনার স্বামী যে আপনার ভাশুরকে নিয়ে আপনাকে সন্দেহ করেন, এটা প্রথম টের পেলেন কবে?"

উত্তর, "মনে নাই।"

প্রশ্ন, "আপনার ছেলেটি জন্মাবার আগেই কি এটা টের পেয়েছিলেন, না পরে।"

উত্তর, "পরে।"

প্রশ্ন, "আপনার ছেলেটির জন্মাবার কত দিনের মধ্যে টের পেয়েছিলেন—বছরখানেকের মধ্যে হবে?"

উত্তর, "হয়ত হবে।"

প্রশ্ন, "তখন ত আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক মোটের উপর স্বাভাবিকই ছিল।"

উত্তর, "তার মানে?"

প্রশ্ন, "অর্থাৎ আমি জানতে চাইছি—স্বামী স্ত্রী যেমন এক সঙ্গে বসবাস করে, একঘরে শোয়, আপনারও ত সেই রকমই থাকতেন?"

উত্তর, "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "কোনও ত কারণ ছিল না সন্দেহ করবার, ঘোমটা টেনে দূরে সরে যেতেন, কথাটি অবধি কখনও কর্নেনি ভাসুরের সঙ্গে—তবুও স্বামী যে কেন সন্দেহ করছেন একথা কোনও দিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেননি?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "কেন?"

উত্তর, "প্রবৃত্তি হয়নি।"

প্রশ্ন, "এই ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই কোনও দিন না কোনও দিন আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা হ'য়েছিল, তা সে কলহের মধ্যে দিয়েই হোক বা ভাল ভাবেই হোক; কেমন?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "আপনি কি বলতে চান এ ব্যাপার নিয়ে আপনার স্বামী কখনও কোনও কথা বলেননি তাই আপনার জিজ্ঞাসা করবার প্রবৃত্তি হয়নি—কি কারণে, কেন, তিনি আপনাকে সন্দেহ করেছেন?"

উত্তর, "হ্যাঁ—তাই বলতে চাই।"

প্রশ্ন, "আভাসে ইঙ্গিতেও কি আপনাকে জানাননি আপনার স্বামী?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "তাহ'লে আপনার স্বামী যে আপনাকে সন্দেহ করতেন এটাই বা জানলেন কি ক'রে? হাত গুণতে জানেন নাকি?"

উত্তর, "সে আমি বোঝাতে পারব না।"

জোরের সঙ্গে প্রশ্ন, "বোঝাবার কিছু নাই শ্রীমতী তুষারবালা। আপনার স্বামী কোনও দিনই আপনাদের সন্দেহের চক্ষে দেখেননি। আপনার স্বামীর সন্দেহ করার গল্পটি এই মোকদ্দমার জন্য আপনারা বিশেষ ক'রে বানিয়েছেন, নতুবা আপনার স্বামীর দাদাকে খুন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কোন উদ্দেশ্যই থাকে না—নয় কি?"

জোরের সঙ্গে উত্তর, "না।"

বুঝলাম। আমার প্রাণের সন্দেহের কথাটা স্বীকার করলে পাছে খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার একটা উদ্দেশ্য প্রমাণিত হ'য়ে যায় তাই ব্যারিষ্টার জেরায় ওটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে গেলেন; এমন কি তুষার ও দাদার সম্পর্কের মধ্যে আমার জানত সত্যিকারের দোষের যে কিছু ছিল, সেটুকু ইঙ্গিতে পর্যন্ত আভাস দিলেন না। ধন্য বুদ্ধি! নেহাৎ আলী মিঞার লিখিত চিঠি আদালতে প্রমাণিত হয়েছে, নতুবা দাদাকে যে পল্‌তা থেকে চলে যাওয়ার কথা লিখে পাঠান হয়েছিল, সেটাও বোধ হয় একেবারে অস্বীকার ক'রে যেতেন।

তুষারের জেরা শেষ হতেই বেলা পাঁচটা বেজে গেল—সেদিন আর কোনও কাজই হ'ল না। পরের দিন বেলা এগারটায় আবার বিচার আরম্ভ হবে—এই কথা জানিয়ে দিয়ে জজ সাহেব উঠে চলে গেলেন।

তুষারের জেরার শেষের দিকটায় একটা অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল আদালত গৃহে। শান্ত গলায় প্রাণ-ভরা দরদ দিয়ে আমাদের ব্যারিষ্টার তুষারকে প্রশ্ন করলেন—"আপনার ছেলেটির বয়স কত হ'ল?"

তুষার তখন ক্লান্ত। মুখের দিকে চাইলেই বুঝা যাচ্ছিল যে, সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্নের আঘাতে সে তখন অভিভূত, আচ্ছন্ন। অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় উত্তর দিল—"সাত বছর।'

প্রশ্ন, "ওর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়—না?"

উত্তর, "প্রায়ই অসুখ করে।"

প্রশ্ন, "সে এখন কোথায় আছে?"

উত্তর, "খুলনায়ই আছে। আমার সঙ্গে এসেছে এখানে।"

প্রশ্ন, "সে নিজের বাপের কথা আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন, "বাবা কোথায় গেল, কবে আসবে—এ সব প্রশ্ন সে করে না আপনাকে?"

কাতর গলায় উত্তর, "করে।"

প্রশ্ন, "ছেলেটি বাপের খুব বাধ্য—বাপকে খুব ভালবাসে—না?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন, "উত্তর দিন আমার কথার?"

ভারী গলায় উত্তর, "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন, "বাপও ছেলেটিকে খুব ভালবাসেন—নয় কি?"

অস্ফুটস্বরে উত্তর, "বাসেন।"

বেশ গম্ভীর গলায় জোরের সঙ্গে প্রশ্ন, "এইবার আমার কথার একটা সত্য উত্তর দিন। আপনার পেটের সন্তানের দোহাই—তারই বাপের বিরুদ্ধে যে সব কথা ব'লে গেলেন, বলুন ত এর বেশীর ভাগই শেখান কথা কিনা?"

তুষার নীরব।

প্রশ্ন, "বলুন। আপনার রুগ্ন সন্তানের মুখখানা মনে ক'রে আমার কথার উত্তর দিন।"

ব্যারিষ্টার প্রশ্ন ক'রে একটু ঝুঁকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তুষারের মুখের দিকে রইলেন চেয়ে। লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলাম তুষার স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েছিল—মাথাটি একটু হেলিয়ে একদৃষ্টে চেয়েছিল নীচের দিকে—চোখের পাতাটি পর্যন্ত যেন নড়ে না। সমস্ত আদালত গৃহ একটা স্তব্ধ নীরবতায় উঠল ভ'রে—সকলেরই আকুলদৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়ে রইল তুষারের মুখের উপর।

আবার প্রশ্ন, "বলুন সত্য কথা—মা হ'য়ে মিথ্যা দিয়ে একমাত্র সন্তানকে পিতৃহারা করবেন না—বলুন?"

এইবার তুষারের সহ্যের বাঁধন ভাঙল। "মাগো"—ব'লে একটা চাপা আর্ত্তনাদ ক'রে আকুলভাবে ফুঁপিয়ে উঠল কেঁদে। মাথাটি এলিয়ে ভেঙ্গে পড়ল—সাক্ষী-মঞ্চের রেলিংএর উপরে।

ব্যারিষ্টার সহানুভূতিমাখা মধুর গলায় বললেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি শ্রীমতী তুষারবালা—আর আমার কোনও প্রশ্ন নেই।"

একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তুষারেরই পানে। আদালত গৃহে দশ জনার চক্ষের সম্মুখে তার সেই অসহায় কান্নার আকুল ভঙ্গিটির মধ্যে কী যে ছিল জানি না—হঠাৎ তারই প্রতি দরদে আমারও প্রাণ কাতর হ'য়ে উঠল দুলে। ক্ষণেকের তরে বহুদিন আগেকার হারিয়ে যাওয়া অনুভূতির আবার যেন একটু আভাস পেলাম।

* * *

পরের দিন বেলা এগারটায় বিচার সুরু হ'ল। তুষারের বাপের বাড়ীর পাড়ার তিন-চারটী সাক্ষী পর পর এসে ব'লে গেল যে দাদার আর্তনাদ শুনে তারা ছুটে ঘটনাস্থলে গিয়ে তুষারের বাপের বাড়ীর বাইরের রোয়াকে রক্তাক্ত অবস্থায় দাদার দেহ পড়ে থাকতে দেখেছিল এবং তাদের মধ্যে একজন, সম্পর্কে তুষারের খুড়তুতো ভাই, নাম জলধর, আলী মিঞাকে সনাক্ত ক'রে ব'লে গেল যে, আলী মিঞা ছুটে পালিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তার সম্মুখীন হওয়াতে পরিষ্কার চিনতে তার কোনও বাধা হয়নি। কেননা দুই একবার আগে তুষারকে বাপের বাড়ীতে আনবার জন্য সে মাধবপুরে গেলে আলী মিঞার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

আলী মিঞা চুপি চুপি আমাকে বললেন, "কি মিথ্যা কথা! এ লোকটির সঙ্গে কখনও আমার পরিচয় হয়নি বা সেদিন রাত্রে আমি ছুটেও পালাইনি। ঘটনাকে এরা একেবারে নতুন রকম ক'রে তৈরী করেছে।"

যাইহোক, এদের এবং এর পরে ডাক্তার, পুলিশ, দারোগা প্রভৃতির সাক্ষী—জেরা ইত্যাদি শেষ হ'তেই বেলা প্রায় পাঁচটা বাজল এবং সেদিনের মত কাজও শেষ ক'রে জজ সাহেব উঠে গেলেন।

জজ সাহেব উঠে যাওয়ার আগে সরকারী উকীলকে ডেকে বললেন, আপনার সাক্ষী প্রমাণ ত আর কিছু নেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আপনার মোকদ্দমাটি বর্তমানে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, তাতে সুশান্তর বিরুদ্ধে আইন অনুসারে কোনও প্রমাণই নাই। সুশান্ত যে খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এ বিষয় ত একমাত্র approver গোলাপ মণ্ডলই বলেছে, কিন্তু তার পোষকতার প্রমাণ কোথায়? অন্য সকলের বিরুদ্ধে প্রমাণ অবশ্য আছে, বিশ্বাস করা না করা সে পরে বিবেচনার কথা। কিন্তু আইন অনুসারে সুশান্তকে শাস্তি দেওয়া চলে না, তাকে মুক্তি দিতে আমরা বাধ্য—সেটা বিবেচনা ক'রে দেখেছেন কি?"

সরকারী উকীল বললেন, "আপনার কথার তাৎপর্য আমি বুঝতে পারছি। সুশান্তর বিরুদ্ধে গোলাপ মণ্ডলের কথার পোষকতায় আমার সাক্ষী ছিল—নবীন মুন্সী। কিন্তু সে ত এখানে—"

জজ সাহেব বললেন, "সে ত এখানে সুশান্তকে সনাক্ত করে না। ঘাটের পাড়ে ষড়যন্ত্রে সুশান্ত ছিল কিনা সে ত ঠিক চিনতে পারেনি ব'লে গেল।"

সরকারী উকীল 'হ্যাঁ' ব'লে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জজ সাহেব একটু বিবেচনা ক'রে বললেন, "সাবিত্রীকে আপনি সাক্ষী হিসাবে ডাকছেন না কেন? গোলাপ মণ্ডলের কথা যদি সত্য হয়, তবে ঘাটের পাড়ে সে ত টাকা দিতে দেখেছে। সে কথা ত সে প্রমাণ করতে পারে।"

সরকারী উকীল বললেন, "তাকে ডাকতে আমি ভরসা করি না। আসামী সুশান্তর দলের লোক। সে এবং আমাদের কথা অনুসারে সুশান্তর সঙ্গে সাবিত্রীর সম্পর্কে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সে সত্য কথা বলবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস হয় না।"

জজ সাহেব আবার চুপ ক'রে কি যেন বিবেচনা করতে লাগলেন। পরে বললেন, "সাবিত্রীকে এখানে সাক্ষী হিসাবে একবার ডাকার অন্যদিক দিয়েও প্রয়োজন আছে ব'ল আমার মনে হয়। তাকে একবার আমাদের দেখা দরকার। সে আছে এখানে?"

সরকারী উকীল বললেন, "হ্যাঁ। আমি অন্য অন্য সাক্ষীর সঙ্গে তাকেও খুলনায় আনিয়ে রেখেছি।"

জজ সাহেব বললেন, "বেশ, আমি তাকে কোর্টের সাক্ষী (courtwitness) হিসাবে ডাকব—সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসাবে নয়। তা'হলে আপনিও তাকে প্রয়োজন হ'লে জেরা করতে পারবেন, অপর পক্ষও জেরা করতে পারবে। কাল ঠিক এগারটার সময় সে যেন হাজির থাকে।"

এই ব'লে জজ সাহেব উঠে চলে গেলেন।

হরিশ আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, "আবার এক মুস্কিল হ'ল দেখছি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এর মানে কি হরিশ? সাবিত্রীকে আবার সাক্ষী ডাকা হচ্ছে কেন?

হরিশ বললে, "আমার মনে হয় জজ সাহেবের মনোভাব তোমার প্রতি ভাল নয়। তাঁর বোধ হয় বিশ্বাস তুমি আসলে দোষী। অথচ সাক্ষী

প্রমাণের বর্ত্তমান অবস্থায় তোমাকে শাস্তি দেওয়া ঠিক হবে না। তাই একবার সাবিত্রীকে ডেকে শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবেন। তা ছাড়া আরও বোধ হয় একটা কারণ আছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি? কি?"

হরিশ বললে, "সাবিত্রীকে বোধ হয় একবার দেখতেও চান জজ সাহেব। অপর পক্ষের কথা ত জান? সাবিত্রীকে নিয়েই যত গোলমাল। তারই জন্য তুষার শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ী চ'লে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাই তাকে দেখলে এসব কথার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কতকটা সঠিক ধারণা করতে পারবেন ব'লে জজ সাহেবের বিশ্বাস।"

ভীত হ'য়ে বললাম, "এখন কি হবে হরিশ?"

হরিশ বললে, "দেখা যাক। আজ রাত্রে একবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখি সাবিত্রীকেও কোনও রকমে একটা খবর পাঠাতে পারি কিনা। সে যদি এসে বলে 'আমার কিছু মনে নাই'—তাহ'লেই ব্যাপারটা যায় চুকে।"

তারপর নিজে মনেই যেন বললে, "তবে আজ রাত্রে সাবিত্রীকে ওরা বিশেষ কড়া পাহারায় রাখবে, আমাদের কাউকে সহজে ঘেঁসতে দেবে না। যাক—জেরা ত আছেই।"

এই ব'লে হরিশ চলে গেল। শেষ পর্যন্ত আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে—সাবিত্রীর কথার উপরে।

পরের দিন বেলা এগারটা আন্দাজ সাবিত্রী এসে নত মস্তকে দাঁড়া[illegible] সকলের চক্ষের সম্মুখে, স্তব্ধ আদালত গৃহে,—আমারই বিরুদ্ধে খুনে[illegible] অপরাধ প্রমাণ করবার জন্য তাকেই হ'ল প্রয়োজন। অদৃষ্টের এই সকরু[illegible] পরিহাসে স্তম্ভিত হ'য়ে একদৃষ্টে রইলাম চেয়ে।

ইতিমধ্যে হরিশকে ডেকে চুপি চুপি প্রশ্ন করেছিলাম—সাবিত্রীকে[illegible] কোনও রকম খবর পাঠানর সুবিধা হয়েছিল কিনা। হরিশ বলেছিল যে, [illegible] একেবারেই কৃতকার্য হয়নি। কোনও কথাবার্তা বলা ত দূরের কথা সাবিত্রীর সঙ্গে চোখাচোখী হওয়া পর্যন্ত সুযোগ দেয়নি সরকার পক্ষ—এ[illegible] কড়া পাহারায় রেখেছিল, আগের দিন রাত্রে।

সাবিত্রীর সাক্ষ্য এ ক্ষেত্রে আইন অনুসারে নেওয়া চলে কিনা এই নিয়ে[illegible] আমাদের ব্যারিষ্টারের সঙ্গে সামান্য কিছু আলোচনার পর সাবিত্রীকে প্র[illegible] করতে সুরু করলেন জজ সাহেব স্বয়ং। প্রথমেই বেশ কড়া সুরে সাবিত্রীকে[illegible]

স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সে সত্য কথা বলবার হলপ নিয়েছে আদালতে—মিথ্যা যেন সে না বলে, কোনও কথা যেন গোপন না করে।

তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে সাবিত্রী সহজ ভাবেই ব'লে গেল যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘাটের পাড়ে সে উপস্থিত ছিল, যখন আলী মিঞা দুই-তিনটী লোক নিয়ে ঘাটের পাড়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে।—

জজ সাহেব তখন সাবিত্রীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এইবার বলুন ত—ঠিক সত্য কথা বলবেন, সেদিন ঘাটের পাড়ে কিছু টাকাকড়ি দেওয়া নেওয়া হয়েছিল কি?"

সাবিত্রী একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল! সবাই চেয়ে রইল একদৃষ্টে সাবিত্রীর মুখের পানে। সাবিত্রী যে আদালতে মিথ্যা কথা বলবে না—এ ধারণা আমার ছিল, কিন্তু তবুও জানি না, সাবিত্রীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে, প্রাণে যেন হঠাৎ একটু আশার উদ্রেক হ'ল—হয় ত এইবার সাবিত্রী মিথ্যা দিয়ে সত্যটুকু দেবে চাপা। বুদ্ধিমতী সে, বুঝতে কি পারেনি যে এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে আমার জীবন মরণের প্রশ্ন নিবিড় ভাবে জড়িত?

বুঝতে পেরেছিল কিনা জানি না, কিন্তু উত্তর দিল।

উত্তর দিল "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন হ'ল, "কে কাকে টাকা দিয়েছিল?"

উত্তর, "আলী মিঞার সঙ্গে যে লোকগুলি এসেছিল. টাকাটা তাদের দেওয়া হয়েছিল।"

প্রশ্ন, "কে দিয়েছিল?"

সহজভাবেই উত্তর দিল, "আলী মিঞা।"

একটু জোরের সঙ্গে প্রশ্ন, "ঠিক মনে ক'রে দেখুন টাকাটা সুশান্ত দেয়নি কি?"

সাবিত্রী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার প্রশ্ন হ'ল, "বলুন?"

উত্তর, "আলী মিঞাই দিয়েছিল।"

জজ সাহেব গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ কি সব কাগজপত্র দেখতে লাগলেন তারপর মুখ তুলে আবার প্রশ্ন করলেন, "টাকাটা দেওয়ার সময় কোনও কথাবার্তা হয়েছিল?"

উত্তর, "হয়েছিল।"

বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল সাবিত্রী ত একটাও মিথ্যা কথা বলেনি, কাজেই সত্য কথাই বলবে—আমি ত কোনও কথা বলিনি সে সময়।

প্রশ্ন, "কে কথা বলেছিল?"

একটু ভেবে উত্তর, "তা' ত মনে নাই।"

প্রশ্ন, "কি কথাবার্তা হয়েছিল, তা মনে নাই।"

জজ সাহেব মুখ নীচু ক'রে কাগজপত্র দেখতে দেখতে আবার কি ভাবতে লাগলেন। তারপর মুখ তুলে সরকারী উকীলের দিকে চেয়ে বললেন, "আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নাই এবার আপনার কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে ত করুন।"

সরকারী উকীল উঠে দাঁড়িয়ে সাবিত্রীকে জেরা করতে সুরু করলেন—

প্রশ্ন, "টাকাটা কেন দেওয়া হ'ল কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কি?"

সাবিত্রী মুখ তুলে সরকারী উকীলের দিকে চেয়ে রইল—কোনও উত্তর দিল না।

বিদ্রূপাত্মক স্বরে প্রশ্ন, "কথাবার্তা ত কিছুই মনে নেই, টাকাটা কেন দেওয়া হ'ল কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কি?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "কৌতূহল হয়নি? রাত্রে চুপি চুপি কতকগুলো লোককে টাকা দেওয়া হচ্ছে—কেন, কি ব্যাপার, জানবার কৌতূহল হয়নি?"

উত্তর, "হয়েছিল, কিন্তু বুঝতে পারিনি।"

প্রশ্ন, "বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "আপনি কাউকে কোনও কথা ঐ নিয়ে জিজ্ঞাসা করেননি?"

উত্তর, "না।"

প্রশ্ন, "কেন? কৌতূহল হ'ল অথচ বোঝবার চেষ্টা করলেন না—কেন?"

উত্তর, "কি চেষ্টা করব?"

প্রশ্ন, "এই ধরুণ কেন টাকাটা দেওয়া হ'ল সুশান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা ত করতে পারতেন?"

সাবিত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

জোরের সঙ্গে প্রশ্ন, "উত্তর দিন আমার কথার? কেন টাকাটা দেওয়া হ'ল, সুশান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করেননি কেন?

উত্তর "আমি কেন জিজ্ঞাসা করব ? বলবার হলে উনি নিজেই বলতেন।"

প্রশ্ন, "তাহ'লে এমন ব্যাপার যা আপনার কাছেও উনি গোপন করেছেন, কেমন ?"

সাবিত্রী নীরব।

ধমকের সুরে প্রশ্ন, "চুপ ক'রে আছেন কেন ? উত্তর দিন।"

জজ সাহেব তখন কথা কইলেন।

সরকারী উকীলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তা এ প্রশ্নের উত্তর সাক্ষী কি ক'রে দেবে ? আমার মনে হয়, এ সব নিয়ে আপনি বৃথাই জেরা করছেন। সাক্ষী যতটুকু যা জানে সত্যকথা বলেছে বলেই আমার বিশ্বাস। পুলিশের কাছে জবানবন্দির সঙ্গে এখানে তার কোনও কথার বিশেষ কোনও অনৈক্য নেই এবং সাক্ষী যে কোনও কথা ইচ্ছে ক'রে গোপন করেছে—সাক্ষীকে দেখে এবং তার কথা শুনে আমার ত একেবারেই মনে হয় না।"

সরকারী উকীল বিনীতভাবে বললেন, "আমার কথা হচ্ছে, সেদিন ঘাটের পাড়ে কি সব কথাবার্তা হয়েছিল সাক্ষীর সবই মনে আছে ; ইচ্ছে ক'রে গোপন করেছে সুশান্তবাবুকে বাঁচাবার জন্য।

জজ সাহেব একটু মৃদু হেসে বললেন, "ইচ্ছে হয় আপনি সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্তু তাতে ক'রে আপনার মোকদ্দমার সুবিধা হবে কি ? সাক্ষী সব ব্যাপারই জানে—এই যদি আপনার কথা হয়, তাহ'লে ত আইন অনুসারে সাক্ষীর কথার মূল্য অনেকটা যায় কমে, কেননা তাহ'লে ত সাক্ষী যাকে বলে accomplice আইনের চক্ষে তাই হ'য়ে দাঁড়ায়।"

আমাদের ব্যারিষ্টার খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলেন এবং সরকারী উকীল একটু যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে "বেশ আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই না" বলে বসে পড়লেন।

আমাদের ব্যারিষ্টার উঠে দাঁড়ালেন সাবিত্রীকে জেরা করবার জন্য।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কথার দায়িত্ব কতখানি আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন ?"

সাবিত্রী একবার মাত্র চোখ তুলে ব্যারিষ্টারের মুখের দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার প্রশ্ন, "সুশান্তবাবুর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ, ফাঁসি হ'তে পারে আপনি নিশ্চয়ই জানেন ?"

একটু চুপ ক'রে থেকে শান্ত গলায় উত্তর, "জানি।"

প্রশ্ন, "সুশান্তবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়নি ব'লেই, প্রমাণ করবার জন্ম আপনাকে ডাকা হয়েছে ; এখন একমাত্র আপনার কথার উপরেই সুশান্তবাবুর জীবন-মরণ নির্ভর করছে—এটা আপনি জানেন কি ?"

সাবিত্রী মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

প্রশ্ন, "এইবার ত বুঝতে পারছেন আপনার কথার দায়িত্ব কতখানি ?"

সাবিত্রী নীরব।

মধুর গলায় প্রশ্ন "উত্তর দিন আমার কথার। বুঝতে পেরেছেন ত ?"

ভারী গলায় উত্তর—"বুঝতে পেরেছি।"

প্রশ্ন, "এখন একটা সোজা উত্তর দিন ত, এই যে ঘাটের পাড়ে টাকা দেওয়ার কথা বললেন, এটা পুলিশ আপনাকে ভয় দেখিয়ে বলিয়েছে—কেমন ?"

সাবিত্রী স্তব্ধ হ'য়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

আবার প্রশ্ন, "পুলিশ এ মোকদ্দমায় আপনাকেও গ্রেপ্তার করবার ভয় দেখিয়ে, সুশান্তবাবুর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণ জন্মই ঐ কথাটুকু আপনাকে দিয়ে বলিয়েছে—না ?"

সাবিত্রী নীরব।

আবার প্রশ্ন, "আসলে কথাটা বানান, মিথ্যা—না ? সুশান্তবাবু ঘাটের পাড়ে কোনও টাকাকড়ি দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে ছিল না—কেমন ?"

সাবিত্রী প্রস্তর মূর্তির মত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, কোনও উত্তর দিল না। আমাদের ব্যারিষ্টার একটু ঝুঁকে সাবিত্রীর দিকে একদৃষ্টে রইলেন চেয়ে উত্তরের আশায়, প্রতীক্ষার উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যে দ্রুতস্পন্দনে যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল।

আবার প্রশ্ন, "এখানে আপনার কোন ভয় নেই। উত্তর দিন আমার কথার। সুশান্তবাবুর বিরুদ্ধে ঐ কথাটুকু মিথ্যা—না ?"

ব্যাকুলভাবে উত্তর—"আমি কি বলব ?"

জজ সাহেব তখন কথা কইলেন।

বললেন—"আপনি সত্য যা তাই বলবেন। আপনি সত্যকথা বলার শপথ নিয়েছেন এখানে—ভগবান সাক্ষী।"

কাতরভাবে উত্তর, "আমি ত মিথ্যা বলিনি।"

হায়রে। জীবনের এই দারুণ মুহূর্তে, আমারই প্রাণের বিনিময়ে একটী মাত্র মিথ্যা কথা—তাও সাবিত্রী আমাকে ভিক্ষা দিল না।

আমাদের ব্যারিষ্টার সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাবিত্রীর পানে তাকিয়ে রুক্ষভাবে প্রশ্ন করলেন, "মিথ্যা কথা জীবনে বলেন না বুঝি কখনও?"

সাবিত্রী নীরব।

ধমকের স্বরে প্রশ্ন, "উত্তর দিন আমার কথার। জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেছেন?"

অস্ফুট স্বরে উত্তর—"হয় ত বলেছি—মনে নাই।"

প্রশ্ন, "আপনার শ্বশুরবাড়ী ত পাবহাটি গ্রাম?"

অস্ফুট স্বরে উত্তর, "হ্যাঁ।"

জোরের সঙ্গে প্রশ্ন, "সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছেন?"

সাবিত্রী নীরব।

আবার প্রশ্ন, "আপনার চরিত্রের জন্য সেখানে থেকে তারা তাড়িয়ে দিয়েছে আপনাকে—কেমন?"

সাবিত্রী নীরব।

কিন্তু এ সব কি হচ্ছে! হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে কেমন কেঁপে উঠল। বুঝতে আমার দেরী হ'ল না যে, আমাদের ব্যারিষ্টার এইবার দশ জনার চক্ষের সম্মুখে সাবিত্রীর নিদারুণ ঘৃণ্য চরিত্র কলুষিত ক'রে প্রতিপন্ন করতে চান যে, সাবিত্রীর মত স্ত্রীলোকের পক্ষে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যাকথা দিয়ে আমার সর্বনাশ করা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কেননা বোঝাতে চান, একটা পাতান ভাই-বোন সম্পর্ক ছাড়া আমার সঙ্গে সাবিত্রীর সত্যিকারের প্রাণের বন্ধন ত কিছুই ছিল না।

ধমকের সঙ্গে প্রশ্ন, "বলুন চুপ ক'রে আছেন কেন? চরিত্রের দিক দিয়ে ভদ্রপরিবারের বাসের অনুপযুক্ত ব'লেই আপনার শ্বশুর বাড়ীর লোক আপনাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে—না?"

সাবিত্রী এবার চোখ তুলে চাইল! সেই চোখ দুটো—জলে ভরা। আকুলভাবে তাকাল সোজা আমারই পানে—এই বিপদে যদি আমার মধ্যে কোনও কূল পায়!

কি তার অপরাধ? সত্য কথা বলেছে? হঠাৎ আমার কি হ'ল জানি না—হরিশকে ডেকে পাঠালাম।

বললাম, "হরিশ! সাবিত্রীকে জেরা তোমরা বন্ধ ক'রে দাও—সাবিত্রীকে জেরা করার প্রয়োজন নাই।"

হরিশ বললে, "সে কি কথা? তুমি কি পাগল হ'লে নাকি?"

বললাম, "না। সাবিত্রীকে অযথা অপমানে অপদস্থ ক'রে আমি আমার মুক্তি চাই না। যদি তোমরা জেরা বন্ধ না কর—আমি জজ সাহেবের কাছে বলব যে, সাবিত্রীর কথা সমস্ত সত্য।"

হরিশ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনও কথা না ব'লে ব্যারিষ্টারের কাছে গেল চলে। দু'জনে একটু পরামর্শ করার পর ব্যারিষ্টার সাবিত্রীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "শুনুন আমি আপনাকে বলতে চাই, এই ঘাটের পারে টাকা দেওয়ার কথাটা মিথ্যা—পুলিশের ভয়ে আপনি বলতে বাধ্য হয়েছেন।"

এই ব'লে আর কোনও জেরা না ক'রে বসে পড়লেন।

সাবিত্রী তখনও চেয়েছিল সোজা আমারই মুখের দিকে—অপলক নেত্রে।

জজ সাহেব সাবিত্রীকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, কিন্তু সাবিত্রী নড়ল না—স্তব্ধভাবে চেয়ে রইল, আমারই পানে। হঠাৎ এ কি হ'ল? তার চোখের চাহনি কেমন যেন অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল আমার, এবং সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশে আকুল ভাবে চাইতে লাগল—কি যেন কি খুঁজে নিতে চায়। বোধ হয় ক্ষণেকের তরে কোথাও একটু বসতে চেয়েছিল, বোধ হয় চেয়েছিল কোনও রকমে নিজেকে একটু সামলে নিতে, কেননা পর মুহূর্তেই সশব্দে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেল—সাক্ষী-মঞ্চের তলায় মেঝের উপরে।

* * *

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যখন সাবিত্রীর জ্ঞান হ'ল না, তখন জজ সাহেবের আদেশে সাবিত্রীকে সদর হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল। জজ সাহেব নিজে জেলার বড় ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখে দিলেন যে, সাবিত্রীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার যেন কোনও ত্রুটী না হয়।

বিচার আবার সুরু হ'ল। জজ সাহেব তখন আমাকে এবং একে একে আলী মিঞা ও নফরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সাক্ষী প্রমাণ শুনে আমাদের কিছু বলবার আছে কিনা। জজ সাহেবের উত্তরে কি বলব না বলব হরিশ আগেই আমাদের শিখিয়ে রেখেছিল। আমি বললাম, "আমি নির্দোষী; আর কিছু বলতে চাই না।" আলী মিঞা বললেন যে, খুনের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগই নেই এবং খুনের জন্য তিনি একেবারেই দায়ী নন্। বললেন যে, তিনি পল্তায় গিয়েছিলেন গজুকে সেখান থেকে, যদি প্রয়োজন হয় ত, একটু জোর দেখিয়ে নিয়ে আসবার জন্য, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়, এবং

গন্টুকে নিয়ে আসবার সময় দাদার আক্রমণে গোলাপ মণ্ডলের সঙ্গে দাদার ধ্বস্তাধ্বস্তিতে দাদা কি ভাবে খুন হয়েছেন, গোলাপ মণ্ডলই বলতে পারে—আলী মিঞা তা জানেন না, কেননা, আলী মিঞা আগেই গন্টুকে নিয়ে নৌকায় এসে উঠেছিলেন, পিছন ফিরে খুনের ব্যাপার তিনি দেখেনইনি কিছু। নফর শুধু "নির্দোষী" ছাড়া আর কিছু বলেনি।

আমাদের কৈফিয়ৎ শেষ হ'লে সরকারী উকীল, সরকার পক্ষের দিক দিয়ে মোকদ্দমার জুরীদের বোঝাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রায় দু'ঘণ্টা কাল ধরে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে নানান ভাবে আলোচনা ক'রে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে এই মোকদ্দমাটীতে আমরা তিনজনেই যে দোষী সে বিষয় কোনও দিক দিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। আমাদের পক্ষের কথা, আলী মিঞার কথা বিদ্রূপ ক'রে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন যে, একটি শিশুকে স্বামী-পরিত্যক্তা অসহায় মার বুক থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য রাত্রিকালে তিন-চারজন গুণ্ডার সশস্ত্র অবস্থায় যাওয়ার যে কি প্রয়োজন, তাঁর ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তা তিনি ধারণাই করতে পারেন না। বললেন, শুধু ছেলেকে আনাই যদি উদ্দেশ্য হ'ত, তাহ'লে দিনের বেলায় বাপ একজন চাকর নিয়ে গেলেই হ'ত যথেষ্ট কেননা, বাপ ছেলেকে আনতে গেলে তার বিরুদ্ধে একমাত্র সন্তানের জননীর রোদন ছাড়া আর কারও কোনও প্রতিবাদ সম্ভবই হ'ত না। আমি যে খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম, সে বিষয় জুরীদের জলের মত বুঝিয়ে দিলেন। আমি এর মধ্যে না থাকলে আলী মিঞা বা তিন-চারজন গুণ্ডায় দাদাকে অযথা খুন করবার কোনও উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না এবং সে ভরসাও তাদের হ'ত না কখনই। এই সম্পর্কে সাবিত্রীর সাক্ষ্য উল্লেখ ক'রে বললেন যে, সাবিত্রী সত্য কথাই বলেছে এবং সাবিত্রীর কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহ'লে রাত্রিকালে অন্ধকারে ঘাটের পাড়ে তিন-চারিজন গুণ্ডাকে চুপি চুপি টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য, নিজের সন্তানকে নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা—এত বড় অসম্ভব কথা কোনও পাগলকেও বিশ্বাস করতে বলা চলে না, তা সে টাকাটা সুশান্তবাবু নিজে হাতে ক'রেই দিক বা আলী মিঞাই হাতে ক'রে দিন! এবং এদিক দিয়ে গোলাপ মণ্ডলকে অবিশ্বাস করার কোনও সঙ্গত কারণই নেই। তুষারের কথা তুলে বললেন যে, তুষার সত্য সত্যই অভাগিনী, সম্ভ্রান্ত বংশের বড় ঘরের বধূ সে, অবস্থার বিপর্যয়ে তাকে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হয়েছে, খুনের মোকদ্দমায় প্রকাশ্য আদালতে; কিন্তু সে যে সত্যকথা বলেছে সে বিষয়ে তাকে দেখে কারো মনে

কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা এত বড় গল্প মিথ্যা, ক'রে বানিয়ে আগাগোড়া বলা একি তার মত অশিক্ষিত বাঙালী ঘরের কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভব? জুরীরাও ত বাঙালী, তাঁরাও ত স্ত্রী, কন্যা, মাতা, নিয়ে ঘর-সংসার করেন, তাঁরাই বিবেচনা ক'রে দেখুন। সত্যকথা বলেছে সে, সরকারী উকীল জোর গলায় বললেন। কেননা, সত্য তার পক্ষে নিদারুণ, সত্য তার পক্ষে মর্মান্তিক, সত্যকে চাপা দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, তার পক্ষে সাধ্যাতীত। বক্তৃতার শেষের দিকে জুরীদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, তাঁদের কর্তব্য সমাজের দিক দিয়ে, মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে, ন্যায়-ধর্মের দিক দিয়ে! বুঝিয়ে দিলেন—বিচারাসনে বসেছেন তাঁরা—তাঁদের একমাত্র কর্তব্য বিচারই করা, তা সে বিচার যতই কঠোর হোক, যতই কঠিন হোক।

সরকারী উকীলের বক্তব্য শেষ হ'লে আমাদের ব্যারিষ্টার উঠে দাঁড়ালেন।

প্রথমেই জুরীদের বললেন যে, ন্যায়ধর্মের দিক দিয়ে, মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে তিনিও বিচারই চান—তবে সুবিচার, অবিচার নয়। বিচারের কতকগুলি আইনসঙ্গত পদ্ধতি জুরীদের বুঝিয়ে দিয়ে বললেন যে, বিচারের নামে কত নির্দোষী লোক বারে বারে শাস্তি পেয়েছে, এমন কি ফাঁসী পর্যন্ত হয়েছে, জগতের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের ত অভাব নেই। বিলাতে জুরীর বিচারে খুনের অপরাধে একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ের কেমন ক'রে ফাঁসী হয়েছিল এবং পরে কি ভাবে প্রকাশ হ'ল যে মেয়েটি ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষী—এই গল্পটী সুন্দর ভাবে মনোরম ভাষায় জুরীদের বুঝিয়ে দিয়ে বললেন যে, ফৌজদারী বিচারে আসামীদের দোষ সম্বন্ধে এতটুকুও সন্দেহ যদি জুরীদের প্রাণে উপস্থিত হয়, তাহ'লে তাঁরা আসামীদের নির্দোষী বলতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গেই বারে বারে মনে রাখতে বললেন, ফৌজদারী আইনের সেই সনাতন বাণীটি—প্রমাণ অভাবে দশটা দোষী লোক যদি মুক্তি পায় ত পাক, কিন্তু ভুল বিচারে একটি নির্দোষী লোকেরও যেন শাস্তি না পায়।

মোকদ্দমাটির সাক্ষী প্রমাণের বিষয় নানান দিক দিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ধরে নানান ভাবে আলোচনা ক'রে আমাদের ব্যারিষ্টার প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে, এ মোকদ্দমাটীতে আমাদের কারো বিরুদ্ধেই দোষ প্রমাণিত হয়নি। গোলাপ মণ্ডলের কথা যে একেবারেই বিশ্বাস করা চলে না, নানান দিক দিয়ে, তার কথা নিয়ে আলোচনা ক'রে নানান যুক্তি-তর্কের অবতারণা ক'রে, জুরীদের দিলেন বুঝিয়ে। বললেন, একটা বড়

কথা, একটা অতি সহজ কথা জুরীরা যেন ভুলে না যান যে খুনের উদ্দেশ্যে মানুষ মানুষকে এভাবে খুন করে না, খুনের উদ্দেশ্যে খুন হয় গোপনে, যথাসম্ভব সব দিকের সমস্ত প্রমাণ বাঁচিয়ে। বললেন, দাদাকে খুন করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহ'লে এভাবে স্পষ্টাস্পটি ছেলে আনতে গিয়ে দাদাকে কখনই খুন করা হ'ত না, কেননা সেক্ষেত্রে যে এ খুনের জন্য আমরাই দায়ী হব একথা ত নেহাৎ মূর্খও বুঝতে পারে—আমি কিম্বা আলী মিঞা কি সেটুকুও বুঝতে পারিনি? কাজেই, এ খুন সব দিক বিবেচনা ক'রে ষড়যন্ত্রের ফলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে হয়নি এ খুন হয়েছে হঠাৎ একটা দৈব-দুর্ঘটনার মত, বিনা কারণে, কোনও একটা সাময়িক উত্তেজনার ফলে। এবং তা যদি হয়, আমাদের ব্যারিষ্টার জুরীদের বেশ সহজ ভাবেই বুঝিয়ে দিলেন, তাহ'লে সরকার পক্ষের কথা, অর্থাৎ গোলাপ মণ্ডলের গল্পটা কখনই সত্য নয়, হতে পারে না—একটা মিথ্যা বানানো গল্প, সুশান্তবাবুকে বিপদে ফেলার জন্যই এ মোকদ্দমার উপযোগী ক'রে তৈরী করা হয়েছে। এবং এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আসামীদের পক্ষের কথাগুলিই যে সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই!

এত বড় মিথ্যা গল্প আমার বিরুদ্ধে কে বানিয়েছে, কেন বানিয়েছে, এই এই প্রসঙ্গে তুষারবালার সাক্ষ্য নিয়ে তীব্র সমালোচনা সুরু করলেন আমাদের ব্যারিষ্টার। তাঁর জেরার প্রত্যেক কথাটি ধরে ধরে আলোচনা ক'রে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন যে, এরকম অনর্গল মিথ্যাকথা খুনের মোকদ্দমায় এতটুকু ইতঃস্তত না ক'রে যে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অনায়াসে বসে ব'লে যেতে পারে, তার তুলনা জগতের মেয়েদের সমাজেই অত্যন্ত বিরল—আমাদের বাঙ্গালী ঘরের মেয়েদের কথা এ ক্ষেত্রে ওঠেই না। তুষারবালার মত মেয়ের সঙ্গে আমাদের ব্যারিষ্টার বললেন, জুরীদের বাড়ীর মেয়েদের তুলনা ক'রে সরকার পক্ষের উকীল জুরীদের বাড়ীর "মালক্ষ্মীদের" অপমানই করেছেন, সম্মান দেখাননি। সংসারের পক্ষে, সমাজের পক্ষে, এরকম স্ত্রীলোক মূর্তিমতী 'অভিশাপ' এবং এরকম 'অভিশাপ' ভগবান করুন, জুরীদের বাড়ীতে যেন কখনও না আসে। সরকারী উকীলের কথার প্রতিবাদে আমাদের ব্যারিষ্টার তাঁর মনের এই একান্ত শুভ কামনাটিও জুরীদের দিলেন জানিয়ে। শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গেই জুরীদের বুঝিয়ে দিলেন যে, তুষারের মত স্ত্রীলোকের কাছ থেকে তার সন্তানকে আনা—এই কার্যটা সরকারী উকীল যতটা সহজ মনে করেন ঠিক ততটা সহজ নয়; কেননা, রোদন সম্বল বাঙালী ঘরের

মেয়ের সঙ্গে তুষারের কোন দিক দিয়েই ঠিক তুলনা করা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে জুরীদের এটাও বুঝিয়ে দিলেন যে, তুষারের মতন মাতার কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে আনার মধ্যে একমাত্র শুভ কামনা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দে বা স্বার্থ ছিল না বা থাকতে পারেও না, যতই পাষণ্ড আমাকে সরকার পক্ষে উকীল আমাকে মনে করুন না কেন। তারপর, সন্তানকে জোর ক'রে কেড়ে আনা ও আমার সঙ্গে নিদারুণ মনোমালিন্যের দরুণ, আমারই রূপবতী স্ত্রীরও আমারই চিরদিনের শত্রু মুকুন্দর এক সঙ্গে যোগাযোগে, কি উদ্দে এই মিথ্যা খুনের ষড়যন্ত্রের গল্পটি তৈরী হ'ল, কেমন ক'রে তাকে উদ্দে প্রণোদিত করা হ'ল একটি মিথ্যা কুৎসিত সন্দেহের কথা সৃষ্টি ক'রে—জুরীদে জলের মত বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন আমাদের ব্যারিষ্টার।

এই প্রসঙ্গেই সাবিত্রীর সাক্ষ্য নিয়ে আলোচনা ক'রে বললেন সাবিত্রীর কথা জুরীরা বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আমার পক্ষ থেকে মোকদ্দমায় তাতে বিশেষ কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। সাবিত্রীর কথা যদি জুরীরা অবিশ্বাস করেন এবং আমাদের ব্যারিষ্টার নানা রকম যুক্তির অবতারণ ক'রে দেখালেন যে সাবিত্রীর কথা অবিশ্বাস করাই সমীচিন, তাহ'লে আমার বিরুদ্ধে এ মোকদ্দমার কোনও প্রমাণও থাকে না। অপর পক্ষে সাবিত্রীর কথা যদি জুরীরা বিশ্বাস করেন, তাহ'লেও খুনের ষড়যন্ত্রে সন্তোষজনক প্রমাণ কি ঐ একটি কথার মধ্যেই নিঃসন্দেহে পাওয়া যায় টাকাটা দেওয়া হয়েছিল, আমাদের ব্যারিষ্টার বললেন, ঠিক সন্ধ্যার সময় প্রকাশ্য জায়গায়, গোপনও নয়, গভীর রাত্রেও নয়, এবং টাকাটা যে কে দেওয়া হয়েছিল, তার কোনও প্রমাণ সাবিত্রীর কথার মধ্যে একেবারেই নাই টাকাটা যদি দেওয়া হয়ে থাকে ত দেওয়া হয়েছিল, নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণে এবং যে কারণই দেওয়া হোক, খুনের উদ্দেশ্যে যে হয়নি এটা নিশ্চিন্ত কেননা, যদি খুনের উদ্দেশ্যে টাকাটা দেওয়া হ'ত, তাহ'লে টাকাটা দেওয় হত অতি গোপনে চুপি চুপি সাবিত্রীকে জানিয়ে কাথাবার্ত্তা ব'লে প্রকাশ্যে টাকাটা দেওয়ার ত কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, আমাদের ব্যারিষ্ট পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন—সাবিত্রী যে খুনের ষড়যন্ত্রে ছিল না সে ত সর্বব সম্মত; এবং সেটা আদালতে তার কথা শুনে কারোরই অবিশ্বাস করা কোন কারণ নাই। অপর পক্ষে, আমাদের ব্যারিষ্টার জোর গলায় বললেন সাবিত্রীর সঙ্গে সুশান্তবাবুর যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা সরকার পক্ষ বলেন, যদি সত্য হ'ত তাহ'লে সাবিত্রীর কি এ জগতে তার একমাত্র আশ্র

প্রাণের একমাত্র অবলম্বন সুশান্ত তারই বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড আদালতে, সমস্ত পরিণাম উপলব্ধি ক'রে ওরকম সাক্ষী দেওয়া—একি কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভব? সত্য কথা বলবারও ত একটা সীমা আছে? বললেন, সাবিত্রী আদালতে এসে শুধু এইটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণ ক'রে দিয়ে গেল যে, তাকে নিয়ে সরকার পক্ষের গল্পটি বানান, মিথ্যা—সাবিত্রীর কথার মধ্যে আর কিছুই প্রমাণ হ'ল না।

আমাদের ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা শেষ হ'তে প্রায় সাড়ে-পাঁচটা বাজল এবং সেদিনকার মত বিচার বন্ধ ক'রে জজ সাহেব উঠে চলে গেলেন। তাঁর বক্তৃতার শেষের দিকটায় জুরীদের প্রতি একটা তীব্র প্রাণস্পর্শী আবেদন সত্যই আমাকে বিশেষ অভিভূত করেছিল—আমি আজও ভুলিনি। বলেছিলেন তিনি "মানুষের মনের নিভৃত গহন তলের ব্যথা অনুভূতির খবর জগতে কেই বা রাখে? কতখানি মর্ম বেদনায় কতখানি নিরুপায় অবস্থায়, মানুষ নিজেরই স্ত্রীর কাছ থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে আনতে বাধ্য হয়, সেই সন্তানেরই মঙ্গলের জন্য তাকে মাতৃহারা করে, তার সেই আকুল বেদনার সমস্ত শেল তুলে নেয় নিজেরই বুকে, সেটুকু বোঝার মত সহানুভূতি, দরদ তাই বা জগতে আছে ক'জনার? প্রত্যেক পদক্ষেপে, প্রত্যেক কথায়, মানুষ মানুষকে ভুল বোঝে, ভুল বিচার করে। ভুলে যায় আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক, যা সহজ, অবস্থার বিপর্যয়ে আমারই পাশের মানুষটির পক্ষে সেইটেই হ'য়ে ওঠে অস্বাভাবিক, সেইটেই আর সহজ নয়। তাই ত বলি মানুষের বিচার—সে ত কখনই শেষ বিচার নয়। সে বিচার, সুবিচার না অবিচার, তারও একদিন বোঝাপড়া হবে—নিশ্চয়ই হবে, সেই আমাদের শেষ বিচারকের শ্রীচরণে!"

পরের দিন আবার বিচার সুরু হ'ল বেলা ১১টায়। সেইদিনই বিচারের শেষ দিন। সাবিত্রী কেমন আছে কে জানে—সকাল থেকেই মনটা যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, একটা নিরাসক্ত অবসন্ন মনোভাব। জেল থেকে আদালতে এসে, হরিশ আসা মাত্র, তাকে সাবিত্রীর খবর জিজ্ঞাসা করেছিলাম —সে কিছুই জানে না।

জজ সাহেব এলেন; তিনি সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ বিশ্লেষণ ক'রে নিজের মতামত দিয়ে জুরীদের বিস্তারিত বুঝিয়ে দেবেন—এ মোকদ্দমায় সেইটুকুই এখন বাকী। তারপরই জুরীরা দেবে "রায়"—দোষী কি নির্দোষী।

তিনি এলেন, বসলেন নিজের আসনে, গম্ভীর মুখে হরিশ ও সরকারী

ডেকে বললেন, "জেলার ডাক্তার সাহেব আমাকে খবর পাঠিয়েছেন সাবিত্রী আজ সকালে মারা গেছে—হাঁসপাতালেই। অতিরিক্ত মানসিক মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়ে গিয়েই সে আদালতে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল। আর তার জ্ঞান হয়নি। এখন তার সৎকারের কি ব্যবস্থা হবে ডাক্তার সাহেব জানতে চেয়েছেন।"

হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলাম, "হরিশ! ভাই! তুমি যাও। যথাবিহিত তার সৎকারের ব্যবস্থা কর। তার আর কেউ নেই জগতে।"

জজ সাহেব তৎক্ষণাৎ হরিশকে অনুমতি দিলেন—হরিশ আদালত ছেড়ে চলে গেল।

সাবিত্রী নাই—আর সে ইহজগতে নাই!

* * * *

আচ্ছন্নের মত বসেছিলাম, আসামীর কাঠগড়ার মধ্যে—কতক্ষণ কে জানে। একটা কথা বুকের মধ্যে বারে বারে আছাড় খেয়ে মরছিল—"হাত ধরনা শান্তদা! না ধরলে কি পারি।" সামান্য পল্লীপথের একটা বাঁশের সাঁকো পেরুতে বহুকাল আগে সে একদিন আমার হাত ধরতে চেয়েছিল, আর আজ—ইহকাল পরকালের সেতু কেমন ক'রে সে পার হ'ল!

হঠাৎ হুঁস হ'ল। দেখলাম প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় কেটে গিয়ে জজ সাহেবের কথা শেষ হয়েছে। জুরীরা উঠে দাঁড়িয়েছেন—রায় দেবার পূর্বে পাশের একটা ঘরে গিয়ে নিজেদের মতামত একবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে নেবার জন্য। চেয়ে দেখলাম—ধীরে ধীরে চোখের জলে কখন যে আমার জামার খানিকটা একেবারে ভিজে গেছে, নিজেই টের পাইনি।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে জুরীরা এলেন ফিরে। একবাক্যে রায় দিলেন। সমস্ত আদালতে চাপা চাঞ্চল্যের মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেল—সকলেই দোষী।

জজ সাহেব জুরীদের মত গ্রহণ ক'রে আমাদের শাস্তি দিলেন। নফর ও আলী মিঞার প্রতি আদেশ হ'ল—'ফাঁসী'। হুকুমের সময় আলী মিঞা জোর ক'রে একবার আমার ডান হাতখানা চেপে ধরেছিলেন—আজ ভুলিনি।

আমার প্রতি আদেশ হ'ল—'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর'। ফাঁসী না দিয়ে দ্বীপান্তরের হুকুম দেওয়ার কারণ জজ সাহেব আমাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন সাবিত্রীকে দেখে, তার কথা শুনে এবং বিশেষ ক'রে জেরায় সাবিত্রীকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানর দরুণ, যদিও অবস্থার বিপর্যয়ে আমি

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলাম, তবুও ফাঁসী হওয়ার মতন সত্যিকারের পাষণ্ড আ... নই ব'লেই জজ সাহেবের বিশ্বাস হয়েছে।

জজ সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ!

## তিন

আমার কথা শেষ হ'ল। সুদূর দ্বীপান্তরে বসে, অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখা এই যে আমার জীবনের কাহিনী—কেন লিখলাম? জগতে কেউ আমার এ কাহিনী কখনও পড়বে কিনা জানি না—কিন্তু গস্নু? সেও কি কোন দিন পড়বে না?

ভগবান তার কল্যাণ করুণ! ইতি—!